সংখ্যা - ১—১২

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

CUL-H04364-33-P30640

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

33

অষ্টাবিংশ বর্ষ

১৯২৫

কলিকাতা,
২।১ রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩।এ, বাধাবাজার লেন, মণিকা প্রেসে
শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

P30640

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
	অ	
একলব্য উদ্ভিদ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে	৮৬৫
	আ	
আমাদের শিক্ষা	স্যার আশুতোষ চৌধুরী	৫৭০
আয়ুঃ ও কোষ	শ্রীশশধর রায়	৪৭
আলোচনা	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১১
আলোচনা	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৩৭০
আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির বিবাহ	শ্রীআজিমউদ্দীন আহম্মদ	৩৮, ১৫৪, ১৮৪
আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির আচার ব্যবহার	,,	৩৫৭
আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির কৃষিকার্য্য	,,	৪৩২
আর্য্য ও ইব্রীয় ভূমির উদ্ভিদতত্ত্ব	,,	৬৫০
আর্য্য ও ইব্রীয় নিবাসের জীবতত্ত্ব	,,	৭০০
	ঈ	
ঈশ	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য	৫১৯, ৬০১
	উ	
উত্তি ও পঞ্চজন	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৫০০
	ঋ	
ঋগ্বেদ আর্য্য ও অনার্য্য	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৭২৪
	ক	
কলিকাতার ইতিহাসের একাংশ	শ্রীআমানতউল্লাহ আহম্মদ চৌধুরী	৬৮১, ৮৫৩
কাকপিল (গল্প)	শ্রীনিধিরাম	৭৬৩
	খ	
খনা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৮৫

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
	গ	
গল্প-সাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৬
গায়ক পাখী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪২৯
গোরা (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৭৪৫
গোরা ও তাহার অবিনাশ	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	৬৪৩
গৌড়-প্রসঙ্গ	শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	২৬৪
	চ	
চন্দ্র-রশ্মি	শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	৫৬৭
চন্দ্রের বঙ্গবিজয়	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	৩০৯
চিরসুন্দরী (কবিতা)	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৫
চিড়িয়াখানা (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৮
	জ	
জিজিয়া	আবদুল কালাম মোহাম্মদ সামসুদ্দিন	৪২২
	ত	
তন্ত্রের ইতিহাস	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৪৬৫
তিমুর বুদ্ধি (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬৩১
	দ	
দুখে ঢুলী (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭১০
দুর্গোৎসবের ব্যাপার (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫৫০
	ন	
ন্যাসপাতি ও নবন্যাস	৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	২৩৬
নায়িকার শেষ কথা (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪২৮
নির্ব্বোধের শাস্তি (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
	প	
পরীর শ্রম (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	
প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দে	

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
প্রাচীন শিল্প-পরিচয়	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৫১, ৮২৫
প্রাণময় প্রেম (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭৪৪
পুরাতন বাটী (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১১৮
পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	২৯২, ৪১৩
পুরুষ যজ্ঞ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩১৩
ব		
বাঁশের কথা	শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন	৭৩৬
বিশু মল্লিকের অধঃপতন (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৫১
বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৬৪৮
বৈরাগী (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৬২
ভ		
ভারতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	২৪১
ভালবাসার আর এক ধারা (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩০২
ম		
মক্কা-ভ্রমণ	শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী	২০৭
মল্লারিসেবক	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	২৯৯
মানব-মঙ্গল	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৪১
মালবাবুর কোর্টশিপ (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৯৩
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	সম্পাদক ৭৬, ১৬০, ২৩৫, ৩০৪, ৩৮৭, ৪৫৭, ৫৩৫, ৬০৫, ৬৭৭, ৭৪৬, ৮২০, ৮৮৯	
র		
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের বিকাশ	শ্রীপ্রিয়লাল দাস	৮৬৮
রায় পরিবার (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১২৫, ৮৩০
শ		
শান্তি (গল্প)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	২১৫

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
	স	
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	সম্পাদক	৬১৫, ৮১৭
সঙ্গীত-ঔষধ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৬৬
সঙ্গীতশাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ	শ্রীআবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বি	৬২৫
সন্ধ্যার (কবিতা)	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২৭
সপ্ত-সিন্ধু	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৫৭৭
সমর্পণ (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫২৩
সমুদ্র-তীরে (গল্প)	শ্রীগুরুদাস সরকার	৪৮৪
সহযোগী সাহিত্য	শ্রীঅনন্তপ্রসাদ পাত্রী	৫৬, ১৩৮, ২০১ ২৮৬, ৩৮১, ৪৪১
সহযোগী সাহিত্য	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৬৫৬
সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয়	শ্রীমহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	৭৮৬
স্থাপত্য-শিল্প	শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১১১, ৬১৭
স্বাভাবিক রঙ্গে আলোক-চিত্র	শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫৯৩
সিন্দুর মা (গল্প)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৪৪৬
সোম যাগ	শ্রীরাগেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১
	হ	
হৃদয়-শ্মশান (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫৯, ১৪৩, ১৯০, ২৭৪, ৩৫০
হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র	স্যার আশুতোষ চৌধুরী	৮০৯
হিব্রু জাতির ধর্ম্মের মূল	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৭৫৩

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অম্বুপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহযোগী সাহিত্য ৫৬, ১৩৮, ২০১, ২৮৬, ৩৮১, ৪৪১

আজিমউদ্দীন আহম্মদ

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির বিবাহ ৬৮, ১৫৪, ১৮৪

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির আচার ব্যবহার ৩৫৭

র্য্য ও ইব্রীয় জাতির কৃষিকর্ম্ম ৪৩২

র্য্য ও ইব্রীয় ভূমির উদ্ভিদতত্ত্ব ৬৬৩

র্য্য ও ইব্রীয় নিবাসের জীবতত্ত্ব ৭০০

আবদুল গফুর সিদ্দিকা

মক্কা-ভ্রমণ ২০৭

আবদুল কালাম মোহাম্মদ সামসুদ্দিন

জিজিয়া ৪২২

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সঙ্গীতশাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ ৬২৫

আমানতউল্লা আহম্মদ

ম্বরূপের ইতিহাসের এক অংশ ৩৬১, ৮৪৩

আশুতোষ চৌধুরী

মাদের শিক্ষা ৫৭০

ইন্দুধর্ম্মের বীজমন্ত্র ৮০৯

উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লোচনা ২১১

সাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী ২২৬

কালিদাস ভট্টাচার্য্য

ঈথার ৪১৯, ৬০১

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র ৫৯৩

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

চিরসুন্দরী (কবিতা) ১৬৫

সন্ধ্যায় (কবিতা) ২৭

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

তন্ত্রের ইতিহাস ৪৬৫

প্রাচীন শিল্প-পরিচয় ৫২, ৮২৫

মল্লারিসেবক ২৯৯

গুরুদাস সরকার

সমুদ্রতীরে (গল্প) ৪৮৪

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

গোমা (কবিতা) ৭৪৫

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

হ্রাসপাতি ও নবহ্রাস ২৭৩

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

উরুক্ষিতি ও পঞ্চজন ৫০০

ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্য ৭২৪

পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ ২৯২, ৪১৩

বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি ৬৩৮

সপ্ত-সিন্ধু ৫৭৭

হিব্রু জাতির ধর্ম্মের মূল ৭৫৩

নিধিরাম

কুইনাইন পিল (গল্প) ৭৭০

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

তিনুর বুদ্ধি (গল্প) ৬৩২
দুখে চুলী (গল্প) ৭১০
নির্ব্বোধের শাস্তি ৮৭৮
বৈরাগী (গল্প) ৩৬২
সমর্পণ (গল্প) ৫২৩

নলিনীমোহন রায়চৌধুরী

সহযোগী সাহিত্য ৬৫৩

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গায়ক পাখী ৪২৯

প্রবোধচন্দ্র দে

অকলঙ্ক উদ্ভিদ ৮৬১
প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান ৬৪৫

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

আলোচনা ৬৭০

ভূপেন্দ্রমোহন সেন

বাঁশের কথা ৭৩৬

ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শাস্তি (গল্প) ২১৫
সিন্দুর মা (গল্প) ৪৪৬

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

স্থাপত্য-শিল্প ১১১, ৬১৭

মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয় ৭৮৬

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

গোরা ও তাহার অবিনাশ ৬৪৩

যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নায়িকার শেষ কথা (কবিতা) ৪২৮
প্রাণময় প্রেম (কবিতা) ৭৪৪
ভালবাসার আর এক ধারা (কবিতা) ৩০২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

খ্রীষ্ট যজ্ঞ ৮৫
পুরুষ যজ্ঞ ৩১৩
সোম যাগ ১

রাধাগোবিন্দ বসাক

চন্দ্রের বঙ্গবিজয় ৬০৯
ভারতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য ২৪১

শশধর রায়

আয়ুঃ ও কোষ ৪৭

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

চিড়িয়াখানা (গল্প) ২৮
দুর্গোৎসবের ব্যাপার (গল্প) ৫৫০
পুরাতন বাটী (গল্প) ১১৮
পরীর শ্রম (গল্প) ৫০৬
বিশু মল্লিকের অধঃপতন (গল্প) ২৫১
মালবাবুর কোর্টশিপ (গল্প) ৩৯৩
সঙ্গীত-ঔষধ ১৬৩

সম্পাদক

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ৭৬, ১৬০, ২০৫, ৩০৪, ৩৮৭, ৪৫৭, ৫৩৫, ৬০৫, ৬৭৭, ৭৪৯, ৮২০, ৮৮৯

হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

গৌড়-প্রসঙ্গ ২৬৪
চন্দ্র-রশ্মি ৫৬৭

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মানব-মঙ্গল ৫৪১

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

রায় পরিবার ৭৯৫, ৮৩৫
স্মরণ-শ্মশান ৫৯, ১৪৩, ১৯০, ২৭৪, ৩৫০

সোম যাগ।

সোম যজ্ঞ অতি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত জটিল। অনেক সরঞ্জাম আবশ্যক; বহু ঋত্বিক আবশ্যক; ব্যয় বিধানও যথেষ্ট। সকলের পক্ষে ইহা সাধ্য ছিল না। সেই জন্য ইহা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইত না। তবে ব্রাহ্মণের ঘরে পর পর তিন পুরুষের মধ্যে কেহ সোম যাগ না করিলে নিন্দা হইত। সেই ব্রাহ্মণকে ত্রিসোমী ব্রাহ্মণ বলিত। সোম যজ্ঞ আর্য্য-জাতির অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। আর্য্য জাতির ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বেই ইহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইরাণীদের মধ্যে সোম যজ্ঞ চলিত ছিল। সোম স্বয়ং এক জন দেবতা। দেবতাদের মধ্যে এক জন রাজা। পরবর্ত্তী কালে দেবতাদের মধ্যে চারি জন রাজার কথা শুনা যায়। এক এক রাজা এক এক দিকের অধিপতি। রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের, যম রাজা দক্ষিণ দিকের, রাজা বরুণ পশ্চিম দিকের, রাজা সোম উত্তর দিকের অধিপতি। দেবতা সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। পার্থিব সোম মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ। এই পার্থিব সোম এক জাতীয় পার্ব্বত্য উদ্ভিদ। হিমালয়ের উত্তরে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে ইহা পাওয়া যাইত। মুঞ্জবান্ পর্ব্বত কোথায় বলা যায় না। হয় ত ইহাই পরবর্ত্তী কালে কৈলাস পর্ব্বতে দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে রুদ্র দেবতার বাস ছিল। বেদের মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। এই রুদ্র দেবতা পরবর্ত্তী কালে আমাদের মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন। সোম সেই মহাদেবের চিহ্ন। মহাদেব ললাটে বা মস্তকে সোমকলা ধারণ করেন। এখন আমরা সোম অর্থে চন্দ্র বুঝি। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সোম এবং চন্দ্রকে একত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সকলে ইহা মানিতে চান না। তাঁহারা বলেন, বৈদিক সাহিত্যের অতি প্রাচীন স্তরে সোমের সহিত চন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না; বেদের সোম গোড়ায় সোম-লতা মাত্র; উদ্ভিদ্ মাত্র। সোমপান করিলে মত্ততা জন্মিত এবং লোকে স্ফূর্ত্তি ও বল পাইত; এই জন্য সোমকে দেবতা করিয়া লইয়াছিল। ইরাণীরা সোমকে হোমা বলিত। আমাদের দেশে সোম যাগ একবারে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু বোম্বাইয়ের পার্সীরা এখনও সোম যাগ করিয়া থাকেন। এখন যে

উদ্ভিদের রস তাঁহারা এজন্য ব্যবহার করেন, তাহাকে হুম বলে। মার্টিন হোগ নামক পণ্ডিত মূল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইয়ে থাকিয়া পার্সীদের প্রাচীন এবং আধুনিক ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি এই হুম রস পান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহা অত্যন্ত বিস্বাদ। উহাতে কোন দেবতার বা কোন মানুষের তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। ফল কথা, পুরাকালে যে সোম যজ্ঞার্থ ব্যবহৃত হইত, সে সোম কোন্ উদ্ভিদ, তাহা কেহ এখন জানে না। বেদপন্থী সমাজে যখন সোম যাগের বহুল প্রচার ছিল, তখনও ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। পর্ব্বত হইতে সোম আনিয়া যজ্ঞের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা এক দল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। যজ্ঞের সময় সোম বিক্রেতা যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া বসিত। যজমান মূল্য দিয়া তাহা খরিদ করিয়া লইতেন। সোম ক্রমশঃ দুর্লভ হওয়াই সোম যজ্ঞ অপ্রচলিত হওয়ার একটা মুখ্য কারণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বেদপন্থী দ্বিজাতি সমাজে সোম যজ্ঞের বহুল প্রচার ছিল। নানাবিধ সোম যাগ তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজারা যে অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞ করিতেন, তাহাও সোম যাগ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা কালক্রমে সোমপানের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সোমপানে অধিকার ব্রাহ্মণেরা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যজমানেরা সোম যজ্ঞ করিতে পারিতেন, কিন্তু সোমরসের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য পান করিতে হইত। ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বা যজ্ঞডুমুরের রস পান করিত; বৈশ্যের পক্ষে দধির ব্যবস্থা ছিল; ইহাতেই তাহাদের সোমপানের ফল হইত। ক্ষত্রিয়েরা সোমপান করিতে পাইবে কি না, তাহা লইয়া কিছু দিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক গণ্ডগোল চলিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা সহজে অধিকার ছাড়িতে চাহেন নাই। ইহা লইয়া যজ্ঞের সময় হাতাহাতি মারামারি পর্য্যন্ত হইত। যাঁহারা এ বিষয়ে কুতূহলী, তাঁহারা আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদের পঁয়ত্রিশ অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সোমপানের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা একটা খুব বড় নজির দেখাইতেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন; বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন; আরও অনেক অনুচিত কাজ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ এবং বৃত্র উভয়েই দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র এইরূপে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত

হইলে দেবতারা বিদ্রোহী হইয়া ইন্দ্রের সোমপান বন্ধ করিয়া দেন। দেখাদেখি ক্ষত্রিয়দেরও সোমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেদপন্থী সমাজে নানাবিধ সোম যাগের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন যজ্ঞ এক দিন, কোন যজ্ঞ একাধিক দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইত। এক দিনের যজ্ঞকে ঐকাহিক যজ্ঞ বলিত। দুই হইতে বার দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন। বার বা বারর অধিক দিন লাগিলে নাম হইত সত্র। কোন কোন সত্র সংবৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত। আমি কেবল আপনাদিগকে ঐকাহিক অর্থাৎ এক দিনে সম্পাদ্য সোম যাগের বিবরণ দিব। এই শ্রেণির সোম যাগের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম অন্ততঃ সাত রকমের ছিল; অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, অপ্তোর্য্যাম এবং বাজপেয়। ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই প্রকৃতি, অন্যগুলি তাহার বিকৃতি মাত্র। অগ্নিষ্টোমের প্রয়োগ পদ্ধতি জানিলে অন্য গুলিরও পদ্ধতির মোটা জ্ঞান জন্মিবে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞের পদ্ধতি ঠিক পাওয়া যায় না। পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য, মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং তৎসম্পর্কে উপাখ্যানাদি নানা কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রহিয়াছে। খাঁটি পদ্ধতিটুকু বুঝিবার জন্য শ্রৌতসূত্র নামক স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্র রচিত হইয়াছিল। আমি ঐতরেয় এবং শতপথ এই দুই ব্রাহ্মণ এবং আশ্বলায়ন এবং কাত্যায়ন এই দুই শ্রৌতসূত্রের সাহায্য লইয়া অগ্নিষ্টোমের বিবরণ সংকলন করিয়াছি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল। উহার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে পরম সহিষ্ণু শ্রোতারও ধৈর্য্য থাকিবে না। সেই জন্য অনেক কাট ছাঁট করিয়া যাহাতে একটা মোটা জ্ঞান জন্মিতে পারে, এইরূপ বিবরণ উপস্থিত করিতে চাহি।

গৃহস্থের অগ্নিশালায় সোম যাগের স্থান সংকুলান হইত না। গ্রামের বাহিরে গিয়া যজ্ঞভূমি পছন্দ করা হইত; উহার নাম দেবযজন ভূমি। সেখানে দুইটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হইত। একটি ঐষ্টিক বেদি, সোম যাগের আনুষঙ্গিক ইষ্টিগুলির জন্য। তাহার পূর্ব্ব দিকে আর একটা বড় বেদি, ইহার নাম সৌমিক বেদি বা মহাবেদি; এই মহাবেদি অনেকটা পাশুক বেদির মত। ঐষ্টিক বেদির পার্শ্বে যথাস্থানে আহবনীয়াদি তিন অগ্নির এবং

ব্রহ্মাদি ঋত্বিকের স্থান থাকিত; সমস্তই ইষ্টি যাগের মত। এই বেদিকে ঘেরিয়া খুঁটির উপর আচ্ছাদন দিয়া যে যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইত, তাহার নাম প্রাগ্‌বংশ শালা; খুঁটির উপরের বাঁশগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে খাটান হইত, সেই জন্য নাম প্রাগ্‌বংশশালা। মহাবেদির উপরেও ঐরূপ কয়েকটি শালা বা মণ্ডপ তৈয়ার করিতে হইত। পাশ্চমাংশের মণ্ডপটির নাম সদঃশালা; মাঝখানে হবির্দ্ধান মণ্ডপ; আর বেদির দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট মণ্ডপ, নাম আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালায় ভিতরে এক সারি অগ্নি থাকিত, অগ্নিস্থানগুলির নাম বিষ্ক্য। বিষ্ক্যের পার্শ্বে বসিয়া ঋত্বিকেরা সোম যাগের মন্ত্র পাঠ করিতেন। মাঝখানে একটি ডুমুরের ডালের খুঁটি পোঁতা থাকিত; নাম ঔদুম্বরী শাখা—উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা ঐ ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া সামগান করিতেন। দুই পাশের দুই কুঠরিতেও দুইটি বিষ্ক্য বা অগ্নিস্থান থাকিত। মহাবেদির পূর্ব্বাংশে উত্তর বেদি ও তাহার নাভি পাশুক বেদির মতই; উহার পূর্ব্ব দিকে পশু বন্ধনের জন্য যূপের স্থান, এবং ভিতরে চাত্বাল, উৎকর ও শামিত্র ভূমি পশু যাগেরই অনুরূপ।

ইষ্টি যাগে চারি জন, পশু যাগে ছয় জন, কিন্তু সোম যাগে ষোল জন ঋত্বিকের দরকার হয়। সকলের নাম জানার দরকার নাই। জনকয়েকের নাম জানা আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ ত আছেনই; তাঁহার উপরে অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা এবং হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ, ইহারাও আছেন। হোতার আর দুই জন সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। নাম দুটি কষ্ট করিয়াও মনে রাখিবেন। ইষ্টি যাগে ও পশু যাগে সামগান নাই; সোম যাগে সামগান নহিলে চলে না। সেই জন্য উদ্গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এই এগার জন ছাড়া আরো পাঁচ জনের দরকার। এইরূপে সর্ব্বসমেত ষোল জন ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়। ষোল জন ঋত্বিক্ ছাড়া চমসাহুতির জন্য দশ জন চমসাধ্বর্য্যুর প্রয়োজন। ইঁহারা ঋত্বিক নহেন, তবে সোম যাগে সহকারিতা করেন। যাগের পূর্ব্বে সোমপ্রবাক নামক ব্যক্তি ষোল জন ঋত্বিককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং যজমান তাঁহাদিগকে বরণ করেন। দেবগণের যজ্ঞে অগ্নি হোতা, আদিত্য অধ্বর্য্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য উদ্গাতা এবং অপ্ সমূহ অন্যান্য ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। যজমান প্রথমে দেব ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিয়া

তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে মানুষ ঋত্বিকদের বরণ করেন। আপনাদিগকে বলিয়াছি, অগ্নিষ্টোম এক দিনের যজ্ঞ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি ইষ্টি যাগ এবং অন্যান্য কর্ম্ম না করিলে সোম যজ্ঞে অধিকারই জন্মে না। ফলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এক দিনের যজ্ঞ হইলেও উদ্যোগ আয়োজন করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতে পাঁচ দিন সময় লাগে। যথাক্রমে বিবরণ দিতেছি।

প্রথম দিন।—প্রথম দিনে যজমান দীক্ষিত হন। ইষ্টি যাগে বা পশু যাগে দীক্ষার প্রয়োজন নাই। এই দীক্ষা এবং দীক্ষার অনুকূল ইষ্টি যাগ প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। আগেই বলিয়াছি, ইষ্টি যাগের জন্য ঐষ্টিক বেদি এবং সোম যাগের জন্য মহাবেদি আবশ্যক। যজমানের বাড়ীতে পূর্ণমাসাদি যাগের জন্য অগ্নিশালা থাকে। কিন্তু এখানে গ্রামের বাহিরে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন ঐষ্টিক বেদি গড়িয়া লইতে হয়। যজমানের বাড়ীতে যে গার্হপত্য সারাদিন জ্বলে, সেই আগুনে দুইখানা অরণি তপ্ত করিয়া আনা হয়। ইহার নাম অগ্নি সমারোপণ। সেই অরণি ঘর্ষণে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন গার্হপত্য জ্বালা হয়। যজমানের বাড়ীর গার্হপত্য এবং এই নূতন গার্হপত্য যে একই অগ্নি, তাহা এতদ্দ্বারা বুঝান হইল। এই নূতন গার্হপত্য হইতে নূতন আহবনীয় ও নূতন দক্ষিণাগ্নি যথাবিধি জ্বালান হয়। সোম যাগের আনুষঙ্গিক সমস্ত ইষ্টি যাগ এই অগ্নিতেই সম্পাদ্য। এইরূপ অগ্নি স্থাপনের পর যজমানের দীক্ষা গ্রহণ। যজ্ঞশালার বাহিরে বসিয়া সপত্নীক যজমান খেউরি করিয়া স্নান করিবেন। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া কুশের উপর দাঁড়াইয়া নবনী মাখিবেন, চোখে কাজল পরিবেন, কুশের দ্বারা গা মাজিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন, আঙ্গুল গুটাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন; যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত বাহিরে আসিবেন না। সেইখানে একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইবে। এই ইষ্টি যাগের নাম দীক্ষণীয় ইষ্টি। দীক্ষার অনুকূল বলিয়া নাম দীক্ষণীয়। যাগের পর যজমান কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তদুপরি বসিবেন। তৃণ ও শণে নির্ম্মিত মেখলা পরিবেন; মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন; কাপড়ের খুঁটায় একটা হরিণের শিঙ বাঁধিয়া হাতে ডুমুর শাখার দণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহাই যজমানের পরিচ্ছদ। যজমানপত্নীর বেশ ভূষা প্রায়ই তদ্রূপ; উষ্ণীষের বদলে তিনি মাথায় জাল পরেন। এই সকল বেশ ভূষার একটা তাৎপর্য্য আছে। দীক্ষাকর্ম্মে যজমান নূতন জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞশালাটাই তাঁহার পক্ষে মাতৃগর্ভস্বরূপ। সেইখানে ভ্রূণস্বরূপে তাঁহাকে যজ্ঞকাল ব্যাপিয়া অবস্থান

করিতে হয়। যজ্ঞান্তে তিনি সেই গর্ভ হইতে নূতন মানুষ হইয়া বা নব-জীবন পাইয়া নিষ্ক্রান্ত হন। তাঁহার বেশ ভূষার কোন্‌টার কি তাৎপর্য্য, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বুঝাইয়াছেন। যথা, গর্ভমধ্যে ভ্রূণ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে, এই জন্য যজমানও মুষ্টিবদ্ধ করেন, ইত্যাদি। দীক্ষা উপলক্ষে যে ইষ্টি যাগ হয়, তাহার দেবতা অগ্নি এবং বিষ্ণু। অগ্নি সকল দেবতার নিম্নে এবং বিষ্ণু সকলের ঊর্দ্ধে; অতএব উঁহাদের দুই জনের যাগ করিলেই সকল দেবতার উদ্দেশে যাগ হয়। এই দুই দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি প্রায়ই পূর্ণমাস যাগের মতই। দীক্ষিত যজমানকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। তিনি সত্য কহিবেন, ক্রোধ করিবেন না, মৃদু বাক্য বলিবেন, সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমন দেখিবেন না; জলে প্রবেশ করিবেন না; বৃষ্টিতে ভিজিবেন না। ভোজন সম্বন্ধেও কয়েকটি নিয়ম আছে। দীক্ষার পূর্ব্বে পেট ভরিয়া ইচ্ছামত খাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু তার পর হইতে নিয়মের বাঁধাবাঁধি। তদবধি দুই বেলা কেবল দুধ খাইতে হইবে। এই দুগ্ধের নাম ব্রত এবং সেই দুগ্ধ পানের নাম ব্রতপান। একবার শেষ রাত্রিতে, একবার মধ্যাহ্নে, দুগ্ধপান চলে। দুধের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয়। পঞ্চম দিনে অর্থাৎ আসল সোম যাগের দিনে সেই দুগ্ধপানও নিষিদ্ধ। সেই দিন যজ্ঞের হবিঃশেষই একমাত্র ভক্ষ্য।

দ্বিতীয় দিন।—এই দিন প্রাতে যজ্ঞের আরম্ভসূচক একটি ইষ্টি যাগ; ইহার নাম প্রায়ণীয় ইষ্টি। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ। এই ইষ্টির দেবতা পথ্যা, অগ্নি, সোম, সবিতা এবং সর্ব্বশেষে অদিতি। দেবতারা অদিতিকে এক সময়ে বর দিয়াছিলেন; তোমাকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। তদবধি সোম যজ্ঞের আরম্ভে অদিতির উদ্দেশে যাগ। অদিতিকে চরু দিতে হয়; আর চারি জনকে আজ্য দিতে হয়।

এই যাগের পর সোম ক্রয়। যজ্ঞশালার বাহিরে সোমবিক্রেতা সোম লইয়া বসিয়া থাকে; তাঁহার নিকট মূল্য দিয়া সোম ক্রয় করিতে হয়। আগে বলিয়াছি, সোমলতা দুষ্প্রাপ্য; পর্ব্বত হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া যজ্ঞের জন্য বিক্রয় এক দল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। সোমবিক্রেতা যজ্ঞ-শালার বাহিরে বসিয়া সোমলতা বেচিত। এই সোমক্রয় ব্যাপারে একটু কৌতুক আছে। সোম এককালে গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন; দেবতারা কৌশল করিয়া সেই সোম আনিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রী-প্রিয়। দেবগণ

কুমারী বাগ্দেবীকে গন্ধর্ব্বদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম লইয়া আসেন এবং নিজেও পলাইয়া আসেন। সোম ক্রয় অনুষ্ঠানে সেই ঘটনার অভিনয় হয়। ঋত্বিকদের সহিত যজমান একটি ছোট বৎসতরী লইয়া সোমবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হন। ঐ সোমবিক্রেতা গন্ধর্ব্ব-স্থানীয় এবং বাছুরটি বাগ্দেবতা। কিছুক্ষণ দর দস্তুর করিয়া বাছুরটিকে মূল্য স্বরূপ দিয়া সোম খরিদ করা হয়। সোম হস্তগত হইলে হঠাৎ লাঠি বাহির করিয়া সোমবিক্রেতাকে খেদাইয়া দেওয়া হয় এবং বাছুরটি কাড়িয়া লওয়া হয়। গন্ধর্ব্বটার সবই গেল; সোমও গেল, বাগ্দেবীকেও সে পাইল না। যজমান সোমলতা কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেন। যজমান এবং অধ্বর্য্যু গাড়ীর উপর বসিয়া থাকেন; হোতা ঋক্‌মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন এবং সুব্রহ্মণ্য নামক ঋত্বিক্ গাড়ী চালাইয়া প্রাগ্‌বংশশালা ঘুরিয়া ভিতরে উপস্থিত হন। সেখানে গাড়ী হইতে সোমকে নামাইয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের পার্শ্বে কাষ্ঠাসনে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সোম দেবতাগণের একজন রাজা। রাজা অতিথিরূপে বাড়ী আসিলে তাঁহার সমাদর করিতে হয়। রাজা সোম অতিথিরূপে যজমানের যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন; এখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইবে। ইহার নাম আতিথ্য ইষ্টি। এই যাগের দেবতা বিষ্ণু; হব্য দ্রব্য পুরোডাশ। ইহাতে একটু বিশেষ বিধি আছে যে, যাগের পূর্ব্বে মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে মিশাইতে হয়। পূর্ণমাসাদি ইষ্টি যাগে অগ্নি মন্থনের দরকার হয় না। আতিথ্য ইষ্টির পর প্রবর্গ্য যজ্ঞ আর উপসৎ ইষ্টি। এই সময়ে যজমান এবং সমস্ত ঋত্বিক একযোগে ঘৃত স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে, এই যজ্ঞে আমরা সকলে এক মত হইয়া কর্ম্ম করিব; পরস্পর বিরোধ করিব না। এই অনুষ্ঠানের নাম তানূনপত্র। অসুরদের সহিত যুদ্ধকালে দেবতারা এইরূপে ঘৃত স্পর্শ করিয়া পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। এখন যেমন ইউরোপের মিত্র রাষ্ট্রগুলি জর্ম্মনির বিরুদ্ধে সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, কতকটা তদ্রূপ। উপসৎ ইষ্টির সমকালে সোমলতাকে টাট্‌কা রাখিবার জন্য সোমে জলের ছিটা দেওয়া হয়। ইহার নাম সোমের আপ্যায়ন কর্ম্ম। আপ্যায়নের পর সোমের নিহ্নব বা পূজা। প্রস্তরের নাম আপনাদের মনে থাকিতে পারে। ইষ্টি যাগে বেদির উপরে এক আঁটি কুশ থাকে; ইহাই প্রস্তর। যজমান কয়জন ঋত্বিকের সহিত প্রস্তরের উপরে হাত রাখিয়া নিহ্নব মন্ত্র বলেন। দ্যাবা/

পৃথিবীকে ঐ মন্ত্রে প্রণাম করা হয়। রাজা সোম দ্যাবাপৃথিবীর অপত্যস্বরূপ; তাঁহাকে প্রণাম করিলে সোমেরই পূজা হয়।

আতিথ্যেষ্টির পরে প্রবর্গ্য আর উপসৎ ইষ্টি। তন্মধ্যে প্রবর্গ্যের কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। ইহা যজ্ঞের মধ্যে কতকটা থাক্-ছাড়া। এই কর্ম্মে আহুতির দ্রব্যের নাম ঘর্ম্ম। তপ্ত ঘৃতে ছাগলের ও গরুর দুধ মিশাইয়া গরম করিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। দেবতার নামও ঘর্ম্ম দেবতা। সংস্কৃত ঘর্ম্ম শব্দ হইতেই আমাদের বাঙ্গালা গরম শব্দ আসিয়াছে। দুধ গরম গরম দিতে হয় বলিয়া উহার নাম ঘর্ম্ম। মাটির ভাঁড়ে ঘর্ম্ম পাক হয়; সেই ভাঁড়ের নাম মহাবীর। পুরোডাশও দিতে হয়, এই পুরোডাশের নাম রৌহিণ পুরোডাশ। ঘর্ম্ম পাকের জন্য পৃথক্ অগ্নিস্থান থাকে। গার্হপত্যের আগুন আনিয়া সেই আগুন জ্বালা হয়। অধ্বর্য্যু আর দুই জন ঋত্বিকের সহিত আগুনে হাওয়া দেন; প্রস্তোতা নামক সামগায়ী ঋত্বিক সাম গান করেন। হোতা শুক্‌মন্ত্র পাঠ করেন; অধ্বর্য্যু আগুনের উপরে তপ্ত মহাবীরে ঘি ঢালেন। তার পর রৌহিণ পুরোডাশ আহুতি দিয়া আসিয়া অধ্বর্য্যু গাভী দোহন করেন; প্রতিপ্রস্থাতা ছাগী দোহন করেন। প্রস্তোতা আর এক প্রস্থ সাম গান ও হোতা আর এক প্রস্থ শুক্ পাঠ করেন। একখানি প্রকাণ্ড কাঠের হাতা থাকে, তাহার নাম উপযমনী। এই হাতায় তপ্ত মহাবীর নামাইয়া রাখিতে হয় এবং মহাবীরের তপ্ত ঘৃতে সেই ছাগ দুগ্ধ ও গো দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু এই ঘর্ম্ম লইয়া অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে একটা আহুতি দেন; এবং অগ্নির উদ্দেশে আর একটা আহুতি দেন। হোতা যথাবিধি যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। তবে ঘর্ম্মের কিয়দংশ হবিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিতে হয়। হবিঃশেষ ভক্ষণের পূর্ব্বে আর একখানি রৌহিণ পুরোডাশের আহুতি হয়। ইহাই প্রবর্গ্য কর্ম্ম। এই প্রবর্গ্য কর্ম্ম যজমানের নূতন জন্মলাভে সাহায্য করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই ঘর্ম্মাহুতির দ্বারা যজমান দেবযোনি অগ্নি হইতে দেবতারূপে উৎপন্ন হন। প্রবর্গ্য কর্ম্মের পর উপসৎ। উপসৎ ইষ্টি যাগ; দেবতা অগ্নি সোম এবং বিষ্ণু। আহুতি আজ্য। অসুরেরা তিন লোক জয় করিয়া ঐ তিন লোককে সোণা, রূপা ও লোহার প্রাকারবেষ্টিত করিয়া পুরীতে বা দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। দেবতারা ঐ তিন পুরীর সমীপে আসন্ন হইয়া পুরী তিনটিকে অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসুরের প্রতি যে বাণ ছুড়িয়াছিলেন, তাহাই উপসদ্—উপ অর্থাৎ সমীপে, সদ্ ধাতুর

অর্থ আসন্ন হওয়া। ঐ বাণে অগ্নি সোম এবং বিষ্ণু, এই তিন দেবতা অবস্থিত ছিলেন। তাহাতেই অসুরদের পরাজয় হয়। এই ত্রিপুর-জয়-কাহিনী আপনাদিগকে পৌরাণিক ত্রিপুরজয়ের কথা স্মরণ করাইবে।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণেই এই প্রবর্গ্য ও উপসৎ অনুষ্ঠান হয়; দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণেও আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ হইবে। উপসৎ করিতে হইলেই অসুর জয়ে দেবগণের সন্ধিবন্ধনের অনুরূপ তানূনপ্ত্র করিতে হইবে এবং জলের ছিটা দিয়া সোমের আপ্যায়ন করিয়া সোমের নিহ্নব বা পূজাও করিতে হইবে। তৃতীয় দিনের পূর্ব্বাহ্ণে প্রবর্গ্য এবং উপসৎ এবং অপরাহ্ণে আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ। উপসদের সঙ্গে তানূনপ্ত্র, সোমের আপ্যায়ন এবং নিহ্নব দ্বিতীয় দিনের মতই। এই তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে সোম যাগের জন্য মহা বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়।

চতুর্থ দিন। চতুর্থ দিন পূর্ব্বাহ্ণেই দুইবার প্রবর্গ্য ও দুইবার উপসৎ সারিয়া ফেলিয়া অন্য আয়োজন করিতে হইবে। প্রথম কাজ, অগ্নি-প্রণয়ন। ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে আগুন আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রাখিতে হইবে। তদবধি এই নূতন অগ্নিই সোম যজ্ঞের আহবনীয় রূপে গণ্য হয়; পুরাতন আহবনীয়টা গার্হপত্য হইয়া যায়। অগ্নিকে লইয়া যাইবার সময় হোতা মন্ত্র পাঠ করেন। তার পরের কাজ হবির্দ্ধান প্রবর্ত্তন। দুইখানি টপ্পর দেওয়া গরুর গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান; সোম যজ্ঞে প্রধান হবিঃ সোম; সেই সোম এই গাড়ীর উপরে রাখা হয় বলিয়া গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান। যজমানের পত্নী গাড়ীর ধুরায় ঘি মাখাইয়া দেন; অধ্বর্য্যু এক গাড়ীতে, প্রতিপ্রস্থাতা অন্য গাড়ীতে চাপিয়া মহাবেদির দিকে চালাইয়া দেন। গাড়ী ঘর ঘর করিয়া চলিতে থাকে; হোতা এবং যজমান মন্ত্র পাঠ করেন। মহাবেদির উপরে পৌঁছিলে, গাড়ী দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপরে চালা বাঁধা হয়; এই চালারই নাম হবির্দ্ধান মণ্ডপ। তার পশ্চিম দিকে আর একটি চালা তৈয়ার হয়; উহারই নাম সদঃশালা ও মহাবেদির দুই পার্শ্বে দুই খানি ছোট ঘর তৈয়ার হয়, উহাই আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালায় ছয়টি আর আগ্নীধ্রীয়ে একটি, এই সাতটি ধিষ্ণ্য তৈয়ার করিতে হইবে; ধিষ্ণ্যের অর্থ অগ্নিস্থান; ইহার পাশে ঋত্বিকেরা সোমাহুতি কালে মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই ধিষ্ণ্যের জন্যও ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখিতে হইবে; পরদিন সেই অগ্নি হইতে আর আর ধিষ্ণ্য জ্বালান হইবে।

ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নি আনয়নের পর সোমের আনয়ন। আপনাদের মনে থাকিবে, দ্বিতীয় দিবসে সোম ক্রয় করিয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে কাঠের আসনে রাখা হইয়াছিল; দুই বেলা জলের ছিটা দিয়া তাহাকে টাটকা রাখা হইয়াছিল। আজ সেই সোমকে সেখান হইতে তুলিয়া পূর্ব্ব মুখে আনিয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপে গাড়ীর উপরে রাখিতে হয়। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নির ও সোমের আনয়নের নাম অগ্নীষোম-প্রণয়ন। সকল কর্ম্মেই হোতাকে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

অগ্নি এবং সোম উভয়কেই মহাবেদিতে স্থাপন করা হইল। ইহাঁরা উপস্থিত না হইলে সোম যাগ হইতে পারে না। অগ্নি এবং সোম উভয়েই দেবতা; এখন ইহাদের উদ্দেশে একটি পশু যাগ আবশ্যক। এই চতুর্থ দিনেই সেই পশু যাগ করিতে হইবে; কেবল ইষ্টি যাগে কুলাইবে না। অগ্নি এবং সোমের উদ্দিষ্ট এই পশুটির নাম অগ্নীষোমীয় পশু। পশুটি মোটাসোটা হওয়া আবশ্যক। এই পশুর মাংস ভক্ষণ করিলে নরমাংস ভক্ষণ হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল; গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। পশু যাগের বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি—যূপচ্ছেদন হইতে যাগ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই করিতে হয়। পশু যাগ সমাপ্ত করিতে অপরাহ্ণ আসিয়া পড়ে। পরদিন প্রকৃত সোম যাগের দিন—এ কয়দিন তাহার আয়োজন উদ্যোগেই গেল। সোম যাগের জন্য সোম লতা ছেঁচিয়া সোম রস বাহির করিতে হয়—তার জন্য জলের দরকার। এই চতুর্থ দিনেই সন্ধ্যাকালে সেই জল আনিয়া রাখিতে হইবে। স্রোতের জল হইলেই ভাল হয়। বাদ্যনা বাজাইয়া সমারোহে নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া রাখা হয়। এই জলেরও একটা নাম আছে—নাম বসতীবরী। অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; অতএব তাহার বিশেষণ বসতীবরীও স্ত্রীলিঙ্গ। এই বসতীবরী জল এবং হবির্দ্ধানে স্থিত সোমলতাকে রাত্রিকালে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপ মধ্যে রাখা হয় এবং যজমান রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেন।

পঞ্চম দিন।—উদ্যোগ আয়োজনে চারি দিন গেল। পঞ্চম দিনে প্রকৃত সোম যাগ। সোমলতা ছেঁচিয়া তাহার রস জলে মিশাইয়া আহুতি দিতে হইবে। সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করার নাম অভিষব। পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্ণে অপরাহ্ণে তিন বার সোমের অভিষব এবং সোমের আহুতি হয়। সোমাভিষব এবং সোম আহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনুষ্ঠান, এক যোগে সমুদায় কর্ম্মের নাম সবন। পূর্ব্বাহ্ণে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্ণে মাধ্যন্দিন

সবন, অপরাহ্ণে তৃতীয় সবন। সোম যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটী পশু যাগও বিহিত। ইহার পূর্ব্ব দিন একটী পশু যাগ হইয়া গিয়াছে,—অগ্নীষোমীয় পশু যাগ;—এ দিন আর একটী পশু যাগ হয়। এই পশু যাগের নাম সবনীয় পশু যাগ। তিন সবনে তিনটী পশু যাগ হয় না। সারা দিনে একটী। একই পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাগ করিয়া তিন সবনে আহুতি দেওয়া হয়। আগে বলিয়াছি, পশু যাগের সঙ্গে পুরোডাশ যাগও থাকে। সবনীয় পশু যাগে পুরোডাশ ত থাকেই, তা ছাড়া আরও ক দ্রব্যের আহুতি হয়। যথা, ধানা, করম্ভ, পরিবাপ এবং পয়স্যা। ধা ঘিয়ে ভাজা যব; করম্ভ ঘৃতপক্ক যবের ছাতু; পরিবাপ ঘৃতপক্ক চা দুধে দই মিশাইয়া পয়স্যা প্রস্তুত হয়। সোমরস পশুমাংস প্রভৃতির নাম শুনিয়া ভৈরবীচক্রের পঞ্চমকারের অন্তর্গত মদ্য মাংস ও মুদ্র আপনাদের মনে আসিবে। আপনারা দেবতাদের রুচির প্রশংসা করিবেন।

পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় বসতীবরী জল আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং যজমান পাহারা দিয়া জাগিয়া আছেন। অতি প্রত্যূষে তিনি ঋত্বিকদিগকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোলেন। হোতা প্রাতরনুবাক নামক ঋক্‌যন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অগ্নি, ঊষা এবং অশ্বিদ্বয় এই সকল মন্ত্রের দেবতা। বহু ঋক্ পাঠ করিতে হয়। পাখী ডাকিলে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হয়। কাজেই আবশ্যকমত শতাধিক বা সহস্রাধিক মন্ত্র পড়িতে হয়। বহু মন্ত্র পাঠে যজ্ঞেশ্বর প্রজাপতি সন্তুষ্ট হন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে যজমান ও তাঁহার পত্নী কয়েকজন ঋত্বিক এবং পরিচায়ক সঙ্গে জলাশয় হইতে জল আনিতে যান। কলসীতে করিয়া জল আনেন। এই জলের নাম একধনা। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় বসতীবরী আনা হইয়াছিল; অদ্য প্রত্যূষে একধনা আনা হইল। এই দুই জল খানিকটা মিশাইয়া তৃতীয় জল হয়, তাহার নাম নিগ্রাভ্য। বসতীবরী একধনা এবং নিগ্রাভ্য এই তিন জলই সোম রস প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক।

এইবার সোম অভিষবের অর্থাৎ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশনের আয়োজন। পূর্ব্ব দিনে হবির্ধান গাড়ীর নীচে চারিটী গর্ত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই গর্ত্তের নাম উপরব। গর্ত্তের উপর কাষ্ঠফলক চাপাইয়া তদুপরি গোচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর সোমলতার টুকরা রাখিতে হয়; পাষাণের আঘাতে থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। পাষাণের আঘাত হয়, আর উপরবের গর্ত্ত হইতে গম গম শব্দ হইতে থাকে। অধ্বর্য্যু আর তিন জন ঋত্বিক পাষাণ

হাতে করিয়া রস বাহির করেন। সোমের টুকরাগুলি মাঝে মাঝে নিগ্রাভ্য জলে ডুবাইয়া সরস করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ ছিবড়া বাহির না হয়, ততক্ষণ রস বাহির করিতে হয়। তিন সবনেই এইরূপ করিতে হয়। প্রাতঃসবনে এবং মাধ্যন্দিন সবনে প্রচুর রস আবশ্যক। সেই জন্য প্রাতঃসবনে সোমের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছেঁচিতে হয়। মাধ্যন্দিনেও প্রায় বাকি অর্দ্ধেক ছেঁচিতে হয়। এক খানা বড় টুকরা তৃতীয় সবনের জন্য রাখা হয়। সেই খানা ছেঁচিয়া যতটুকু পাওয়া যায়, তৃতীয় সবনের পক্ষে তাহাই প্রচুর। এইরূপে নিষ্কাশিত বসতীবরী এবং একধনা এই দুই জলে মিশাইলে আহুতির জন্য রস হয়। রস রাখিবার জন্য তিনটী বড় বড় কাঠের গামলা বা কলস একটীর নাম আধবনীয়, একটীর নাম দ্রোণকলস, আর একটীর নাম পূতভৃৎ। আধবনীয়ে বসতীবরী এবং একধনা দুই জল ঢালিয়া তাহাতেই নিষ্কাশিত সোমরস মিশান হয়। এইরূপে প্রস্তুত রস ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। দ্রোণকলসের মুখে মেষ লোমের ছাঁকনি রাখিয়া আধবনীয়ের জল ঢালিয়া ছাঁকিতে হয়। এইরূপে ছাঁকিলে সোমরস পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়। ছাঁকা সোমের নাম হয় পবমান সোম। এই বিশুদ্ধ সোমরসের অর্দ্ধেক দ্রোণকলসে এবং অর্দ্ধেক পূতভৃতে রাখা হয়। পূতভৃতে রাখিবার সময় একটু আড়ম্বর আছে; পরে বলিব। সোম যাগে বহু দেবতাকে আহুতি দিতে হয়। এক এক আহুতিতে যতটুকু সোমরস গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম গ্রহ। সোম রস ছোট ছোট পাত্রে লইয়া আহুতি দেওয়া হয়। প্রত্যেক পাত্রে একবারে যাহা লওয়া হয়, তাহাই গ্রহ। তিন শ্রেণির পাত্র আবশ্যক। প্রথম শ্রেণির পাত্রকে পাত্রই বলে; সংখ্যা এগার খানি। দ্বিতীয় শ্রেণির পাত্রের নাম স্থালী; সংখ্যায় চারি খানি। তৃতীয় শ্রেণির পাত্রের নাম চমস; সংখ্যায় দশ খানি। এইবার যাগের আরম্ভ।

(১) প্রথমে প্রাতঃসবন। প্রথমাহুতি সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অধ্বর্য্যু এক খানি পাত্রে কিঞ্চিৎ রস লইয়া উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। ইহা যাগ নহে, হোম। অধ্বর্য্যু নিজেই একটি যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দেন। উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পড়া হয় বলিয়া হোমের নাম উপাংশু হোম। যে রসটুকু দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু গ্রহ। যে পাত্রে করিয়া দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু পাত্র। সূর্য্যোদয়ের পর পুনরায় সূর্য্যেরই উদ্দেশে অন্তর্যাম হোম। ইহাও হোম। অন্তর্যাম পাত্রে অন্তর্যাম গ্রহ

লইয়া যজুর্মন্ত্র সহিত আগুনে দেওয়া হয়। এই হোমের পর ঋত্বিকেরা মহা বেদির বাহিরে আসিয়া পূতভৃতে ঢালিবার জন্য সোম ছাঁকেন। দ্রোণকলসে সোম আগেই ছাঁকিয়া রাখা হইয়াছে। পূতভৃতে সোম ছাঁকায় আড়ম্বর আছে। এক দিকে সোম ছাঁকা হইতেছে, অন্য দিকে সেই পবমান সোমের উদ্দেশে উদ্গাতা প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামগান করিতেছেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র গান। পবমান সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া নাম পবমান স্তোত্র। মহাবেদির বাহিরে আসিয়া গীত হয় বলিয়া নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। তৎপরে তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহাহুতি তিন জোড়া দেবতার উদ্দিষ্ট। প্রথম আহুতি ঐন্দ্রবায়ব অর্থাৎ ইন্দ্র এবং বায়ুর উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় আহুতি মৈত্রাবরুণ অর্থাৎ মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট। তৃতীয়টি আহুতি আশ্বিন অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু যথাক্রমে এই তিন গ্রহ আহুতি দেন। এবার হোম নহে; রীতিমত যাগ। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা মন্ত্র এবং হোতা স্বয়ং যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। বষট্‌কারের পর অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ। আহুতি-দাতা অধ্বর্য্যু এবং বষট্‌কর্ত্তা হোতা উভয়ে একযোগে প্রত্যেক গ্রহের শেষাংশ পান করেন। পান অনাবশ্যক; ঘ্রাণ মাত্রেই ভক্ষণ হয়; বড় জোর ঠোঁট ভিজাইতে হয়। তৎপরে শুক্র গ্রহ এবং মন্থি গ্রহের আহুতি। উভয়ই ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট; অধ্বর্য্যু শুক্র গ্রহ এবং প্রতিপ্রস্থাতা মন্থি গ্রহ গ্রহণ করিয়া পাশাপাশি দাঁড়ান; এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠের পর বষট্‌কারের সময় আগুনে দেন। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌-কর্ত্তা একত্র গ্রহশেষ পান করেন। এবার ঘ্রাণমাত্রে চলে না; রীতিমত পান করিতে হয়। শুক্র এবং মন্থি এই দুই গ্রহ আহুতির পর বলা হয় "নিরস্তঃ শণ্ডঃ নিরস্তোমর্কঃ।" তাৎপর্য্য, এতদ্দ্বারা শণ্ড এবং মর্ক এই দুই অসুরকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আপনারা অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের শণ্ডামার্ক নামে দুই পুত্রের পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়াছেন। সেই কাহিনীর মূল এইখানে পাওয়া যায়। শুক্র শব্দের অর্থ উজ্জ্বল; উহা সোম রসের চলিত বিশেষণ। শুক্র পাত্রে রক্ষিত সোম রসকে বিশেষতঃ শুক্র গ্রহ বলা হয়। কোনরূপে এই শুক্র গ্রহের সহিত আকাশস্থ শুক্র গ্রহের—planet Venusএর—একীকরণ হইয়া থাকিবে। Planet Venus আকাশস্থ planetগণের সকলের চেয়ে উজ্জ্বল। তাহা হইলে মন্থি গ্রহ কে হয়? মহাত্মা গঙ্গাধর টিলক অনুমান করেন একই planetএর দুই নাম, শুক্র এবং মন্থি। একটি morning star, আর একটি evening star.

প্রাতঃসবনের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু হোম নাই, অন্তর্যাম হোম নাই, দ্বিদেবত্য যাগ নাই, ঋতুগ্রহ যাগও নাই। শুক্র গ্রহ ও মন্থি গ্রহের যাগ আছে। উহার সঙ্গে চমসাহুতি আছে। এই সব আহুতির পর তিন প্রধান আহুতি—তজ্জন্য যথারীতি শস্ত্র পাঠ ও স্তোত্র গান। প্রথম দুই আহুতির নাম মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র—স্তোত্রগানের পর হোতা শস্ত্র পাঠ করেন, অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। তৃতীয় আহুতি উক্থ্য তিন অংশে দেওয়া হয়। শস্ত্র পাঠ করেন, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। মাঝে মাঝে চমসাহুতি পূর্ব্ববৎ।

তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু ও অন্তর্যাম হোম নাই। দ্বিদেবত্য নাই, ঋতুগ্রহ নাই, শুক্র মন্থি পর্য্যন্ত নাই। এই সকলের পরিবর্ত্তে আদত্য ও সাবিত্র গ্রহের এবং পাত্নীবত গ্রহের আহুতি আছে। স্তোত্রগান এবং শস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রধান আহুতি দুইটি;—বৈশ্বদেব এবং আগ্নি মারুত। তাহার মাঝে মাঝে চমসাহুতি।

এই সকল আহুতিতে সোমরস প্রায়ই ফুরাইয়া আসে! যে একটু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ধানা বা যব ভাজা মিশাইয়া মাথায় লইয়া উন্নেতা নামক ঋত্বিক্ আহুতি দেন; হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। ইহার নাম হারিযোজন গ্রহ। ইহাতে শস্ত্র পাঠ নাই। এই খানে সোমাহুতি সমাপ্ত হইল। পশু যাগের যে সকল অঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ করিয়া তৃতীয় সবন সমাপ্ত করা হয়। যজমান সহিত ঋত্বিকেরা এখন সামগান শুনিতে শুনিতে অবভৃথ স্নানের জন্য জলাশয়ে গমন করেন। সোম যাগের সরঞ্জামগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বরুণ দেবতাকে একটা পুরোডাশ দিয়া সপত্নীক যজমান স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, এবং দীক্ষাকালে যে সকল বেশভূষা করিয়াছিলেন, তাহাও ত্যাগ করেন। যজমান এখন সোমযজ্ঞে পুনর্জ্জন্ম পাইলেন। এখনও কিন্তু খোলসা নাই। অবভৃথ স্নানের পর যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিয়া আর একটি ইষ্টি যাগের প্রয়োজন। দীক্ষার পর দিন প্রায়ণীয় ইষ্টি যাগে কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল। উদয়নীয়ে কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হয়। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ; উদয়ন শব্দের অর্থ সমাপ্তি। উদয়নীয় যাগের পদ্ধতি সর্ব্বাংশে প্রায়ণীয়েরই মত। যজ্ঞের আরম্ভ এবং শেষ এক রকমের করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, সমস্ত যজ্ঞটা একগাছা লম্বা দড়ি; প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়, এই দুই ইষ্টি যাগের দ্বারা এই দড়ির দুই প্রান্তে গিঁঠ দিয়া দড়িকে শক্ত করা হয়।

আপনারা মনে করিতেছেন, এইবার অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু এখনও অব্যাহতি পাইবেন না। ইষ্টি যাগের পর আর একটি পশু যাগ করিতে হইবে। বন্ধ্যা গাভী, তদভাবে একটি বৃষ দ্বারা পশু যাগ হইবে। ইহার নাম অনুবন্ধ্য পশু যাগ। পশুযাগের পর নূতন করিয়া মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই অগ্নিতে আবার একটি ইষ্টি যাগ। ইহার নাম উদবসানীয় ইষ্টি যাগ। এই যাগে অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ দিতে হয়। এইবার সত্যসত্যই অব্যাহতি। যজমান ঐ ইষ্টি যাগ সমাপনের পর সন্ধ্যাকালে দেবযজন ভূমি হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

অগ্নিষ্টোমের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে তাহার ক্রম মনে রাখা আপনাদের কঠিন হইবে। আর একবার অতি সংক্ষেপে আওড়াইব; তাহাতে মনে রাখিবার সুবিধা হইতে পারে।

অগ্নিষ্টোমে সোমাহুতি এক দিনে সম্পাদ্য; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চারি দিন যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতে হয়; সমুদায় কার্য্যে পাঁচ দিন লাগে। প্রথম দিনে সপত্নীক যজমানের দীক্ষা এবং সেই প্রসঙ্গে দীক্ষণীয় ইষ্টি যাগ। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণে যজ্ঞের আরম্ভ সূচনায় প্রায়ণীয় ইষ্টি যাগ। পরে সোম ক্রয় করিয়া যজ্ঞশালায় সোমের আনয়ন, এবং সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ আতিথ্য ইষ্টি যাগ। আতিথ্যের পর পূর্ব্বাহ্ণেই প্রবর্গ্য যজ্ঞ এবং উপসদিষ্টি যাগ। এই সময়ে তানূনপাত্র দ্বারা যজমান ও ঋত্বিক্‌দের সন্ধিবন্ধন। উপসদের সঙ্গে সোমে জলের ছিটা দিয়া আপ্যায়ন ও সোমের পূজার জন্য নিহব পাঠ। সেদিন অপরাহ্ণেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ। তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণে প্রবর্গ্য উপসৎ এবং অপরাহ্ণেও প্রবর্গ্য উপসৎ। মাঝে মহাবেদি নির্ম্মাণ। চতুর্থ দিনে পূর্ব্বাহ্ণেই দুই বার প্রবর্গ্য এবং দুই বার উপসৎ সারিয়া উত্তর বেদিতে অগ্নিপ্রণয়ন। এই অগ্নিতে সোমাহুতি হইবে। অগ্নি প্রণয়নের পর সোম রাখিবার গাড়ী দুইখানির—হবির্দ্ধান শকট দুইখানির—প্রবর্ত্তন অর্থাৎ মহাবেদির উপরে আনয়ন। তার পর অগ্নি ও সোমের প্রণয়ন; অর্থাৎ ধিষ্ণ্য জ্বালিবার জন্য অগ্নি আনয়ন এবং ঐষ্টিক বেদি হইতে সোমের আনয়ন। এই অগ্নি ও সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্নীষোমীয় পশু যাগ। সন্ধ্যার পর বসতীবরী জল আনয়ন। পঞ্চম দিন সোম যাগের দিন। ভোরের বেলায় হোতা প্রাতরনুবাক মন্ত্র পড়েন; এবং ঋত্বিকেরা একধনা জল আনেন। তার পরে সবন আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সবনে সোমের অভিষব হয় অর্থাৎ নিগারের জল সোম [illegible]

একধনার সহিত মিশাইতে হয়; পরে ছাঁকিয়া লইয়া দ্রোণকলস ও পূতভৃৎ পূর্ণ করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বা স্থালীতে এবং চমসে করিয়া এই সোমের আহুতি দেওয়া হয়। অনেক আহুতি হয়;—অন্যান্য আহুতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু প্রধান আহুতিগুলিতে আড়ম্বর আছে। প্রধান আহুতির পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিকেরা একযোগে স্তোত্রগান করেন, আর হোতা বা তাঁহার সহকারী ঋত্বিক শাস্ত্র পাঠ করেন। এক এক শস্ত্রমধ্যে বহু ঋক্ থাকে। শস্ত্র পাঠের পর সোমাহুতি ও সোমপান হয়; তৎপরে চমসাহুতি ও চমসপান হয়। তিন সবনেই এইরূপ; তবে প্রাতঃসবনের চেয়ে মাধ্যন্দিন সংক্ষিপ্ত; তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। তিন সবন ব্যাপিয়া একটি পশু যাগ হয়—উহার নাম সবনীয় পশু যাগ।

তিন সবনের পর সপত্নীক যজমানের অবভৃথ স্নান। সেখানে বরুণকে পুরোডাশ দিয়া যজ্ঞশালায় ফিরিয়া যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদয়নীয় ইষ্টি যাগ। তৎপরে অনুবন্ধ্য পশু যাগ। পশু যাগের পর মন্থন দ্বারা নূতন অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে উদবসানীয় ইষ্টি যাগে যজ্ঞ সমাপ্ত করা হয়।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্যয়সাধ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্ততঃ একশত গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ঋত্বিকদের ভাগ এইরূপ। ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু এই চারিজন প্রধান ঋত্বিকের প্রত্যেকে বারটি করিয়া আটচল্লিশটি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া চব্বিশটি। পোতা, প্রতিহর্ত্তা, আচ্ছাবাক ও নেষ্টা প্রত্যেকে চারিটি করিয়া ষোলটি। অগ্নীৎ, সুব্রহ্মণ্য, গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, প্রত্যেকে তিনটি করিয়া বারটি। সমুদায় একশতটি গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। তদ্ব্যতীত কিছু সোনা, ঘোড়া, বস্ত্র, ছাতু, তিল ইত্যাদিও ঐ অনুপাতে দক্ষিণা দেওয়া হয়। চমসাধ্বর্য্যুরাও যথাসম্ভব দক্ষিণা পান। মাধ্যন্দিন সবনের সময় দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নিষ্টোমের বিবরণ এইখানে সমাপ্ত করিলাম। আপনারা ধীরভাবে শুনিলেন; আপনাদের জয় হউক।

অগ্নিষ্টোমের নানা বিকৃতি আছে; তন্মধ্যে উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র এই তিনটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাহি। ইহাদের পদ্ধতি অগ্নিষ্টোমেরই মত; তবে কিছু কিছু বিশেষ বিধি আছে। প্রথমে উক্থ্য যাগ। অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবনে পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুইটি, তাঁহার

ও সহকারীদের তিন। তৃতীয় সবনে শস্ত্র সংখ্যা দুইটি—হোতাই দুই শস্ত্র পাঠ করেন; সহকারীদের শস্ত্র নাই। কাজেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিন সবনে মোটের উপর শস্ত্র সংখ্যা বার। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্রগান হয়; অতএব স্তোত্র সংখ্যাও বার। আনুষঙ্গিক সবনীয় পশুযাগে একটি মাত্র পশু; উহাই সবনীয় পশু; অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ দিতে হয়। এই হইল অগ্নিষ্টোম। উক্থ্য যজ্ঞের প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন অগ্নিষ্টোমেরই মত। তৃতীয় সবনে হোতার দুই শস্ত্র ব্যতীত হোতার তিন সহকারীর, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন জনের, তিন শস্ত্র আছে। কাজেই প্রত্যেক সবনে শস্ত্র সংখ্যা পাঁচ; তিন সবনে পনের। শস্ত্র যখন পনের, স্তোত্রও তখন পনের। সবনীয় পশু দুইটি—অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের উদ্দেশে আর একটি ছাগ। তার পর ষোড়শী যজ্ঞ। ইহাতে উক্থ্য যজ্ঞে বিহিত পনেরটি শস্ত্র ত আছেই; তাহার উপর অতিরিক্ত আর একটি শস্ত্র আছে। কাজেই শস্ত্র সংখ্যা ষোল। অতএব স্তোত্র সংখ্যাও ষোল। ষোল বলিয়া যজ্ঞের নাম ষোড়শী। সবনীয় পশু এবার তিনটি; অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ এবং ইন্দ্রের মেষ। তার পর অতিরাত্র যজ্ঞ; পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞগুলি দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হয়; রাত্রিতে কোন কাজ থাকে না। অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শীর উপরে অতিরিক্ত রাত্রিকৃত্য থাকে। এইজন্য নাম অতিরাত্র; রাত্রিকালে তিন পর্য্যায়ে সোমাহুতি। প্রতি পর্য্যায়ে চারিটি শস্ত্র; হোতার একটি, তাঁহার সহকারী তিন জনের তিনটি—এইরূপে তিন পর্য্যায়ে বারটি শস্ত্র। রাত্রি শেষে আরো একটি শস্ত্র হোতার পাঠ্য। কাজেই ষোড়শীর ষোল শস্ত্রের উপরে এই তেরটি যোগ করিলে মোটের উপর উনত্রিষটি শস্ত্র হয়। অতএব অতিরাত্র যজ্ঞে সমুদায়ে উনত্রিশটি শস্ত্র। অতএব উনত্রিশটি স্তোত্র। সবনীয় পশু চারিটি। অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ এবং তদ্ব্যতীত সরস্বতীর উদ্দেশে একটি ছাগ।

অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, এই সকল সোমযজ্ঞ এক দিনেই শেষ হইবে। দীক্ষা এবং উদ্যোগ আয়োজনে ও আনুষঙ্গিক ইষ্টি যাগাদিতে কয়েক দিন যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত সোম যাগ এক দিনের অনুষ্ঠান; এক দিনেই তিন সবন। কিন্তু বড় বড় সোম যজ্ঞে একাধিক দিন লাগিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বার দিন অথবা তাহার অধিক দিন ধরিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে সত্র বলিত। দ্বাদশাহ নামক সত্র বার দিনের অনুষ্ঠান; গবাময়ন নামক

সত্র সংবৎসরের অনুষ্ঠান। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক বহুবৎসরব্যাপী সত্রানুষ্ঠান করিতেন, এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আপনারা শুনিয়াছেন। এই সকল বহুদিনব্যাপী সত্রানুষ্ঠানে প্রত্যহই সোম যজ্ঞ হইত; প্রত্যহই সোমের অভিষব, সোমের আহুতি, ও তৎসহিত পশু যাগাদি হইত। দ্বাদশাহ যজ্ঞে প্রথম দিনে অতিরাত্র ও শেষ দিনেও অতিরাত্র যজ্ঞ; মাঝের কয়েক দিনের কোন দিন বা অগ্নিষ্টোম, কোন দিন উক্থ্য, কোন দিন বা ষোড়শী ইত্যাদি যজ্ঞ হইত। সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রও ঐরূপ—প্রথম দিনে অতিরাত্র, শেষ দিনে অতিরাত্র, অন্যান্য দিনে অগ্নিষ্টোমাদি যাগ। সংবৎসরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত; প্রথম ছয় মাসে যজ্ঞগুলির যে পর্য্যায় ছিল, দ্বিতীয় ছয় মাসে তাহার পর্য্যায় বিপরীত ক্রমে উল্টাইয়া বৎসরের দুই ভাগকে বিম্ব প্রতিবিম্বরূপে symmetrical করা হইত। এ সকলের আলোচনার আর প্রয়োজন নাই। আর কথা বাড়াইলে আমাকে গালি দিবেন। সোম রসে মাদকতা ছিল, কিন্তু আমি সোম যজ্ঞের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে আপনাদের অবসাদ বই উন্মাদনা কিছুই হয় নাই। দুইটা রোচক কথা বলিয়া আমি আজি ছুটি লইব।

আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, সোম লতা যে কোন্ লতা, এ কালে তাহা কেহই জানে না। বেদ এবং আবেস্তা উভয় শাস্ত্রের বিবরণে বুঝা যায় যে, উহা এক জাতি ওষধি। ওষধি শব্দে বর্ষজীবী উদ্ভিদ বুঝায়; যে সকল গাছ বৎসরের মধ্যেই জন্মে, বাড়ে ও মরিয়া যায়; পর বৎসর আবার নূতন করিয়া জন্মে, বাড়ে ও মরে। সোমকে ওষধিপতি বলা হয়। সোমের বা সোম রসের বর্ণ ছিল অরুণ, পিঙ্গল; সোমের একটা প্রসিদ্ধ বিশেষণ শুক্র; শুক্র অর্থে উজ্জ্বল। উহার রসে মিষ্টতা ছিল; উহার নামান্তর মধু—বেদে ইহাকে বহু স্থলে মধু বলা হইয়াছে; উপরন্তু ইহা মাদকতা জন্মাইত, বাক্যে স্ফূর্ত্তি দিত, গায়ে বল দিত। দেবতারা ইহা পান করিতেন; ইন্দ্র সোম পান করিয়া বৃত্রকে পরাজয় ও বধ করিয়াছিলেন। শুধু বল কেন, সোমরস ব্যাধি দূর করিত। অধিক কি বলিব, বেদের ভাষায় সোম অমরতা দিত। দেবতারা সোম পান করিয়াই অমর হইয়াছিলেন; ঋষিরাও অমরত্ব পাইবার জন্য সোম পান করিতেন। অমরতা দিতে পারে বলিয়াই সোম যজ্ঞের মাহাত্ম্য। সোমের নামান্তরই এই জন্য অমৃত। এই যে সোম, মর্ত্ত্যে তিনি ওষধির রাজা; স্বর্গে তিনি দেবগণেরও এক জন রাজা; ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখিবেন, সোমকে ভূয়োভূয়ঃ

রাজা সোম বলা হইয়াছে। রাজা সোম যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলে উঁহার সম্মানার্থ আতিথ্য ইষ্টি যাগের বিধি। এককালে দেবগণের নিকটেও ইনি দুর্লভ ছিলেন। দেবতারা ইহাঁর জন্য লালায়িত ছিলেন; ইহাঁর সন্ধান পাইয়া কৌশল আশ্রয়ে ইহাঁকে আনিয়াছিলেন। সোম আনয়নের আখ্যায়িকাতে বৈদিক সাহিত্য পূর্ণ। স্বর্গের কোন্ উচ্চ দেশে সোম গুপ্ত ছিলেন; সুপর্ণ বা শ্যেন পাখী সেখান হইতে দেবতাগণের জন্য, ইন্দ্রের জন্য, সোম আহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় বহু স্থলে এই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিবেন। পুরাণে ইহা গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত হরণের আখ্যানে পরিণত হইয়াছে। বেদে দেখিবেন, সোম জলের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন; পুরাণেতিহাসে দেখিবেন, সোম বা অমৃত উদ্ধারের জন্য সমুদ্র মন্থন আবশ্যক হইয়াছিল—দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই অমৃতপ্রার্থী হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে নানা নিধি উঠিয়াছিল; সর্ব্বশেষে উঠিয়াছিলেন সোম বা অমৃত। দেবতারা অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া সেই অমৃত লাভ করেন; কেবল মহাদেবের ভাগে পড়িয়াছিল বিষ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সর্ব্বত্র এই আখ্যায়িকা নানারূপে দেখিবেন। সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট লুক্কায়িত ছিলেন; কোন পাখী, শ্যেনী বা সুপর্ণী সেই সোম আনয়ন করে; সেই সুপর্ণী আর কেহ নহে, স্বয়ং গায়ত্রী। আবার দেখিবেন, গন্ধর্ব্বদের নিকট সোম ছিলেন; দেবতারা বাগ্‌দেবীকে সেই সোম আনিবার জন্য পাঠাইতেছেন; স্ত্রীপ্রিয় গন্ধর্ব্বেরা নগ্না কুমারী বাগ্‌দেবীর লোভে সোম ছাড়িয়া দিল; বাগ্‌দেবী সোম লইয়া চলিয়া আসিলেন। সোম যজ্ঞের আরম্ভে সোমক্রয় উপলক্ষে এই ঘটনার অভিনয় হইত, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই বাগ্‌দেবী এবং গায়ত্রী অভিন্ন; কেন না গায়ত্রী ছন্দোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। দেবের মন্ত্রই বাক্; এবং বেদের সারভূতা গায়ত্রী মন্ত্র বেদের শ্রেষ্ঠ বাক্য; গায়ত্রীই বাগ্‌দেবতা। স্বয়ং বাগ্‌দেবতাকে সোম আনয়ন করিতে হইয়াছিল—তিনিই সোম আনিয়া দেবগণকে অমৃতত্ব দান করিয়াছিলেন। দেবতারা সোম যাগ করিতেন; স্বয়ং প্রজাপতি সোম যাগ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্ত্য দেবগণের পানের জন্য সোম রস প্রস্তুত করিতেন। আবেস্তা শাস্ত্রেও সোমের এই সমুদয় মাহাত্ম্য, এই সমুদয় আখ্যায়িকা, কোনও না কোনও আকারে পাওয়া যায়; আবেস্তা শাস্ত্রেও বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্ত্যের নাম প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের মধ্যেও উপাখ্যান

আছে, দেবরাজ Zeusএর জন্য ঈগ্‌ল পক্ষী মধু আনিয়াছিল; জর্ম্মাণদের মধ্যেও উপাখ্যান ছিল, দেবরাজ Odhin ঈগ্‌ল রূপ ধারণ করিয়া মধু আনিয়াছিলেন। এই ঈগ্‌ল পক্ষী শ্যেন বা সুপর্ণ; এই মধুই সোম। এই সোম কেবল বেদপন্থীর প্রধান দেবতা নহেন; সমস্ত আর্য্য জাতিরও অতি প্রধান এবং অতি প্রাচীন দেবতা। সোম যজ্ঞ আর্য্য জাতিরই প্রাচীনতম জাতীয় অনুষ্ঠান। সর্ব্বত্র ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; কেবল বোম্বাই প্রদেশে কয়েক জন পার্সী ঔপনিবেশিক এখনও এই প্রাচীন অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই।

এই সোম দেবতাটী কে? আপনারা সোমলতা কখনও চোখে দেখেন নাই। সোম শব্দের অর্থ কি, প্রশ্ন করিলে আপনারা বলিবেন, সোমের অর্থ চন্দ্র। ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে সোমকে চন্দ্রই বলা হইয়াছে—পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সোম আর চন্দ্র অভিন্ন। ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র মধ্যেও কয়েক স্থলে সোম অর্থে যে চন্দ্র তাহা মনে করিতেই হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত আছে; সূর্য্যকন্যা সূর্য্যাকে তাহার ঋষি বলা হইয়াছে। ঐ সূক্ত মধ্যে সূর্য্যারই বিবাহের বর্ণনা রহিয়াছে। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাষায় ঐ সূক্তের আরম্ভ হইয়াছে। "পৃথিবী সত্য দ্বারা উত্তম্ভিত রহিয়াছে, দ্যুলোক সূর্য্যদ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আদিত্যগণ ঋতকে আশ্রয় করিয়া দ্যুলোকে রহিয়াছেন; সোমও ঋতের আশ্রয়ে ধৃত রহিয়াছেন। সোমের বলেই আদিত্যগণ বলীয়ান, সোমের বলেই পৃথিবী মহীয়সী। অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ—নক্ষত্রগণের সন্নিধানেই সোম অবস্থিত রহিয়াছেন।" নক্ষত্রগণের নিকটে যে সোম, সে সোমকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। লতা সোমকে সেই চন্দ্রের পার্থিব মূর্ত্তিও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋষি পরক্ষণেই সাবধান হইয়া বলিতেছেন, "সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্তি ওষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ওষধি সোমকে পেষণ করিয়া লোকে মনে করে যে সোম পান করিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে সোমের নিগূঢ় তথ্য জানেন, সে সোমকে কেহই পান করিতে পায় না। পুনরায় জোরের সহিত বলা হইতেছে, "ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ"—পৃথিবীর কেহই সোমকে পান করিতে পায় না। আবার বলা হইয়াছে, "যং ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ"—দেব সোম, তোমাকে যে পান করা যায়, তাহাতে তোমার ক্ষয় হয় না, তোমার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই সোম দেবতা কোন্ দেবতা?

ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মত। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এখনও এই হেঁয়ালির রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মান পণ্ডিত হিলিব্রান্ত জোরের সহিত বলেন, চন্দ্রই আর্য্য জাতির প্রধান দেবতা ছিলেন, চন্দ্রই সোম; ঋক্ সংহিতায়ও সর্ব্বত্র সোম অর্থে চন্দ্র। অন্য পণ্ডিতেরা বলেন, ঋক্ সংহিতায় সোম সোমলতা মাত্র; ক্রমশঃ তাহাতে চন্দ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রচারের সময় তিনি একবারে চন্দ্র হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে যখন বিতণ্ডা, তখন আমাদের মত মূর্খের নিরস্ত থাকাই উচিত। কিন্তু চন্দ্রের সহিত পার্থিব সোমলতার এই সম্পর্ক কিরূপে কল্পিত হইল, মানব বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রশ্ন এই যে, চন্দ্রের ও সোমলতার সাদৃশ্য কোথায়? নিতান্ত আন্দাজের উপর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থলে উল্লেখ আছে যে, সূর্য্য অস্তমিত হইলে সূর্য্যের তেজের কতকটা চন্দ্রে প্রবেশ করে; কতকটা ওষধি মধ্যে প্রবেশ করে; তাই রাত্রিকালে চন্দ্র উজ্জ্বল হন, কোন কোন ওষধিও উজ্জ্বল হয়। কোন কোন ওষধি—বন্য লতা বা বন্য উদ্ভিদ্ রাত্রিতে উজ্জ্বল হয়; অর্থাৎ—phosphoresce করে। কথাটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে। বস্তুতই চাঁদের আলো এবং বুনো লতার phosphorescence সূর্য্য রশ্মিরই পরিণতি মাত্র। হিমালয় পর্ব্বতে এইরূপ phosphorescent ওষধি আছে, কালিদাসের সময় হইতে কবিগণ তাহা বলিয়া আসিতেছেন। পার্ব্বত্য লতাগুল্মের এই দীপ্তি কালিদাসের কবিচিত্তে বেশ একটা ধাক্কা দিয়াছিল। কুমারসম্ভবের আরম্ভেই "ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রাজন্যাম্ অতৈলপূরাঃ সুরত প্রদীপাঃ" এই শ্লোকটি স্মরণ করিবেন। ওষধিপতি সোমলতা এ পর্য্যন্ত কেহ identify করিতে পারেন নাই; কিন্তু খুব সম্ভব ইহা রাত্রিকালে phosphoresce করিত। লোকে দেখিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ থাকে, সন্ধ্যার পর আঁধার ঘনীভূত হইলে আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠে; পৃথিবীতে সোমলতাও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; একের সঙ্গে যেন অন্যের সম্পর্ক বাঁধা আছে। আকাশের চাঁদ ক্রমে ক্ষয় পায়, অমাবস্যার দিন যেন একবারে লুপ্ত হয়; কিন্তু দুদিন পরে আবার ক্ষীণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমার দিনে পূর্ণচাঁদ আকাশ আলো করে। এই চাঁদ কোথায় যায়? দেবগণ ইহাকে পান করেন, তাহাতেই ইহা ক্রমে ক্ষয় পায়। কিন্তু ইহা একবারে ক্ষীণ হইবার বস্তু নহে; ইহা আবার বৃদ্ধি পায়, ইহার

আপ্যায়ন ঘটে। বস্তুতঃ ইহা লুপ্ত হইবার নহে; ইহা অমৃতস্বরূপ। সোমলতা ওষধি, অর্থাৎ বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। বৎসর মধ্যে জন্মে, বাড়ে, মরে, আবার পর বৎসর যথাকালে গজাইয়া উঠে; আরণ্য উদ্ভিদ্, কেহ রোপণ করে না, কেহ যত্ন করে না, অথচ মরিয়াও যেন মরে না। আকাশের চাঁদ যেমন লুপ্ত হইয়াও লোপ পায় না; পৃথিবীর লতাও তেমনি মরিয়াও মরে না। উভয়েই স্বরূপতঃ এক; উভয়েই অমৃতস্বরূপ। আকাশে যে গ্রহপতি, পৃথিবীতে তাহা ওষধিপতি। উভয়ই স্বরূপতঃ এক; উভয়েই সোম। আকাশের নক্ষত্রগুলি দেবতাদের গৃহ; দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি। দেবতারা আপন আপন ঘরে বসিয়া থাকেন; সোম সেই ঘরে ঘরে বিচরণ করে; দেবতারা তাহা পান করেন; পানের পর সোমপাত্র রিক্তপ্রায় হইলে সোমের আবার আপ্যায়ন হয় বা পূরণ হয়। আকাশে নক্ষত্রমধ্যে বিচরণ কালে ছোট ছোট গ্রহগুলিও—planet গুলিও—হয়ত ছোট ছোট সোমপাত্র; ঐ পাত্রও অমৃতপূর্ণ; দেবতারা ঐ গ্রহ পূর্ণ করিয়া সোম পান করেন। পৃথিবীতে ওষধি সোম দ্যুলোকে স্থিত সেই সোমেরই প্রতিরূপ। যজমান ও ঋত্বিকেরা পাত্র পূর্ণ করিয়া সোমরসের গ্রহ পান করেন। সেই সোমও ফুরায় না; সেই জন্য তাহার আপ্যায়ন অনুষ্ঠান।

এই যে সোম দেবতা, তিনি মূলে দ্যুলোকবিহারী চন্দ্রই ছিলেন, অথবা পার্ব্বত্য লতামাত্র ছিলেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। বেদপন্থী যাজ্ঞিকের এবং যজমানের সে বিচারে বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টাইলারের স্বীকারোক্তি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে শুনাইয়াছি। Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself but of the intention with which the worshipper performs it. কোন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, যজমানের পক্ষে ও যাজ্ঞিকের পক্ষে ঐ intention-টাই বড় কথা এবং একমাত্র কথা। সোম দেবতা মূলে যিনিই হউন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাঁহাকে কোন্ চোখে কিরূপে দেখিতেন, তাহাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম "এষো দেব অমর্ত্যঃ"। ইহাঁরা স্তুতি গানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং মুখর। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ইহার প্রশংসার্থ মন্ত্র পাঠ করিতেন, শুক্ মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেন, উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সাম মন্ত্রে ইহার স্তুতি গান করিতেন। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলটাই

ইহাঁর স্তুতি গীতে পরিপূর্ণ—ঋক্‌সংহিতা ব্যাপিয়া ইহাঁর প্রশংসাবাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত ইহাঁর গুণ গান করিতেছেন; বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না। এই অমর্ত্ত্য দেব, এই চিরনবীন শিশু, এই জ্যোতির্ম্ময় গন্ধর্ব্ব, আকাশের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত ছিলেন; সেখান হইতে জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; ইহাঁর শুভ্র তেজ দীপ্তি পাইতেছিল; দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। ইনি স্তম্ভের মত দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূলোককে দ্যুলোকের সহিত যুক্ত করিয়াছেন; তিনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া আছেন। এই নবীন যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্মিয়াছেন, ইনি দিব্যরূপে রূপবান, ইনি নরের প্রতি কৃপাবান, ইনি জগতের আয়ুঃস্বরূপ। দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন বলিতেছেন, ইনি দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণমধ্যে ঋষি, মৃগগণমধ্যে মহিষ, গৃধ্রগণমধ্যে শ্যেন পক্ষী। তিনি "ঋতস্য গোপা" সত্যের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি বিদ্বান; ঊর্দ্ধ হইতে তিনি বিশ্বভবনে দৃষ্টি করেন। "ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্রে, আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া"—তাঁহারই মায়াবলে বরুণদেবের জিহ্বাগ্রে সত্যধর্ম্মের তন্তুসূত্র পবিত্রোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে। ঋষি কশ্যপের সহিত আমরাও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

ঋতং বদন্ ঋতদ্যুম্ন
সত্যং বদন্ সত্যকর্ম্মন্
শ্রদ্ধাং বদন্ সোমরাজন্
ধাত্রা সোম পরিষ্কৃতঃ।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

হে ঋতদ্যুম্ন, তুমি ঋত বাক্য বলিয়া থাক; হে সত্যকর্ম্মা, তুমি সত্য বাক্য বলিয়া থাক; হে সোম রাজা, তুমি শ্রদ্ধাবাক্য বলিয়া থাক; ধাতা কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হইয়া ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ
সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ,
সং যন্তি রসিনো রসাঃ
পুনানো ব্রহ্মণা হরে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

সত্য তুমি উগ্র; তুমি বৃহৎ; তুমি রসস্বরূপ; তোমার রসধারা সর্ব্বত্র

মিলিত হইতেছে; অহে হরি, ব্রহ্ম বাক্যে পূত হইয়া তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যত্রানুকামং চরণং
ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ,
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

ঊর্দ্ধস্থিত সেই তৃতীয় নাকে, সেই তৃতীয় দ্যুলোকে, যেখানে যথাকাম মুক্ত ভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোকসকল জ্যোতিষ্মান্, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র রাজা বৈবস্বতো
যত্রাবরোধনং দিবঃ,
যত্রামূর্যাহবতীরাপঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

যেখানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যেখানে দ্যুলোকের অবরোধ দ্বার, যেখানে অপ্‌সমূহ প্রবহমান, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র জ্যোতিরজস্রং
যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্,
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান
অমৃতে লোকে অক্ষিতে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

যেখানে অজস্র জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্গলোক অবস্থিত, হে পবমান সোম, সেই অক্ষয় অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সন্ধ্যায়।

১

জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়—
নহে দূরে দীর্ঘ অবসর ;
কর্ম্মের গুঞ্জন ক্লান্তপ্রায়,
আসিছে কি নিস্তব্ধ প্রহর ?
বল প্রিয়ে, কোথা ছিনু—কে মিলাল'
অন্তরে অন্তর।

২

মনে পড়ে প্রথম যৌবন,
প্রভাতের অরুণ-উন্মেষ ;
বনে-বনে বিহঙ্গ-কূজন,
ফুলে-ফুলে গন্ধ পরিবেষ।
প্রাণে তৃষা কি আকুল—নয়নে কি স্বপন-
আবেশ !

৩

এসেছিল বসন্ত যখন,—
কুঞ্জে-কুঞ্জে কে দিল সংবাদ ?
বর্ণে—গন্ধে ভরিল ভুবন,
রূপে—রসে কে দিল আস্বাদ ?
তখন কি দিলে দেখা অঞ্চলে লইয়া সুধাগাধ।

৪

মনে হ'ত সকলি সুন্দর ;—
কি উদার ধরণীর বুক,
মধুময় কিবা আত্ম-পর,
কি মধুর প্রকৃতির মুখ।
মুগ্ধনেত্র—মুগ্ধ হিয়া, ভাবিলাম করতলে সুখ।

৫

সুখে কভু ছিল না সন্দেহ,
অভাব ত বাজিত না বুকে ;
নিত্যপূর্ণ কমলার গেহ,
কি সৌন্দর্য্য বসিত ও মুখে।
গৃহকোণে খেলা-ঘর,—সেই স্বর্গে খেলিয়াছি
সুখে।

৬

এবে হায়, কোথা সে বিশ্বাস,—
কোথা প্রীতি—দেবতার দান।
বুকভাঙ্গা পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
কর্ণে শুনি মৃত্যুর আহ্বান।
ওই প্রিয়ে, কোথা সুখ—কোথা আশা—
হু-হু করে প্রাণ।

৭

ধূসর আকাশ-পানে চাহি—
সুখ-দুখ—নাহি কারও ধ্যান।
সাঁঝে পাখী উড়ে যায় গাহি—
যেন কোন্ বিষাদের গান।
একে একে উঠে তারা—নাহি জানে সুখের
সন্ধান।

৮

আজি মোরা সুখের কাঙ্গাল—
একি সত্য—অথবা স্বপন ?
সেই তনু—প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল,
তুমি আমি অভিন্নহৃদয়।—
এত দিনে—এ সন্ধ্যায়—বুঝিবার এসেছে
সময়।

৯

সেই প্রেম নয়নের কোণে,
সেই হাসি শুচি করে আলো ;
সেই তৃপ্তি বসি একাসনে,
সেই তুমি—সেই বাস' ভালো।
বাহিরে আসুক্ সন্ধ্যা—গৃহকোণে তুমি
দীপ জ্বালো।

১০

স্বার্থ ল'য়ে কি ঘোর প্রমাদ—
বারু করে খুলি বিতরণ ;
চারি দিকে হানাহানি বাদ—
কে করিবে তিক্ত তাহে মন ?
আমাদের তরে থাক্—সন্ধ্যা-দীপ, শান্ত
গৃহকোণ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

চিড়িয়াখানা।

১

গ্রে ষ্ট্রীটে —নং বাটীর একতালার ঘরগুলি এ কালের মত। দ্বিতলের গৃহ সে কালের মত। বাটীর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। উদ্দেশ্য 'আবরু'-রক্ষা। পার্শ্বের বাটীতে পূর্ব্বে এক জন সুবর্ণবণিক বাস করিতেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় চলিয়া যাইবার পর সে বাটীতে ছাত্রদিগের একটী 'মেস' সংস্থাপিত হইয়াছিল। যখন সে বাটী একতালা ছিল, তখন এ বাটীর প্রাচীর ছোট। সে বাটীর দ্বিতলে গৃহ নির্ম্মিত হইলে, এ বাটীর প্রাচীর উচ্চ হইয়া অবশেষে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষের মাথা ছাড়াইয়া উঠিল। দ্বিতলের বারান্দায় ঘন ঘন বাতায়নশ্রেণী স্থাপিত হইল, এবং তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া লৌহের 'রেলিং' খাড়া হইল। কালক্রমে একটা কাকাতুয়া সেই রেলিং বাহিয়া উপরে উঠিত, এবং নীচে নামিয়া আসিত। তাহার ধ্বনিতে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ কম্পিত হইত। নিকটে পাখী আসিতে পারিত না।

বারান্দায় আরও কতকগুলি খাঁচায় পাখী ছিল। বারান্দায় পূর্ব্বে রৌদ্র যাইত, এখন আর যায় না। স্ত্রীলোকেরা ছাতে যায় না। ভাড়াটিয়া বাটী হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা নিম্নতলে আসে না। কর্ত্তা নিজের জমিদারীর কাগজপত্র লইয়া বসিয়া থাকেন। ঘটনাক্রমে কোনও স্ত্রীলোক সে প্রদেশে গেলে চীৎকার করিয়া উঠেন। স্ত্রীলোকেরা বারান্দায় দিনের বেলায় যায় না। গেলে কাকাতুয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

বাহিরে পুষ্পোদ্যান ছিল। সেই প্রাচীরেরই মধ্যে। সেই উদ্যানে কীট, পতঙ্গ, পশু ও পক্ষীর অভাব ছিল না। একটা হরিণ চরিয়া বেড়াইত, তাহার সিং খুব বড়। একটা গাভী ছিল। কতকগুলি খরগোষ ছিল। বিলাতী ইন্দুর ছিল। কতকগুলি ময়ূর মধ্যে মধ্যে আসিয়া টবে জল পান করিয়া যাইত।

কর্ত্তা হলধর বসুর বাটীতে অনেক লোক। কিন্তু জানিবার যো নাই। সকলেই নিঃশব্দ। দরওয়ান রামানুজ সিং রামায়ণ পাঠ করিত—কিন্তু নিঃশব্দে। কর্ত্তা চণ্ডীপাঠ কিংবা গীতা পাঠ করিতেন, তাহাও নিঃশব্দে। স্ত্রীলোকেরা নিঃশব্দে উপন্যাস পাঠ করিত। কোন্ সময় এবং কে পাঠ করিত, তাহা জানা যাইত না, কিন্তু—লাইব্রেরী হইতে দুই তিন দিন অন্তর অনেকগুলি উপন্যাস আসিত, এবং তাহার রসিদ স্ত্রীলোকেরাই দিত। হলধর বসুর পুত্র

সন্তান ছিল না। থাকিলে বাটী অত নিঃশব্দ ভাব ধারণ করিত না। কিন্তু এক জন জামাতা ছিল। তাঁহার চেহারা দেখিলেই বুঝা যাইত যে, তিনি এক জন জামাতা। জামাতা খুব নিঃশব্দ। কিন্তু কর্ত্তার ভয়ে নহে। তিনি কাণে কম শুনিতেন, এবং কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলেও চটিয়া যাইতেন। এই গুণটুকু লক্ষ্য করিয়া বসুজা মহাশয় তাঁহাকে গৃহজামাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিতেন। বলা বাহুল্য যে, জামাইবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর কথোপকথন কেবল ইঙ্গিতে হইত।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, দ্বিতলের গৃহ সে কালের মত। বারান্দার চতুর্দ্দিকের সারি সারি রেলিংএর মধ্যে অনেকগুলি কামরা। একটা পূজার ঘর নিশ্চয় ছিল। কারণ, বারান্দায় মালিনী আসিয়া ফুলের সাজি রাখিয়া যাইত। মালিনী কেন? জামাইবাবু ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের দ্বিতলে যাইবার অধিকার ছিল না। মালিনীর স্বামী কিন্তু 'মালী' নয়। মালিনী বত্রিশ বৎসরের বিধবা। মালী অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ। সে কর্ত্তার তিন পুরুষ দেখিয়াছিল, এবং লর্ড বেন্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারলকে একদা অশ্বারোহণে যাইতে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করাতে তাহাকে অনেক দিন 'গবর্ণমেণ্ট হউসে' মালীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সে পেন্সন পাইলে হলধর বসুর পিতামহ রাম বসু (তাঁহার একটা কবির দল ছিল) স্বীয় উদ্যানের মালীরূপে নিযুক্ত করেন। সেই অবধি উদ্যানের শোভা। উদ্যানের বৃক্ষগুলি প্রায় পঁচিশ বৎসরের। তাহারা মালিনী অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ছোট। অর্থাৎ, উদ্যান-প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মালিনী সেখানে ঘটনাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া বসুজা মহাশয় তাঁহার গৃহিণীর পূজার ফুল তুলিতে ও সচন্দন তুলসীপত্র যোগাড় করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মালিনী কর্ত্রীঠাকুরাণীর প্রিয় পাত্রী, সুতরাং কর্ত্রীঠাকুরাণীর তিনটী কন্যাই মালিনীর শাসনাধীনা। সেকালের আরও একটা লক্ষণ যে, দ্বিতলে কর্ত্তা থাকিতেন দক্ষিণ প্রান্তে। প্রথমা কন্যা নলিনী (যাঁহার স্বামী 'জামাইবাবু') থাকিতেন উত্তর দিকে। পূর্ব্ব দিকে দ্বিতীয়া কন্যা অনিলা থাকিত, এবং তাহার গৃহে মালিনী বাস করিত। অনিলার ঘরে ধূপ ও নানাবিধ পূজার সরঞ্জামের ছড়াছড়ি। একটা আলমারীতে অনেকগুলি 'টিকিটমারা' পুস্তক। অধিকাংশ নভেল। পশ্চিম দিকে কনিষ্ঠা কন্যা খুকীর বাস। খুকী ও অনিলা, তাহাদের নলিনীদিদির ন্যায় নিতান্ত পঞ্চাশনশীন নহে। কারণ, অনিলার বিবাহ হয় নাই, এবং সম্প্রতি

'দ্বিতীয় শ্রেণী'তে প্রোমোশন পাইয়াছে। খুকীর বয়স মোটে দশ কিংবা এগার বৎসর। অনিলা খুব অঙ্ক কসিতে জানে। তাহার মতে খুকীর বয়স আধুনিক 'এভারেজ' মানবের আয়ুর ১/৬ অংশ, এবং তাহার নিজের ১/৬ অংশ। তাহার মতে দ্বিতল গৃহে :—

নলিনীদিদির	১/৬ অংশ	তাহাদের মাতার	১/৬ অংশ
তাহার	১/৬ ,,	জামাইবাবুর	১/২ ,,
খুকীর	১/৬ ,,	কর্ত্তার	১/৬ ,,

সর্ব্বসমেত ১/৬+১/৬+১/৬+১/২+১/৬=২ ১/২টি সম্পূর্ণ মানবের বাস।

২

খুকীর ঘরের বেশী ভাগই পুতুলে সাম্মান। খুকী দিনের বেলায় সেই গুলি গণিয়া রাখে, এবং রাত্রিকালে অনিলাদিদির ঘরে শুইয়া পড়ে। জামাই বাবু নিতান্ত দরকার না হইলে দিনের বেলা দ্বিতলে উঠিতে চাহেন না, এবং তিনি না উঠিলেও যদি তাঁহার মনটা সিঁড়ি বাহিয়া উঠে, তখন তিনি তামাক সাজিয়া তাহার ধূম পান করেন। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির ধাপ কয়টা, তাহা তিনি ও বাটীর 'কণ্ট্রাক্টার' ছাড়া আর কেহ জানিত না। জামাইবাবু আরও বেশী জানিতেন। সিঁড়িতে উঠিতে ঠিক পুরা এক মিনিট লাগিত। নামিতে ঠিক দুই মিনিট লাগিত। এ সম্বন্ধে অনিলা চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়াছিল যে, নামিবার সময় জামাইবাবু ইহজীবনের উদ্দেশ্য ভাবিতেন, তাহাতেই অত দেরী হইত, এবং উঠিবার সময় একটা মতলব করিয়া আসিতেন, তাহা কিন্তু নলিনীদিদি ব্যক্ত করিতে দিতেন না। এই জন্য জামাইবাবু কল্পনা-নদীর মাঝে দুইটী তরীতে পদস্থাপন পূর্ব্বক দুলিতেন। সেই সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কাকাতুয়াও দুলিত, এবং সঘনে চীৎকার করিয়া উঠিত। তখন জামাইবাবু বারান্দায় গিয়া তাহার মুখে একটা কাঠী দিয়া থামাইতেন। কাকাতুয়ার চীৎকার সকলেই সহিয়া থাকিত, কারণ দ্বিতলে শব্দ-জগতের সেই একমাত্র মালিক, যেমন একতালায় কর্ত্তা স্বয়ং।

ক্রমাগত অন্ধকারে থাকিয়া বাটীর মেয়েগুলি খুব কর্ম্মী ও কেশজাল সুদীর্ঘ। ক্রমাগত সাবধানে থাকিয়া সকলেরই চক্ষু খুব টানা ও পদবিক্ষেপ ধীর। ক্রমাগত নিঃশব্দে থাকিয়া সকলেরই স্বর অতিশয় কোমল। সকালে ও সন্ধ্যায় পূজাগৃহে এক ঘণ্টাকাল ভক্তিভরে বসিয়া থাকায় সকলের স্বভাব অতি ধীর ও নম্র।

দ্বিতলের গৃহকর্ম্মের খুব বাঁধা বন্দোবস্ত। প্রত্যেকের নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া রাখার কথা। প্রত্যেকে নিজের কাপড় দ্বিতলের কলে দুই বেলা ধৌত করে। সূর্য্যোদয়ের সময় সকলে অনিলার ঘরে গিয়া বসে, এবং সূর্য্যাস্তের সময় সকলে খুকীর ঘরে গিয়া চুল বাঁধে। এবং তৎক্ষণাৎ সকলে দ্বিতলের রন্ধনশালায় গিয়া জলখাবার তৈয়ারী করে, এবং নীচে পাঠাইয়া দেয়। কখনও কখনও অনিলা, খুকী ও স্ত্রী নলিনীকে লইয়া বাটীর মোটরকারে জামাই বাবু হাওয়া খাইতে যান, এবং হাওয়া খাওয়া সাঙ্গ হইলে বাটী ফিরিবার সময় হাসিতে চেষ্টা করেন। এমন কি, জামাই বাবু এক দিন গুণ্-গুণ্ স্বরে গান ধরাতে অনিলা তাহার পিতাকে বলিয়া একটী ডল্‌সেটিনা কিনিয়াছিল। সম্প্রতি তাহার 'বেলো' খারাপ হইয়া যাওয়াতে অনিলার মন খারাপ হইয়াছিল। জামাইবাবু মধ্যে মধ্যে কর্ত্তা বাটীতে না থাকিলে একটু জোরে গায়িতে চেষ্টা করিতেন। কর্ত্তা থাকিলে নিঃশব্দে গায়িতেন। কর্ত্তা ধর্ম্মসঙ্গীত ছাড়া আর কিছু ভালবাসিতেন না। তাঁহার মতে চীৎকার করিয়া গাওয়া অসভ্যতা, এবং তাহাতে দেবতাদের মানের হানি হয়। কর্ত্তা তালের সঙ্গে গায়িলেই চটিয়া যাইতেন। কিন্তু জামাইবাবুর তালই বেশী 'দোরস্ত' ছিল। তালের জোরে গান চলিয়া যাইত, যেমন হামাগুড়ির জোরে শিশু চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে, যেমন হামাগুড়ির পরে শিশু চিৎ হইয়া পড়ে, সেই রকম জামাইবাবু তাল 'ফেরতা' করিয়া লইতেন, এবং তাহার গুণপণা দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিতেন। অনিলা অনেকগুলি গান জানিত, এবং সেগুলি নানা রকম করিয়া গায়িত। খুকীর মনে হিংসা ছিল না, কিন্তু দিদির গান সম্বন্ধে সামান্য একটু ছিল, কারণ স্কুলে সকলেই অনিলার প্রশংসা করিত। খুকীর প্রশংসা কেহই করিত না।

এই রকম করিয়া দিন কাটিতেছিল। এমন সময় পার্শ্বের বাটীতে একটা বিপ্লব ঘটিল। মেসের ছেলেদের মধ্যে এক জনের বাক্স পুলিস তালাশ করিয়া যাওয়াতে বাটীর মালিক সে বাটী হইতে সকলকে উঠাইয়া দিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সেখানে একটী পরিবার আসিয়া জুটিল। তাহারা ফুলের টব দিয়া ছাত সাজাইয়া ফেলিল, এবং সেই ছাতের উপর চেয়ার লইয়া সকালে ও সন্ধ্যায় বসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের স্ত্রীলোকদের সাজসজ্জা অনেকটা এ কালের মত, এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা খুব 'রিফাইন্‌ড'। তাহারা চার সঙ্গে বিস্কুট খাইত, এবং তাহাদের বাটীতে 'মালিনী' ছিল না। তাহাদের পাখী ছিল না। কিন্তু তাহাদের একটা টেবল্ হার্ম্মোনিয়ম ছিল, এবং বাটীর একটী ছেলে সুন্দর

সেতার বাজাইত। তাহার সময় অসময় ছিল না। বোধ হয়, বহি মুখস্থ করিয়া অত্যন্ত অবসাদ হইলে সে সেতার ধরিত, এবং তাহা বাজাইতে বাজাইতে ঘুমাইয়া পড়িত। ছেলেটি কলেজে বি. এস্-সি. পড়ে। নাম, প্রবোধচন্দ্র। তাহাদের ধরণ ব্রাহ্মদিগের মত। স্ত্রীলোকেরা কোমল বুট জুতা পায় দিয়া ছাতে বেড়ায়। এক জন চস্‌মা চোখে দেয়। সে 'বি. এ. পাস'। প্রবোধের দিদি।

প্রবোধের দিদিকে প্রবোধ 'বি.এ. দিদি' নাম রাখিয়াছিল। প্রবোধ বাপের অত্যন্ত আদরের ছেলে। তাহার ইচ্ছা ছিল, ক্রমে দিদি 'এম. এ. দিদি'র পদে আরোহণ করিবে। কিন্তু দিদির বিবাহ সিমলা পাহাড়ের এক জন সেক্রেটারি-য়টের বড় বাবুর সঙ্গে হইয়া যাওয়াতে তিনি 'কলেজ কেরিয়ার' পরিত্যাগ করিয়া দাম্পত্যজীবনের জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। দিদির প্রধান কাজ চিঠি লেখা, এবং তাঁহার চারি রকম চিঠির কাগজ ও পাঁচ রকমের লেফাফা ছিল। তিনি সরু 'নিবে' স্বামীকে পত্র লিখিতেন, নচেৎ কাগজ বেশী খরচ হইয়া যাইত। নিমন্ত্রণপত্র মোটা 'নিবে' ও সবুজ কালীতে লিখিতেন। দরকার হইলে লাল ও নীল কালী মিশাইয়া বেগুনে কালী করিয়া লইতেন, এবং একই পত্রে কখনও সবুজ, কখনও বেগুনে, কখনও নীল প্রভৃতি কালীর সহযোগে চিত্র বিচিত্র করিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতেন।

আজ 'বি. এ. দিদি' প্রবোধের সঙ্গে ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বসুজা মহাশয়ের ছাতের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে এ বাটীর দ্বিতলের সংগঠন-প্রণালী, ও কাকাতুয়ার ধ্বনি, এবং অবরুদ্ধ স্ত্রীলোকদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা ও জামাইবাবুর আরোহণ ও অবরোহণ প্রভৃতি দেখিয়া দিদি প্রবোধকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এটা একটা চিড়িয়াখানা নিশ্চয়।'

৩

প্রবোধ সাহস পাইয়া আলিশার নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বাড়ীর দোতালায় কে আছ গো, এটা কি চিড়িয়াখানা?' খুকী একাকী তাহার ঘরে বসিয়াছিল। সে মেমসাহেবের মত একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক জন পঞ্জাবী আস্তীনওয়ালা যুবককে দেখিয়া একেবারে খোলা ছাতে উঠিয়া গেল, এবং প্রাচীরের উপর গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কি চীনেবাজারের সওদাগর?' উত্তর শুনিয়া প্রবোধ খুব হাসিল। বি.এ. দিদি বলিলেন, এরা নিশ্চয় পর্দ্দানসীন। 'তোমার চেয়ে বড় মেয়ে এ বাড়ীতে নাই?'

খুকী দৌড়িয়া অনিলাকে ডাকিয়া আনিল। অনিলা প্রাচীরে গলা বাহির

করিয়া দিল। প্রবোধ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'দিদি, কি সুন্দরী মেয়ে দেখ! যেন শকুন্তলার ছবিখানি।' তাহা শুনিয়া অনিলা অন্তর্ধান হইয়া গেল।

বি.এ. দিদি বলিলেন, 'তোমাদের চেয়ে বড় মেয়ে নাই? তোমাদের যাকে ডাক না।'

খুকী। বড় দিদি ও মা পুরুষ মানুষের সম্মুখে বেরোন্ না।

দিদি। (প্রবোধের প্রতি) 'তুমি চলে যাও।'

প্রবোধ চলিয়া গেলে নলিনী প্রাচীরের উপর গলা বাড়াইয়া দিল। বি.এ. দিদি খুব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম?'

নলিনী। আমার নাম নলিনী। আপনারা এ বাড়ীতে কবে এসেছেন?

বি.এ. দিদি। আজ সাত দিন হ'ল। আমরা মনে করেছিলেম, এ বাড়ীটা 'চিড়িয়াখানা'; তাই প্রথমে এদিকে যেঁসি নাই। ওরা কি তোমার বোন্? সকলের মুখ এক ছাঁচে ঢালা। আমি 'ফটো' তুল্‌তে পারি। 'ক্যামেরা' আছে।

নলিনী। আপনার স্বামী এ বাড়ীতে থাকেন?

বি.এ. দিদি। (হাসিয়া) তাও কি কখন হয়? তা হলে আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে যেতুম। তিনি নাই বলেই আমি ছাতে এসে তোমাদের সন্ধান করেছি। আমার স্বামী সিমলায় পাহাড়ে থাকেন।

অনিলা পার্শ্বে লুকাইয়াছিল। সে বলিল, সে পাহাড়টা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে।

বি.এ. দিদি। তোমার স্বামী কোথায় থাকেন?

অনিলা। (গলা বাড়াইয়া) এ বাটীরই নীচের তালায়। আমাদের দিদির স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন ত?

নলিনী। তাঁর কথা অনিলাকে জিজ্ঞাসা করুন।

অনিলা। তিনি আমাদেরই বাড়ীতে থাকেন।

বি.এ. দিদি। সে খুব ভাল। চিঠিপত্র লিখ্‌তে হয় না। কোনও ভাবনা চিন্তে নেই। খাবারগুলি সব দেখে শুনে দেওয়া যায়। অসুখ হলে কাছে থাকা যায়।

অনিলা। নলিনী দিদি তাঁকে সপ্তাহে একবার চিঠি লেখেন, এবং জামাই-বাবু তার উত্তর পাঠিয়ে দেন।

বি.এ. দিদি। এ বন্দোবস্ত খুব চমৎকার। বাটীর মধ্যেই স্ত্রী স্বামীকে পত্র লেখার প্রথা এই প্রথমে শুনলুম।

অনিলা। ঠিক সে রকম নয়। দিদি চিঠি লিখে দেন। মালিনী ডাকঘরে ফেলে দেয়। জামাইবাবুও তার উত্তর ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসেন।

বি.এ. দিদি। এটা আরও চমৎকার বন্দোবস্ত। অসুখ বিসুখ হ'লে?

অনিলা। ডাক্তারে খবর না দিলে আমরা অসুখ বিসুখ গ্রাহ্য করিনে। আমাদের সামান্য অসুখ বিসুখ হ'লে আমরা তুলসীপাতার রস খাই।

নলিনী। আমাদের বারান্দায় অনেক রকম পাখী আছে, তাদের এই সময় খেতে দিতে হয়।

বি.এ. দিদি। আমার বড় ইচ্ছা, তোমাদের বাড়ী একবার দেখি। অন্ততঃ দোতালা। আমার বোধ হয় তোমরা এক তালায় থাক না?

অনিলা। না। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে, এই সহরে যদি ছাতের সঙ্গে ছাত জুড়ে একটা লম্বা রাস্তা থাকত, তবে আমরা রোজ বেড়াতুম।

বি.এ. দিদি। সেটার যোগাড় করা কোনও শক্ত কথা নয়। তোমাদের ছাত হ'তে আমাদের ছাত কেবল দুই হাত তফাৎ বই ত নয়। একখানা তক্তা ফেলে দিলেই হবে। কাল এর বন্দোবস্ত করা যাবে। আমার 'ক্যামেরা' এনে কাল তোমাদের ফটো তুলে নেব। তুমি স্বামীকে কি কালী দিয়ে পত্র লেখ?

নলিনী। কালো কালী।

বি.এ. দিদি। সেটা উচিত নয়। হয় সবুজ নয় বেগুনে কালী দিয়ে লিখ। নিজের কালী না থাকলে অনেক সময় জাল চিঠি বেরোয়। কিংবা চিঠি ওলট-পালট হয়ে যায়। অনেক চিঠি লিখতে হলে এমনই জঞ্জাল হয় যে, সাম্‌লানো মুস্কিল। আমি একটা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। মাঝে আমার স্বামীকে যে কবিতা লিখেছিলুম, সেটা মাসিক পত্রিকায় 'পোষ্ট' হয়ে গিয়েছিল। সেটা কবিতা। পত্রিকায় যে কবিতা লিখেছিলুম, সেটা স্বামীর খামের মধ্যে 'পোষ্ট' হয়ে গিয়েছিল। এমন ভুল মাঝে মাঝে হওয়া অসম্ভব নয়।

নলিনী। আমি স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিনে।

বি.এ. দিদি। ঐ যে কাকাতুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে—উনি কে?

অনিলা। ঐ ত আমাদের জামাইবাবু।

বি.এ. দিদি। খুব ভালমানুষ বলে বোধ হয়। আচ্ছা, উনি বাড়ীতে শাল গায় দিয়ে থাকেন কেন?

অনিলা। তা না হ'লে বাবা চটেন। বাবা বলেন, সকলে নিজের নিজের মর্য্যাদা রেখে চ'লবে।

বি.এ. দিদি। এ প্রথাটাও মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের প্রবোধ তা মানে না। তবে জামাইবাবু ও ছেলে, অনেক তফাৎ।

অনিলা। জামাইবাবু কাণে কম শোনেন, সেই জন্য তিনি বড় একটা ওপরে আসেন না।

বি.এ. দিদি। কি দুঃখের কথা, কি আশ্চর্য্য কথা। আমার স্বামীও কাণে কম শুনতেন, কেবল আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে সেরে গেছেন। কাণের সুব্যবহার না হ'লে কাণ খোলসা হবে কেন? স্ত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে কথা না কহিলে, স্ত্রীর দিকে ভাল করে চেয়ে না দেখ্‌লে চক্ষু কর্ণের উৎকর্ষ কখনও হ'তে পারে না। আমার বড় দুঃখ হয়েছে তোমাদের দশা দেখে। তোমরা কি ক'রে জীবন কাটাচ্ছ, জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

নলিনী। দিদি, তুমি যদি ওঁর কাণ ভাল ক'রে দাও, তবে চিরকাল দাসী হয়ে থাক্‌ব।

বি.এ. দিদি নলিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, তোমার স্বামী আমার মায়ের পেটের ভাই, আমি তাঁর কাণ সারিয়ে দেব।

৪

অনেক ডাক্তার জামাইবাবুর কর্ণের চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কোনও উপকার দর্শাইতে পারেন নাই। বি.এ. দিদির অভূতপূর্ব্ব প্রস্তাবে সকলের মনে একটা আশা হইল। নলিনীর ধারণা হইল যে, একলা বাটীতে চুপ করিয়া বসিয়া স্বামীর কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, এবং চক্ষু পাছে অন্ধ হয়, এই ভয় ভবিষ্যতেও ছিল। নলিনীর মাতা শুনিয়া খুব খুসী হইলেন, এবং বি.এ. দিদিকে তার পর দিতলে লুকাইয়া লইয়া আসিলেন। মালিনী উভয় ছাতের মাঝে একখানা তক্তা বসাইয়া সুচারু রাস্তার বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

বি.এ. দিদি গৃহগুলি পরিদর্শন করিয়া বলিলেন, 'এখানে কর্ণ সারিবার উপায় নাই। কর্ত্তা যখন শব্দের বিরোধী, সে বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতি অসম্ভব। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, দাম্পত্য কলহ মানব জগতের উন্নতির মুখ্য কারণ, কেন না, প্রাণ খুলিয়া ঝগড়া আর কারও সঙ্গে অসম্ভব। অন্ততঃ সকালে ও বিকালে চা খাইবার সময় একটু তর্ক করিলে উন্নতি হইতে পারে।'

সেই জন্য বি.এ. দিদি নলিনীকে জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়া তাঁহাদের ছাতের উপর চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

নলিনীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কি বেহ্ম', আপনাদের সঙ্গে চা খেতে দোষ নেই ত?'

বি.এ. দিদি। (সগর্ব্বে) 'স্বয়ং ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে গেছেন। আমরা সমাজের বেহ্ম নয়। কেবল ধরণধারণ বেহ্মর মতন। ঠাকুর দেবতাদের মেনে চলি। তবে অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না।'

নলিনীর মা। তা হলেই হল মা। অস্থিতে নাই বা বিশ্বাস কল্লে, রক্ত-মাংসটুকু বিশ্বাস কল্লেই যথেষ্ট। আর বিশ্বাস কেই বা করে? আমরাও দেখিনি, তোমরাও না। তবে মেনে চলা ভাল। গেরস্তর ঘরে কখন কি বিপদ ঘটে, তা বলা যায় না। যত বিপদের ত্রাণকর্ত্তা দেবতারা। আমার ঘাড়ে একবার মাকসা চেটেছিল, কোনও ডাক্তার কিছু কর্ত্তে পারে নি। তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। অবশেষ কেবল কালীঘাটে পুজো দিয়ে ঘাড় তুল্‌তে পাল্লেম।

বি.এ. দিদি 'গিন্নী'র মনরক্ষা করিয়া কহিলেন, 'আমারও সেই মত। বিপদের সময় চেষ্টা করায় কোনও হানি নাই। আমরাও ঐ রকম অনেক একস্‌পেরিমেণ্ট করেছি।'

ইতিমধ্যে নলিনী জামাইবাবুকে ও বাড়ীর ছাতে যাইতে রাজি করাইয়াছিল। ছাতের যে দিকে ছায়া, সেই দিকে বি.এ. দিদি পর্দ্দা খাটাইয়া একটা জাপানী টেব্‌লের উপর চায় সরঞ্জাম ও কেক্ সাজাইতে লাগিলেন। নলিনী ও বাটী হইতে কড়াইসুঁটীর গরম কচুরী লইয়া আসিল।

জামাইবাবুর আহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কেক্ ও কচুরী মিশাইয়া কি করিয়া খাদ্যের মান রক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি শীঘ্রই ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে চা খাইয়া তাঁহার উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়া উঠিল। তিনি বি.এ. দিদিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, 'উনি এক জন মহাপুরুষ।'

ইহাতে নলিনী হাসিল, এবং লজ্জিত হইল। বি.এ. দিদি বলিলেন, 'ভাইয়ের প্রশংসা শিরোধার্য্য, এতে লজ্জার কোনও কারণ নাই।'

জামাইবাবু কর্ণের পার্শ্বে করতল প্রসারিত করিয়া ধ্বনি গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি পেয়ালা শেষ হইলে বলিলেন, 'টিক্!'

জামাইবাবুর দাম্পত্যজীবনের মধ্যে এমন উৎসাহ কখনও দেখা যায় নাই। নলিনী খুব খুসী হইয়া বলিল, 'আচ্ছা বল, দিদি শুনবেন।'

জামাইবাবু বলিলেন, 'জীবনের ভার স্কন্ধে না পড়িলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন হয় না। সংসারে কোনও প্রান্তে, কর্ম্মক্ষেত্রে, নিঃসহায় অবস্থায় না পড়লে

সেটা কেহ বুঝতে পারে না। তাই আমি অনেক সময় মনে করেছিলেম যে, ওকে নিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ভয় হয়। সেই জন্য চেষ্টা করি নাই।'

নলিনী অবাক হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'ঠিক বল্‌ছ?'

জামাইবাবু। নিশ্চয়।

নলিনী। তবে এতদিন একবার বলা উচিত ছিল।

জামাইবাবু। বলি কখন? বলিলে পাছে তুমি রাজি না হও, তবে ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা। বলিবার 'ফুরসৎ' কৈ? আহার এত বেশী রকম হয় যে, সুন্দর কল্পনাগুলি পেটের মধ্যেই থাকিয়া যায়। যাই কোথা? যদি কষ্ট হয়, তখন তুমি আমাকে দোষের ভাগী করিবে।

নলিনী। তোমার কষ্ট কি আমার নয়? শুনছ দিদি?

বি.এ. দিদি। শারীরিক কষ্ট যাহারা ভাবে, তাদের দিয়ে সংসারের কোনও উপকার হয় না। আমার মতে তোমাদের এক দিন রাত্রিতে পালিয়ে অন্ততঃ গোলদীঘীর ধারেও বেড়ান উচিত ছিল। এটুকু সাহসও যদি না হয়, তবে বিপদে আপদে স্ত্রীকে রক্ষা করবে কি ক'রে?

নলিনী। আমরা ত মাঝে মাঝে এক সঙ্গে থিয়েটরে গিয়েছি।

জামাইবাবু। তাতে ছাই হয়। তুমি কেবল হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক। তোমার হৃদয়ে স্পন্দন কখনও হয়, তা আমার বিশ্বাস হয় না।

নলিনী। তুমি কি তাদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক না?

এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা কলহের সূত্রপাত দেখিয়া বি.এ. দিদি খুব খুসী হইলেন।

৫

কেন না, কলহই প্রেমের প্রথম সোপান।

বি.এ. দিদি একবার মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—'দ্বন্দ্ব না হইলে প্রণয় প্রগাঢ় হয় না। অনেক সময় দুইটী ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে খুনাখুনি হইয়া যায়, পরে পরস্পরের অবস্থা দেখিয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের এত করুণার সঞ্চার হয় যে, অবশেষে উভয়ে উভয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।'

তাই তিনি বলিলেন, 'দেখ গোবিন্‌লাল (গোবিন্‌লাল জামাইবাবুর নাম) স্ত্রীর চেয়ে আর মায়ার মানুষ কেহ নাই। নিজে না খেয়ে, রোগে কাতর হয়ে, সকল সুখ ত্যাগ করে' প্রথমে গৃহের মধ্যে শান্তি সঞ্চার করে। কখনও

ছেলেপুলের লাথি খায়, কখনও স্বামীর তাড়া খায়, কখনও শ্বশুর শাশুড়ীর গঞ্জনা। স্ত্রী যেন সকলেরই শত্রু। যেন বিশ্বের সকলেই সেই প্রেম ও আত্ম-ত্যাগের গ্রন্থির উপর কুঠারাঘাত করে। কিন্তু সতী বলিয়া সহিয়া যায়। স্ত্রীর গুণে পশু থেকে মানুষ কি ক'রে হয়, তার উদাহরণ ভারতবর্ষ। প্রত্যেক স্ত্রী যীশুখ্রীষ্টের মত কষ্ট পেয়ে মরে, কিন্তু সতী ব'লে সরে যায়। স্ত্রী না থাকিলে ছেলে হয় না, ভাই হয় না, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয় না।

'তবে কলহ হওয়া স্বাভাবিক। ডারউইন যেখানে পশুজগতের দ্বন্দ্ব দেখিয়ে-ছেন, সেটা করুণার প্রথম সোপান। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের স্রোত দেখে অশোকের মনে যেমন করুণার সঞ্চার হয়েছিল, আমাদের গৃহস্থের ঘরে স্ত্রীর কষ্ট দেখেও কখনও পুরুষের মনে করুণার সঞ্চার হবে, তা নিশ্চয়।'

বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে নলিনী চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। বি.এ. দিদি চশমাখানি রুমালে মুছিয়া আর এক পেয়ালা চা তৈয়ারী করিলেন।

এমন সময় মালিনী আসিয়া খবর দিল যে, খুকীর সঙ্গে অনিলার ঝগড়া হইয়াছে, এবং সেই ঝগড়া দেখিয়া কাকাতুয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। নীচে কর্ত্তা তাহা শুনিয়া চটিয়াছেন।

অনিলার সঙ্গে খুকীর মধ্যে মধ্যে খাবার লইয়া ঝগড়া হয়, এবং তাহাতে বাটীর পশু পক্ষী বিরক্ত হইয়া কলরব আরম্ভ করে। জামাইবাবু ছাড়া তাহা থামাইবার কেহ নাই। ঝগড়ার সূত্রপাত মালিনী করিয়া দেয়। সে অনিলাকে ভালবাসে। খুকী অত্যন্ত রাগী। সে মালিনীকে ধরিয়া প্রহার করে, এবং মধ্যে মধ্যে চিম্‌টী কাটিয়া দেয়। কর্ত্তা ছোট মেয়েকে ভালবাসেন। গিন্নী অনিলার দিকে। বাটীতে গোলমাল করিবার যো নাই, কিন্তু আজ নলিনী ও জামাইবাবু না থাকাতে অকস্মাৎ গোলমাল বাধিয়া গিয়াছিল।

তাহা শুনিয়া নলিনী স্বামীকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রবোধ কলেজ হইতে আসিয়া দিদির চক্ষু টিপিয়া ধরিল।

'বি.এ. দিদি, তুমি এতক্ষণ করছিলে কি?'

বি.এ. দিদি। বেশী কিছু নয়, ঐ চিড়িয়াখানার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। ওদের জামাইবাবু এক জন অদ্ভুত লোক।

প্রবোধ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। 'চিড়িয়াখানা'র কথা শুনিয়া তাহার সেতার বাজাইবার ইচ্ছা হইল।

একটা 'এলোমেলো' বাতাস তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহিয়া চিড়িয়াখানার

সুপারী বৃক্ষের মাথা দুলাইয়া দিল। সন্ধ্যা যখন খুব জমকাল, আকাশের তারা যখন খুব উজ্জ্বল, এবং হাওয়াটা যখন খুব মধুর, তখন প্রবোধ তাহার ক্ষুদ্র সেতার লইয়া মনের সাধে পূরবী রাগিণী আলাপ করিতে লাগিল।

কিন্তু অন্য দিনের মত আজ সেতার বাজিল না। প্রবোধের একটা বাঁশের বাঁশী ছিল। প্রবোধ সেটা বাহির করিয়া ছাতের আলিশার উপর মস্তক রাখিল, এবং একটা গৎ বাজাইতে বাজাইতে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল।

নিদ্রিত প্রবোধের হস্ত হইতে বাঁশী স্খলিত হইয়া চিড়িয়াখানার বারান্দায় পড়িয়া গিয়াছিল, এবং কাকাতুয়া সেটা মুখে করিয়া উচ্চ 'রেলিং' হইতে নীচে নামিতেছিল, এমন সময় অনিলা তাহা লক্ষ্য করিয়া কাকাতুয়ার মুখ হইতে বাঁশীটি কাড়িয়া লইল।

খুকীর সঙ্গে ঝগড়ার পর অনিলা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। সেতারের আলাপ ও তৎপরে বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার রাগটুকু তিরোহিত হইয়া মায়া-মমতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কাকাতুয়ার মুখ হইতে বাঁশী কাড়িয়া লইয়া অনিলা তাহা বাজাইতে বসিয়া গেল। বলা বাহুল্য, অনিলার বাঁশী বাজাইবার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু সুরজ্ঞান থাকাতে 'কসরৎ' করিতে চেষ্টা করিল, এবং সেই 'কসরতে'র ফলে বাঁশীটি অপূর্ব্ব ধ্বনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। তার মধ্যে কোনও সুর ছিল না, কোনও রাগিণী ছিল না, এমন কি, সা রি গ ম-গুলিও অনাথ আতুরের মত অঙ্গুলির টিপ্পনীতে ত্রাহি স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া পাখীগুলি অসময়ে ডাকিয়া উঠিল, নারিকেল গাছের অগ্রভাগে ময়ূর কেকারব ছাড়িয়া দিল, এবং কাকাতুয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল।

বেগতিক দেখিয়া অনিলা নিজের শয়নগৃহে গিয়া বাঁশীটি বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, পর দিন তাহার জানা রাগিণীগুলি ও সঙ্গীত-সমাজের প্রকাশিত গৎগুলি তাহাতে সুচারুরূপে বাহির করিবে।

পাখীদের চীৎকার শুনিয়া খুকী লুকাইয়া বারান্দায় আসিয়াছিল, এবং অনিলাদিদির কসরৎ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। সে মনে মনে মতলব আঁটিল যে, সময় পাইলে দিদির বালিশের তলা হইতে বাঁশীটি চুরী করিয়া একবার বাজাইয়া দেখিবে। মতলবটা খুব সাধু, কিন্তু খুকী সে দিন ও তার পর দিন সময়াভাবে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই।

৬

নলিনীর সঙ্গে বি.এ. দিদির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা প্রত্যহ ছাত ডিঙাইয়া ও বাটীতে চলিয়া যায়। বি.এ. দিদি অনিলার পড়া মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন, এবং শক্ত অঙ্ক থাকিলে (বিশেষতঃ ত্রৈরাশিকগুলি) প্রবোধকে দিয়া কসাইয়া লন।

আজ অনিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা, তাই সে সকাল সকাল স্কুলে গিয়াছিল। খুকীদের সেই জন্য ছুটী। অবসর পাইয়া খুকী প্রবোধের বাঁশীটি অনিলার ঘর হইতে লইয়া নিজের ঘরে গিয়া বাজাইবার চেষ্টা করিতেছিল। নলিনী তাই দেখিয়া গৃহিণীকে খবর দিল।

গৃহিণী খুকীকে ডাকিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, 'তুই অনিলার বাঁশী কেন নিয়েছিস্?'

খুকী। এ বাঁশী দিদির নয়। ও বাড়ীর ছাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, তাই দিদি লুকিয়ে বাজাত।

গৃহিণী। সে কি কথা রে? ওরা যে 'বেম্ম'। ওদের এঁটো বাঁশীতে অনিলা মুখ দেয়?

ইহা মনে করিয়া গৃহিণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নলিনী বলিল, 'তাতে আর দোষ কি? গঙ্গাজলে ধুয়ে নিলেই চল্‌বে।'

গৃহিণী তাহাতে আরও রাগিয়া গেলেন, এবং নলিনীকে ডাকিলেন। নলিনী আসিলে গৃহিণী বলিলেন, 'তোরা বাড়ীতে থেকেও আমার দেখ্‌বার শোনবার কেউ নেই? এই যে সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল, এখন উপায়? অনিলা বেম্মদের এঁটো বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে। এখন যে বাড়ীর হাঁড়ীগুলো ফেল্‌তে হয়, কাপড় চোপড় ধোপার বাড়ী দিতে হয়। কর্ত্তা শুন্‌লে বলবেন কি? কি ছিষ্টিছাড়া মেয়ে গো! আমি আগেই বলেছিলেম, মেয়ে ছেলেদের বেশী দিন স্কুলে দিলে তাদের আর জাতিবিচার থাকে না। এখন উপায়?'

নলিনী মনে মনে হাসিল। এ কয় দিন ধরিয়া জামাইবাবু ও সে যে পরিমাণ বিস্কুট, কেক, ডিমের ওম্‌লেট্ প্রভৃতি খাইয়াছে, তাহার কাছে বাঁশী কোথায় লাগে! কিন্তু গৃহিণীকে ভয়ানক উতলা দেখিয়া নলিনী বলিল, 'এটা গ্রহদোষ হয়ে গিয়েছে। গেরণ টেরণ লাগ্‌লে আমরা যেমন হাঁড়ি ফেলে দিই, সেই রকম একটা কিছু কর্‌লেই হবে।'

গৃহিণী। তাই কর মা। আমি ত আর পারি নে। এই বিয়াল্লিশ

বৎসর ধরে' কেবল তোদের জাতি ও কুলমান রক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে আমার বাতে ধরেছে; তাতেও কি তোদের একটু দয়া মায়া হয় না?

নলিনী দয়া মায়া দেখাইয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল; মালিনী একেবারে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। গৃহিণী বলিলেন, 'থাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে, কর্ত্তা শুন্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না। তিনি একেই গোলমাল ভালবাসেন না, তার উপর জাতি নিয়ে টানাটানি। এ কথা বাইরে কেউ শুন্‌লে মেয়ের বিয়ে হবে না।'

খুকী, এত দূর গড়াইবে, তা মনে করে নাই। পাছে বাঁশী নিয়ে গোলমাল হয়, সেই জন্য সে এক দৌড়ে ছাত পার হইয়া প্রবোধের নিকট উপস্থিত।

প্রবোধ খুকীর চক্ষু জলাকীর্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপারখানা কি? এ যে আমার বাঁশী। কোথায় ছিল?'

খুকী। এটা আমাদের বারান্দায় পড়ে গিয়েছিল, তাই দিদি বাজাত। মা শুনে বড় রাগ করেছেন। দিদির জাত গিয়েছে। তোমাদের এঁটো বাঁশীতে মুখ দিয়ে। দিদি বাড়ী ফিরে এলে মা ভয়ানক বক্‌বেন।

প্রবোধ। আচ্ছা, তুমি যাও, এর বিধান আমি কর্‌ব এখন।

খুকী লুকাইয়া তার ঘরে আসিয়া বহি লইয়া পড়িতে বসিল। এ দিকে জামাইবাবু, নলিনী, নলিনীর মা (গৃহিণী) ও মালিনী তন্ন তন্ন করিয়া অনিলার ঘর খুঁজিয়া বাঁশী পাইল না।

বিকালে অনিলা স্কুল হইতে হাসিমুখে আসিয়া খবর দিল, 'মা! আজ সব কয়টা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি।' কিন্তু অন্যদিনকার ন্যায় গৃহিণী আজ সন্তুষ্ট হইলেন না।

গৃহিণী। তোদের এগ্‌জামিনের মুখে ছাই।

অনিলা। কেন মা?

গৃহিণী। তোর কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই? তুই ঐ বেহ্মদের এঁটো বাঁশীতে মুখ দিয়েছিস্?

অনিলা। আমি অত ভেবে দেখি নাই।

গৃহিণী। অত বড় সোমত্ত মেয়ে, তোর এটুকু জ্ঞান নাই। আর বাঁশী বাজান সখ্‌ই বা কি? মেয়েছেলে কি কখনও বাঁশী বাজায়?

অনিলার মুখ রক্তবর্ণ হইল। সে মুখখানি ভার করিয়া ছাতের উপর চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া অনিলা কাঁদিতে বসিল।

গৃহিণী মনে করিলেন, একবার 'অনিলাকে ডেকে এনে বুঝাই।' আবার মনে করিলেন, 'একটু দুঃখ অনুতাপ করুক। অত বড় মেয়ের একটু বুদ্ধি নেই!'

অনিলা কতক্ষণ কাঁদিয়াছিল, তাহার মনে ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা চারি দিক ছাইতেছিল, আকাশে তারকা দেখা দিতেছিল। এমন সময় কে আলিশার পার্শ্বে আসিয়া ডাকিল, 'অনিলা!'

অনিলা সচকিতে চাহিয়া দেখিল—প্রবোধ। প্রবোধ তাহার সঙ্গে আর কখনও কথা কহে নাই। অনিলা প্রথমে ভয়ে কথা কহিল না।

প্রবোধ। আমার জন্য তুমি কষ্ট পেয়েছ, সেই জন্য আমি সাহস করে' এসেছি। বাস্তবিক পক্ষে বাঁশীটা এঁটো নয়। আমি ওটা রোজ গঙ্গাজল দিয়ে ধুই।

কথাগুলি শুনিয়া অনিলার বোধ হইল যে, প্রবোধ যেন খুব আপনার লোক। প্রবোধ আবার বলিল, 'অন্ততঃ সে দিন যখন স্বপ্নাবেশে আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, তার আগে খুব ধুয়েছিলুম। তোমার মনে কোনও সন্দেহ কি কষ্ট যেন না হয়।'

অনিলা। না।

ঐ 'না'র মধ্যে সংসারের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান লুকানো ছিল। সেটা প্রবোধকে অধীর করিয়া তুলিল। প্রবোধ বলিল, 'ঐ গঙ্গাজলটুকু ভালবাসা —সেখানে কোনও জাতিবিচার নাই।' প্রবোধ তখন ফিরিয়া যাইতেছিল। সমস্ত চিড়িয়াখানার পাখী ও পশুর সন্ধ্যা-কলরব তখন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনিলা সেখানে বসিয়া কথাগুলি ভাবিতে লাগিল।

৭

চিড়িয়াখানার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বি.এ. দিদির কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিল না। বি.এ. দিদি একবার নলিনীর সহিত পরামর্শ করিলেন, এবং নলিনী জামাইবাবুর সহিত কি পরামর্শ করিল, এবং জামাইবাবু নিজে সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিলেন। মালিনী দেখিল, অনিলা দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও জাগিয়া রহিয়াছে। অত রাত্রি জাগা অনিলার অভ্যাস নাই। পরীক্ষাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। তবে এত রাত্রি জাগিয়া কেন? মালিনী বলিল, 'দিদিমণি, তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

অনিলা বলিল 'দাও।'

কিয়ৎক্ষণ পরে অনিলা বলিল, 'মা কি রাগ করেছেন?'

মালিনী। মোটেই না। ওটা কেবল কর্ত্তার ভয়ে। বাবার জাতিবিচার খুব! সেই ভয়ে মা অত বক্‌ছিলেন। এই যে আমরা পশু ও পাখীগুলোর মুখে মুখ দিই, তাতে কত জাতি যায়? মানুষের বেলাই কি বত দোষ? তাও ত সেটা মুখ নয়, একটা বাঁশী। আর মানুষটাও কিছু হাবশী মুসলমান নয়, আমাদেরি জাত, উচ্চ বংশের, যেন দেবতা। আর অমন সুন্দর মুখ!—

মালিনীর মুখ খুলিয়া যাইবার বিশেষ কারণ ছিল। সেও ছেলেবেলা ঐ রকম কোনও একটা ঘটনা হওয়াতে রাত্রি জাগিয়াছিল, এবং সেই সময় তাহারও একটী সুন্দর মুখের কথা মনে হইয়াছিল, এবং মনে হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাল্যস্বপ্ন সকলেরই এক রকম, মনস্তত্ত্বও একই বিধানে গড়া, সুতরাং মালিনীর পূর্ব্বস্মৃতিটুকু ঠিক সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

মালিনীর মন্তব্য-প্রকাশের পর গৃহিণী অনিলার ঘরে আসিলেন। 'মা, তোর কি হয়েছে? আজ এখনও তোর ভাত পড়ে রয়েছে?'

অনিলা। আমার অসুখ হয়েছে।

মা অনিলার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ছি! রাগ কর্ত্তে নেই।' মা অনিলাকে ধরিয়া নলিনীর ঘরে লইয়া গেলেন। অনিলার রাগ তখন বার আনা ঘুচিয়াছিল, বাকী চারি আনা নলিনীদিদির বুকে গিয়া জল হইয়া গেল।

অনিলা সে রাত্রি দিদির নিকট শয়ন করিল, এবং নলিনী অনিলার মনের অনেক কথা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল। অনিলা একটা কথাও খুলিয়া বলে নাই, কিন্তু তাহাতেই তাহার মনের কথাগুলি সুচতুরা নলিনী বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। ভালবাসার কথা এমনি আশ্চর্য্য ধরণের যে, তাহাতে সাক্ষী সবুত্ এবং আত্মপ্রকাশের দরকার হয় না! স্বরচিত জালে জীব আপনই জড়াইয়া পড়ে, অথচ বদ্ধাবস্থা স্বীকার করে না।

রাত্রিকালে গৃহিণীর সহিত কর্ত্তার কি কথা হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। কিন্তু প্রাতঃকালে সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, কর্ত্তার একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ কর্ত্তা দরওয়ানকে উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিতে বলিলেন, এবং নিজে উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডী পাঠ করিলেন। বৃদ্ধ দরওয়ানের মনে একটা খোলসা মুক্ত ভাব আসিয়া অধিকার করিল। বৃদ্ধ মালী মালিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি?'

মালিনী অঞ্চলে মুখ খানিকটা ঢাকিয়া বলিল, 'বোধ হয়, মেজোদিদির সঙ্গে ও বাড়ীর প্রবোধ বাবুর বিয়ের কথা হচ্ছে।'

মালী। এটা আশ্চর্য্য নয়?

বৃদ্ধ লাঠী ধরিয়া উঠিয়া বসিল। মানুষের মধ্যে প্রণয় যেন মিথ্যা জগতের মধ্যে একটা সত্য, ঘোর তমিস্রার মধ্যে একটা আলোক, মৃত্যুর মধ্যে একটা জীবন। সে কথা শুনিলেই মানুষ বল পায়।

এমন সময় দরওয়ান ও কর্ত্তার খাস চাকর বনমালী আসিয়া জুটিল, এবং সেই সমিতির মধ্যে বসিয়া গেল। দুই একটা খরগোস্ ও সেই সিংওয়ালা হরিণটাও অগ্রসর হইল। ময়ূর সুপারী বৃক্ষ হইতে উড়িয়া হরিণের স্কন্ধে বসিয়া গেল। প্রণয়ের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিতে ভালবাসে।

বনমালী বলিল, 'তাই ত! এক দিনে প্রণয়?'

মালী। দরওয়ানজী! তুমি ত ছেলেমানুষ, আমার এই আশী বচ্ছর বয়স। আমি এক দিনে একটা দোপাটী ফুলের গাছে ফুল ফুটিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যাকালে বীজ পুঁতে দিলুম, সকাল বেলা গাছ হাহাকার ক'রে বেড়ে উঠলো, বেলা আটটার আগেই কুঁড়ি বেরিয়ে গেল, আর দশটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই ফুল। মানুষের মনে এক মিনিটে প্রণয় জন্মাতে পারে।

দূরে কর্ত্তা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'বনমালী!'

বনমালী শশব্যস্তে ছুটিয়া গেল।

কর্ত্তা। আজ থেকে তোরা চুপি চুপি কথা কস্‌নে। আমার বিরক্ত বোধ হয়। যা বল্‌বি, মন খুলে বল্‌বি। জগতে সকলেই স্বাধীনতা চায়। বনের পশু, বাড়ীর মেয়েছেলে, দাস দাসী, সকলেই চায়, সেটাকে রুদ্ধ করা আমাদের সাধ্য নয়। তোদের মনের কথা আমাকে খুলে বলিস্—কোনও ভয় নাই।

বনমালী চক্ষের জলে ভাসিয়া করযোড়ে বলিল, 'যে আজ্ঞা, কর্ত্তা!'

৮

আজ অরিন্দম বাবু সিমলা পাহাড় হইতে আসিয়াছেন। আসিবার কারণ তাঁর স্ত্রীর একখানা 'লাল কালীর চিঠি'।

অরিন্দম বাবু আপিসের 'ফাইল্' লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। স্ত্রীর চিঠিগুলি খুব লম্বাচৌড়া দেখিলে রাত্রিকালে পাঠ করিতেন। কিন্তু এবারকার চিঠি ভয়ানক রকম সংক্ষিপ্ত—'তুমি আমার মাথা খাবে যদি পত্র পাঠ সাত দিনের ছুটী নিয়ে চলে না এস।'—বি.এ. দিদি।'

অরিন্দম বাবু ভাবিলেন, 'যদি না যাই, তবে মাথাই বা কি করিয়া থাওয়া

সম্ভব? ইহার কৈফিয়ৎ বোধ হয় এই যে, না গেলে মাথা খারাপ হইয়া যাইতে পারে।' সুতরাং সাত দিনের ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়াই অরিন্দম বাবু প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?'

প্রবোধ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কই! আমি ত কিছুই জানি না।

অরিন্দম বাবু বিপাকে পড়িয়া স্ত্রীর ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, আর একটী স্ত্রীলোক বসিয়া। সুতরাং তিনি কপাটের আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খবর কি?'

বি.এ. দিদি অরিন্দমকে টানিয়া বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে একটী বালিকা বসিয়া অঙ্ক কসিতেছিল। বি.এ. দিদি তাহার চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে তোমার পছন্দ হয়?'

একেই সারারাত্রি জাগিয়া অরিন্দম বাবু অবসন্ন, তাহার উপর হেঁয়ালির ছড়াছড়ি দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। বি.এ. দিদি বলিলেন, 'আরও বুঝিয়ে বলি। এটি ঐ চিড়িয়াখানার মেয়ে। প্রবোধ একে দেখে পাগল হয়ে গেছে। এখন এর একটা কুলকিনারা কর।'

অনিলা দুই হাতে মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিল।

'দিব্যি মেয়ে; যেন ছবিখানি।'

বি.এ. দিদি। প্রবোধ এর নাম রেখেছে 'শকুন্তলা'। প্রথমে একে আমি আবিষ্কার করি। তার পর ওর দিদি, যাকে ঘরে দেখ্‌লে, সেও এসে পড়্‌ল। আর একটা কথা বলি, 'ওর দিদির স্বামীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে, তাঁর নাম 'জামাইবাবু'। এঁরা সব আমার শিষ্য। এঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আমি এক জন মহাপুরুষ। তাই প্রমাণ কর্ত্তে তোমাকে ডেকেছি।'

তার পর অরিন্দম বাবু সকলকে লইয়া ছাতে বেড়াইতে গেলেন। যদিও সিমলা পাহাড় খুব রমণীয়, কিন্তু কলিকাতার মধ্যে জড়প্রকৃতির ভাগ কম, আর মানবপ্রকৃতির ভাগ বেশী, সেটা তাঁহার ধারণা হইয়া গেল। ক্রমে, আহার ও একটা লম্বা নিদ্রার পর তিনি চিড়িয়াখানার মালিক বসুজা মহাশয় ও তাঁহার জামাতার সহিত কথোপকথনে অতিশয় প্রীত হইলেন।

বসুজা মহাশয়। দেখ বাবা! সংসার ও সমাজ কখন কি আকার ধারণ করে, আমরা বুঝতে পারি না। অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্ত্তে গিয়ে

আমরা অবসন্ন হয়ে পড়ি। আমি এই চব্বিশ বৎসর জমীদারীর কাগজপত্র ও ছোট একটী সংসার নিয়ে লুকিয়ে ব'সেছিলুম, কিন্তু বিধাতার বিধানে ঘোর বিপ্লব ঘটে গেল। প্রথম বিপ্লব, আমার জামাতা তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বাস কর্ত্তে চায়। প্রথমে আমার আপত্তি ছিল, কিন্তু ভেবে দেখলুম, তাদের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া মহা পাপ। দ্বিতীয় বিপ্লব, আমার মেয়ে অনিলার নূতন ভাব। তোমরা ছেলে মানুষ, ও সব বুঝতে পার। আমাদের এখন শেষ কাল। যাতে তোমরা সুখী হও, তাতেই আমাদের শেষকালের শান্তি।

অরিন্দম বাবু বিনীতভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, 'আপনার মত লোকের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা হবে, সেটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রবোধকে বোধ হয় আপনি জানেন না, সে একটী রত্ন। যেখানে থাক্‌বে, সংসারকে পবিত্র ও স্নেহময় করে তুল্‌বে।'

চিড়িয়াখানার মধ্যে কিছু দিন পরেই প্রবোধ আসিয়া বসিল, এবং অনিলা প্রবোধের পার্শ্বে বসিয়া অঙ্কে মনঃসংযোগ করিল। প্রবোধের বাঁশীটি লইয়া অনিলা বাজাইত, প্রবোধ সেতার ধরিত, এবং কাকাতুয়া চুপ করিয়া তাহা শুনিত। জামাইবাবু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলিগড় হইতে অনিলাকে পত্র লেখেন, এবং কর্ত্তা কাশীধাম হইতে আশীর্ব্বাদ পাঠান। বি.এ. দিদি সিমলা হইতে বেগুনে ও সবুজ কালী দিয়া অনিলার পত্র চিত্র-বিচিত্র করেন, এবং মধ্যে মধ্যে পুরাণো 'ফার্ণ' পাঠাইয়া দেন। দরওয়ান উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করে। মালিনী অনিলার চুল বাঁধিয়া দেয়। তখন ময়ুর পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রবোধ বি. এস্-সি. হইয়া পশুদিগের সমাজতত্ত্ব লিখিতেছে। অনিলা তাদের 'ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স' টুকিয়া দেয়। মানুষের পরিবর্ত্তন কেন ঘটে, এবং অনেকগুলি আয়ু মিলিত হইয়া একটা দীর্ঘায়ু কি করিয়া সম্ভবে, তাহার তথ্য উভয়ে আবিষ্কার করিতেছে। প্রবোধের বেশ বিশ্বাস যে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সখ্যতার সঞ্চার হইলে সমাজ দীর্ঘজীবী হয়, অথচ কেহ কাহাকেও সংহার করিয়া আত্মা কলুষিত করে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আয়ুঃ ও কোষ।

গত আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'আয়ুঃ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, মৃত্যু

(১) জীব-বিবর্ত্তনের ফল ;

(২) দেহকোষ সকলের দীর্ঘকালব্যাপিনী দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতার ফল ;

(৩) দেহকোষ সকলের Sclerosis নামক অবস্থার পরিণাম।

কিন্তু আর একটী গুরুতর কথা এখনও বলা হয় নাই। উহা কোষ-পরিত্যাগের কথা। আমাদিগের দেহে নানাবিধ কোষ আছে ; অস্থিকোষ, শিরাকোষ, স্নায়ুকোষ, পেশীকোষ ইত্যাদি। অস্থির কঠিন কোষ শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় না। অন্যান্য কোষ বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য (৬০।৭০ বৎসর বয়স) পর্য্যন্ত বহুবার পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহার স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। দেহের কোথাও একটী ক্ষত হইলে দূষিত কোষ সকল পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষের উদ্ভব হয় ; তাহাতেই ক্ষত স্থানের পূরণ হইয়া যায়। ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু দেহে স্বভাবতঃই ছয় সাত বৎসর পর পর স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির কোষ সকল পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এইরূপ অনেকবার হইয়া থাকে।

কোষ সকল স্বতঃই বিশ্লিষ্ট হয় ; * এবং আহার দ্বারা পুনরায় গঠিত হয়। আহারের ফল পুষ্টি ; এবং নানাবিধ কর্ম্মের ফল ক্লান্তি ও ধ্বংস। দেহ (দেহ-কোষ সকল) কর্ম্ম দ্বারা ক্লান্ত হয়,এবং নষ্ট হয় ; আহারের দ্বারা পুষ্ট হয়। এই দুই কারণ যত দিন এরূপ থাকে যে, পুষ্টির পরিমাণ অধিক হয়, তত দিন দেহ পুষ্ট হইতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টি কমিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেহ নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। তখনই বার্দ্ধক্যের সূচনা হয়। অবশেষে যখন পুষ্টি অপেক্ষা ক্ষয়ই অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, তখন মৃত্যু আসন্ন, বুঝিতে হয়।

বলিয়াছি, কোষ সকল জীবিতকাল মধ্যে বহুবার পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। কিন্তু বার্দ্ধক্যে অথবা পীড়ায় যখন কোষ সকলের পুষ্টির এবং ক্রিয়াশক্তির হ্রাস হয়, তখন পুরাতন কোষ পরিত্যক্ত

* শ্রাবণ সংখ্যা ; ২৮৪ পৃষ্ঠা।

হইয়া সেই স্থলে নূতন কোষ জাত হইবার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পীড়ায় অথবা বার্দ্ধক্যের বৃদ্ধির সহিত এই বিঘ্ন উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠে। পরে যখন কোষত্যাগের, অথবা ত্যক্ত কোষের স্থলে নূতন কোষোৎপত্তির বিঘ্ন অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, অথবা ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন মৃত্যু আসন্ন হইয়া উঠে। ইহার পরিণাম-ফল—মৃত্যু।

সুতরাং উপরে যে তিনটি কারণ লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই চতুর্থ কারণটির সন্নিবেশ আবশ্যক হইতেছে।

(৪) কোষত্যাগের এবং তৎস্থলে নূতন কোষের আবির্ভাবের বিঘ্ন, অথবা বিরতি।

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মৃত্যুর এই কারণটি, অর্থাৎ কোষত্যাগ ও নূতন কোষাবির্ভাব বংশানুগত। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে মৃত্যুকে সাধারণতঃ বংশানুগত বলিয়াছি।

এক্ষণে পূর্ব্বের প্রশ্নগুলি স্মরণ করুন।

(১) আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে?

(২) শেষই বা হয় কেন?

(৩) বহুকোষ জীবকেও কি অমর অথবা দীর্ঘায়ুঃ করা যায়?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক্ষণে কঠিন হইবে না। মৃত্যুর যে পাঁচটি কারণ উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছি, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তাহাই। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই বলিলেই প্রচুর হয় যে, ঐ সকল কারণ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কার্য্য উৎপাদন না করে, সেই পর্য্যন্তই আয়ুঃ। দেহকোষের হ্রস্বতা, কোষতন্তুগুলির কাঠিন্য, * কোষের ক্রিয়াশক্তির অপচয়, কোষত্যাগের এবং নবকোষোৎপত্তির বিরতি,—এই সকল, অথবা ইহাদিগের মধ্যে গুরুতর কারণগুলি যখন বিশেষভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মৃত্যু। যে পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত আয়ুঃ, অর্থাৎ জীবিতকাল। সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম দুইটী প্রশ্নের উত্তর এই ভাবেই দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদান করিতে পারিলে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, মানবসমাজ বিশেষ লাভবান হইতে পারে। দীর্ঘায়ু অথবা অমর হইবার উপায় কি? আমি এ স্থলে জীবাত্মার কথা বলিতেছি না। উহা ত অমর আছেই। আমি স্থূল দেহের কথাই বলিতেছি।

* Sclerosis.

এ প্রসঙ্গে প্রথমতঃই বলা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় মানব-দেহকে অমর করা অসম্ভব। কারণ, মৃত্যুর মূল কারণ জীব-বিবর্ত্তন * নিবৃত্ত হইবার নহে। যাহা হউক, অমর হওয়া, অর্থাৎ স্থূল দেহকে অমর করা সম্ভব না হইলেও, দীর্ঘকাল, এমন কি, অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী করা সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহা পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইতে পারে। আমরা যে দেহ-কোষ সকলের দুর্ব্বলতার ও ক্ষীণতার কথা বলিয়াছি; যে কোষতন্তুগুলির কাঠিন্য ও কোষের হ্রস্বতার কথা বলিয়াছি; যে পুরাতন কোষত্যাগের এবং নবকোষোদ্ভবের কথা বলিয়াছি; সে সকলেরই ন্যূনাধিক প্রতিরোধ প্রযত্নসাধ্য। চিকিৎসকগণ কোষের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতার বর্ত্তমানকালেই ন্যূনাধিক উপশম করিতে পারিতেছেন। হ্রস্বতাও তাঁহাদিগের আদেশ নিতান্তই অমান্য করিতেছে, এমন নহে। কিন্তু কাঠিন্য (sclerosis) সম্প্রতি তাঁহাদিগের অবাধ্য। কিন্তু কঠিন কোষতন্তু যে কোনও কালেই পূর্ব্ববৎ নরম হইতে পারে না; নরম হওয়া যে একবারেই অসম্ভব, এবং চিরতরে অসাধ্য, এরূপ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তৎপরে, কোষত্যাগের ও নূতন কোষাবির্ভাবের কথা বিবেচনা করিলেও বুঝা যায় যে, যদিও পুরাতন কোষত্যাগ নিবৃত্ত হইবার নহে, তথাপি তৎস্থলে নূতন কোষের উৎপাদন চিরকাল অসাধ্য থাকিতে পারে না। উহা কালে মানবের আয়ত্ত হইবে, এরূপ আশা দুরাশা নহে। বিশেষতঃ, এই ক্রিয়া যখন বংশানুগত, তখন বংশানুক্রম পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেই ইহা সুসাধ্য হইতে পারে। বহুবিধ কোষ ছয় সাত বৎসর পরে পরিত্যক্ত হয়, তাহা বলিয়াছি। যদি দশ বার পরিত্যক্ত হয়, এবং তৎস্থলে নূতন কোষ জাত হয়, তবে মানব ৬০।৭০ বৎসর জীবিত থাকিবে। যদি কুড়ি বার পরিবর্ত্তিত হয়, তবে মানব ১৪০।১৫০ বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যাঁহারা ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের দেহের কোষ সকল ১৬ বার পরিত্যক্ত হইয়া তৎস্থলে নূতন সুস্থ কোষ জাত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তি যে সকল অপত্য উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দেহেও বংশানুক্রমে ঐরূপ বহুবার কোষ পরিত্যক্ত হইয়া নূতন সুস্থ কোষ জন্মিবে। সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক দীর্ঘায়ুঃ বংশের

---

* স্মরণ করিতে হইবে যে, এককোষ অবস্থায় জীবের মৃত্যু ছিল না; বিবর্ত্তনবশতঃ বহু-কোষ হইবার পর মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বয়-কন্যাদিগকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলেই মানবকে দীর্ঘায়ুঃ করা সম্ভব হইতে পারে।

দেহের কোষ সকলের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতা বর্ত্তমান সময়েও কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিরোধযোগ্য, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এ সকলকে বিশেষভাবে প্রতিরোধ করিবার কতিপয় বিঘ্ন আছে। সে সকলের মধ্যে প্রধান বিঘ্ন নিরানন্দ, অনাহার, অথবা অল্পাহার, এবং পীড়া। মানব-মনে আনন্দ * না থাকিলে দেহকোষ সুস্থ থাকিতে পারে না। এ নিমিত্ত নির্দ্দোষ আনন্দ দীর্ঘায়ুঃ লাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অনাহার অথবা অল্পাহারে দেহকোষ সকল শীর্ণ, সুতরাং আয়তনে হ্রস্ব, এবং দুর্ব্বল, সুতরাং ক্ষীণ-ক্রিয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা সকলেরই সুবোধ্য; বিশেষতঃ জীবকোষ সকল যে জীববস্তুতে পূর্ণ, তাহা যখন স্বভাবতঃই বিশ্লিষ্ট হইতেছে, এবং আহার দ্বারা পুনর্গঠিত হইতেছে, তখন অনাহারে অথবা অল্পাহারে ইহারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-ক্রিয় হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। ইহার সহিত নানাবিধ পীড়া দেহকে অধিকার করে। দেহে পীড়ার বীজ প্রবেশ করিলেই পীড়া উৎপন্ন করে, এমন নহে। দেহের অর্থাৎ রক্তমধ্যস্থ জীব-কোষগুলির পীড়া-নিবর্ত্তক শক্তি আছে; তাহাতেই বিনা চিকিৎসাতেও বহু রোগী আরোগ্য লাভ করে। অনাহারে অথবা অল্পাহারে ঐ সকল জীবকোষকে দুর্ব্বল করায় উহাদিগের পীড়া-প্রতিরোধক শক্তির হ্রাস হয়; সুতরাং পরিণামে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

যদি দেহ-পোষণের উপযুক্ত আহার-প্রাপ্তি ঘটে, এবং অসাধ্য পীড়ার বীজ দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, অথবা প্রবিষ্ট হইলেও বিশেষভাবে ক্রিয়া-বিকাশ করিতে অক্ষম হয়, তবে দীর্ঘায়ুঃ হইবার প্রধান বিঘ্ন বিদূরিত হয়।

দীর্ঘায়ুঃ হইবার আর এক প্রধান উপায়,—অস্বাস্থ্যকর বেষ্টনীকে স্বাস্থ্যকর করা। ইহা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অসাধ্য নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দীর্ঘায়ুঃ হইবার যতগুলি বিঘ্ন আছে, তাহার সকলগুলিই মানব-প্রযত্নে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। কেবল কোষের কাঠিন্য এখনও প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাও যে কাল-সহকারে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, এ কথা বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু এ সকল উপায় ভিন্ন আর কি কোনও উপায় নাই? উত্তর—আছে।

* এই শব্দ সুখ অর্থে ব্যবহৃত হইল।

উহা যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত। সুতরাং যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত। যোগের যে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা দেহকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ করা যায়, তন্মধ্যে প্রধান এই কয়েকটী :—

(ক) শ্বাস নিয়মিত করা;

(খ) সময় এবং দৈহিক অবস্থাভেদে বাম অথবা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রশ্বাসের চলাচল করা; তখন অপর নাসাপুটে শ্বাস প্রশ্বাস না করা, অথবা অতি অল্প করা।

(গ) মলদ্বার, মূত্রদ্বার, অথবা কণ্ঠনালীর যোগে দেহাভ্যন্তর পরিষ্কার রাখা; অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থ অপরিচ্ছন্ন এবং দূষিত পদার্থ সকল ঐ সকল দ্বার-যোগে ত্যাগ করা।

(ঘ) অল্পাহার করা। আহার্য্য বস্তু স্বাদু ও সহজে পরিপাক যোগ্য হওয়া উচিত। দেহরক্ষা বিষয়ে যে বস্তু অত্যন্ত অনাবশ্যক, তাহা দেহমধ্যে কখনই লওয়া উচিত নহে।

(ঙ) দুশ্চিন্তা, দুঃখ, ক্রোধ, কাম ও হিংসাকে যথাসাধ্য মনোমধ্যে স্থান না দেওয়া।

(চ) প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করা, এবং যথাসাধ্য নিষ্পাপ থাকিবার চেষ্টা করা।

(ছ) অল্পভাষী হওয়া, এবং প্রত্যহ কিয়ৎকাল নির্জ্জনে থাকা।

এ সকল উপায় সকলেই অবলম্বন করিতে পারেন। এক দিকে অল্পায়ুঃ-বংশের বংশানুক্রম-সংশোধন, অপর দিকে এই নয়টী উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেক স্থলে সুস্থ থাকিবার ও দীর্ঘায়ুঃ হইবার আশা করা যায়। জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবক স্বাস্থ্য-নাশকর এবং আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্ম প্রায় নিত্যই করিতেছেন। ইহারা সাবধান না হইলে এতদ্দেশীয় সমাজের ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীশশধর রায়।

ক্ষৌমবস্ত্র।

অর্থশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গক দুকূল, অর্থাৎ, বঙ্গদেশীয় ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ (তৈলাক্তের মত)। পৌণ্ড্রক অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশজাত বস্ত্র শ্যামবর্ণ ও মণির মত স্নিগ্ধ। সুবর্ণকুড্যদেশজাত (সৌবর্ণকুড্য) বস্ত্র সূর্য্যসমানবর্ণ, ইহার বান মণিস্নিগ্ধ অনের মত, অর্থাৎ গলিত বৈদূর্য্যাদি মণির তুল্য চাকচিক্য-যুক্ত। এই বস্ত্রের বান চতুরস্র, অর্থাৎ চতুষ্কোণ হইয়া থাকে। কতক বান ব্যামিশ্র অর্থাৎ নানারূপ হয়। অত্রত্য বান শব্দের অভিধানসম্মত অর্থ,—সীবন কর্ম্ম। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

বানং গুণতন্তুকে শুক্লে সীবনে গমনে ক্বটে।
জলসংপ্লুত-বাতোর্ম্মি-সুরস-সৌরভেষু চ॥

সীব ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়-যোগে সীবন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধাতুর অর্থ তন্তু-সন্তান। এই তন্তুসন্তানের অর্থ,—বয়ন (বোনা) অথবা শেলাই করা, এই দুইই হইতে পারে। এই স্থলে বয়ন অর্থ গৃহীত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার বয়নেই চতুরস্র চিহ্ন প্রোদ্গিত হইত। পক্ষান্তরে, যদি শেলাই অর্থ গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহাতে সূচীর দ্বারা চতুষ্কোণ প্রভৃতি বোঁটা উঠান হইত, অথবা পাইড়ে সূচীর দ্বারা চতুষ্কোণাদি কারুকার্য্য করা হইত।

সৌবর্ণকুড্য বস্ত্রের বয়ন কার্য্যে একাংশুক (একখানা বস্ত্র) অথবা অর্দ্ধাংশুক, দ্ব্যংশুক, ত্র্যংশুক ও চতুরংশুক হইয়া থাকে। অর্থাৎ, আধখানা, এবং দুই তিন চারিখানা বস্ত্র এক সঙ্গে বোনা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই কাশিক, অর্থাৎ

সূক্ষ্মাংশুকৌ মৃদুস্থূলৌ তন্তুবস্ত্র যথাক্রমম্।
যে জন্তবো দক্ষিণপূর্ব্বসিন্ধুকচ্ছে বনে বা প্রসবন্তি সূক্ষ্মং
শুক্লাতিশুক্লং প্রসবন্তি তন্তুং তে ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যতমাঃ প্রদিষ্টাঃ॥
যে জন্তবঃ পশ্চিমসিন্ধুকচ্ছে বনেঽথবাঽনুপমহীপদেশে।
আদীপ্তশুক্লং প্রসবন্তি তন্তুং তেঽন্বী বিশঃ পুণ্যতমাঃ প্রদিষ্টাঃ॥
যে জন্তবঃ সর্ব্বসমুদ্রকচ্ছে বনেঽথ সাধারণভূ-প্রদেশে।
নানাকৃতিস্তে প্রসবন্তি তন্তুং শুক্লং গরিষ্ঠাকৃতয়ো হি শূদ্রাঃ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রসংজ্ঞানি বর্ণাক্রমম্।
বর্ণানি ভেজ্যো জায়ন্তে যথাপূর্ব্বং শিবানি চ॥
একজাতিভবং বস্ত্রমুত্তমং সংপ্রচক্ষতে।
দ্বিজাতি-সম্মতং মধ্যং ত্রৈজাতমধমং বিদুঃ॥
চতুর্জাতং হি কৌবেরং কদাচিদপি নাচরেৎ।
চত্বারি তেষাং নশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ কুলং বলম্॥

কাশীদেশীয়, এবং পৌণ্ড্রক ক্ষৌমবস্ত্রও ব্যাখ্যাত হইল; (৬) অর্থাৎ, তাহাদের লক্ষণও সুবর্ণকুড্যজ ক্ষৌমবস্ত্রেরই অনুরূপ।

কৌটিল্য কার্পাস বস্ত্রের গুণাগুণসূচক লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া, সংক্ষেপতঃ কেবল কোন্ কোন্ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, মধুরাদেশজ, অপরান্তদেশজ, কলিঙ্গদেশজ, কাশীদেশজ, বঙ্গদেশজ, বৎসদেশজ ও মহিষদেশজ কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস সূতার কাপড় শ্রেষ্ঠ। (৭) সে কালের "মধুরা" বর্ত্তমান সময়ে মথুরা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কৌটিল্যের গ্রন্থে বস্ত্রপরীক্ষার বিবরণ জানা যায়; অতএব তাঁহার সময় হইতেই এই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, এমন বুঝিলে বড়ই ভুল করা হইবে। কারণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের উদ্ভাবক নহেন। তিনি কেবল বিনয়ে চন্দ্রগুপ্তের জন্য প্রাচীন বিবিধ শাস্ত্র হইতে প্রমাণাবলী সংগৃহীত করিয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং স্মরণাতীত কাল হইতেই এই বিদ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে, এমন বুঝিতে হইবে। এই স্থলে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক যে, অর্থশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর, সাহিত্যিক-সমাজে উহার বিশেষ অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অনুবাদক মহাশয়ের অনুবাদে মূলের অর্থ কতটুকু বিবৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি শিক্ষিতমণ্ডলীর অবধান একান্ত বাঞ্ছনীয়। ক্ষৌমবস্ত্র সম্বন্ধে তিনি মূলের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে প্রদর্শিত হইল। সুধীগণ উহা পাঠ করিয়া সারবত্তা নির্ণয় করিবেন। (৮)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

(৬) বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং নৈবর্ণকুড্যকং সূর্য্যবর্ণং মণিস্নিগ্ধোপকরণানং চতুরস্রবানং ব্যামিশ্রবানং চ। এতেষা মেকাংশুক মর্দ্ধং দ্বিত্রিচতুরংশুক মিতি। তেব কার্পাসিকং পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতম্।

(৭) মাধুর মাপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকং চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠমিতি।

(৮) *From Shama Sastry's English Translation (p. 93)*

"That which is manufactured in the country, Vanga (Vangaka) is a white and soft fabric (dukula) (1) that of Pandya manufacture (Paundraka) is black and as soft as the surface of a gem; and that which is the product of the country, Suvarnakudya, is as red as the sun, as soft (2) as the surface of the gem, woven while the threads are very wet, and of uniform (chaturasra) or mixed texture (vyamisravana). Single, half, double, treble, and quadruple garments are varieties of the same."

From the Comm of Bhattasvamin :—(1) Dukula is a fine fabric and Kshauma is a little coarse.

(2) It is rubbed with a gem and smoothened while being woven.

সহযোগী সাহিত্য।

'সংঘ' বা 'গণতন্ত্র'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাম্বার্টাইকেল অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নবিশারদ শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর সংঘ সম্বন্ধে গত এপ্রিল মাসে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার সার সঙ্কলন করিলাম।

প্রাচীন ভারতে খ্রীঃ পূঃ ৬০০—৩২৫ শতাব্দীতে প্রচলিত রাজতন্ত্রেতর সংঘ বা গণতন্ত্রের বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। 'বহুপুত্রগণসংঘস্য ভিক্ষুঃ' ও 'সংঘেভ্যোগণপ্রশংসয়োঃ' পাণিনির এই দুইটী সূত্র হইতে বেশ বোধ হয় যে, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে লোকে সংঘ শব্দটী পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিত। সংঘ শব্দের সাধারণ অর্থ, 'কোন প্রকারে একত্রিত জনতা'; আর 'একটী বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সমিতি' ইহার পারিভাষিক অর্থ, এবং ইহাই আমাদের আলোচ্য।

অভীষ্ট উদ্দেশ্যের পার্থক্যহেতু সংঘও নানা প্রকারের। ধর্ম্মবিষয়ক মতাদি-প্রচারের জন্য গঠিত সঙ্ঘের নাম ধর্ম্মসংঘ, যেমন বৌদ্ধসংঘ। পালি পাত্রবিধি গ্রন্থে বুদ্ধ ও তাঁহার ন্যায় আরও সাত জন ধর্ম্মসংঘের নেতার উল্লেখ আছে। 'সমণব্রাহ্মণা' পদটী হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধসংঘও জৈনসংঘের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগেরও ধর্ম্মসংঘ ছিল। বাণিজ্য শিল্পের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য গঠিত সমাজ 'বাণিজ্যসংঘ বা শিল্পসংঘ'। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে শ্রেণী বা সংঘের নিত্যাগকালে 'বার্ত্তোপজীবি-সংঘ' অর্থাৎ শ্রমজীবীদের সংঘের বর্ণনা করিয়াছেন।

যে সকল বলবন্ত লোক অস্ত্রব্যবসায় দ্বারা নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিত, পাণিনি তাহাদিগকে 'আয়ুধ-জীবি-সংঘ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যৌধেয়, পাণ্ড, অন্ধক, রাক্ষস প্রভৃতি 'আয়ুধ-জীবি-সংঘে'র অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার সংঘই 'রাজনৈতিক-সংঘে'র আদর্শে গঠিত হইত। এখন দেখা যাউক, এই 'রাজনৈতিক-সংঘে'র অর্থ কি? পাণিনির 'অনশ্বপশস্যাং'—সূত্রটীর টীকা করিবার সময় কাত্যায়ন ক্ষত্রিয়গণের ভিতর 'এক-রাজ' (possessed of Individual Sovereign) এবং সংঘ (possessed of Collegiate Sovereign) এই উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কাত্যায়নের 'সংঘ' ও কৌটিল্যের 'রাজশব্দোপজীবি-সংঘ' একই প্রকারের, এই সংঘ বা গণের প্রত্যেকেই 'রাজা' উপাধি ধারণ করিতেন; এক জন রাজা (Sovereign One) ও বহুরাজা (Sovereign Number) এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যই উভয়বিধ ক্ষত্রিয় জাতির পার্থক্য সূচিত হইত। মজ্‌ঝিমনিকায়ে লিচ্ছবি ও মল্লদিগকে স্পষ্টভাবে সংঘ বা গণ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

এই সকল রাষ্ট্রনৈতিক-সংঘের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর বিবরণ বৌদ্ধ ও পালি গ্রন্থনিচয় এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের একশত সপ্তম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। জাতক ও কৌটিল্য হইতে আমরা জানি যে, এক সময় রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ৭৭০৭ জন লিচ্ছবি রাজা

বৈশালী নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন; ইঁহাদের সকলেরই উপাধি রাজা, পুত্রদের উপাধি রাজকুমার, এবং পবিত্র জলে তাঁহাদের অভিষেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কাত্যায়নের মতে, বহু বিভিন্ন রাজকুলের বা শাসকসম্প্রদায়ের নায়কদিগকে লইয়া রাজনৈতিক সংঘ গঠিত হইত; প্রত্যেক নায়কই রাজা উপাধি ধারণ করিতেন, এবং সংঘের ভিতরে সর্ব্বতোমুখী সমতা রক্ষিত হইত। শাসনকার্য্যপরিচালনের ভার অবশ্য বর্ত্তমান যুগের প্রজাতন্ত্রগুলির ন্যায় স্বল্পসংখ্যক মনোনীত নেতার হস্তে সমর্পণ করা হইত, শান্তিপর্ব্ব ও কৌটিল্য তাঁহাদিগকে 'সংঘ-মুখ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটী জাতকে দেখিতে পাই যে, রাজবর্গের বৈশালী নগরীতে অবস্থানকালে প্রত্যেকের নিজের নিজের 'উপরাজ' বা রাজপ্রতিনিধি, সেনাপতি ও ভাণ্ডাগারিক তাঁহার নিকট অবস্থান করিত। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রত্যেক লিচ্ছবি রাজের নিজের পৃথক্ রাজ্য ছিল, এবং তথায় তিনি বিচারকার্য্য প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে একাকী সর্ব্বোচ্চ শক্তি চালনা করিতেন। এই সকল রাজগণের অনেকেই লিচ্ছবি-সংঘে সমবেত হইতেন, এবং এই লিচ্ছবি-সংঘ সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের 'বিজিত' বা রাজ্যে—অর্থাৎ বিভিন্ন রাজবর্গের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্রের সমষ্টিরূপ বিস্তৃত রাজ্যে—যে কোনও ব্যক্তিকে নিহত, দগ্ধ, বা নির্ব্বাসিত করিতে পারিতেন। এই সকল বিষয়ে সম্মিলিত সংঘ সমষ্টিবদ্ধ রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। এ বিষয়ে মজ্‌ঝিমনিকায়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈশালীর লিচ্ছবি-গণ ও কসিয়ার মল্লগণ এবংবিধ রাজনৈতিক সংঘের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৌটিল্য বৃষ্ণিসংঘ প্রভৃতি আরও অনেক সংঘের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণও এরূপ অনেক সংঘের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের একটী জাতির উদাহরণ গ্রহণ করুন;—এরিয়ানের (Arrian) অবষ্টনৈ, ডিওডোরাসের (Diodorus) সম্বষ্টৈ, কার্টিউসের (Curtius) সব-কী এবং ওরোসিউসের (Orosius) সব-গ্রী,—মহাভারতে কথিত অম্বষ্ঠ ও কাহারও কাহারও মতে পাণিনির যৌধেয়গণের অন্তর্ভুক্ত সৌভের। কার্টিউস্ (Curtius) ও ডিওডোরাসের (Diodorus) মতে উক্ত জাতির রাজ্য "প্রজাতন্ত্র" ছিল। এরিয়ান (Arrian) কথনিয়ান (Kathanians) অক্সিড্রেকাই (Oxidrakai) ও মল্লয়ি (Malloi) এই তিনটীকে স্বাধীন "সাধারণতন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; প্রথম ও দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্রক ও মালব নামে পঞ্জাবে কর্ত্তৃক 'সঙ্ঘ'-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এরিয়ানের গ্রন্থে নিসা (Nysa) আলেকজান্দারের সময়ে "কুলীনতন্ত্র" (aristocracy) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। রাজতন্ত্র (monarchs), কুলীনতন্ত্র (aristocracy), কতিপয় শাসনতন্ত্র (oligarchy), ও প্রজাতন্ত্রের (democracy) পার্থক্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বিশেষরূপে বুঝিতেন, সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যে জাতিগুলিকে অ-রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও কুলীনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সংঘ-রূপে বুঝিতে হইবে। এই সকল সংঘ সাধারণতঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০-৩২৫ অব্দাব্দীতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরাহমিহিরের 'গণ-রাজ্য' ও 'গণ-পূজন' হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ইহা একেবারে লোপ পায় নাই। এই সকল সংঘের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য কোনও নগরবিশেষ বা দেশবিশেষের উপর নির্ভর করিত না; কারণ, মালব-গণ প্রথমে পঞ্জাবে ছিল,

তথা হইতে জয়পুর ও শেষে বর্ত্তমান মালওয়ায় উপস্থিত হয়। আবার, আয়ুধজীবি-সংঘ গণের রাজনৈতিক-সংঘে পরিণত হইতে পারিত। এ বিষয়ে যৌধেয়গণ দৃষ্টান্তস্বরূপ। রাজতন্ত্র জাতির কুলীনতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হইবার উদাহরণ কুরু ও পাঞ্চালেরা; জাতক ও প্রাচীন পালি সাহিত্যে ইহারা 'একরাজ' বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু কৌটিল্যের সময়ে 'রাজশব্দোপজীবি-সংঘে' পরিণত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক সংঘ 'কুলাধিপত্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত। অমুত্তর-নিকায় দুই প্রকারের শাসন-ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন,—'গণ-জেট্‌ঠক' ও 'কুলাধিপতি'। কুলাধিপতিগণ প্রত্যেক কুল বা পরিবারের ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁহাদের অধিকৃত ভূমিভাগ এই উভয়েরই উপর আধিপত্য করিতেন; উদাহরণস্বরূপ শাক্য রাজা শুদ্ধোদনের নাম করা যাইতে পারে। প্রত্যেক কুল বা সম্প্রদায় আবার, গৃহপতি, কুটুম্বী ও কুলিকে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গৃহ, কুটুম্ব, বা কুল, অর্থাৎ পরিবারের নেতারা গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন (পশ্চিম-ভারতের অমুশাসনাবলী ও নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রলিপি দ্রষ্টব্য); এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ তাঁহার 'History of India' পুস্তকে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক গৃহপতির ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত হইবার কারণ,—তাঁহারা সকলেই, প্রথম যে সকল ব্যক্তি এই সকল দেশে স্বীয় বাসস্থান ঠিক করিয়া লন, তাঁহাদের বংশধর। অবশ্য ক্রয় বিক্রয় দ্বারা নূতন লোকের আগমন সম্ভবপর, কিন্তু সাধারণতঃ ঐ ধারণা সত্য বলিয়া বোধ হয়। এ প্রসঙ্গে মনুর "দণ্ডী কুলং তু ভুঞ্জীত" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন পরিবার নিজেরাই ভূমিকর্ষণ করিতেন, তাঁহাদের ভিতর পরস্পর জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাঁহারা সকলেই একই ভূমিখণ্ডের অধিকারী ছিলেন, এবং এই সূত্রে নিজেদের ভিতর স্বায়ত্ত-শাসক গ্রাম্য সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গৃহ বা কুটুম্বের নেতা এবং পরিবারবর্গকে লইয়া কুল বা সম্প্রদায়, এবং প্রত্যেক কুল বা ক্ষত্রিয় (কারণ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের উপরেই রাজ্যশাসনের ভার ছিল) কুল বা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা রাজা (কুলাধিপতি) হইতেন, এবং কুলভুক্ত জনসমূহ ও তদধিকৃত ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেন। কুলাধিপতির পরিবারে রাজকীয় ক্ষমতা সংবদ্ধ থাকিলে, শাসনপ্রণালী সাম্রাজ্যের মতে একরাজ; কিন্তু যদি ক্রমে ঐ ক্ষমতা পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইতে থাকে, একরাজতন্ত্র (monarchy) কুলীনতন্ত্রে (arjstocracy) পরিণত হয়। সুতরাং এই কুলীনতন্ত্র বা কতিপয়-শাসন এক প্রকারের সংঘ। আমার বিবেচনায়, সন্নিবদ্ধ বিভিন্ন জাগ্রাণ রাজ্যগুলির সমষ্টি—বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ আর্য্যাণ সাম্রাজ্যের—আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রগঠন প্রণালীর সহিত লিচ্ছবি-সংঘের গঠনতন্ত্রের বহুল সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এরিয়ান (Arrian) নিসাকে 'পুরতন্ত্র' 'City-state' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাদ-রত্নাকর, বায়ুসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, (Cunningham) কানিংহাম কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ও (Buhler) বুহলার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মুদ্রামিশ্র, পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজির সম্পাদিত নাসিক গুহালিপি (১৮ নং) প্রভৃতিতে এই মতের পোষক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহার প্রদেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সূতিকাগার; আবার এই বিহার প্রদেশেই লিচ্ছবি-সংঘ রাজত্ব করিতেন ও রাজত্ব করিতেন। সুতরাং বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মসংঘের গঠনকালে পূর্ব্বপ্রচলিত

রাজনৈতিক-সংঘের গঠনপ্রণালী অবলম্বন করেন, এবং তাহার নাম এবং কার্য্যপ্রণালীও গ্রহণ করেন। এই জন্য বুদ্ধ নিজে যখনই কোনও নূতন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাও দিয়াছেন; কিন্তু সংঘ বা তৎসম্পর্কিত কোনও শব্দের অর্থ দেন নাই, দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ধর্ম্মসংঘ ও রাজনৈতিক সংঘের তর্কপ্রণালী ও কার্য্যনির্ব্বাহের পদ্ধতি একই প্রকারের; সুতরাং আমি বিনয়পিটক হইতে এই সকল সংঘের ব্যবহারীতির বর্ণনা করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার জন্য আসনাদি অগত্যাৎ সজ্জিত করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, চুল্লবগ্গ তাঁহার নাম দিয়াছেন—'আসন-প্রজ্ঞাপক'। তাহার পর একটী 'জ্ঞপ্তি' (motion) দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করা হইত। তাহার পর মহাবগ্গের বর্ণনা অনুসারে "কম্মবাচা" (resolution) অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ে সংঘ কি কর্ত্তব্য মনে করেন; এই "কম্মবাচা" এক বার অথবা তিন বার উচ্চারণ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক বারে "জ্ঞপ্তি"টী বলিতে হইবে। 'মতপ্রকাশকালে' (Voting) মৌন সম্মতিলক্ষণ বলিয়া ধরা হইত, যাঁহারা জ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগকে বাক্য দ্বারা নিজেদের অসম্মতি জানাইতে হইত। যদি 'জ্ঞপ্তি' সমস্ত সভ্যদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইত, এবং সকলেই চুপ করিয়া থাকিতেন, তবে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত (carried unanimously) বলিয়া বিবেচিত হইত। তর্ক ও মতদ্বৈধ ঘটিলে "ভেলুগ্গাসিকা"র (Vote of the majority) গ্রহণ হইত। সাম্যগণ 'শলাকা' দ্বারা স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতেন (ballot-voting), "শলাকা-গ্রাহাপক" নামক কর্ম্মচারী এই সকল 'শলাকা' সংগ্রহ করিতেন। পীড়া বা অন্য কারণে অনুপস্থিত ব্যক্তির মতপ্রকাশ "ছন্দ" নামে অভিহিত হইত (absentee vote)। 'কার্য্যসম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা' (quorum) ঠিক রাখিবার জন্য 'গণ-পূরকে'র ("whip") সাহায্য লওয়া হইত। বাস্তবিক সেই সুপ্রাচীন যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৬০০-৩২০) তর্করীতি ও কার্য্যনির্ব্বাহ-পদ্ধতির এবংবিধ সূক্ষ্ম বিভাগ ও সুচারু সৌষ্ঠব দেখিয়া স্বভাবতঃই বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হৃদয়-শ্মশান।

ক

[ধরানাথের কথা।]

১

বাল্যকালাবধি আমি স্বভাবতঃ সাহিত্য-রসে বঞ্চিত—যৌবনে ডাক্তার হইবার পর হইতে লিখিয়াছি কেবল প্রেসক্রিপশন, পড়িয়াছি কেবল ডাক্তারী পুস্তক পুস্তিকা পত্রাদি। স্ত্রীকে পত্র লিখিবার সুযোগও বিলাতে হইবার কিছু-

বার পর হইতে আর পাই নাই; কারণ, তাবধি যখন যেখানে গিয়াছি, তখনই তিনি সঙ্গে; যদি কখনও কার্য্যগতিকে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তবে সৌহৃদ-সংবাদের জন্য টেলিগ্রামেই কাজ সারিয়াছি। এই অবস্থায় আমি যে উপন্যাসের অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করিতেছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হইতে পারে। সে কৈফিয়তে আমি একটা নজীর দিব—আমেরিকার এক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার-সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই অন্ততঃ একখানা উপন্যাসের উপকরণ থাকে। সে কথা যত সত্য হউক আর না হউক, অনেকেরই অভিজ্ঞতায় একখানা উপন্যাসের উপকরণ থাকে। আমার অভিজ্ঞতায় যে সব উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে উপকরণ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক, তাহাই সাজাইয়া গুছাইয়া একটা ধারাবাহিক বিবরণের প্রকাশে আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করিতেছি।

তখন আমি দিল্লীতে হাঁসপাতালে ডাক্তার। শীতকাল—একে দিল্লীর শীত, তাহাতে সে বৎসর শীত কিছু অধিক—একেবারে কন্‌কনে—যেন হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা হইলেই ঘরে অগ্নি জ্বালিতে হয়। এই অবস্থায় রাত্রি প্রায় দুইটার সময় যখন ঘণ্টার শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। হাঁসপাতালে বিশেষ জরুরী কাজ না পড়িলে এ অসময়ে আমাকে ডাকিত না। গৃহিণীরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "এত রাত্রিতে—এই শীতে!" হাসিয়া বলিলাম, "মরণের কালবিচারও নাই! মরণের মরণ হয় না?" উঠিয়া ড্রেসিং-গাউন জড়াইয়া হাঁসপাতালের আফিস-ঘরে আসিলাম। আমার সহকারী তথায় নাই—দুই জন অপরিচিত লোক বসিয়া আছে। আমি রোগীদের ওয়ার্ডে যাইয়া দেখিলাম, এক জন রোগীকে শয্যায় ফেলিয়া আমার সহকারী আবশ্যক যন্ত্রাদি গুছাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আফিং খাইয়াছে।" উভয়ে তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে—রোগীর উদর হইতে অহিফেন বাহির করাইয়া তাহার চিকিৎসার উপদেশ দিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছি, তখন দেখিলাম, আফিস-ঘরে আগন্তুকদ্বয় এমন ঝগড়া বাধাইয়াছে যে, কেরাণী বেচারা খাতা লইয়া বসিয়াই আছে—আর গোলমালে হাঁসপাতালের সব রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। আমি ধমক দিতে এক জন একটু নরম হইল। সে হোটেলের কর্ত্তা। তাহার হোটেলে রোগী আসিয়াছিল, এবং

তথায় সে আহ্নিকেন সেবন করিয়াছিল। পরে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিয়া তাহার চাকর তাহাকে ডাকিয়া আনে, এবং সে দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া টাঙ্গা করিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে আনিয়াছে। সে রোগীর কাছেই জানিয়াছে, তাহার নাম—শীতলচন্দ্র রায়, বাড়ী বঙ্গদেশে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঝগড়া কি লইয়া?" সে বলিল, অপর ব্যক্তিও রোগীর সঙ্গে এক সময়ে তাহার হোটেলে আশ্রয় লয়, এবং রোগীর ঘরের পাশের ঘর ভাড়া লয়। সে বলিতেছে, রোগীর নাম—বিন্দুমাধব সমাদ্দার। সে লোকটা ততক্ষণ তাহার গাজীপুরী দাড়ী চুমরাইতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কেমন করিয়া উহার নাম জানিলে?" সে অত্যন্ত উদ্ধতভাবে উত্তর করিল, যেহেতু সে সরকারী আদমী এবং পুলিসের লোক, সেহেতু সে সবজান্তা; কেন না, জানাই তাহার কাজ, এবং জানিবার জন্যই সরকার তাহাকে তলবতঙ্কা দেন। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে—সে এই রোগীর সঙ্গেই বানারস হইতে আসিয়াছে—আজ কাল বাঙ্গালীকে বিশ্বাস নাই। তাহার উদ্ধত কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল—বাঙ্গালীর সম্বন্ধে তাহার মত-প্রকাশে আর আমি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলাম না—বলিলাম, "এখনই বাহির হইয়া যাও।" সে আহত সর্পের মত ফোঁস্ করিয়া উঠিল—পুলিসের আদমীকে এত বড় কথা! আমি বলিলাম, "তুমি কাঁড়ি হইতে আসিয়াছ কি জাহান্নম হইতে আসিয়াছ, জানিতে চাহি না। তুমি পুলিস কি গুণ্ডা, তাহাও জানিবার দরকার নাই। এই মুহূর্ত্তে তুমি হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া না গেলে আমি তোমার কাণ পাকড়াইয়া বাহির করিয়া দিব।" আমি দ্বারবানদিগকে ডাকিলাম। লোকটা পর দিন ইহার প্রতীকার করিবে, শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া গেল। আমি হোটেলওয়ালাকেও যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া গেলে, কেরাণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রেজিষ্টারে কি নাম লিখিব?" আমি উত্তর দিলাম, "আজ কিছু লিখিও না। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। বাস্।"

আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম; কিন্তু তাহা হইল না। আমি রোগীর কাছে ফিরিয়া গেলাম। বিন্দুমাধব সমাদ্দার! নামটা বরাবরই আমার কাছে অসাধারণ বোধ হইত। সে প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বের কথা। মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কলেজে আমার এক জন সহপাঠীর নাম ছিল—বিন্দুমাধব সমাদ্দার। কলেজে পঠদ্দশায় আমার সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাই

ছিল। তাহার পর যেমন হয়—দুই জন দুই পথে গিয়াছিলাম—ঘনিষ্ঠতাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতযাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি তাহার সন্ধান হারাই নাই। তাহার পর চাকরী লইয়া আসিলাম পঞ্জাবে—যে কয় দিন মা ও দাদা বাঁচিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় যাইতাম। কিন্তু বসন্ত আমাকে পঞ্চকাণ্ডমধ্যে মাতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন করিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী ভ্রাতার পরামর্শে দাদার বিধবা কলিকাতার ছোট বাড়ীখানির ভাগ পাইবার জন্য মামলার ভয় দেখাইলেন। সংসারের উপর বিরক্ত হইলাম—মনে করিলাম, আমার জন্য আর সব গহনা বিক্রয় হইয়াছে, দাদা কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি কি দাদার মেয়ের সঙ্গে বাড়ীর খরচা লইয়া ঝগড়া করিব? বাড়ীর অংশ তাহাকে দানপত্র করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর সে বেদনা-ক্ষত যাহার প্রেমভেষজে শুষ্ক হইয়াছে, তিনিও কখনও আমাকে বাঙ্গালায় যাইতে বলেন নাই। কারণ, তিনি জানেন, তথায় ফিরিলে স্মৃতির দহন-যন্ত্রণায় আমি কাতর হইব। এইরূপে বাঙ্গালার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বিন্দুমাধবের সন্ধান পাইব কেমন করিয়া? কিন্তু এ কি সেই? যদি সে হয়, তবে কেমন করিয়া, কি সূত্রে বিদেশে আসিল; কেন বিপন্ন হইল? সে কি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল? রোগীর কাছে ফিরিয়া গেলাম। যখন ষ্টম্যাক্-পম্প দিয়া উদর হইতে অহিফেন বাহির করিয়া দিয়াছি, এবং ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, তখন তাহার চেহারা ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—অকালজরাগ্রস্ত হইলেও এ যে সেই বিন্দুমাধব, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

এ সেই বিন্দুমাধব। মানুষের হৃদয় কত দুর্ব্বল, কত কোমল, বিন্দুমাধবকে চিনিবামাত্র অনুভূতিতে তাহা বুঝিলাম। কালের ব্যবধান সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল—আমি যেন সে কাল ভুলিয়া গেলাম। আমার কাছে হাঁসপাতাল—রোগী—ডাক্তারী—সবই যেন মায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সত্য কেবল সেই তরুণ যৌবন—সেই গঠদশা—সেই সব সতীর্থ, আর তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাধব। আমার হৃদয়ের কোন্ কোণে বিস্মৃত সতীর্থ বিন্দুমাধবের প্রতি এত স্নেহ লুকাইয়াছিল, জানিতে পারি নাই। কিন্তু আজ সেই স্নেহের উৎকণ্ঠায় আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। সহকারীকে আবার এবার চিকিৎসার ও সতর্কতার উপদেশ দিয়া আমি বাসায় ফিরিবার পথে আফিস-ঘরে আসিলাম, এবং কেরাণীকে অন্যত্র বলিলাম, "এই ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি কাগজে পত্রে

যা কথাবার্ত্তায় কোনও সংবাদ প্রকাশ করিও না।" তাহার পর বাসায় ফিরিলাম।

গৃহিণী তখন নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া অগ্নি আবার জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, এবং সেই অগ্নির কাছে বসিয়া একখানা মাসিকপত্র পাঠ করিতেছেন। আগুনের আলো তাঁহার মুখে পড়িয়া তাঁহাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে চুম্বনের আলোড়ন সংবরণ করিব? আমাদের দাম্পত্য-জীবন সন্তানের স্নেহে স্নিগ্ধ হয় নাই। তাই বোধ হয় আমরা প্রথম প্রণয়ের তাপই রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। আমি কোনও কাজে যতক্ষণ বাহিরে থাকিতাম, ততক্ষণ গৃহিণী আমারই প্রতীক্ষায় সব কাজ ত্যাগ করিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে ঘটনার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমার বাল্যবন্ধু! তবে কালই তাঁহাকে আমাদের বাসায় আন।" আমি বলিলাম, "আনিতেই হইবে। নহিলে বেচারাকে লইয়া পুলিস টানাটানি করিবে।"

২

পর দিন কিরূপে পুলিসের কৌতূহল প্রহত করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলাম, তাহা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, পুলিসের কাছে জানিতে পারিলাম—সন্দেহ ছাড়া পুলিসের বিন্দুমাধবকে লক্ষ্য করিবার কোনও কারণই নাই। গত ছয় মাস সে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অথচ পুলিস তাহার কোনও কাজ সন্দেহের অণুবীক্ষণেও ধরিতে পারে নাই। কাজেই তাহার পশ্চাতে লাগিয়া পুলিস সাবধানের হিসাবে সরকারী তহবিল যথাসম্ভব হাল্কা করিয়া দিতেছে।

পুলিসের গোল মিটাইয়া আমি বিন্দুমাধবের কাছে গেলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে চিনিতে পার?" সে আমার দিকে চাহিল। দেখিলাম, নয়নে সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত দৃষ্টি—দৃষ্টিতে সেই দৃঢ়তা। সে আমাকে ভাল করিয়া দেখিল, "দেখিয়া চিনিতে পারি না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে পারি—তুমি ধরানাথ দত্ত।"

আমি বলিলাম, "ঠিক ধরিয়াছ। আর তুমি তাহার সতীর্থ বিন্দুমাধব সমাদ্দার। সুতরাং পুলিসের হুকুমের আদেশে তোমাকে হাঁসপাতাল ছাড়িয়া বন্ধুগৃহে যাইতে হইবে।"

বিষের ক্রিয়ায় ও চিকিৎসায় ফলে বিন্দুমাধবের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল—

আমার কথায় তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ যেন আরও পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার নয়নে কাতরতা ও আশঙ্কা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তাহা হইবে না",—তাহার পর সে বলিল, "তুমি বিন্দুমাধবকে বাঁচাইয়াছ বটে, কিন্তু সে তোমার সেই পরিচিত বিন্দুমাধব নহে। সে বিন্দুমাধব মরিয়াছে। কোনও ঔষধে, কোনও চিকিৎসায় তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "ঔষধের সংবাদ চিকিৎসক রাখে—রোগী সে বিষয়ে অনধিকারী। যখন আমার হাতে পড়িয়াছ, তখন চিকিৎসার ভার আমার। শুশ্রূষার ভার আমার স্ত্রী লইবেন, বলিয়াছেন।"

শেষ কথায় বিন্দুমাধব যেন কেমন বিমনা হইল। তাহার পর সে বলিল, "আমি মরিতেছিলাম; তুমি আমাকে বাঁচাইলে কেন?"

তবে বিন্দুমাধবের অহিফেন-সেবন ভ্রান্তিবশতঃ নহে—ইচ্ছাকৃত! কিন্তু দুঃখের—বেদনার—যাতনার মাত্রা কত দূর বাড়িলে মানুষ আত্মহত্যা করিতে পারে? বেদনায়—যাতনায় বুদ্ধিহারা না হইলে ত মানুষ সে কাজ করিতে পারে না। তবে বিন্দুমাধবের জীবনে কি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহারই আঘাতে সে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল? সে রহস্য জানিয়া আমি কি তাহার বেদনাবিক্ষত হৃদয়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে পারিব না?

যাহা হউক, বিন্দুমাধবকে অনেক চেষ্টায় আমার গৃহে আনিলাম। আমার কাছে তাহার সব কথা শুনিয়া তাহার অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকে আবার সংসারী করিতে আমার গৃহিণীর স্বাভাবিক ইচ্ছা যেন জিদে পরিণত হইল। কিন্তু পাছে সে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, সেই ভয়ে আমরা অতি সাবধানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ, আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে পূর্ব্ববৎই বিমলবুদ্ধি আছে। জ্ঞানের অনুশীলনে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। তবে তাহার দুঃখের কারণ কি?

৩

নাবিক নূতন নদীতে পাড়ি জমাইবার পূর্ব্বে যেমন সাবধানে নদীর অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ্য করে, আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার উত্তমার্দ্ধ তেমনই সাবধানে বিন্দুমাধবকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যে কোনও বিষয়ের আলোচনা করিলেই আমি তাহার অধ্যয়নের বিস্তারে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইতাম। তাহার কথায় যেন বর্ণের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ ছিল। এমন লোকের জীবনে কি

থাকিতে পারে যে, তাহার জন্য সে আত্মঘাতী হইতে পারে? সমুদ্রে যেমন মুক্তা প্রবাল থাকে, তেমনই হাজার কুম্ভীরও থাকে। কিন্তু সে কি? আমি এক দিন তাহার পরিজনগণের কথা জানিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলাম। পরন্তু সে সেই দিন হইতেই বিদায় লইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। ভাব বুঝিয়া আমি আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতাম না। সে প্রায় প্রতিদিনই চলিয়া যাইতে চাহিত; আমি ও আমার স্ত্রী বিশেষ অনুরোধে তাহাকে নিরস্ত করিতাম।

আমরা লক্ষ্য করিলাম, আমার গৃহে গৃহিণীর অবারিত কর্তৃত্ব এবং আমার সর্ব্ববিষয়ে গৃহিণীর বুদ্ধিতে ও ব্যবহারে নির্ভরশীলতা তাহার বিস্ময়ের উৎপাদন করিত। তাহা হইতে গৃহিণী অনুমান করিয়া ফেলিলেন, বিন্দুমাধবের পত্নীই তাহার জীবনে বেদনার কারণ ও কেন্দ্র। বিন্দুমাধবের রোগের নিদান-নির্ণয়ে তাঁহার নৈপুণ্য-পরিচয়ে আমি সত্য সত্যই বিস্মিত হইয়াছিলাম।

দিল্লী গৌরবের রাজধানী—কীর্ত্তির শ্মশান। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে সাহজাহানাবাদ—কত রাজধানীই এই দিল্লীর বক্ষে স্মৃতিমাত্র রাখিয়া গিয়াছে! কিন্তু রাজধানী বিলুপ্ত হইলে তাহার স্মৃতি ব্যতীত আরও কিছু থাকে। সৌধে, স্তম্ভে, মন্দিরে, ভগ্নাবশেষে সেই স্মৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। আমি মধ্যে মধ্যে বিন্দুমাধবকে সেই সব দেখাইতে লইয়া যাইতাম। আমার এক জন বন্ধুও প্রায়ই আমাদের সহগামী হইতেন। তিনি—অধ্যাপক সেন। লোকটি দর্শনের অধ্যাপনা করেন—কেশে ও বেশে অমনোযোগে একেবারে দার্শনিক। মধ্যে মধ্যে যমুনার কূলে কুদাসিয়া বাগে বৃক্ষতলে বসিয়াই অধ্যাপনা করেন। লোকটী একহারা—লম্বা; মুখে পাইপ; নয়নে সরলতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টি। একটা রবিবারে আমরা সাহজাহানের কেল্লা দেখিতে যাইব, স্থির হইল। যাইবার পথে আমরা সেনকে গাড়ীতে তুলিয়া লইব। আমরা যখন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহার কন্যা আশা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বেহালা বাজাইতে শিখিতেছে, আর পুত্র অশোক একটা খেলার ট্রাইসিকল লইয়া ব্যস্ত। আমি বলিলাম, "অশোক ও আশা আমাদের সঙ্গে চলুক।" অশোক ট্রাইসিকল ছাড়িয়া আসিয়া বলিল, "হাম যায়েগা ডাক্তার সাহেব।" সে দিল্লীবাসের ফলে হিন্দীটাই বেশী বলিত। সেন বলিলেন, "তবে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইহার জন্যও কি গৃহিণীর অনুমতি লইতে হইবে?" সেন বলিলেন, "নিশ্চয়। সংসারে যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা—কোনও বিষয়ে

তাঁহার ক্ষমতা অস্বীকার করা রাজদ্রোহ।" আমি বলিলাম, "আপনি রাজভক্ত প্রজা বটেন।" তিনি বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার সাহেব, এখন আপনাদের দেখাইয়া না হয় একটু বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু তাহার ফলে শেষে যখন করুণ রস প্রকাশ করিতে হইবে তখন?" সেন গৃহিণীর অনুমতি আনিতে গেলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, বিন্দুমাধব কি ভাবনায় আত্মবিস্মৃত। সেদিন কেল্লায় দাওয়ানী আম, দাওয়ানী খাস, রঙ্গমহল, হামাম, এ সব সে যেন দেখিয়াও দেখিল না। সে কি ভাবিতেছিল। অথচ সে সব সৌধের ইতিহাস সে আমাদের অপেক্ষা ভাল জানিত—তাহার নিকট সে সব সৌধদর্শনের কৌতূহলই স্বাভাবিক। আমি গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "রোগনির্ণয়ে আমাদের ভুল হয় নাই। ঠিক ধরিয়াছি।" আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "খুব যে বড় ডাক্তার! একেবারে M. D.!" তিনি বলিলেন, "সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? তোমার My dear কি আর কেহ হইতে পারে?" সহসা বাহুবল্লরীতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া গৃহিণী চুম্বনে আমার মুখ প্লাবিত করিয়া দিলেন। প্রিয়তমা—প্রিয়তমাই বটেন।

৪

দিল্লীর নিম্নে যমুনা, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় নামশেষ। দেখিলে দুঃখ হয়। ধূ ধূ বালুবিস্তারের মধ্যে শীর্ণ জলধারা! এ কি সেই যমুনা, যাহার কূলে বৃন্দাবনলীলা হইয়াছিল?

"তা'র কূলে কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুল ছায়া দান;
তা'র জলে জলে ছুটে প্রেমের স্মিরিতি,
কল্লোলে বিরহ-গান।"

এ সে যমুনা নহে। তাহার পর যে যমুনার প্রবাহ সাহজাহানের দুর্গমূল প্রক্ষালিত করিত, এ সে যমুনাও নহে। মোগল-দিল্লীর গৌরবের মত সে যমুনাও দুর্গ হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। আছে স্মৃতি। তবুও এ যমুনা—কঙ্কর-কঠিন দেশে স্নিগ্ধ সলিলের ধারা। তাই আমি প্রায়ই নদীকূলে বেড়াইতে যাইতাম—শুষ্ক ও আর্দ্র বালুর উপর দিয়া জলধারার কাছে যাইতাম। সেদিন অপরাহ্ণে বিন্দুমাধবকে সঙ্গে লইয়া আমি নদীতীরে যাইতেছিলাম। পথে বিন্দুমাধব বলিল, "দেখ, ধরানাথ, তুমি কেবলই আমাকে ধরিয়া রাখিতেছ। আর নহে। এবার আমি যাইব।" আমি বলিলাম, "আমি ধরিয়া রাখি

নাই—অনুরোধ করিতেছি।" সে বলিল, "তোমার ও তোমার স্ত্রীর স্নেহ বড় এমন অসাধারণ যে, তোমাদের অনুরোধ বন্ধনেরও অধিক। কিন্তু আমাকে আর অনুরোধ করিও না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে?"

ঠিক সেই সময় কোথা হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া যমুনার বক্ষের বালু উড়াইয়া চারি দিক ধূসর আবরণে আবৃত করিল। বিন্দুমাধব বলিল, "ঐ ঝাপটা বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর—ও কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "উহার ত নিরুদ্দেশ যাত্রা। তোমারও কি তাহাই?"

"হাঁ।"

"তোমার কি কোনও কাজ নাই?"

বিন্দুমাধব দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না।"

আমি বলিলাম, "দেখ, অকারণ কৌতূহলের যষ্টি দিয়া আমি তোমার জীবনের রহস্য যবনিকা উত্তোলিত করিতে চাহি না। কিন্তু এ কথা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তোমার মত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জগতে কোনও কাজ নাই।"

"বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে কি কাজের কোনও সম্বন্ধ আছে?"

"অহে—কাজই মানুষের জীবন।"

বিন্দুমাধব হাসিল; বলিল, "যে জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহার ত কাজ নাই।"

"সে অবস্থা ব্যাধির বিকার।"

"ব্যাধি! যদি তাহাই বল, তবে সে ব্যাধির কিন্তু কোনও চিকিৎসা নাই। 'ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি—বৈদ্যে নাহি পান বিধি।' সে ব্যাধি তোমাদের চিকিৎসার অতীত।"

"আমার চিকিৎসার অতীত 'অসাধ্য ব্যাধি'র ঔষধও ত দাশরথি প্রেস্‌-ক্রাইব করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর বিলাতফেরত ডাক্তার আমি যদি সে প্রেসক্রিপশন গ্রহণ না-ই করি, তবু জানি, স্নেহ—প্রেম—ভালবাসা এ সব ভেষজে অমন অনেক অসাধ্য ব্যাধি সারে। আর এ ব্যাধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—কাজ।"

নিতান্ত নিরাশভাবে মাথা নাড়িয়া বিন্দুমাধব বলিল, "তোমার মায়াপুরীতে আসিয়া—তোমার আর তোমার স্ত্রীর অযাচিত—অপ্রত্যাশিত স্নেহে আমার

দৃঢ় মতও পরিবর্ত্তন করিবার প্রলোভন হয় বটে; কিন্তু, ডাক্তার, অনেক কিতাবতী কথা কেতাবেই ভাল—জীবনে প্রযোজ্য নহে।"

"তুমি এত নিরাশ হইলে কেন?"

"সে সুদীর্ঘ কথা।"

"সে কথার আলোচনা করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না।"

"তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। চল—আমার জীবনের মত শুষ্ক ঐ বালুস্তারে যাই। বিদায় লইবার পূর্ব্বে তোমাকে বুঝাইয়া যাইব—মানুষের জীবন তাহার পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বহ হইতে পারে।"

আমরা অগ্রসর হইয়া ফল্গুর বালুস্তারে যাইয়া বসিলাম। বিন্দুমাধব তাহার কথা বিবৃত করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

মুখবন্ধ।

নোয়া-পুত্র সেমের বংশধরগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক জগতে Semite বা Semetic আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সেমীয়গণ আরবীয়, ইব্রিয়, আসিরীয়, অরামীয় প্রভৃতি বহু শাখা এবং ইস্রায়েল, য়িহুদি প্রভৃতি নানা প্রশাখায় বিভক্ত। যাহাদিগকে আমরা ইস্রায়েল ও য়িহুদি বলিয়া থাকি, ইহারা সকলে সাধারণতঃ হিব্রু বাইবেলে খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইব্রিয় নামে পরিচিত ছিল। মহাপুরুষ আব্রাহাম, যোসেফ বা ইউসফ ও মুসা আপনাদিগকে ইব্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। এই কারণে আমরা সেমীয় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সুবিধার জন্য প্রবন্ধে ইব্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

ভাষাতত্ত্বের সহায়তায় জাতিতত্ত্ব-নির্ণয় এখন অসার ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Prof. Sayce মহোদয় বলেন—"The distinction of language do not follow the distinction of race and whereas it is impossible to change one's race there is no difficulty in changing one's language." অন্যত্র বলেন, "We can change our language. We can not change our race." বিশেষতঃ প্রাচীন আর্য্য ভাষার সঙ্গে সেমীয়-ভাষাপুঞ্জ অপ্রাচীন গ্রীক, লাটিন

ইত্যাদি ভাষার তুলনা অসমীচীন। প্রাচীন আর্য্য ভাষার পার্শ্বে জগতে একমাত্র সেমীয় ভাষা দাঁড়াইতে পারে। এই সেমীয় ভাষার ইব্রিয় শাখার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন:—"The Primitive tongue is supposed by some to have been closely allied to the Hebrew."

Major Condor নামক বহুভাষাবিদ পণ্ডিত এমন সত্তরটী ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ভাষার মূলে এক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও বাক্যকথন Monosyllablic ও Polysyllablic এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিব্বতী, চীনা, তাতারী, জাপানী, বর্ম্মিজ প্রভৃতি মঙ্গোলীয়ান জাতির ভাষা Monosyllabic, এবং আর্য্য, সেমীয়, গ্রীক, রোমান, কেল্ট প্রভৃতি জাতির ভাষা Polysyllablic। জাতিতত্ত্ব (Ethnology) হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর লোক White stock বা race (শ্বেতবর্ণ), Yellow stock (পীতবর্ণ), Black stock (কৃষ্ণবর্ণ), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাচীন হিত্তিয় (Hittite) ও অতি প্রাচীন Accad (আক্কাদ) ও Sumer বা Shinar প্রদেশের Non-Semetic অধিবাসিগণ এবং প্রাচীন এলমীয়গণ (Elamite) yellow stock ভুক্ত।

আর্য্য, সেমীয়, ভূমধ্যসাগরীয় (গ্রীক, রোমান আদি) কেল্ট প্রভৃতি জাতি White race বা stockএর অন্তর্গত। শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্যে ইহাদের বর্ণে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও, ইহারা মূলে এক।

ভাষার উচ্চারণগত একতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অপ্রাচীন গ্রীক Athena, Artemis এবং Adonis ইত্যাদি দেবদেবীর সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক অহনা ইত্যাদি দেবদেবীর তুলনা করিবার পূর্ব্বে, ঐ সমস্ত গ্রীক দেবদেবীর মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। পিতা, মাতা, দুহিতা, অর্ভক ইত্যাদি শব্দ সহ Father, Mother, Daughter, Orfan ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণগত সামঞ্জস্য থাকিলেও, ঐ সমস্ত শব্দের বৈদিক প্রাচীন প্রয়োগের অনুসন্ধান আবশ্যক।

পৌত্তলিক কিংবা বহুশক্তিবিশ্বাসিমাত্রই আর্য্যদের জ্ঞাতি, এবং যে স্থান হইতে পৌত্তলিকতার কোনও প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে, সেই স্থানই আদি আর্য্যনিকেতন, ইহা হাস্যকর কথামাত্র। এ সম্বন্ধে হাস্যজনক একটী কথা স্মরণ হইল। কাঁঠাল খাইবার কায়দা না জানায় এক কাবুলীর দাড়ি গোঁপে খুব আঠা লাগিয়া যায়। কাঁঠালের আঠা দূর করিবার উপায় অন্বেষণে

থাকায় কাবুলীকে শেষে বাধ্য হইয়া শ্মশ্রু আদি ফাঁসাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ইহার পর যখন কাবুলী হাটে বাজারে বৈষ্ণব শ্রেণীর দাড়ি গোঁপ কামান লোক দেখিত, তখনই বলিত, 'ভাই তোমাভি কাঁঠাল খায়া ?'

যে প্রকার একভাষাভাষী লোক পৃথিবী ব্যাপিয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ যিহোবা কি ইন্দ্রভক্ত, অগ্ন্যুপাসক কি কোরাণভক্ত জগৎ জুড়িয়া থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব অসম্ভব। বরং ইন্দ্র কি যিহোবার ভক্ত ভারতে এবং নিন্দুক ইংলণ্ডে, ইহা রেল-টেলিগ্রাফবিহীন সেই প্রাচীন কালে অসম্ভব ছিল। ভক্ত এবং নিন্দুক, ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী থাকাই সম্ভবপর।

ঋগ্বেদে বর্ণিত বিবাদ বিসংবাদ আর্য্য ও ইরাণী বিবাদ নহে। ইহা আর্য্য ও ইব্রিয় বিবাদের কাহিনীমাত্র। এই বিবাদ, বিসংবাদ Separationএর ফলে এক সম্প্রদায় বহুশক্তিবিশ্বাসী, প্রভাত হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত দিবস, পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাসগণনাকারী, বাম হইতে ডান দিকে লিখন-পদ্ধতি গ্রহণকারী, সুরাভক্ত, যজ্ঞে মধুদ্রব্যবহারকারী ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং তদ্বিপরীতে অপর সম্প্রদায় একশক্তিবিশ্বাসী, সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিবস, নূতন চন্দ্র হইতে নূতন চন্দ্র পর্য্যন্ত মাসগণনাকারী, ডান হইতে বাম দিকে লিখন-পদ্ধতি গ্রহণকারী, সুরাবিরোধী, যজ্ঞে মধুবর্জ্জনকারী ইত্যাদি। উভয় সম্প্রদায়ই অহি, বল রূপ Evil spiritএ বিশ্বাসী। বহু বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও বহু বিষয়ে অনৈক্য আছে। এই White stockএর (শ্বেতবর্ণ) অন্তর্ভূত আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির মধ্যে ভাষা, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কোথায় ঐক্য, কোথায় অনৈক্য, ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। অদ্য ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইলাম।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

বিবাহের আবশ্যকতা।

And the Lord God said, (it is) not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.—*Genesis.* 2—18.

অর্থাৎ, "সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্যে তাহার অনুরূপ সোসর নির্ম্মাণ করি।" সেমীয় (Semetic) শাস্ত্রমত সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিরক্ষার জন্য গোড়াতেই নরের নারী আবশ্যক হইয়াছিল, এবং নারী ব্যতীত নরের একাকী থাকা বস্তুত বিধেয়ও হয় নাই।

বৈদিক যুগেও অবিবাহিত জীবন আকাঙ্ক্ষনীয় ছিল না। ঋগ্বেদের বহু ঋকে সন্তানকামনা ও পত্নীপ্রার্থনা দ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়। বৈদিক কালেও যে নরের জন্য নারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল, ইহা ৫।৪৬।৮ ঋকের ভারতী, ধিষণা, বরুণানী, ইন্দ্রানী, অশ্বিনী প্রভৃতি দেবপত্নীদিগের কল্পনার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। আর্য্য-শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

"যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্"।

—বৃহৎপরাশর-সংহিতা ৪।৭০

অন্যত্র—

"অপুত্রকের কোনও লোক নাই"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্জিকা, ১ম খণ্ড।

মুসলমান শাস্ত্র হদিস বলিতেছেন,—বিবাহিত ও অবিবাহিত দুই ব্যক্তিই যদি সমান বিদ্বান, সমান গুণসম্পন্ন ও সমবয়স্ক এবং সমান চরিত্রবান হয়, তাহা হইলে আচার্য্য কার্য্যের জন্য বিবাহিতকেই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

অর্দ্ধাঙ্গিনী। সর্ব্বশাস্ত্রেই নারীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। প্রাচীন ইব্রিয় শাস্ত্রে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী-রূপে পরিচিত।

"They shall be one flesh"—*Genesis 2—24.*

অর্থাৎ, তাহারা একাঙ্গ হইবে। বিবাহকালের বর্ণনায় বৈদিক ঋষি বলিতেছেন,—"জায়া বিশতে পতিম্"। অর্থাৎ, পত্নী পতিতে প্রবেশ করিতেছে, বা তাহারা এক হইয়া যাইতেছে। ১০।৮৫।২৩ ঋক্।

আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদাদি শাস্ত্রে স্ত্রী যে অর্দ্ধাঙ্গিনী-রূপে পরিচিত, তাহা রামায়ণের দ্বারাও বুঝা যায়।

"বেদাদনন্যরূপা পুরুষস্য দারাঃ।" অর্থাৎ, বেদে পত্নী পতির দেহের অর্দ্ধাংশ বলিয়া কথিত।—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ২৪।৩৮।

উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুর মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন, অতি প্রাচীনকালে বিবাহপ্রথা ছিল না; মনুষ্যগণ ইতর প্রাণীর ন্যায় মিলিত হইত। মহাভারতের এই উপাখ্যান আমরা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যে বৈদিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আলোচনার কোনও বিজ্ঞানসম্মত উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই, সেই বৈদিক যুগের প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদে বিবাহের ও বিবাহিত জীবনের, এমন কি, বিবাহের আচার-পদ্ধতির বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে।

অতি প্রাচীনকালে ইব্রিয় জাতির বিবাহ *bena* (বেনা) ও *baal* (বাল)

নামক দুই প্রকার প্রথায় সম্পন্ন হইত। তন্মধ্যে "বেনা" নামক প্রথাই প্রাচীনতর। এই "বেনা" প্রথা আধুনিক কালে ইব্রিয় বা য়িহুদি সমাজ হইতে লোপ হইয়াছে। প্রথমে এই "বেনা"র কথা বলিব। হিব্রু ভাষাতে "বেন" শব্দের অর্থ অপত্য, সন্তান, বংশ ইত্যাদি। পুরুষ মৈথুন ও অপত্যকামনায় নিজ পিতৃগোষ্ঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্যার পিত্রালয়ে গিয়া কন্যা যাচ্ঞা ও বিবাহ করিয়া চিরজীবন তথায় বাস করিত। সন্তানগণ মাতৃকুলের অধিকার প্রাপ্ত হইত।

ইব্রিয় বেনা।

বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর পুরুষকে আমরা ঘরজামাতা বলিয়া থাকি। নারী-যাচ্ঞা হেতু এই শ্রেণীর স্ত্রীকে আমরা "বনিতা" বলিতে পারি। নরনারীর এই প্রকার মিলনে পুরুষ স্বামী বা প্রভুতুল্য, এবং নারী অধীনা বা গৃহিণীরূপে গণ্যা হইত না। ইহাতে নর-নারীর গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইত না; কেবল প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যৌন সম্মিলন দ্বারা অপত্য উৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইহাতে পুরুষকে নারীর ভার-বহন ও তাহাকে নিজগৃহে বহন করার প্রথা ছিল না। প্রায় খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাকোবের (Jecob) ঘরজামাতারূপে বিবাহ (Genesis ২৯ অধ্যায়) এবং যাকোবের স্ত্রী ও সন্তানগণ সম্বন্ধে লাবনের উক্তি "এই কন্যাগণ আমারই কন্যা, এই বালকগণ আমারই বালক" ইত্যাদি (Genesis ৩১।৪৩) দ্বারা "বেনা" প্রথার প্রমাণ পাইতেছি। আদম ও ইভের বিবাহ নাকি এই "বেনা" প্রথায় (Hebrew Antiquity 12) সম্পন্ন হইয়াছিল। এই কথার পোষকতায় আদি মনুষ্য আদম ও ইভের সম্বন্ধে ঈশ্বরোক্তি লইয়া আমরা আরও একটু আলোচনা করিব।

"Therefore shall a man *leave* his father and his mother, and shall cleave unto his wife"; Genesis 2—24.

উদ্ধৃত leave শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ *Azab*। এই *Azab* শব্দটী অন্য স্থানে (Genesis 39—12, 13) "পরিত্যাগ" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতি-প্রাচীন কালে (Primitive time) ইব্রিয় পুরুষ যে নারীর জন্য পিতৃগোষ্ঠী পরিত্যাগ করিত, তাহা ইহা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

ঋগ্বেদের ১।৩৪।২,১।৫৬।২,৯।৬৪।২১,৯।৮৫।১০,১১ ঋকে ও অন্যান্য বহু ঋকে আমরা "বেনা" শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। বিখ্যাত বেদ-ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্য মহোদয় ১।৫৬।২ ঋকে "বেনা" অর্থ "কান্তাস্ত্রিয়ঃ কাময়মানাঃ" এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কম্" ধাতুর অর্থ ইচ্ছা, সুতরাং সম্ভোগার্থে যে নারীকে গ্রহণ করা যায়, সেই স্ত্রী

আর্য্য বেনা ও বনিতা।

কান্তা, কামিনী। ৯।৩৪।২১ ঋকে যে বেনা শব্দ আছে, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় তাহার অর্থ সুশ্রী পুরুষ, এবং ইংরেজি অনুবাদক গ্রিফিথ friends অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋকে যজ্ঞের স্তব বা গানের প্রসঙ্গ আছে। ৯।৮৫।১০,১১ ঋকের "বেনা" শব্দের অর্থ গ্রিফিথ Loving-ones ও দত্ত সাহেব সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া "বেন" নামক কোনও ব্যক্তি মনে করেন। বৈদিক কালে যে স্ত্রীলোকে পুষ্পচয়ন, (১।৫৬।২ ঋক) সোম-সংগ্রহ ও তাহা প্রস্তুত এবং প্রস্তুতশালায় গান করিত, ইহা ঋগ্বেদের ৯।৬৬।৮ ঋকে দৃষ্ট হয়। বৈদিক কালে স্ত্রীলোকে যজ্ঞকর্ম্মও করিত। বেনা শব্দের অর্থ "বনিতা" হইতে পারে কি না, আলোচনাযোগ্য। "বনিতা" শব্দ বন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বন্ অর্থে যাচ্ঞা বুঝায়। যে নারীকে যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ বা বিবাহ করা যায়, সেই নারীকে বনিতা বলিতে পারি। এই প্রকারে যাচ্ঞাকারী নরের নারীসন্নিধানে গমনের আভাষ ঋগ্বেদ ১।১০৫।২ ঋকের "অর্থমিদ্বা ও অর্থিন আজায়া যুবতে পতিম্" অর্থাৎ অর্থ নিকটে পায়, জায়া পতিকে নিকটে পায়, ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায়। প্রাচীন দ্রবিড় জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত আছে।

এক্ষণে "বল" নামক বিবাহ-প্রথার আলোচনা করিব। হিব্রু ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় "বল" অর্থে ক্ষমতা, শক্তি, শক্তিবান, প্রভু ইত্যাদি বুঝায়। বল্লভ অর্থে অধ্যক্ষ, নায়ক, পতি ইত্যাদি। হিব্রুতে বালা অর্থে গৃহিণী, সংস্কৃতে ষোড়শী নারী। সম্যকরূপে বহন করা হেতু বিবাহ। নারীর ভার-বহন ও নারীকে গৃহে বহন করার অর্থ বিবাহ। ইব্রিয় জাতির প্রাচীন "বল" নামক প্রথা দুই প্রকার। তন্মধ্যে বরের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব দ্বারা কন্যার আনয়ন ও বরের বাড়ীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া প্রাচীনতর প্রথা। আব্রাহাম-পুত্র ইসহাকের (খৃঃ পূঃ ২২০০) এই প্রকার প্রথায় বিবাহ (Genesis 24) হইয়াছিল।

ইব্রিয় Baal ও আর্য্য বল্লভ।

ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশ হইতে আমরা "Bena" নামক প্রথার পোষক প্রমাণ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঋগ্বেদের যে অংশকে অপ্রাচীন বলা হয়, তাহার (১০ম মণ্ডলের) ৮৫ সূক্তে সূর্য্যকন্যা সূর্য্যার সহিত অশ্বিদ্বয় অথবা সোমের রূপক বিবাহের যে চিত্রটী আছে, তাহাতে আমরা বিবাহসম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য কথা জানিতে পারি। উক্ত সূক্তের ২৩ ঋকের "অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থা যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্" দ্বারা কন্যা আনয়ন জন্য, নিষ্কণ্টক ও সোজা

পথের প্রার্থনায় বরের বন্ধুগণের দূরদেশে গমন সূচিত হইতেছে। আব্রাহাম যেহেতু সর্বদা কন্যা নিকটে না থাকায় কানান অর্থাৎ পালেষ্টাইন হইতে বহু দূরবর্ত্তী অন্যান্য নহরীয়ম (মেসোপোটেমিয়া) দেশে কন্যা আনয়ন জন্য (Genesis 24—10) লোক পাঠাইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তদ্রূপ বৈদিক কালে সর্বদা কন্যা নিকটে না থাকায় বিবাহের জন্য বরের বন্ধুগণকে যে কন্যা আনয়ন করিতে দূর দেশে যাইতে হইয়াছিল, উক্ত ঋক দ্বারা তাহা সমর্থিত হয়। বেবেরা-নারী কন্যাকে বাড়ীতে আনিয়া যে প্রকারে ইসহাকের সহিত তাহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, বৈদিক যুগেও সেই প্রকারে (১০।৮৫।২৩ ঋক) কন্যা আনিয়া বরের আলয়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত, ইহা বুঝা যায়। ১০।৩৯।১ ঋকের "যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাম্" অর্থাৎ শুন্ধ্যুবনামী পুরুমিত্র রাজার কন্যাকে তোমরা রথে করিয়া আনিয়া বিমদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলে; ১।১১৭।৫ ঋকের "আ বাং পতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষাবৃণীত জেতা যুবাং পতী" অর্থাৎ সূর্য্যা সখ্যতা হেতু আসিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, ইত্যাদি ঋকেও তাহাই সমর্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হওয়া প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ইব্রিয়দের দোভাষাত্রাক্রমে কন্যার পিত্রালয়ে যাইত এবং সেই স্থানে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত। Judges 14—8 এবং Matthew 25—6 পদে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাই। আধুনিক কালে যে প্রণালীতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, এই প্রকার বিবাহের বর্ণনাও ঋগ্বেদের ১০।৪০।১৩ ঋকে উল্লেখ আছে। "কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্" পতিগৃহে যাইবার পথ বিপদসঙ্কুল না হয় নারী এমত প্রার্থনা করিতেছে। বিবাহকার্য্য পূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছে বলিয়া "পতি" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ৯।১০১।১৪ ঋকে বর কন্যার নিকট যায় ইত্যাদি দ্বারা কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহকার্য্য হইত বুঝা যায়। কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক বরের বাড়ীতে বিবাহকার্য্য সমাধা হওয়া এই প্রাচীনতর প্রথাটি এখনও উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় (রাজবংশী) সমাজে প্রচলিত আছে।

Genesis 6—2 (আদি পুস্তক) পাদে যে "Son's of god এবং daughter's of men কথাগুলি আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। উহা অসবর্ণ বিবাহের পরিচয় জ্ঞাপক কথা মাত্র। ঠিক কোন্ সময় হইতে ইব্রিয় জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

অসবর্ণ ও সবর্ণ বিবাহ।

আব্রাহাম তৎপুত্র ইসহাকের সঙ্গে অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা পৌত্তলিক কানানীয় কন্যা বিবাহ (Genesis 24—3,4) দিতে এবং ইসহাক তৎপুত্র যাকোবকে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিতে নিষেধ (Genesis 28—1,6) করিয়াছিলেন। যাকোবের ভ্রাতা এসৌ অসবর্ণা হিত্তিয় জাতীয়া কন্যা বিবাহ (Genesis 26—34) করিয়া পিতামাতার বিরাগভাজন (Genesis 28—8) হইয়াছিলেন। ইস্রায়েলদের ব্যবস্থাকর্ত্তা যিনি অসবর্ণ ও অসগোত্র বিবাহ রহিত (Talmud 59, Exodus 34-16) করিয়া গিয়াছেন; সেই ব্যবস্থাকর্ত্তা স্বয়ং মুসাও কুশিকবংশীয়া অসবর্ণা কন্যা বিবাহ (Numbers 12—1) করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ (Exodus 34—16) হওয়া সত্ত্বেও পরবর্ত্তী কালে য়িহুদী সমাজে অসবর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অফিছসম্ভব পালেষ্টীয় কন্যার সহিত শিমসোনের বিবাহ (Judges 14) ও দাউদ রাজার হিত্তিয় জাতীয়া বৎসেবাকে (2 Samuel 11) গ্রহণ এবং সলোমনের মিসরীয় কন্যা বিবাহ (1 Kings 3) দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। Jacna 8—28 এবং Avesta Vispered 3—18 পাঠে ইহা বুঝা যায়। মনুসংহিতাদি দ্বারা পরবর্ত্তীকালে আর্য্যদের মধ্যে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া থাকিলেও বৈদিককালে সবর্ণা ও অসবর্ণ দুই প্রকার বিবাহই প্রচলিত ছিল। ১০।১৭।২ ঋকের "অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃধী সবর্ণামদহুর্ভিষতে" বিবরণকে "সবর্ণা কন্যা" দেওয়া এবং ১০।৮৫।২৩ ঋকের সবর্ণা কন্যার জন্য দূরদেশে গমন দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত ক্ষত্রিয় জাতীয়া কন্যা শান্তার বিবাহ (রামায়ণ আদিকাণ্ড ১০।৯৩) ও রাজা দশরথের মাহিষী শ্রেণী ব্যতীত "বাবাতা" ও "পরিবৃত্তা" অর্থাৎ বৈশ্য, শূদ্র, শ্রেণীর পত্নীর বৃত্তান্ত (রামায়ণ আদিকাণ্ড ১৪।৩৫) অসবর্ণ বিবাহের প্রাচীনতম প্রমাণ নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩য় পঞ্জিকার ১১শ খণ্ডের ইন্দ্রের "বাবাতা" শ্রেণীর "প্রাসহা" নাম্নী পত্নীর উল্লেখ এবং ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ন্যাবাশ্ব ঋষির সহিত নৃপবীতি রাজার কন্যার বিবাহ উপাখ্যান অসবর্ণ বিবাহের প্রাচীন প্রমাণ।

ক্রমশঃ

শ্রীআজিমউদ্দীন আহম্মদ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র।—প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়ী' নামক কবিতা। ইহার ছন্দ 'বাঙ্গালা', কিন্তু ভাষা 'চলিত' নয়। যেমন ভাব, তেমনই ভাষা নহিলে চলে না, প্রতিভা ভাবের যোগ্য ভাষাই বাছিয়া ব্যবহার করে, তাহার একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের সৃষ্টি অসম্ভব, 'বিজয়ী'র ভাষায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'সিন্ধুদলের রত্নকমল ফুটল যেন দশভরে ;
দূর গগনের শুভ্র তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।'

এ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীসুকুমার রায়ের 'জীবনের হিসাব' অত্যন্ত দুষ্পাচ্য প্রহেলিকা। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের 'লীলা' নামক ক্ষুদে কবিতাটি চারি চরণে সম্পূর্ণ—ইহাতে শিলা কেন বড় হইল, এবং মুক্তা কেন ছোট হইল, এই বিষম বরযাত্রী-ঠকানো প্রশ্ন করিয়া কবি উত্তর দিয়াছেন—

'ক্ষুদ্র যে গো ব্যর্থ নহে জানিয়ে দিতে ভাই,
বিশ্বপতি ক্ষুদ্র করে মুক্তা গড়ে তাই।'

দুটি চরণে তিনটি 'চ বৈ তু হি'—'যে গো' ও 'ভাই'। আর ক্ষুদ্রের কারণ-রহস্যও অত্যন্ত অপূর্ব। ইহা সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। এইরূপ আর একটি কবিতা মনে পড়িতেছে—'আজগুবী দুনিয়ার খেলা সর্ষির মধ্যি ভাল।' তবে এই সর্ষে-ঘটিত উচ্ছ্বাসে একটু অদ্ভুত রহস্যের সমাবেশ আছে, শিলা-মুক্তারা দ্বন্দ্বে তাহা নাই। শ্রীসীতা দেবীর 'রূপান্তর' একটি আখ্যায়িকা ; 'ছোট গল্প' নহে। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'মহর-মজদার নামাবলী' উল্লেখযোগ্য। 'পঞ্চশস্যে' দেখিলাম—'এক গেলাস ঘোল আর এক গেলাস কমলা লেবুর রস তুলনা করিলে কমলার রসে ঘোলের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পুষ্টিকর সামগ্রী পাওয়া যায়। এক গেলাস কমলার রস, পৌনে এক গেলাস খাঁটি দুধের সমান পুষ্টিকর। কলিকাতায় খাঁটি দুধ যেমন দুষ্প্রাপ্য তাহাতে কমলার রস খাইয়া দুধের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। লেবুর মধ্যে যে অম্লরস থাকে তাহা হজমের সহায়তা করে ; কমলা লেবুর মধ্যে যে মিষ্টরস থাকে তাহা সহজেই শরীরে গৃহীত হয়, হজম করিয়া লইতে হয় না। শর্করা বা জমাইবার কার্বোহাইড্রেট ছাড়া কমলার রসে শতকরা একভাগ প্রোটিন বা পোষ্টাই সামগ্রী আছে। সুতরাং কমলা লেবুর রস মুখরোচক বাদু ও পুষ্টিকর একাধারে।' 'আদর্শ গ্রাম' নামক প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে বলি।—'নাড়ারণ' ছবিখানির ছাপা দেখিয়া কিছু বুঝিবার যো নাই, চিত্র-পরিচয়ের ব্যাখ্যা দেখিয়া বুঝিতে হয়। নাড়ারণ—অর্থাৎ, চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ'। ইহা বলিলেই সকল বলা হইল। ইহাতে রস নাই, তবে কস আছে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবের 'প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব' ও শ্রীপ্রমথনাথ দত্তের 'সন্তরণে বাঙ্গালী' পড়িয়া বাঙ্গালীর মনে গৌরব-গর্ব্ব উথলিয়া উঠিবে।—এলাহাবাদের শ্রীলালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন যুগের নবীন বাঙ্গালী। সন্তরণে ইহার অদ্ভুত দক্ষতা।—সন্তরণে লালমোহন বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না।—ইনি এই শক্তি বিপক্ষের উদ্ধারে নিয়োগ করিয়া সার্থক করিতেছেন। জন্মগ্রহণ ইস্তারই যেন ইঁহার জীবনের ব্রত। লালমোহন বাবুর আদর্শ বাঙ্গালীর জীবনে সার্থক হউক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস 'বসন্তে' কতকগুলি পদ্য ছন্দে গাঁথিয়াছেন। মামুলী কথা। বসন্তের 'চরণ-পরশ লভি ফুটিল কুসুমাবলি'—এই একটি চরণই কবিতা। 'দেশের কথায় নানা অধ্যের নমস্কার আছে। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়ার 'বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল'কে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিলাম।—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থের 'প্রথম পত্র' ছড়ার হিসাবে মন্দ নয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশ,—'পিতৃমাতৃ বীরভূমি-নিবাসী পণ্ডিত সারদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের অলসোল্‌স্ কলেজের ফেলো নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এইরূপ ফেলো হইলেন। তিনি ১৯১৬ সালে গ্রীক-লাটীন ভাষায় অক্সফোর্ডের বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং পারদর্শিতা অনুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে ললনক্-বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয় হইয়াছেন। দেশে থাকিতেও তিনি কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় ঈশানবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং এম্-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয়-স্থানীয় হন।'

ভারতী। চৈত্র।—সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পাথর ফাট্ কর দরিয়া ছুটে' নামক একটি গল্প। ইহাতে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা আছে। কিন্তু হেলে ধরিবার আগে কেউটে ধরিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয়, ফলে তাহাই হইয়াছে।—গোঁড়া কল্পনার গিরি-লঙ্ঘনের চেষ্টা সকল হইতে পারে না। অপ্রকৃতকে অন্ততঃ প্রকৃতবৎ করিয়া তুলিবার শক্তি সকলের থাকে না। 'ক্ষুধিত পাষাণের' সৃষ্টি 'জ্যাঠামী'র উপাদানে সম্ভব নহে। অক্ষমতার ঠোকরে 'আদিমিক' আখ্যানবস্তুটি শুধু ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। শ্রীগুরুদাস সরকারের 'ওমারের বৌদ্ধপ্রভাব' উল্লেখযোগ্য। লেখক অনুসন্ধান করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'আঁধিয়া' গল্পটি মন্দ নহে। বোধ হয় আরও ছোট হইলে ভাল হইত। 'আধিয়া' ছোট গল্পের মহাশত্রু। ক্ষুদ্র পরিসরে কোনও বিষয়ের বিস্তারই শোভা পায় না, মানায় না। কথার বিস্তার, বর্ণনার বিস্তার, ভাবের আতিশয্য, যাহা এক কথায় সারা যায়, তাহার জন্য এক ঝুড়ি কথার সমাবেশ—ছোট গল্পে আদৌ চলে না। আর, ফ্যানাইবার প্রয়োজন সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য দেখিয়া মনে হয়, 'ফ্যানান'ই যেন রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য! শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'বসন্ত-বিলাপে' পাকা ঘুঁটী কাঁচাইয়াছেন।—

'আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুটিল ?
কেন কিংশুক ফুল চীন বাস পরে ঢাকল হয়ে উঠ্‌ল ?'

ইহার ভাষ্যোপান্ত এইরূপ। এ প্রশ্ন মৌলিক হইতে পারে। শব্দচয়নও সুন্দর। কিন্তু ইহার ভাবের ক্ষেত্র কি ?—'বসন্ত-বিলাসে' মধ্যে মধ্যে 'স্বাকামী' আছে। যথা—'খসে যাক্ ওড়নার কাঞ্চন পাড়, কুঞ্জের ঝুলনার 'পর।' তা যেন গেল, কিন্তু 'ভারতী'র উপর উড়িয়া পড়ে কেন ? কতকগুলি মিষ্ট কথার গাঁথুনীই কি কবিতা ? শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুরের বন্যা'

নামক গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'আহ্বানে' আছে,—'সেদিন তোমাদের দেশী স্কিপটি পাকিয়ে তোলবার যত্নে তখনকার প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করেছিলুম—যদিও গরুর লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি সব রকম বীর্য্যোদ্দীপক খেলা দেখাবার বাধ স্থানে স্থানে খুলে দিয়েছিলুম।' 'দেশী কিলটি পাকিয়ে তোলবার প্রথম চেষ্টা—শক্তি-সংঘ' করে। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাড়ীতে তাহাকে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি শক্তি-সংঘের প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ইহলোকে নাই।—সুচনায় শ্রীমতী সরলা দেবী শক্তি-সংঘকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, শ্রীমতী সরলা দেবীর সাহচর্য্যে নবীন কর্ম্মী যথেষ্ট উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাহাও আমাদের মনে আছে। অনেক দিনের কথা, প্রথম উদ্যমের ইতিহাস বোধ হয় শ্রীমতী সরলা দেবীর মনে নাই। 'দেশী কিলটী পাকিয়ে তোলবার * * ব্যবস্থা' সেই প্রথম।—ইতিহাসের কথা, তাই একটু টুকিয়া রাখিলাম। শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের 'পরাজয়' নামক গল্পটি ডোডের 'ফরাসী গল্পের আভাসে' রচিত। অনুবাদ না দিয়া আভাস দিলেন কেন? অনুবাদেই মনটা থাকে না, আভাসে ত 'আসলে'র অনেকটাই উপেক্ষা যায়।

সুবর্ণবণিক্ সমাচার। চৈত্র।—'জয় কৃষ্ণ কৃপাময়' নামক কবিতায় শ্রীতোষানাথ বড়াল তোটককে পৃথুলিত করিয়াছেন। ইহা ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালা নয়।

'ধনবল্লভ বেদ-বিনীত-গুণ
গুণহীন হতাখিল-ভূ-পিশুন
পিশিতাশি-নিকৃন্তন নষ্ট-রুষ
বৃষভানু-সুতা-প্রণয়াভিলষ'

পড়িলে 'ভাগব-বিজয়' মনে পড়ে। 'মাদুলনরী-বধে'র 'ক্রতিপথবাহন সাধু পুচ্ছ বিভঙ্গিরা'ও মনে পড়ে, এমন নয়। 'অঘ-দণ্ডন পণ্ডিত-দৈত্যমন' বাঙ্গালায় চলিবে না, চলিতে পারে না। বড়াল মহাশয় অনর্থক পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু বিবাহ ও নারীর অবস্থা' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের পরামর্শমত বিবাহের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'একণে সগোত্রে বিবাহ হইলে কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পিতৃবংশের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বাদ দিলেই যথেষ্ট হয়।' ইহাও কি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত? বিবাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অনেক পরামর্শ আছে। আমেরিকার কোনও কোনও ষ্টেটে আইনের দ্বারা সমাজের রুগ্ন ও অপরাধপ্রবণ মানব মানবীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিবাহই সকল ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নহে। বীজ-নির্ব্বাচনের জন্যই যে সকল বিধি সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও সমাজে তাহাদের প্রয়োজন আছে কি না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে এখন তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।—ইংরেজী কেতাবে ইউরোপের মিশ্র সমাজ সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছেন, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাপত্র বাঙ্গালায় রচ্ছ লিখিবেন না। এ সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে লোক-মতের গঠন আবশ্যক। তাহার প্রথম ও প্রধান সাধন,—বহুলপ্রচার-বিজ্ঞানের প্রচার, সেই বিজ্ঞানের ইঙ্গিত অনুসারে এ দেশে তৎসংপৃক্ত তথ্যের সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিচার। শুধু সগোত্রে বিবাহ দিবার প্রস্তাব না দিয়া, কেন সগোত্রে বিবাহ দিলে এ দেশেও 'কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই', তাহা সপ্রমাণ করুন। এ সকল বিষয়ে শুধু ধিক্কারে ও পরিহাসে ও যথোচিত উপদেশে

কোনও ফল হয় না। শ্রীযতীন্দ্রকুমার তাহা 'দেওয়ান প্রতিপালন সম্বন্ধে কয়েকটি কথায় লিখিয়াছেন,—'কারণ তাঁহাদের স্নেহভঙ্গুরতার ধারণা বহু বিদর্শনের ফলে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ সন্তানের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।' ভাষাও বুঝাইবার জন্য? এ ভাষায় কি বুঝিব? লেখকের বক্তব্য অত্যন্ত সাদাসিধা। তাহারও ভাষার আড়ম্বরে ও অসংযুক্তায় আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্রিকের 'যোগিনী' এই সবে আসরে নামিয়াছেন। এ ভাষায় গল্প ফুটিবে না। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের গ্লানি পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। তাহাতে স্বধর্মনিষ্ঠদের কি লাভ? 'দেবাশ্চরন্ত কুলে জন্ম, মদান্ধত্বং তু পৌরুষম্' স্মরণ করিলে হয় না? এক জাতি আর এক জাতিকে পদদলিত করুক, ব্রাহ্মণ হইলেও আমরা তাহা চাহি না। নিম্ন জাতি উন্নত হউক, ইহাও আমাদের কামনা। কিন্তু উচ্চ জাতিকে গালি দিয়া, বা তাহাদিগকে 'মিশ্র জাতি' প্রতিপন্ন করিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু অক্ষয়কুমার বড়াল ঋষিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া যে স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, তাহা অনেক ব্রাহ্মণেরও কামনার বস্তু। সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরাকালের ব্রাহ্মণ বর্ণোত্তম হইয়াছিলেন।—পুরাবৃত্ত, ইতিহাস ঘাঁটিয়া অদ্য বর্ণকে নীচু করিয়া কোনও বর্ণ উঁচু হইতে পারে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। বিশে শতাব্দীর ভীষণ জীবন-যুদ্ধে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' অস্বীকার করিয়া বিজয়ী হইবার কোনও আশা নাই।—ইউটোপিয়া এখনও কিছু কাল কল্পনায় কল্পলোকেই বিরাজ করিবে। মানব-সমাজ বর্ণভেদও বর্জন করিতে পারে, কিন্তু শ্রেণীভেদ, শক্তি-ভেদ, বৃত্তিভেদ, বিশেষতঃ ধনী দরিদ্রের ভেদ, মুষ্টিধনী ও শ্রমজীবীর ভেদ কবে অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহা আপাততঃ কল্পনারও অগোচর। প্রাচীন ভেদ যদি যায়, নূতন ভেদ তাহার পরিত্যক্ত সিংহাসন ও বৃত্তাসন অধিকার করিবে। বেদান্তের অভেদ কবে মানব ব্যবহারে-ক্ষেত্রে সত্যে পরিণত করিতে পারিবে, তাহা কে বলিবে? তত দিন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' ভিন্ন মানবের গতি নাই। সে যোগ্যতা-লাভের প্রথম সোপান—সঙ্ঘের সৃষ্টি, সংহতির সৃষ্টি। বিরোধে ও আক্ষরিক কলহে শক্তিক্ষয় করিলে আমরা সঙ্ঘের সৃষ্টি করিতে পারিব না। আগে জাতিভেদ চূর্ণ করিব, তাহার পরে বাঁচিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব, এমন সঙ্কল্প কোনও জাতির পক্ষেই সমীচীন নহে। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেব 'রেশমে' যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতন তথ্য নাই। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সে সমুদয়ে যাহা নাই, অথবা সে সকল নিবন্ধ লিখিত হইবার পর যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী লেখককে তাহাই লিখিতে হয়। কিন্তু এ দেশে কোনও বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ লেখকই ততটা আয়াস স্বীকার করিতে চাহেন না। ফলে, তাঁহাদের রচনা নিষ্ফল হয়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের 'দোল-পূর্ণিমা' ছাপা হইল কেন? যিনি 'হসন্তিকা' লেখেন, দোলের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিবার তিনি কে? শ্রীময়ময় লাহার 'মরালে'র আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তাহারা কি লাল-সায়রের সমর-কণের মহান দেবিয়া ছবিখানি তুলিয়াছেন? 'দেখছ কি তাই উচ্চ গ্রীবা-ধারি' কবিতা নহে; রসসম লিখিলেও তাহাতে রসের ফোয়ারা ছুটিতে পারে না। শ্রীঅমরেশ মল্লিকের 'অন্নের খনি-পরিদর্শন' শুষ্ক-চণ্ডালী ভাষায় লিখিত। শ্রীরমেন্দ্রকুমার বসুর 'মরার আমেজ' ভগ্নসমাধির যোগ্য নহে। সব টানিয়া বোনা যায়, কিন্তু

ইতর-শব্দের টানা পোড়েনে রসিকতার জেলে-কাচাও বোনা যায় না। হেহে, খিক্‌খিক্ ব্যঙ্গ উচ্চ স্তরের সামগ্রী। শক্তিশালীর কলমেই তাহা ফোটে; অক্ষমের পক্ষে রসিক হইবার চেষ্টা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর হইতে পারে না। রসিকতার উৎকর্ষই উৎভোগ্য—অপকর্ষ হওয়ারনোক্ষ।

মালঞ্চ। চৈত্র।—প্রথমেই 'বর্ষ বিদায়'। শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ এই 'বিদায়ে' কবিতার অনেক উপাদানকেই কুলায় বাতাস দিয়া বিদায় করিয়াছেন। 'পুরাতনের আজ্ঞে ভেদি নবীন মারে উঁকি।' শ্রীনলিনকুমার চক্রবর্ত্তী 'দোলো আবীর হইতে শঙ্খধর পর্য্যন্ত অনেক উপকরণের জায়মানী করিয়াছেন; কেবল যাহা আহরণ করিয়া পাওয়া যায় না, সেই 'দুর্লভ' কবিত্বের এক কণাও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি যাঁহারা লেখেন, এবং যাঁহারা ছাপেন, এই উভয়ের মধ্যে বাহাদুর কে? বেতালপঁচিশীর বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে অনায়াসে এই প্রশ্ন করিতে পারিতেন। শ্রীময়ূখনাথ মিত্রের 'সরস্বতীর ইতিহাসে' 'নূতন মিছু' আছে। সমস্ত কবিতাটি দুইবার পড়িয়া ইহার রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। যে 'নূতনের' কথা বলিতেছিলাম, তাহা এই,—'সে কি অপূর্ব্ব আকুল পুলকে ছাইল আধেক তনু'—আধেকে পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চ, অপরার্দ্ধে নাই। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে। নূতন নয়? এই চরণের শেষ আছে—'লীলা-চঞ্চল উচ্ছল জলরাশি।' কাহার সহিত ইহার অন্বয়, তাহা বলিতে পারি না। 'উচ্ছল জলরাশির' পুলক, অথবা উহাই পুলকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাও অজ্ঞেয়! কিন্তু কথা ত গাঁথা হইয়া গেল। তবে কবিতাটির নাম 'সরসীর ইতিহাস'। অতএব, আঁচে অনুমেয়, ইহার তনুই—'উচ্ছল জলরাশি', এবং তাহারই আর্দ্রিক 'আকুল পুলকে' কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবিতা বটে। কিন্তু এত কুস্তি করিয়া, রামমূর্ত্তি বা ভীমভবানী ভিন্ন আর কে কবিতার রস ভোগ করিতে পারে? 'পল্লীর প্রাণ' এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু 'কমলার পাকিশালে বামা' নামক ছবিখানির বাম দিকে দণ্ডায়মানা নারীর চোর দেখিয়া, কলা-লক্ষ্মীর প্রাণ যে ওষ্ঠ কণ্ঠাগত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শ্রীঅনীকুমার দেব 'অনশ্বর' উল্লেখযোগ্য। ইহা আর আমো ও আর ছায়ায় রচিত,—অর্থাৎ, কতক বুঝা যায়, কতক বুঝির অতীত। যেমন—'আমি সৃষ্টি, তুমি স্রষ্টা, অন্তর অমিল জানি নিরন্তর।' 'অন্তর' ও 'অমিলে'র মিল নিশ্চয়ই অনশ্বর। 'হৃদয়ের তালে মোর বিশ্ব-সুর বাঁধে মহা-মালিকার।' সে 'মহামালিকা' কি বস্তু, যাহাতে 'বিশ্ব-সুর বাঁধে'? কবিতাও আধকাল স্বপ্রকাশ। উহাকে পাঠকের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য কবিরা কোনও চেষ্টাই করেন না। এমন কি, একটু প্রসাধনের আভাসও অনেকের কবিতায় দেখিতে পাই না। বাল্মীকির স্বতঃ-উদ্গীরিত 'মা নিষাদ' শ্লোকের মত বাঙ্গালার বহু কবিতাই un-touched by hands; un-touched by brain ও কোন্ নয়? শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্রের 'ষ্টেট-ব্যাঙ্ক' নামক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি এখনও চলিতেছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চন্দ্র 'বিকাশে' ও শ্রীপ্রমথনাথ দে 'আষেষায়' ফুটিয়াছেন।—'বিকাশে' 'কুঞ্জবনে ডাকিল কোকিল, গুঞ্জরিল অলি!' কোকিল ত চিরকালই ডাকে, কিন্তু ১৩২৪ সালের শেষ মাসে নগেন্দ্রের ইন্দ্রজালে অলি অর্থাৎ ভ্রমর গুঞ্জরিয়া উঠিল। এতকাল গুঞ্জরিয়া শেষে 'ফেল-ফেরের খাতিরে' 'গুঞ্জরিল'। ইহাকে তথাকথিত ছাপাখানার ভূতের ভুল বলিতে সাহস হয় না। এ যে মৌলিকতার ও উটটার মুখ! ইহার উপর আবার 'রূপ যিনি ঘুরে ছিলেন, রূপে দিলেন ধরা।' সুতরাং 'গীতাঞ্জলি' হারিয়া

গেল। কবি প্রমথনাথ উকীল। তাঁহার মক্কেল আয়ে ত? কবিতাটি তাহাদের হাতে না পড়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'মাইত্রি' একটি চলনসই গল্প—অত্যন্ত অযত্নে লেখা। 'চলতি' ভাষার সম্বন্ধে—শুধু সাধু নয়—সুসাধু ভাষার চমৎকার 'মিল' দেখে মনে হয়, যেন 'সার্দ্দিলে ছাগলে এক ঘাটে জল খাচ্ছে।' যথা, 'শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল।' শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখুটীর 'যুদ্ধ-যাত্রী' যেন বিষম বিদ্রূপ। এ 'রাজার আহ্বান' নয়, মার আদেশ। কবির একটি কথায় আমরাও সায় দিতে পারি,—'পড়ে থাক আজ ছিন্ন বীণাটি'। বাস্তবিক, ভাঙ্গা বীণায় 'ঝান্‌ঝানানী' অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালী কলমের মুখে অনর্থক শব্দবিকৃত হইয়া, দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া লাভ কি? শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ভাষার ভাস্কর' নামক কবিতাটি উপভোগ্য। সম্পাদক কিন্তু 'পাষাণ ভাঙ্গিয়া' দিয়াছেন; ইহার পার্শ্বেই শ্রীফণিবালার প্রেমের অপচার—'বিদায়' সাজাইয়া দিয়াছেন। ইহার এক একটা লাইন পড়া দুষ্কর। 'তব কেশ-তমঃ পিছে করি ব্যাকরণ তোমার বদন।' তার পর, কল্পনার দৌড়ও পক্ষিরাজের মত!

'পাখী যদি না ডাকিত হায় তবে রাত্রি হতো নাকো ভোর,
পক্ষী কিগো সৃষ্টি বিধাতার করাইতে শুধু আঁখিলোর?'

কালিদাস বিহগানুরাগী এজন্য বা নিমলাচরণ তাহাকে প্রশ্ন না করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীকে বিব্রত করিতেছেন কেন? আশ্চর্য্য এই যে, এক জন শিক্ষিত বিক্রেতারও এই সব 'ন্যাকামী' চাপাইতে লজ্জা হয় না। আলবারিক মম্মটের ভাগিনেয় নৈষধচরিত লিখিয়া মামাকে দেখাইতে গিয়াছিলেন। মামা মম্মট নৈষধ পড়িয়া ধলিয়াছিলেন, 'বাপু হে! দোষ পরিচ্ছেদটা লিখিবার পূর্ব্বে যদি জানিতে, তোমার কাব্য হইতেই সমস্ত উদাহরণগুলি তুলিয়া দিতে পারিতাম, অসংখ্য কাব্য ঘাঁটিয়া মরিতে হইত না। চৈত্রের 'মানস' ও কবি কালিদাসের 'বিদায়ে'ও মম্মটের কাজ চলিত! সুধালার মেজর শ্রীত্রিভেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর 'উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-ভ্রমণ' উপাদেয়;—চৈত্রের 'মালঞ্চের' সর্ব্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য রচনা। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত 'কুঞ্জের ব্যথায়' আপনার 'ব্যথা'র যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়—

'নিত্য হেরি গ্রামের ঘাটে কত পল্লী-বধূ,
তাদের মুখে তাদের বুকে আছে কতই মধু;
যখন তারা কলসী কাঁকে ঘোমটা টেনে মুখটি ঢাকে
তখন আমি তাদের পানে চেয়েই থাকি শুধু।
আগুন লেগে প্রাণটা যেন বড়্‌ড করে ধূ ধূ।'

ইহা কি ছাপাইবার মত? মণিমোহন 'তাদের বুকে' মধু দেখিয়াছেন, তাহাও 'মুখের সঙ্গে'। কবির প্রাণটা পুড়িয়া ছাই হইলে একটু পবিত্র হইতে পারে। চাষারা কবিতা লেখে না, তাহারা নিশ্চয়ই পল্লীবধূদের প্রতি লোলুপ 'শ্যেন-দৃষ্টি' নিক্ষেপ করে না—বাঙ্গালার ধর্ম্মভীরু চাষার মানহানি করিবেন না। পরিণতবয়স্ক সম্পাদকের রুচিও ধন্য। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহের 'ভাঙ্গা-স্বোত্র' চলনসই, তবে দেশকালের উপযোগী।

স্বাস্থ্য-সমাচার। চৈত্র।—'আলোচনা'য় বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা, বম্বের জেলা-বোর্ডের পল্লী-স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা, মেগ, এবং ব্যবস্থাপক-সভায় মাদক-নিবারণের প্রস্তাবের

সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বিদ্যাসাগর বাঙ্ময়িকা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। 'ডাক্তার বসুর জানাটোমিক্যাল লিমিটেড' বাঙ্গালীর একটি গুরুতর অভাব দূর করিবে। কিন্তু যিনি এই অনুষ্ঠানটি সফল করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, সেই S. P. Bose Esqr কি অ্যাসিয়াটিক সোসাইটী fame-এ মহামান শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু? শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরীর 'প্রাণিজ পারা' তথ্যপূর্ণ, সুলিখিত সন্দর্ভ। ইহাতে আধুনিক বিজ্ঞানের ও প্রাচীন আয়ুর্বেদের মত বন্ধনিষ্ঠ হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ হইলে 'সোনায় সোহাগা' হয়। বর্ণে। জেলা-বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীমধুসূদন মজুমদারের রচিত ও প্রচারিত, এবং বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলীর অনুমোদিত 'ওমাউষ্ঠা' নামক ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি সম্পাদক এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা রোগ ইহার ও এইরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্যের 'কাটানটে' উল্লেখযোগ্য। 'বিবিধ সংগ্রহে' মুক্তি-ফৌজ কর্তৃক পরীক্ষিত ও গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত 'রোগের ঔষধ' মুদ্রিত হইয়াছে। এই চিকিৎসা 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র সম্পাদক মহাশয়ের অনুমোদিত কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। থাকিলে সাধারণ পাঠকের সুবিধা হইত। 'প্রশ্নোত্তর' মুলতুবী হইল কেন?

সন্দেশ। চৈত্র।—'নকল ধনস্তর' নামক মুখপত্রের ছবিখানি দেখিয়া চিত্রিত হইতে হয়। রঙ্গ প্রভৃতি সকল উপাদানই এখন দুর্লভ। ইউ-রাগ এও সল এ সময়েও এমন সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন! 'অদেশ' কাঁচা হাতের রচনা। শ্রীকুলদারঞ্জন রায়ের 'অগুভ্রত' বেশ হইয়াছে। 'কথাসরিৎসাগর' হইতে সঙ্কলিত 'মোহজ্বরের উপাখ্যান' উপভোগ্য। 'সন্দেশে' প্রাচী ও প্রতীচী, উভয় দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কল্পনার সমাবেশ থাকে। কেবল ইংরেজীর অনুবাদই 'সন্দেশে'র একমাত্র সম্বল নয়। ইহাই প্রকৃত পথ। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুরাতন লেখা হইতে এবার 'আষাঢ়ে' মুদ্রিত হইয়াছে। শিশু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য কেমন করিয়া বিজ্ঞানের কথা লিখিতে হয়, রায় মহাশয় তাহার আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। 'রাবণ রাজার দেশে' শিশুদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী। 'ধনস্তর' পাঠীর গল্প ও বিবরণ। সুলিখিত। 'দাশুর কীর্ত্তি' ও 'হিংসুটী' চয়নসই গল্প। 'শালুক বিশুক' প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি নিপুণ লেখক। বন্ধুগণও এই নিবন্ধে উপকৃত হইবেন, বোধ হয় বলিলে অপরাধী হইব না। প্রকৃতির এ সকল তথ্য—রহস্য আমাদের দেশে এখনও জনসাধারণের, শিক্ষিতসমাজেরও অজ্ঞাত। 'চোর-ধরা' পড়িয়া নিশ্চয়ই 'সন্দেশে'র ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিবে।

প্রতিভা। চৈত্র।—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের '১৩২৩ সালের বঙ্গসাহিত্য' উক্ত অব্দে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা, এবং মাসিকে প্রকাশিত বিষয়সমূহের সূচী—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। অমূল্যবাবু একটু বাছাই করিয়া, সংক্ষেপ বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, যোগাড়ের গ্রন্থগুলির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিলে বাঙ্গালী পাঠকের উপকার হইতে পারে। বর্ণানুক্রমিক সমালোচনায় কোনও বিশেষ লাভ নাই। তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন 'সাবরমতী নাম' তত্ত্বের

মন্থন করিতেছেন। আমরা সাধারণ পাঠক, অমৃতের ভিখারী। কিন্তু যে মন্থন, দুর্বোধ্যতার হলাহল উঠিতেছে। কবির ভাষায় বলি,—'বুঝি—যেন—নাহি—বুঝি, ধরিতে ধরি না, ধরা যায়।'—শ্রীযুক্ত বিলচন্দ্র ভাদুড়ীভূষণ 'রাধা' প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক মতের সমর্থন। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'বৈষ্ণব-সাহিত্য' পাকিবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। শ্রীভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরীর 'নূতন ও পুরাতন' চর্ব্বিতচর্ব্বণ। শ্রীঅবিনাশকুমার সেনের 'ইউরোপ-যাত্রা প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী' উল্লেখযোগ্য। আমাদের নদীয়ার এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে গিয়াছিলেন; রাজা রামমোহন রায় ও বিষয়ে বাঙ্গালীর অগ্রণী নহেন। ইঁহার নাম—ইতি (?) সামউদ্দীন। লেখক বলেন,—'সম্প্রতি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে শিগারফ্ নামা বিলায়ৎ (Shigarf Nama Vilayat) নামক যে একখানি পার্শি গ্রন্থ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, এ সম্মান রাজার প্রাপ্য নহে—উহা পার্শি গ্রন্থের লেখক 'ইতি সামউদ্দিন' নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকেই এ সম্মানের অধিকারী।' সামউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমার পিতার নাম তাজউদ্দিন। নদীয়া জেলার অধীন পাননর পরগণার কশবা গ্রাম আমার জন্মস্থান। আমি বহুদিন ধরিয়া নবাব মিরজাফরের সেরেস্তায় কার্য্য করিয়া পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। ইহার পরে মিরকাশীম নবাবী পদ লাভ করিলে আমি নবাব সেরেস্তার কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের অধীন কর্ম্ম গ্রহণ করি। * * * এই সময়ে বোর্ড কাইব ইংলণ্ড হইতে আসিয়া বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। ইহার পর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সাহ আলম ক্লাইবের দুরবস্থার কথা বিবৃত করিয়া এক পত্র ও বহুমূল্য উপঢৌকনসহ কাপ্তেন সুইটনকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট প্রেরণ করেন। আমি সম্রাটের পক্ষ হইতে মুন্সী-রূপে কাপ্তেনের সহকারী হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। ইংলণ্ডে যাওয়ার পাথেয়স্বরূপ রাজকোষ হইতে সম্রাটের অন্যতম মন্ত্রী নবাব মনিরউদ্দৌলা আমাকে ৪।০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যাইবার পথে সুইটনের নিকট শুনিলাম যে, যে উপহার-দ্রব্য ও পত্র লইয়া আমাদের যাইবার কথা, তাহা সাহেব আমাদের সঙ্গে আইসে নাই, বোর্ড ক্লাইব সেগুলি রাখিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। যে জন্য যাইতেছি তাহাই যখন ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিল, তখন আমার ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু তখন সমুদ্রবক্ষে, জাহাজ হইতে আর ফিরিয়া আসিবার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হইয়াই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ডে চলিলাম। এখানে পৌঁছিয়া ক্লাইবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 'আমি ইংলণ্ডে যাওয়ার পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণ ঢাকা ও চট্টগ্রামের মসলিন ব্যতীত কোন শিক্ষিত বা ভদ্র বাঙ্গালী দেখেন নাই। সুতরাং সেখানে গিয়া আমি একটী দর্শনীয় বস্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু, যাউক সে কথা। কিছুদিন পরে ক্লাইব ইংলণ্ডে আসিলেন, কিন্তু সম্রাটের পত্র বা উপঢৌকনের কথা একেবারেই গোপন করিয়া ফেলিলেন। আমি যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম, তত দিন সুইটন ও তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু বান্ধব আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে ইংলণ্ডে রাখিয়া তাঁহাদিগকে পার্শি ভাষা শিক্ষা

বিবার জন্য উচ্চ বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা আমাকে ইংরাজ-খানিকা বিবাহ করিবার জন্যও অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রস্তাবেই আমি সম্মত হই নাই। 'অবশেষে কলিকাতা কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ মাকেঞ্জির সাহায্যে জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলাম। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেক বৎসর চুপচাপ করিয়া ছিলাম। পরে ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল জন্ রাফটন্ (Colonel John Wroughten)এর সহিত পুণায় ও সাতারায় যাই।' সানউদ্দীনের জীবনের আর কোনও কাহিনী 'বিলায়ত্' নামা বিলায়তে' নাই। শ্রীরামেশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার ত্রিপদী ছন্দে 'জীবন-প্রবাহ বেয়ে কোথা চলে যাও?'—ইত্যাকার প্রশ্ন করিয়াছেন।—উত্তর—অধিকারচর্চ্চায়। শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী 'সরস্বতী' প্রবন্ধে প্রমাণ সহ বৈদিক সরস্বতীর পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের 'আগমনী'র সূতিকাগারে বিসর্জ্জন হইলে কোনও ক্ষতি হইত না। 'প্রতিভা'র পুরাতন লেখকগণ কি হাল ছাড়িয়া দিলেন?

উদ্বোধন। চৈত্র।—শ্রীস্বামী নারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' এবার 'ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানে'র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর তখন অসুস্থ। কালী-পূজার দিন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আবেশে সংগৃহীত কালীপূজার উপকরণ দিয়া, 'জয় মা' বলিয়া, ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করেন। পরে অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন।—ইহাই বোধ হয় ঠাকুরকে দেবতাবোধে অর্চ্চনা করিবার প্রথম সূচনা। —বিশ্বাসের বস্তু, বিচারের নয়। নিবেদিতার 'অর্চ্চনায় শ্রীবিবেকানন্দ' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'টলষ্টয়ের আদর্শ' সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শিক্ষাপ্রদ। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ-স্মরণে' উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যের ন্যূনা এত অধিক যে, বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা চটুকে অভিনয়ের মত। সোজা কথা ও সোজা পথ যেন সাহিত্যে বর্জ্জনীয়। বড় বড় কথায়, কাব্যের ছটায়, সমাসের ঘটায় একটা প্রচণ্ড, শূন্যগর্ভ, শালপাতাবাহী, বাক্যের ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টিই যেন সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য, এবং শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-প্রদর্শনই যেন নাগরিকতার চরম লক্ষ্য। সোজা কথাও ভাষার দোষে বোঝা যায় না। যথা,—'এইটাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্ত্তমান ভারতের আসল ভাবিবার ও সাধন করিবার দিক।' ইহাতে অন্বয় পাওয়া যায় নাই। সমস্তটা পড়িয়া বিশেষায় হইতে হয়, অথচ কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা হয় না। রাধাকমল বিবেকানন্দকে উপলক্ষ করিয়া আপনার চিন্তার জাঁক ও ভাবুকতার জমক দেখাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, ফলতঃ আসল উদ্দেশ্যটি দুর্ব্বিবিনোদন সাহিত্যিক কসরতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। স্বামী শ্রীঅমূল্যানন্দের 'অজ্ঞান বা নামা' সুলিখিত সন্দেহ। স্বামী শ্রীবাসুদেবানন্দের 'ভারতীয় শিক্ষা' চৈত্রের 'উদ্বোধনে'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শ্রীকালীপ্রসন্ন বেদের বিশেষত্বহীন 'মাধী-আহ্বান' 'উদ্বোধনে'র যোগ্য নহে। যাঁহারা কাদিনী-কাতরের মায়া কাটাইয়াছেন, তাঁহারাও কাদির মায়ায় মুগ্ধ-বস্ত্র!

খ্রীষ্ট-যজ্ঞ।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়, খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা বিদ্রূপ প্রচলিত আছে।

এই দেবতা খাওয়ার কথা আমি তুলিয়াছি। Eucharistic Sacrifice উপলক্ষে যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করা হয়, উহা খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত—উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়। এতদ্দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়; খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট হইয়া যায়; মানুষ দেবতা হইয়া যায়। আপনারা হাসিবেন ও বলিবেন, একাত্মতা সম্পাদনের এমন সহজ উপায় আর নাই; চিবাইয়া আত্মসাৎ করার মত একাত্মতা পাইবার উপায় আর নাই।

হাসিলে চলিবে না; মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানা দেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের এই উপায়টি কেবল খ্রীষ্টানের আবিষ্কার নহে। দেবতাকে আত্মস্থ করিবার এমনই একটা উপায় বহু দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক জন মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

"Sacrifice is primarily a sacramental meal at which the communicants are a deity and his worshippers, and the elements the flesh and blood of the sacred victims. Primitive tribes everywhere seem to regard themselves as related to their gods by the bond of kinship and every tribe has certain sacred animals which it regards as related to the tribal god by precisely the same bond. These sacred animals are probably a survival of the totem-stage through which all civilised races seem to have passed."

আপনারা এই totemএর কথা শুনিয়াছেন। বহু অসভ্য জাতি আপনাকে কোন না কোন জন্তুর বংশধর বলিয়া মনে করে; সেই জন্তুকে আপনার জ্ঞাতি মনে করে; তাহার পূজা করে, এমন কি আচারে ব্যবহারে সেই জন্তুর অনুকরণ করে। সেই জন্তুটার নাম টোটেম; জন্তু না হইয়া গাছপালা বা অন্য কিছু টোটেম হইতে পারে। পুরাণে বর্ণিত নাগ জাতির,

পক্ষিজাতির কথা আপনাদের মনে পড়িবে; বাসুকি, তক্ষক ইত্যাদি নাগের কথা মনে পড়িবে; সম্পাতি, জটায়ু প্রভৃতি পাখীর কথা মনে পড়িবে; বালী, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরের, জাম্ববান্ প্রভৃতি ভালুকের কথা মনে পড়িবে। বংশ প্রতিষ্ঠা যে পশু হইতে, বংশধরগণের পূজা পাওয়া সেই পশুর পক্ষে সহজ; পণ্ডিতেরা বলেন, এইরূপে বহু স্থলে পশু দেবতা হইয়া গিয়াছে। পশু এইরূপে দেবত্ব পায়, আবার অন্য দিকে মানুষ ও দেবতা জাতি সম্পর্কে সম্বন্ধ হইয়া যায়। ঐ পণ্ডিত বলিতেছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান একটা sacramental meal মাত্র; যজ্ঞের পর যাবতীয় লোকে যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করে। ইহাতে তাহারা দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। পশুবধটা যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান নহে; সকলে মিলিয়া পশুমাংস ভক্ষণটাই প্রধান অনুষ্ঠান—"The significant part of a sacrifice is not the slaying of the victim, but the sacrificial meal which follows. During this meal the life of the sacrificial animal with its mysterious nature is supposed to pass physically into the communicants, whereby the natural bond of union between the god and his clients is sacramentably confirmed and sealed. The object is always to renew and strengthen the ties of kinship and friendship between the god and his worshippers."

যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ কালের পণ্ডিতদের এই একটা থিয়োরি—এই থিয়োরির সমর্থনের জন্য বহু দেশ হইতে তাঁহারা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন; চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছেন। মতভেদেরও অন্ত নাই। এই টোটেম সম্বন্ধেই কোন পণ্ডিত বলেন, অসভ্য জাতি মাত্রেই টোটেম মানে; এ কালে যাহারা খুব সভ্য, তাহাদের অসভ্য পূর্ব্বপুরুষেরাও এক কালে টোটেম মানিত। অন্য পণ্ডিতে টোটেমের এলাকার সঙ্কীর্ণ করিতে চাহেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেজার বলিতেছেন,—"We may say broadly that totemism is practised by many savage peoples, whose complexion shades off from coal black through dark brown to red. With the somewhat doubtful exception of a few mongoloid tribes in Assam, no yellow and no white race is totemic." অর্থাৎ কালা, পিঙ্গলা ও রাঙা মানুষে টোটেম মানে, ধলা ও হলদে মানুষে মানে না। টোটেমের কথা এখন থাক; দেবতা খাওয়ার দৃষ্টান্ত দুই একটা আলোচনা করিব।

মেক্সিকোতে এক কালে নরযজ্ঞ হইত। উহাদের প্রাচীন দেবতাদের নাম উচ্চারণ ভীষণ ব্যাপার। তাহাদের একটি দেবতার নাম ছিল—হেজকাৎলি পোকাস না ঐরূপ একটা কিছু। বড় লোকের ছেলে ধরিয়া সেই দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইত। কিছুকাল ধরিয়া যোয়াকে দেবতা বলিয়া মান্য করা হইত; সে একাধারে মানুষ ও দেবতা হইত; অবশেষে তাহাকে বধ করিয়া তার মাংস সকলে বাটিয়া খাইত। মেক্সিকোতে হুইজি-পুজলি নামে আর একটি দেবতা ছিল; তাহার মন্দার মূর্ত্তি গড়িয়া সকলে খাইত, মনে করিত, দেবতার মাংস খাওয়া হইতেছে। মিশর দেশের প্রধান দেবতা অসিরিসের নাম আপনারা শুনিয়াছেন। পশু মধ্যে বৃষ অসিরিসের পার্থিব মূর্ত্তি বলিয়া পূজা পাইত। আমাদের গাভী যেমন ভগবতী, মিশর দেশে বৃষ সেইরূপ ভগবান্ ছিলেন। তবে মিশর দেশে এই দেবতাটিকে বধ করিয়া তাহার মাংস সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিত। Encyclopædia of Religion and Ethics এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "From a very early stratum of religion comes the idea of feeding on the God." গ্রীকদের মধ্যে, রোমানদের মধ্যে এইরূপ দেবতা খাওয়া প্রথা চলিত ছিল কি না, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ ঘটিয়াছে। বাদানুবাদের হেতু আছে—কেন না, গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা জোরের সহিত বলিতে চাহেন যে, এই দেবতা খাওয়া ব্যাপারটা আমাদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান; আর কোন ধর্ম্মে দেবতা খাওয়া নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহা মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, উহা সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। কাজেই দুই দলে গণ্ডগোল বাধিয়া যায়; সেই গণ্ডগোলের অন্ত হয় না। দেবতার উদ্দেশে পশু বধ, এবং সেই পশুর মাংস ভক্ষণ বহু দেশেই আছে। কিন্তু সেই পশুটা দেবতা কি না, সেই পশুর মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন কি না, উহার মধ্যে দেবতার real presence আছে কি না, সেই পশু খাইলে দেবতাকে খাওয়া হয় কি না, দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া দেবতার সহিত একতাপ্রাপ্তি ঘটে কি না, ইহা লইয়াই তর্ক উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলিতে চাহেন, এইরূপে দেবত্ব লাভের প্রার্থনা করি, কেবল আমরা। অন্যে কেবল পশু মাংস খায়—উদর পূরণের জন্য; বড় জোর দেবতার প্রসাদ পাইয়া নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করে মাত্র। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ব্যাপারটা একটা গূঢ় রহস্য,

একটা mystery; অন্য জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি ইহার অনুরূপ কিছু থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টানেরা বলিবেন, উহা শয়তানের কারসাজি।

আজি কালি Mithraism লইয়া খুব আলোচনা হইতেছে। এই মিথ্র দেবতা প্রাচীন পারসীদিগের খুব প্রাচীন দেবতা; বেদপন্থীদের প্রাচীন দেবতা মিত্রের সহিত ইনি অভিন্ন। বেদে যিনি মিত্র, আবেস্তা শাস্ত্রে তিনিই মিথ্র। আমি ইহাকে মিত্রই বলিব। বেদে ইনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম; ঋগ্বেদ সংহিতায় ইহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই বরুণ দেবতার চিরসহচররূপে দেখিতে পাওয়া যায়;—মিত্র এবং বরুণ যেন এক জোড়া দেবতা। ভট্টিকাব্যের "ইতঃ স্ম মিত্রা-বরুণৌ কিমেতৌ" এই শ্লোকটি মনে করুন। বনবাসী রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া লোকে বলাবলি করিত, এ কি, মিত্র এবং বরুণ কি স্বর্গ হইতে নামিয়া বনে বেড়াইতেছেন? সোমযজ্ঞের প্রাতঃসবনে একটা সোমাহুতি মিত্র ও বরুণ এই জোড়া দেবতাকেই দেওয়া হইত, এ কথা আগে বলিয়াছি। তাঁহারা মাদকপ্রিয় ছিলেন না; মাদকত্ব নাশের জন্য তাঁহাদের সোমরসে দধি মিশাইতে হইত। আমরা বরুণকে বরং স্মরণে রাখিয়াছি; তিনি এখন জলাধিপতি ও পশ্চিম দিকের অধিপতি; কিন্তু মিত্রকে আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে মিত্র এবং বরুণের স্থান আরও উচ্চে—বরুণ স্বয়ং অহুর মজ্দ্—অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; মিত্র তাঁহার সহচর, মর্য্যাদায় প্রায় বরুণের সমান। মিত্রদেবের মর্য্যাদা পারসী সমাজে ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি বরুণদেবের পুত্র ও চিরসহচর; পতিত মানবের প্রতি তিনি করুণাময়—মিত্র নামেই তাঁহার পরিচয়;—তিনি মানবের ত্রাণকর্ত্তা—Saviour, Redeemer, এবং Mediator হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের সহিত মিত্রদেবতার আপনারা তুলনা করিবেন।

এই মিত্র দেবতার পূজা পারসী সমাজের সীমা ছাড়াইয়া রোম সাম্রাজ্য মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজ কাল তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফিলাডেলফিয়া সহরের অধ্যাপক Groten Christian Eucharist সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিত্র পূজার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, "We can almost trace its progress along the southern and western shores of the Black Sea, up the Danube, into the forests of Germany, then down into Italy, then westward through Gaul across the channel into the land of the Britons. It followed the

Roman army and through the missionary zeal of Roman officers made its triumphant headway. The remarkable parallelism between its tenets and the doctrines of Christianity has awakened deep surprise and has led some modern students mistakenly to view Christianity as simply a revamping of Mithraism". লেখক খ্রীষ্টীয় Divinity শাস্ত্রের অধ্যাপক; তিনি বলিতেছেন, "mistakenly"; কিন্তু অনেক পণ্ডিতে জোরের সহিত বলিতে চাহেন, যে রোম সাম্রাজ্যমধ্যে খ্রীষ্ট পূজার তুলনায় মিত্র পূজার প্রসার প্রতিপত্তি অধিক ছিল; সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনও প্রথমে মিত্র পূজার পক্ষপাতী ছিলেন; পরে তিনি খ্রীষ্টান হন। তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটেরা আইনের জোরে, গায়ের জোরে, মিত্র পূজা বন্ধ করিয়া দেন। মিত্র পূজা বন্ধ করিয়া দেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মিত্র পূজার বহু অনুষ্ঠান, বহু তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; নতুবা জনসাধারণ মিত্রকে ছাড়িয়া খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিত না।

এই মিত্র পূজায় খ্রীষ্টানদের eucharistic অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে ঋত্বিকেরা রুটি ও সোমরস উৎসর্গ করিতেন। মিত্র পূজার প্রতিপত্তির সময়ে সোমরস দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার বদলে আঙ্গুরের রস জলে মিশাইয়া দেওয়া হইত। এই ব্রাহ্মণেরই ফেনাইলে মদ হয়। "They placed before the mystic a loaf and a cup full of water over which the priest pronounced the sacred formulas. This oblation of bread and water, with which they mingled wine, is compared by the Christian apologist with the Christian communion."

মিত্র পূজায় এই খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান দেখিয়া সেকালের খ্রীষ্টান ফাদারেরা চটিয়া আগুন হইতেন। তাঁহাদের দুই এক জনের কথা শুনুন। জষ্টিন মার্টার বলিতেছেন, "The wicked devils have imitated the Christian institution in the mysteries of Mithras commanding the same thing to be done. For, bread and a cup of water are placed with certain incantations in the mystic rites of one who is being initiated." টার্টুলিয়ান বলিতেছেন, "The devil, by the mysteries of his idol, imitates even the main parts of the divine mysteries. Mithra even celebrates the oblation of bread."

যীশুখ্রীষ্ট কথায় কথায় আপনার রক্তমাংসকে খাদ্যের সহিত, অন্নের সহিত, তুলনা করিতেন; এবং সেই অন্ন যে অমৃতস্বরূপ, তাহাও ঘুরাইয়া বলিতেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অন্ন-ব্রহ্মের কথা আপনাদের স্মরণে আসিবে। খ্রীষ্টের উক্তি—I am the bread of life—আমি প্রাণের অন্নস্বরূপ। He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in Me and I in him—যে আমার মাংস ভক্ষণ করে এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাহাতে অবস্থিত হই—উভয়ের একতা সম্পাদিত হয়। Except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.—যে এই মানব-সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে নাই বা রক্ত পান করে নাই, সে মৃত। খ্রীষ্ট এখানে আপনাকে মানবরূপী,—জীবরূপী—বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পুনশ্চ "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood, hath eternal life."—যে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, আমার রক্ত পান করিয়াছে, সে অমরতা পাইয়াছে।

আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। খ্রীষ্টানেরা যে রুটি আর মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাহা খ্রীষ্টের মাংস আর রক্ত; উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়; খ্রীষ্ট তাঁহাদের দেবতা; জনকেশ্বরে আর তনয়েশ্বরে কোন ভেদ নাই; উভয়েই এক আত্মা। গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, ইহা আমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান; অন্য কোন সমাজে যদি উহার অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান থাকে, তাহা শয়তানের কারসাজি—diabollcal parody. প্রশ্ন উঠে, আমাদের বেদপন্থী সমাজে ঐরূপ অনুষ্ঠান ছিল কি না? আবেস্তাপন্থী সমাজে নিশ্চয় ছিল; বেদপন্থী সমাজে ছিল কি না?

এই আলোচনার পূর্ব্বে আমার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন। আপনারা মনে করিবেন না, খ্রীষ্টান সমাজের অনুরূপ অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী সমাজের মধ্যেও ছিল, এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া আমি বৈদিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি; ইহাতে আমাদেরও গৌরব বাড়িবে। সেরূপ দুরভিসন্ধি আমার কিছুই নাই। তবে আমি এখানে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; বৈদিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন সাদৃশ্য যদি থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান আমি কর্ত্তব্যবোধ করিতেছি। সেটা না দেখাইলে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। সেই সাদৃশ্য কোথা হইতে

আসিল, কিরূপে ঘটিল, আপনারা তাহার বিচার করিবেন। আমি এই সাদৃশ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বৈদিক অনুষ্ঠানে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত, আর সোমরস দেওয়া হইত। রুটিটা পশুমাংসেরই বদলে দেওয়া হইত; সেই পশুমাংসে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না, তাহা দেখিতে হইবে। রক্ত দেওয়া বেদপন্থীর পক্ষে নিষিদ্ধ; কেন না বেদপন্থীর দেবতা রক্ত খাইতেন না; রক্ত রাক্ষসের প্রিয়। খ্রীষ্টের রক্ত অমরত্ব দিতে পারে; কিন্তু আমাদের সোমরস রক্ত নহে; উহা একবারে অমৃত। উহা পান করিলে অমৃত হওয়া যায়—দেবত্ব পাওয়া যায়। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি বলিতেছেন, "অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—আমি সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি; আমি জ্যোতি লাভ করিয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি। এই পুরোডাশ আর সোমরস দেবতাকে দিতে হইত, আর ঋত্বিকেরা যজমান সহিত ইহা ভক্ষণ করিতেন। সোমরস পান ত অমৃত পান; পুরোডাশ ভক্ষণের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, এবং খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যের সহিত ইহার কোন মিল আছে কি না, তাহাও বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানটার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক।

খ্রীষ্টজন্মের পর শওয়া তিন শ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমস্ত রোমসাম্রাজ্যে খ্রীষ্ট পূজা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এখনও মিত্র পূজাকে ঠেলিয়া উঠিতে পারে নাই। খ্রীষ্টানেরা সমস্ত সাম্রাজ্যকে কতকগুলি এলাকায় ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; এক এক এলাকা এক এক বিশপের অধীন। রোমের সম্রাট্ কাইসার কন্‌ষ্টাণ্টাইন এতদিন 'সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান' ছিলেন; তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় মিত্রকে, অন্য পাল্লায় খ্রীষ্টকে, বসাইয়া তুলনা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি খ্রীষ্টের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। খ্রীষ্ট পূজা রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে তর্ক উঠিয়াছে, এই খ্রীষ্টটি কে? ঈশ্বরের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটে, কিন্তু পিতা পুত্রে সমান কি না? উভয়ে তুল্যমূল্য কি না? পুত্র ষোল আনা ঈশ্বর কি না? ষোল আনা ঈশ্বর হইলে একেশ্বরবাদ থাকে কোথায়? খ্রীষ্টীয় সমাজে ইহা লইয়া দলাদলি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। কাইসার কন্‌ষ্টাণ্টাইন নাইসিয়া নগরে খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতি আহ্বান করিলেন—বহু পূর্ব্বে অশোক যেমন বৌদ্ধ সঙ্গীতি ডাকিয়াছিলেন সেইরূপ—নানা দেশ হইতে খ্রীষ্টান যাজকেরা আসিলেন; হাজার দুই যাজক আসিলেন, তার মধ্যে তিন শতাধিক বিশপ। যাজ-

প্রাসাদের বড় হলে তাঁহারা সারি দিয়া বসিলেন; হলের মাঝখানে উচ্চাসনে বাইবেল রক্ষিত হইল—রত্নখচিত purple robe পরিয়া স্বয়ং কাইসার সিংহাসনে বসিলেন;—আজি তিনি রোমের রাষ্ট্রগোপঃ পুরোহিতঃ—pontifex maximus. যাজকগণের ভোট লইয়া তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব মঞ্জুর করিবেন। এক দিকে Ariusএর দল; ইহাঁরা খ্রীষ্টকে ষোল আনা ঈশ্বর বলিতে নারাজ; অন্য দিকে Athanasiusএর দল; ইহাদের মতে খ্রীষ্ট ষোল আনা ঈশ্বর। আথানেসিয়সের জয় হইল। উপস্থিত যাজকগণের কোলাহলে এরায়সের দলের ক্ষীণ স্বর ডুবিয়া গেল। রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা অনুমোদন করিলেন। খ্রীষ্টের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কাইসারের আদেশ রোমসাম্রাজ্যে প্রচারিত হইল—রোমের কাইসার মানিয়া লইয়াছেন, খ্রীষ্ট পরিপূর্ণ ঈশ্বর; যে রোমান ইহা মানিবে না, সে রাষ্ট্রের শত্রু। এরায়সের রচিত পুঁথিপত্র চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়ান হইল; তাঁহার দলের যে দুই জন বিশপ স্বীকারপত্রে সহী দেন নাই, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইলেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত জন কয়েক ইউনিটেরিয়ান ছাড়া সমস্ত খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। যে ইহাতে সংশয় করে, সে খ্রীষ্টান নহে।

নাইসিয়া নগরে প্রচারিত খ্রীষ্টীয় সমাজের এই স্বীকারোক্তির নাম Nicene Creed; সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহা মানিয়া থাকেন। আপনারা জানেন, ইংরেজেরা রোমের বিশপের এলাকার বাহিরে; ইহাঁরা পোপের অধীনতা কাটিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের আমলে Church of England এর ধর্ম্ম সম্পর্কে মতামত বাঁধা যায়। ৩৯টি ধারায় তাহা বিধিবদ্ধ। উহাই ইংরেজের চার্চ্চের বিখ্যাত Thirty-nine Articles, বিশপেরা এই ধারাগুলি সঙ্কলন করেন; এবং রাণী এলিজাবেথ পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর হইলে উহা অনুমোদন করেন। মনে রাখিবেন, ইংরেজদের রাজাও ইংরেজের দেশে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত—Defender of the Faith; তবে ইংরেজদের রাজা প্রজাপ্রতিনিধিদের সম্মতি না লইয়া কিছু করিতে পারেন না। তাই এই ধারাগুলি পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর করিয়া লওয়া দরকার হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টে ভোটের দ্বারা জনকেশ্বরের সহিত তনয়েশ্বরের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, এবং আজি পর্য্যন্ত সেই সম্পর্ক বাহাল আছে।

Nicene Creed স্বীকার করিতেছেন—We believe in one God,

the Father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Word of God, God from God, Light from Light, Life from Life, true God from true God, the only begotten Son, begotten not made, of the same essence with the Father, the first-born of every creature, begotten of God the Father before all ages, through whom also all things were made, who for our salvation took flesh and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day, and ascended unto the Father, and will come again in glory.

Church of England মানিয়া লইতেছেন—There is but one living and true God, everlasting, without body parts or passions, of infinite power wisdom and goodness, the maker and preserver of all things both visible and invisible; And in unity of this Godhead there be three persons of one substance power and eternity, the Father, the Son and the Holy Ghost. The Son, which is the Word of the Father, begotten from everlasting of the Father, of one substance with the Father, took man's nature, so that two whole and perfect natures, that is to say, the Godhead and manhood, were joined together in one Person, never to be divided, whereof one is Christ, very God and very man, who truly suffered, was crucified, dead, and buried, to reconcile his Father to us and to be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men.

আপনারা দেখিলেন, ইংলিশ চর্চ্চ অনেকগুলি বিশেষণ স্পষ্টভাবে দিয়াছেন, যাহা Nicene Creedএ নাই, বা অস্পষ্টভাবে আছে। Nicene Creed প্রচারিত হইবার পর উহা আরও পল্লবিত হইয়াছিল; এইরূপ পল্লবিত আর একটা creedএর নাম Athanasian Creed; Church of England এই creedটিও মানিয়া লইয়াছেন; কাজেই উহা এতটা স্পষ্ট হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারদের মতে প্রত্যেক বিশেষণের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অখ্রীষ্টানের পক্ষে সেই তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। আমি যথাশক্তি আমাদের ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করিব। ইংলিশ চর্চ্চ বলিতেছেন, There is but one God—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; তিনিই God the Father—যো নঃ পিতা জনিতা;—তিনি living God তিনি প্রাণস্বরূপ, স উ প্রাণস্য

প্রাণঃ; তিনি everlasting—অজ বা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত; without body—অমূর্ত্ত বা মূর্ত্তিরহিত;—without parts, কলাহীন বা নিষ্কল, নিরবয়ব, অখণ্ড; without passions—শুদ্ধ, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। এই বিশেষণগুলি একত্র করিলে আমাদের ভাষাতে পাওয়া যায়—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সো বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ"—এই বাক্যের প্রায় সকল বিশেষণই খ্রীষ্টানদের ভাষায় আছে। নিষ্ক্রিয় বিশেষণটা নাই। খ্রীষ্টানেরা ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে। দিব্য বা জ্যোতির্ম্ময় বিশেষণটাও এখানে নাই, কিন্তু Nicene Creed মধ্যে আছে। বাহ্যাভ্যন্তরঃ বা সর্ব্বব্যাপী—এটাও নাই। খ্রীষ্টান ইহাতে আপত্তি করিবেন কি না জানি না। তাহার পর বলিতেছেন "of infinite power"—সর্ব্বশক্তি; "of infinite wisdom"—সর্ব্বজ্ঞ—এই দুইটি বিশেষণ আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপরিচিত। তার পরে বিশেষণ—of infinite goodness—এখানে goodnessএর অর্থ kindness—it denotes the Divine will realising itself in imparting happiness to creatures—ইহার নামান্তর Grace কৃপা বা করুণা। অদ্বয়বাদী তাঁহার পরব্রহ্মে এই বিশেষণ অর্পণে কুণ্ঠিত হইতে পারেন; কিন্তু রামানুজ স্বামী তাঁহার ব্রহ্মে, তাঁহার বাসুদেবে, অকুতোভয়ে এই বিশেষণ আরোপ করিয়াছেন—"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" "জগতমুপকারায় চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য" তিনি "অপার-কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য-ঔদার্য্য-মহৌষধি।" তৎপরে বলা হইতেছে, তিনি maker and preserver of all things, visible and invisible তিনি যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থিতিবিধাতা; অর্থাৎ তিনি ভূতযোনি—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।

জনকেশ্বরের বিশেষণগুলি আপনারা শুনিলেন। ঈশ্বরের সহিত খ্রীষ্টের সম্পর্ক স্থির করিবার জন্য খ্রীষ্টান সমাজে অনেক গণ্ডগোল হইয়াছে। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব পূর্ণ না আংশিক, ইহা লইয়াই বিরোধ। Nicene Creed যে সম্পর্ক চিরকালের জন্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বিখ্যাত Trinity তত্ত্ব, বা ত্রিপুরুষ তত্ত্ব। প্রথম পুরুষ জনকেশ্বর, দ্বিতীয় পুরুষ তনয়েশ্বর, তৃতীয় পুরুষ Holy Spirit. Trinity তত্ত্ব মতে ঈশ্বর এক হইয়াও এই তিন পুরুষ রূপে বিদ্যমান; ইহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ ঈশ্বর, অথচ ঈশ্বর তিন জন নহেন, এক জন; "The three Persons are of the same essence, power and

eternity". Each is God; in each dwells the whole fullness of the godhead. প্রত্যেকেই নিত্য, প্রত্যেকেই সর্ব্বশক্তিমান্। এইখানে এক দল বলিতেন, পুত্র পিতার সমান; আর এক দল বলিতেন, পুত্র পিতার সদৃশ। এক দলের মতে সম্পর্কের নাম homo-ousia—সমাত্মকতা, অন্য দলের মতে নাম homoi-ousia সদৃশাত্মকতা। পিতা ও পুত্র উভয়েরই একই essence, substance বা বস্তু। অথচ উভয়ের মধ্যে একটা উপাধিগত ভেদ আছে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর হইতে জাত; সকলের অগ্রে জাত; begotten of the Father, first begotten of the Father. পিতা ঈশ্বর যাবতীয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা—maker of all things; কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি maker নহেন; সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি begetter মাত্র, জন্মদাতা মাত্র। ইহার মানে এই যে, যাবতীয় ভূতের তিনি নিমিত্ত কারণ মাত্র, কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি নিমিত্ত কারণও বটে, উপাদান কারণও বটে। কুম্ভকার যেমন নিমিত্ত কারণ, সে মাটি দিয়া ঘট গড়ে; কিন্তু পিতা পুত্রের পক্ষে নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ; তিনি আপনার উপাদান হইতেই পুত্রকে জন্ম দেন।

পিতা পুত্রের জন্ম দিয়াছেন, সকলের অগ্রে জন্ম দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কবে কোন্ কালে জন্ম দিয়াছেন? খ্রীষ্টান উত্তরে বলেন, before all ages অর্থাৎ যখন কাল পর্য্যন্ত ছিল না, সেই কালে। ইহার অর্থ পুত্র পিতার মতই অনাদি ও নিত্য। পিতা যে তারিখে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সেই তারিখের হিসাব দেন, কিন্তু পুত্রের জন্মের কোন তারিখ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ফলে তিনি কালাতিগ, কালাতীত, beyond time; যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সেই কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন।

এইখানে পিতা পুত্রে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ। পিতা অনাদি ও নিত্য; পুত্রও অনাদি নিত্য, অথচ পুত্র পিতা হইতে জাত। পিতার যত কিছু উপাধি বা বিশেষণ, সমুদায়ই পুত্রে বিদ্যমান; একটা অতিরিক্ত বিশেষণ পুত্রে আছে,—তিনি পিতা হইতে জাত।

খ্রীষ্টের এই বিশেষণটি দেখিয়া আপনাদের হিরণ্যগর্ভকে মনে পড়িবে। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"—হিরণ্যগর্ভ জাত হইয়াছিলেন; অথচ তিনি সকলের অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি অগ্রজন্মা ঈশ্বর। জন্মমাত্রেই তিনি ভূত সকলের পতি হইয়াছিলেন, ভূতপতি আর

প্রজাপতি যদি এক অর্থে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজাপতিও অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা আমাদের শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। এই প্রজাপতিই ভূতসকলের স্রষ্টা—তিনি কামনা করিলেন, আর ভূতসকলের ও প্রজাসকলের সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্ট সম্বন্ধেও খ্রীষ্টান বলেন, তিনি অগ্রজন্মা পুত্র এবং তাঁহার দ্বারাই পিতা ঈশ্বর ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—through Him all things were made; খ্রীষ্টের জন্মেই সৃষ্টির আরম্ভ—His everlasting birth is the first step towards creation, and the universe of things owes its origin to Him. হিরণ্যগর্ভ যেমন ভূত সকলের পতি, খ্রীষ্টানেরাও খ্রীষ্টকে সেইরূপ ভূত সকলের পতি বলিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের চলিত বিশেষণ our Lord; আর একটা বিশেষণ King,—King of Kings or Lord of Lords; far above all authority and power and every name which is named.

আপনারা দেখিলেন, পিতা ও পুত্র সর্ব্বতোভাবে ও তুল্যরূপে পরিপূর্ণ ঈশ্বর; তবে উভয়ের মধ্যে উপাধিভেদ আছে। উভয়েই অনাদি ও নিত্য হইলেও পিতা জন্মরহিত বা অজ; পুত্র পিতা হইতে জাত এবং অগ্রে জাত। এই ভেদ সত্ত্বেও অভেদ স্পষ্ট করিবার জন্য আরও কয়েকটি বিশেষণের প্রয়োগ হয়। পুত্র পিতা হইতে জন্মিয়াছেন; কে কাহা হইতে জন্মিয়াছেন? উত্তরে বলা হয়, God from God—ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর জন্মিয়াছেন; very God from very God—পূর্ণ ঈশ্বর হইতে পূর্ণ ঈশ্বর জন্মিয়াছেন। অতঃপর বলা হয় Light from Light—পিতা জ্যোতিঃস্বরূপ, পুত্রও জ্যোতিঃস্বরূপ। Life from Life—পিতা প্রাণস্বরূপ, পুত্রও প্রাণস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের সেই সূত্র তিনটি মনে করুন—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ", "প্রাণস্তথানুগমাৎ", "অতএব প্রাণঃ"। ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি উপনিষদের বাক্য অবলম্বনে এই সূত্র তিনটি। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"অথো যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু, সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু, অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু, যদিদং বাব তদ্, যদিদং অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ"—যে জ্যোতিঃ দ্যুলোকের উপরে, বিশ্বের পৃষ্ঠে, সর্ব্বলোকের পৃষ্ঠে দীপ্তিমান্, পুরুষের অন্তঃশরীরে যে জ্যোতিঃ দীপ্তিমান্, সেই পরজ্যোতিই এই জ্যোতিঃ। ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয়, কেন না, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তাঁহার প্রভায় আর সমস্তে প্রভা দেয়, তাঁহার প্রভায় আর সকলে প্রভান্বিত হয়। কৌষীতকি

বলিতেছেন, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব"—আমি প্রাণ-স্বরূপ ও প্রজ্ঞাস্বরূপ, আয়ুঃস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ; আমাকে উপাসনা কর। ছান্দোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "কতমা সা দেবতা" ? উত্তরে বলিতেছেন, "প্রাণ ইতি হোবাচ"—তিনি প্রাণ। এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষা আর হইতে পারে না।

এই খ্রীষ্টকে যেমন Son of God বলা যায়, তেমনি ইহাঁকে Son of Man বলা হয়। Nicene Creed এই Son of Man সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলিতেছেন, Who for our salvation became flesh, and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day and ascended unto the Father. এইরূপে সংক্ষেপে খ্রীষ্টের মনুষ্য জীবনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানবের পরিত্রাণের জন্য মানব-বিগ্রহ ধরিয়া মানবের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং মানবের জন্য প্রাণ দিয়া তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থান করেন, ও পিতার সমীপে উপস্থিত হন। এই জন্য তাঁহাকে Saviour বলা হয়। Saviour শব্দের অনুবাদ আপনারা শুনিতে চাহেন? তারা-সার উপনিষদে ইহার অনুবাদ পাইবেন—অত্যন্ত পরিচিত ভাষায় অনুবাদ পাইবেন—Saviourএর অনুবাদ তারক ব্রহ্ম।

মানবরূপে বা জীবরূপে ঈশ্বরের অবতরণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। যিনি ঈশ্বররূপে অমূর্ত্ত, জীবরূপে তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বরত্ব যেমন পরিপূর্ণ, তাঁহার জীবত্বও সেইরূপ পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের সহিত তিনি যেমন একাত্মা, জীবের সহিতও তিনি তেমনি একাত্মা। একাধারে তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। মনে করিবেন না, মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণেই তিনি জীবত্ব পাইলেন; তিনি অনাদি জীব। মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণের নাম Incarnation বা মানববিগ্রহধারণ; কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতেই তিনি জীব—কেন না "He was in the flesh, as before the Incarnation, in the bosom of the Father." তিনি মানবজন্ম গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই জীবরূপে পিতার সহিত যুক্ত ছিলেন। মর্ত্ত্যভূমি হইতে তিরোভাবের পরেও তিনি এই জীবত্ব ত্যাগ করেন নাই। এইরূপে পূর্ণ ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ জীবত্ব তাঁহাতে চিরতরে মিলিত হইয়া আছে। "Two whole and perfect natures, the Godhead and the manhood, were joined together in one Person, never to be divided." এই পূর্ণ ঈশ্বরত্ব এবং পূর্ণ জীবত্বের সম্মিলনে একই Christ; ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব তাঁহাতে একাধারে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। কখনও তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে নাই বা ঘটিবে না।

ইতর জীবের সহিত এই খ্রীষ্টের সম্পর্ক কিরূপ? জীবমাত্রই ঈশ্বরের পুত্রস্থানীয় হইয়াও পুনের অধিকারে বঞ্চিত; জীবের অপরাধে উভয়ের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে। এই অপরাধের খ্রীষ্টানী নাম Sin—পাপ। অধ্যাপক ডয়সেন দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টান যেখানে বলেন পাপ, বেদপন্থী সেখানে বলেন অবিদ্যা। খ্রীষ্টান বলেন, এই অপরাধে জীব তাহার অধিকারচ্যুত হইয়াছিল—এমন কি ঈশ্বরের সহিত জীবের একটা শত্রুতা সম্পর্ক—enmity দাঁড়াইয়াছিল। পিতা করুণাময়—তিনি পুত্রগণকে কোলে টানিয়া লইতে চাহেন—নতুবা তাঁহার সোয়াস্তি নাই। জীবের পাপ এমন ভীষণ পাপ যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহা মোচন করিতে পারে না; বেদপন্থী বলিলেন, "ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পারং তারয়তি"—তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের অবিদ্যার পরপারে তারণ করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। খ্রীষ্টান বলিতেছেন—Man's sin was so great that God only could pay it; therefore one must pay it who is God and Man. Hence the necessity of the Incarnation. The son of God died for man in his own nature and thus wrought out a perfect satisfaction for his sin. Being originally in the absolute form of God, He emptied Himself of the invisible splendours of the Deity and took upon Him the form of a *bondman* and appeared in the likeness of man. জীবের তারণার্থ খ্রীষ্ট স্বয়ং জীব সাজিলেন, যাবতীয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, গর্ভাবাস জন্ম মৃত্যু দুঃখ দৈন্য সমুদয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর; I and my Father are one—আমার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য; তথাপি তিনি আপনার সমুদয় ঐশ্বর্য্য হইতে আপনাকে রিক্ত করিয়া ক্ষুদ্র জীব হইলেন। তিনি বড় হইয়াও ছোট হইলেন; তিনি মুক্ত পুরুষ হইয়াও বদ্ধ জীব—bondman—সাজিলেন। এই বদ্ধ জীব বিশেষণটা আপনারা মনে রাখুন। ক্ষুদ্র জীব সাজিয়া তিনি দীন দরিদ্রের মধ্যে জন্মিলেন। তাঁহার গৃহ ছিল না, তাঁহার উপজীবিকা ছিল না; তাঁহার স্বজনেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল; তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন; রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিল; ইতর জনে তাঁহার অঙ্গে থুৎকার দিল; তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে ধরাইয়া দিল; আর শিষ্যেরা অন্তিমকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিল;—অবশেষে দুই চোরের মাঝে ক্রসে চাপিয়া মরণযাতনা ভোগ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইতর মানবের মত দারুণ যাতনা ও দারুণতর অপমান সহিয়া এই যে মরণ, ইহাই হইল খ্রীষ্টের আত্মদানরূপ মহাযজ্ঞ। তিনি পূর্ণ জীবধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমুদয় মানবের তিনি প্রতিভূ ছিলেন; অতএব সমস্ত মানবজাতির নিত্যরূপে তিনি আপনাকে নরপশুরূপে এই পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিলেন। এ যজ্ঞে তিনিই পশু; মেষের মত তিনি যজ্ঞভূমিতে বধার্থ আনীত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে Lamb of God রূপে—ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট মেষরূপে—পরিচিত করিয়াছিলেন— বহু স্থলে তাঁহাকে মেষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জেহোবার উদ্দেশে মেষ দেওয়া হইত; তিনি সেই মেষপশুরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যজ্ঞিয় পশু। তিনি আপনাকে আপনি আহুতি দিয়াছিলেন—অন্য যাজকের প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তিনি একাধারে ঋত্বিক্ এবং পশু,—Priest এবং Victim. সমস্ত মানব তাঁহার যজমান; তিনি তাহাদের ঋত্বিক্ সাজিয়া আপনাকেই পশুতে পরিণত করিয়া আত্মাহুতি দিলেন। এই আত্মাহুতি কাহার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন? তাঁহার পিতার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন—যে পিতা-ঈশ্বরের সহিত তিনি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। মৃত্যুর পরে তিনি উত্থিত হইয়াছিলেন; মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই; মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া তিনি তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। পিতা-ঈশ্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মানবের সেই পুরোহিত মানব-যজমানের পক্ষ হইতে সেই আহুতি পিতার নিকট অদ্যাপি অর্পণ করিতেছেন—চিরকাল অর্পণ করিবেন। এই আহুতি দ্বারা জীবের পাপ মোচন হইল;—ঈশ্বরের ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা দূর হইল—জীব পুনরায় পিতার নিকট পুত্ররূপে গৃহীত হইল। উভয়ের মধ্যে atonement হইল; এই atonement অর্থে at-one-ment অর্থাৎ making at one. খ্রীষ্টানে বলিবেন, ইহা reconciliation; খ্রীষ্টেশ্বরের সন্ধিস্থাপন; বেদপন্থী বলিবেন, ইহা কেবল সন্ধিস্থাপন নহে, ইহা একাত্মতা স্থাপন। যজমান ইহাতে দেবতা হইল; জীব শিব হইল। মনে রাখিবেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই জীবের সহিত শিবের মিলন ঘটিল। এ যজ্ঞের ঋত্বিক্ স্বয়ং ঈশ্বর, আহুতির দ্রব্য স্বয়ং ঈশ্বর, এবং উদ্দিষ্ট দেবতাও স্বয়ং ঈশ্বর। প্রকৃতই ইহা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্—ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হব্যকে ব্রহ্মের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন।

বাইবেলের বর্ণনামতে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে খ্রীষ্ট সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া-

ছিলেন; লোকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সমাধি শূন্য; কোন কোন ভক্তকে তিনি এই অবসরে সশরীরে দেখাও দিয়াছিলেন। তার পরে তিনি তিরোধান করেন—স্বর্গে আরোহণ করেন। এই ঘটনার নাম Resurrection বা পুনর্জন্মলাভ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এই ঘটনা টিকে না—এই ঘটনার পক্ষে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয়, কোন ঐতিহাসিক তাহাতে তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে—এই ঘটনাকে অমূলক বলিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হয়। এই ঘটনাতে প্রতিপন্ন হইল যে, খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয়। যে মৃত্যু জীবের পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই মৃত্যুকে তিনি জয় করিলেন; যিনি অমর, তিনি ত অমর রহিলেন; মরণধর্ম্মী জীবকেও তিনি অমরতা দান করিলেন। ঈশ্বরে যে অমরতা স্বভাবতঃ বিদ্যমান, ইতর জীবও তাহাতে অধিকার পাইল। এই অমরতার প্রাপ্তি খ্রীষ্টানের salvation বা মুক্তি। এতদ্দ্বারা জীব ঈশ্বরের সমীপস্থ হইল। আমাদের ভাষায় সালোক্য বা সামীপ্য লাভ ঘটিল। ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ বা একবারে ঈশ্বরত্ব লাভ, খ্রীষ্টানের পক্ষে হয় ত বাঞ্ছনীয় নহে;—আমাদের দেশে মুক্তিপথের পথিকেরাও যেমন সাযুজ্য চাহেন না, কতকটা সেইরূপ। অমরতাপ্রার্থী খ্রীষ্টানেরা স্বর্গে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে চান,—একবারে সশরীরে স্বর্গে যাইতে চান। কোনরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে স্বর্গে যাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। মর্ত্ত্যভূমির জীর্ণবাস ত্যাগ করিয়া বিদেহ মুক্তিতে তাঁহাদের পোষায় না—তাঁহারা একবারে কলার মেকটাই সমেত সশরীরে ঈশ্বরের সালোক্য বা সামীপ্য প্রার্থনা করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কথা আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকা মধ্যেও আছে—যযাতি, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির সশরীরে স্বর্গ গমন চেষ্টার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যুধিষ্ঠির প্রায় নির্ব্বিঘ্নে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। বেদপন্থীর এই স্বর্গ কিন্তু নিকৃষ্ট লোক; ইহা ব্রহ্মলোক নহে। বেদের ভাষায় ইহা দেবগণের প্রিয় ধাম; যিনি মোক্ষার্থী তিনি ইহা প্রার্থনা করেন না। যুধিষ্ঠির সশরীরে এই স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জীবধর্ম্ম পরিহার সম্ভব নহে। যীশুখৃষ্টও ক্রসে মরণের পরে এবং সমাধি হইতে উত্থানের পূর্ব্বে একবার অধোভুবনে বা নরকে গিয়াছিলেন—Athanasian Creed ইহা স্পষ্টবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন। সত্যই তিনি নরক দর্শনে গিয়াছিলেন—নতুবা তাঁহার জীবত্ব পরিপূর্ণ হইত না। ক্ষুদ্র

জীবকে যাহা কিছু সহিতে হয়, ঈশ্বরও জীব সাজিয়া সে সমস্তই সহিয়াছিলেন।

খ্রীষ্ট দেবতাটি কে, এখনও তাহা বুঝিতে বাকি আছে কি? খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে খ্রীষ্টের যে সকল বিশেষণ আরোপ করা হয়, আমি যথাশক্তি তাহা এ দেশের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম—অনুবাদ দেখিয়া আপনারা হয় ত চমকিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে খ্রীষ্টানের ও বেদপন্থীর ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিলেন। ফলে আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বলিতে চাহি, আমাদের শাস্ত্রে যাঁহাকে জীব বলা হয়, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে তিনিই খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক। আমাদের দেশে এই সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া যেমন অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় সমাজেও সেই সম্পর্ক বুঝিতে গিয়া সেইরূপ নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল—কয়েক বৎসর ধরিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ সেই বাদ প্রতিবাদের আলোড়নে কম্পিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টীয় সমাজ শেষ পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা একবারে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ না হইলেও অদ্বয়বাদকে ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। খ্রীষ্টান মানিয়া লইয়াছেন, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি সঙ্কল্প মাত্রে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন—God said, Let there be light, and there was light ইত্যাদি। বেদান্তেও 'স ঐক্ষত' 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী এই সকল আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "সঙ্কল্পেনাসৃজৎ লোকান্"—সঙ্কল্প দ্বারাই তিনি লোকসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলে বলে, He made man after his own image—আমরাও বলি, ঈশ্বরই জীব হইয়াছেন; উভয়ের সম্পর্ক বিম্ব-প্রতিবিম্বের সম্পর্কের মত। Image শব্দের বাঙ্গলাই প্রতিবিম্ব। খ্রীষ্ট এক দিকে Son of God হইয়াও স্বয়ং true God, very God, perfect God বা মহেশ্বর বা পরমেশ্বর; অন্য দিকে তেমনি তিনি Son of Man হইয়াও perfect Man, sinless Man বা পুরুষোত্তম। উভয়েই অনাদি নিত্য, উভয়েই সর্ব্বেশ্বর, উভয়েরই ঈশ্বরত্ব পূর্ণ। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর দুই ভিন্ন পুরুষ হইলেও এবং উভয়ে সমানভাবে ঈশ্বর হইলেও ঈশ্বর এক বই দুই নহে। There is but one God, but not two Gods. খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিশিয়া রহিয়াছে, খ্রীষ্ট একাকী পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলে? খ্রীষ্টীয় সমাজে

নানা বাদ প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়াছি। Arius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন পুত্র, তখন তিনি পিতার পরে জন্মিয়াছেন; তিনি অনাদি নিত্য হইতে পারেন না। Apollonarius বলিলেন, খ্রীষ্ট একাকী এক জন পুরুষ; তিনি হয় পুরাপুরি ঈশ্বর না হয় পুরাপুরি জীব; একা তিনি উভয় হইবেন কিরূপে? বৃহদারণ্যকে তিনি উত্তর পাইতে পারিতেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"; উনিও পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ; "পূর্ণাৎ পূর্ণমুচ্যতে" পূর্ণ হইতেই পূর্ণ বাহির হইয়া থাকে—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ; Nestorius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন ঈশ্বর, অপিচ খ্রীষ্ট যখন জীব, তখন তিনি এক জন পুরুষ নহেন; এক খ্রীষ্টের মধ্যে দুই জন পুরুষ বিদ্যমান। Eutychius বলিলেন, খ্রীষ্ট এক পুরুষ; তিনি হয় ঈশ্বর, নয় জীব; একাধারে উভয় হইতে পারেন না। খ্রীষ্টীয় সমাজ পরিশেষে এ সকল মতই ত্যাগ করিল—বলিল, না, খ্রীষ্ট একই পুরুষ; তিনি যুগপৎ ঈশ্বর এবং জীব। যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব—জীবেশ্বরে কোন ভেদ নাই। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলিব? ইহার পর যখন খ্রীষ্ট নিজ মুখে বলেন, আমি আর আমার পিতা অভিন্ন;—I and my Father are one.—তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনিই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব?

এই যে ঈশ্বর, যিনি অনাদি নিত্য কালাতীত, যিনি চিরমুক্ত, তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, bondman সাজিয়াছিলেন; তিনি বস্তুতঃ ভূমা হইয়াও ক্ষুদ্র হইয়াছিলেন; আপনাকে দেশকালে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন—তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া দুঃখ তাপের অধীন হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই নরদেহেও, সেই বদ্ধ অবস্থাতেও, তাঁহার ঈশ্বরত্বের অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খ্রীষ্টান বলেন, Though he humbled Himself, He never for one moment ceased to be God. আমরাও বলি, জীব চিরমুক্ত, তাঁহার বন্ধন একটা অভিনয় মাত্র।

আপনারা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহবাদের কথা শুনিয়াছেন। এই ভাগবত মত খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতে এই মতের সবিশেষ উল্লেখ আছে; মহাভারতের ঐ অংশ খ্রীষ্টজন্মের পরে মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ কথাটা আর জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই ভাগবত

মতের নাম চতুর্ব্যূহবাদ; রামানুজ স্বামী ইহাকে চাতুরাত্ম্য উপাসনা বলিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টসমাজের Trinity বা ত্রিব্যূহবাদের অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য যে, কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, এই গণ্ডগোলের কথা আপনা হইতেই উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলেন, একই ঈশ্বর ত্রিধা অবস্থিত; তিন পুরুষরূপে অবস্থিত—Father, Son এবং Holy Ghost; অথচ এই তিন পুরুষই সমানভাবে ঈশ্বর। তিন জনই সমানভাবে নিত্য ও শাশ্বত, co-eternal, অথচ পিতা পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন, beget করিয়াছেন, এবং Holy Ghost পিতা পুত্র উভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—proceed করিয়াছেন। তর্ক উঠে যে, পুত্র যদি পিতা হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়ে নিত্য—co-eternal—হন কিরূপে? উভয়ে সমান ও পূর্ণ ঈশ্বর হন কিরূপে? Arius ও তাঁহার অনুগামীরা এই তর্ক তুলিয়া পুত্রকে পিতা হইতে খাট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বৎসর ধরিয়া তজ্জন্য বিবাদ চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিন পুরুষেরই একাত্মতা ও পূর্ণতা স্বীকৃত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র মতে এক বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম চতুর্ধা অবস্থিত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ, এই চারি ব্যূহরূপে অবস্থান করেন; ইহারা সকলেই পূর্ণ ঈশ্বর, পরব্রহ্মস্বরূপ; অথচ এক জন অন্য জন হইতে জাত। কে কোথা হইতে জন্মিলেন, তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে "পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে"। পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জন্মেন, এই সঙ্কর্ষণই জীব। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন জন্মেন, এই প্রদ্যুম্ন মন; প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্মেন, এই অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধকে লইয়া আমাদের এখন প্রয়োজন নাই; বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের সম্পর্ক দেখুন। বাসুদেব পরব্রহ্ম, কিন্তু সঙ্কর্ষণ জীব। পরব্রহ্ম হইতে জীব জন্মিয়াছেন, অথচ সেই জীবও পরব্রহ্ম। রামানুজ স্পষ্ট বলিতেছেন, "সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি", এক জন জীব, অন্য জন ঈশ্বর, জীব ঈশ্বর হইতে জন্মিতেছেন, অথচ উভয়েই ব্রহ্ম, এই একটা মস্ত হেঁয়ালি। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে হেঁয়ালি উঠিয়াছিল, ইহা সেই হেঁয়ালি। বেদবাক্য এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। বেদশাস্ত্র ও বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রায় একবাক্যে জীবকে নিত্য ও জন্মরহিত বলিয়া মানিয়াছেন। জীবের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "ন

জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোঽমৃতোঽভয়ঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। বেদপন্থী রামানুজ এই সকল বেদবাক্য ও স্মৃতিবাক্য অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তিনি বলিতেছেন, জীবরূপী সঙ্কর্ষণ যে নিত্য, সে বিষয়ে সংশয় করি না। বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি নিত্য। তবে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণের যে উৎপত্তি কথা আছে, তাহা অচেতন ভূতোৎপত্তির মত উৎপত্তি নহে। "বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিত-সমাশ্রয়-ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্দ্ধা অবতিষ্ঠতে" বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম আশ্রিতবৎসল, তিনি আশ্রিতগণের আশ্রয় হইবার জন্যই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। রামানুজ পরম বৈষ্ণব; পাঞ্চরাত্র মতকে রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। শঙ্করাচার্য্যের ভাগবতমতে অনুরাগ ছিল না। তিনি এক নিঃশ্বাসে ভাগবত মত উড়াইয়া দিলেন—বলিলেন, বেদমতে জীব নিত্য, এবং পাঞ্চরাত্র মতে জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন; যাহার উৎপত্তি আছে, সে নিত্য হইতে পারে না; অতএব পাঞ্চরাত্র মত বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। এরারসও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য।

আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টানদের জনকেশ্বরের স্থলে বাসুদেবকে ও আর তনয়েশ্বরের স্থলে সঙ্কর্ষণকে বসাইলে পাঞ্চরাত্র মতে আর খ্রীষ্টীয় মতে কোন ভেদ থাকে না। জনকেশ্বর বাসুদেব স্বয়ং; তিনি আশ্রিতবৎসল; আশ্রিতগণের উদ্ধারের জন্যই তিনি পুত্র খ্রীষ্টকে জন্ম দিয়াছেন। তনয়েশ্বর সঙ্কর্ষণ স্বয়ং, তিনি বাসুদেব হইতে জাত, অথচ বাসুদেব হইতে অভিন্ন। তিনি আবার Son of man, Perfect Man, অতএব তিনিই জীব। জীব ঈশ্বর হইতে জাত, অথচ ঈশ্বরের মতই নিত্য।

খ্রীষ্টের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। খ্রীষ্টানের ভাষা দিলাম, অথচ বেদপন্থীর ভাষায় তাহার অনুবাদ দিলাম। কিন্তু খ্রীষ্টের একটা বড় বিশেষণ সম্পর্কে এখনও কিছু বলি নাই। বাঙ্গালীয় খ্রীষ্টান একবাক্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিতেছেন—তিনি Word of God. Church of England ইহা মানিয়া লইয়াছেন—the Son which is the Word of the Father. এই বিশেষণটির মূল জোহন প্রচারিত সুসমাচার মধ্যে পাওয়া যায়—সেটা আপনারা জানেন; তথাপি আমি আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি। "In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word

was God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made." পুনরায় বলা হইতেছে, "And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth."

মিশনারিদের বাঙ্গালা অনুবাদ "আদিতে বাক্য ছিলেন" লইয়া আপনারা বিদ্রূপ করিয়াছেন; আমি Wordএর বাঙ্গালায় বাক্য বলিব না—আমি বলিব বাক্ বা শব্দ। অমনি আপনারা স্তব্ধ হইবেন। জোহনের অনুবাদে যদি আমি বলি "অগ্রে বাক্ ছিলেন অথবা শব্দ ছিলেন", অমনি আপনারা চমকিয়া উঠিবেন এবং বলিবেন, এই খ্রীষ্ট তবে ত আর কেহ নহেন; ইনি আমাদের চিরপরিচিত সেই শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতা। বেদপন্থীর সাহিত্য শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ; জোহনের বাক্যে আপনাদের কোনরূপ হেঁয়ালি ঠেকিবে না। শব্দই ব্রহ্ম; শব্দ হইতে লোকসকল সৃষ্ট হইয়াছে; শব্দই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছে; এ সকল আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত কথা। জোহনের সুসমাচার গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; ইংরেজী Word শব্দের লাটিন অনুবাদ Verbum; গ্রীক অনুবাদ Logos. স্বর্গে তিনি অমূর্ত্ত Logos; মর্ত্ত্যভূমিতে তিনি বিগ্রহবান্ Logos—Word made flesh.—শব্দব্রহ্ম স্থূল দেহ লইয়া অবতীর্ণ। এই Logos নামের পিছনে পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক পণ্ডিত হীরাক্লিটসে এই Logosকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যাহাকে ঋত বলে, ঐ পণ্ডিত Logos শব্দে তাহাই বুঝিতেন; এই ঋত দ্বারা জগৎ ধৃত আছে, উত্তম্ভিত আছে, ইহাই সেই Cosmic Law, যদ্দ্বারা নক্ষত্রগণ স্বস্থানে ধৃত আছে, গ্রহগণ আপন পথে চলিতেছে। বেদপন্থীর ভাষায় ইহা ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। বৌদ্ধেরাও ইহাকে ধর্ম্ম নাম দিয়া ত্রিরত্নের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহার অন্য নাম Psyche বা Principle of Life গ্রৌষ্টিক-দের হাতে ইনি Reasonএ বা প্রজ্ঞায় পরিণত হইয়াছেন, যে প্রজ্ঞা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধেরাও কালে ধর্ম্মকে প্রজ্ঞায় বা প্রজ্ঞাপারমিতায় পরিণত করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রিয়া সহরে ইহুদীদের জমকাল আড্ডা ছিল। সেখানকার ইহুদীরা গ্রীক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহুদীদের একটা পুরাতন সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল; ঈশ্বর বলিলেন, জগৎ হউক, আর জগৎ হইল; এখানে ঈশ্বরের বাক্য হইতে বা শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি। এই শব্দকে তাহারা Memra

বলিত। আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে ইহুদীদের এই Memra গ্রীকদের Logosএর সহিত মিশিয়া গেলেন। এই তত্ত্বের পরিণতি হইল, Philo নামক গ্রীক-ভাবাপন্ন ইহুদীর হাতে; শব্দের সহিত ধর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা মিশিয়া গেলেন; এবং জগতের কর্ত্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব এই প্রজ্ঞাত্মা শব্দ-ব্রহ্মে আরোপিত হইল। Philoর ভাষায় এই শব্দ ঈশ্বর হইতে জাত, সকলের অগ্রে জাত; তিনি আদি জীব, ইতর জীব তাঁহার প্রতিবিম্বরূপী; তিনি ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করিয়া জগদ্বিধান নিয়মিত করেন; প্রজ্ঞা তাঁহার জননী; কোথাও বা তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞাত্মা। সুসমাচার প্রচারক জোহন যে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তাঁহার শব্দ-ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন, তাহাতে কেহ সংশয় করেন না। Philo খ্রীষ্টান ছিলেন না। জোহন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে বসিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্টকেই শব্দ-ব্রহ্মরূপে প্রচার করিলেন, এবং শব্দ-ব্রহ্মের সমুদয় বিশেষণই খ্রীষ্টে আরোপ করিলেন। ঈশ্বর যে নরদেহ ধারণ করিতে পারেন, কোন জীব যে ঈশ্বর হইতে পারেন, ইহুদীর পক্ষে ইহা কল্পনাতীত। জোহন কিন্তু খ্রীষ্টের সেই দিক্‌টাতেই জোর দিলেন। তিনি অগ্রে শব্দরূপে বিদ্যমান ছিলেন; তিনি নরদেহ গ্রহণ করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন; জীবের মঙ্গলের জন্য আপনি জীবলীলার অভিনয় করিলেন। খ্রীষ্টের ক্রুসে আরোহণটাই যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গ সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ, কেন না ঈশ্বরের জীবত্ব-গ্রহণই আত্মোৎসর্গের ব্যাপার। যে বড়, সে ছোট হইলেই তাহার আত্মোৎসর্গ হইল। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে; সৃষ্টির আদি হইতেই ইহার ব্যবস্থা হইয়া আছে। খ্রীষ্টানের ভাষায় the Incarnation and the Passion, as the Sacrament of the divine Self sacrifice, were parts of the counsels of God from all eternity. The Logos before Incarnation was Man. ঈশ্বর যে জীব হইবেন, যিনি নিত্যমুক্ত, তিনি যে বদ্ধ সাজিবেন, ইহা জগৎ সৃষ্টিরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য; ইহাই তাঁহার জগতে আত্মপ্রকাশের নিগূঢ় রহস্য।

আমি তুলনামূলক আলোচনায় বসিয়াছি—পুঁথি বাঁটিয়া খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের যে তাৎপর্য্যটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। খ্রীষ্টানের মতে খ্রীষ্ট শব্দস্বরূপ, বাক্যস্বরূপ,—বেদপন্থীর ভাষায় তিনি শব্দ-ব্রহ্ম, এবং বাগ্‌দেবতা। তিনি যাহা ঈশ্বর, আবার তিনি স্বয়ং জীব। তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং জীব। মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে কোন ভিন্ন ভেদ নাই। তিনি

চিরমুক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশার্থ বদ্ধ জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহাকে খাট হইতে হইয়াছিল—যিনি মহৎ, তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছিল,—জগতের সম্মুখে আপন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্যই তিনি এইরূপে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় ইহা লীলাকৈবল্য। ইহা জাগতিক বিধান—জগৎসৃষ্টিই এই আত্ম-বিসর্জ্জন। যে সকল ইতর ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান,—ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপ ধরিয়া যে সকল ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান—যাহারা স্বকৃত পাপের ভরে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে রহিয়াছে, যাহারা সেই পাপের ভরে মৃত্যুর বশ হইয়াছে, অমরতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই অগ্রজন্মা আদি জীব এই আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা তাহা-দের পাপ নাশ করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে দেখাইলেন, যে পাপ চিরস্থায়ী নহে; খ্রীষ্টকে জানিলেই, খ্রীষ্টের স্বরূপ জানিলেই, জীবেশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিলেই, এই পাপ থাকিবে না, তখন সে অমরতার অধিকার পাইবে—তাহার স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন খুলিয়া যাইবে। যে নিত্যমুক্ত হইয়াও আপনাকে বদ্ধ মনে করে, বদ্ধবৎ আচরণ করে, সে মুক্ত হইবে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে দারুণ ব্যবধান, সে স্বেচ্ছাক্রমে কল্পনা করিয়াছে, সে ব্যবধান লুপ্ত হইবে। এ জন্য খ্রীষ্টের সহিত তাহার একাত্মতা-স্থাপন আবশ্যক। খ্রীষ্ট মানবলীলায় ক্রসের উপরে মরণাভিনয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি মরণাভিনয় দ্বারা মরণ জয়ের অভিনয় দেখাইয়াছেন; মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সেই যজ্ঞকে অঙ্গীকার করিয়া সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে। এই যজ্ঞটা, এই মৃত্যু স্বীকারটা একটা অভিনয়, মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন অভিনয়, উহা অবিদ্যা। বিদ্যা বা সত্য জ্ঞান লাভে মৃত্যু থাকে না। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর পারে আসিয়া বিদ্যার দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। এ খ্রীষ্ট যে যজ্ঞিয় পশু সাজিয়াছিলেন, সেই পশুর রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা—communion—প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের রক্ত মাংস খায়—eucha-rist খায়, খ্রীষ্টের অন্তিম আদেশ অনুসারে উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ লইয়া খ্রীষ্ট সম্পাদিত যজ্ঞের পুনরভিনয় করে—যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ দ্বারা খ্রীষ্টকে আত্মসাৎ করে, আত্মস্থ করে, খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ জীব এইরূপে মুক্তির পথে প্রেরিত হয়।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়; এই কথা লইয়া আমি আরম্ভ

করিয়াছি। ক্রুসে আরোহণের পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি শিষ্যগণের সহিত ভোজনে বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপর রুটি ও মদ ছিল। খ্রীষ্ট বলিলেন, এই রুটি আমার মাংস, এই মদ আমার রক্ত; ইহা তোমরা খাও। এই বলিয়া তিনি শিষ্যদিগকে ঐ রুটি ও মদ বাঁটিয়া দিলেন। পরদিনে তিনি পশু-রূপে ঈশ্বরের নিকট আপনাকে আহুতি দিলেন। পূর্ব্বদিনের ঐ অনুষ্ঠান পরদিনের যজ্ঞাভিনয়ের rehearsal স্বরূপ। খ্রীষ্টানেরা তাবধি ঐ রুটি ও মদ খাইয়া আসিতেছে; উহাতে সেই যজ্ঞিয় পশুর রক্ত মাংস খাওয়াই হইতেছে—ঐ যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণই হইতেছে। এই ভক্ষ্য দ্রব্যের নাম eucharist; eucharist ভক্ষণ খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তির অনুকূল, বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রাপ্তির অনুকূল, পশুর পক্ষে পশুপতিত্ব প্রাপ্তির অনুকূল। মনে রাখিবেন, খ্রীষ্ট যজ্ঞে পশু হইয়াছিলেন; ক্রুসটাই সেই যজ্ঞের যূপ। যিনি স্বয়ং পশুপতি, তিনি পশু সাজিয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিলেন, পশুরূপে মৃত্যু স্বীকার করিয়া মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন; ইতর পশুরা সেই পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া পশুপতির সহিত একাত্মতা লাভ করিবে; এইরূপে পশু জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আশ্চর্য্য যে, আমাদের দেশেও পাশুপত দর্শনের ভাষায়, শৈব সম্প্রদায়ের ও শাক্তসম্প্রদায়ের ভাষায়, পশু শব্দের অর্থ বদ্ধ জীব, পশুপতি অর্থে ঈশ্বর; পশু জন্ম হইতে অব্যাহতির নাম মুক্তি। খ্রীষ্টানের eucharist সম্বন্ধে খ্রীষ্টানের কথা না শুনিলে আপনারা হয়ত বলিয়াও মানিবেন না; তাই পুনরায় একজন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদের কথা শুনাইতেছি—"The sacrifice of Christ was once offered on the cross"—ক্রুসে আত্ম দান করিয়াই খ্রীষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন—ইতিহাসে এই একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান। "It is offered, to the Father, and to the Son, and in it our Lord offers and is offered and receives the sacrific." ঐ যজ্ঞের দেবতা জনকেশ্বর, ঐ যজ্ঞের দেবতা তনয়েশ্বর; ঐ খ্রীষ্ট স্বয়ং একাধারে ঋত্বিক্, পশু এবং দেবতা। তিনি আপনাকেই আপনার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছেন, আবার বলি, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। "On the Cross and in the Eucharist there is one Sacrifice"—ক্রুসের উপর যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, eucharist ভক্ষণকালেও সেই যজ্ঞেরই পুনরভিনয় হয়—উভয়ই এক যজ্ঞ। "He unites man with Himself and this means of reconciliation is in the Eucharist." এই হবিঃশেষ ভক্ষণেই মানব খ্রীষ্টের

সহিত মিলিত হয়—জীবেশ্বরে একতা সম্পাদিত হয়। "It is not a symbol of a sacrifice, but really a sacrifice, in which that which is offered in sacrifice is the body of Christ, and in which the moment of sacrifice is when the bread and wine are changed into His body and blood."—মন্ত্রোচ্চারণের পর যখন রুটি ও মদ খ্রীষ্টের রক্ত মাংসে পরিণত হয়, ঠিক তখনই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। "He has not ceased from His priestly office and exercises an abiding ministry in our behalf as a priest for ever"—ক্রসের উপর মহাযজ্ঞে তিনি নিজেই ঋত্বিক্ ছিলেন—কিন্তু সেই ঋত্বিক্ কর্ম্ম হইতে এখনও তিনি নিবৃত্ত হন নাই; তাঁহার পিতার নিকট সেই যজ্ঞ আজিও অর্পিত হইতেছে, এবং চিরদিন অর্পিত হইবে।

আজিকার মত আমি এইখানেই ছুটি লইতে চাহি। আজ বৈদিক যজ্ঞের কথা একবারে তুলি নাই বলিলেই হয়। আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা বলিলাম। আমি আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। বেদপন্থী সমাজে বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি দেখাইতে চাহি। আমি দেখাইতে চাহি, এই যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া বেদপন্থী সমাজ ধৃত ছিল; ধৃত ছিল কেন, এখনও ধৃত আছে। এখন শ্রৌতযজ্ঞগুলির নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি; যজ্ঞের দেবতাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি, অথচ আমাদের প্রায় অজ্ঞাতসারে আমরা যজ্ঞকে ধরিয়া আছি; যজ্ঞের তাৎপর্য্য ঠিক রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে যজ্ঞকে ধরিয়া আছি। আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, আমাদের লোকস্থিতি ও লোকযাত্রা আজি পর্য্যন্ত যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই তাৎপর্য্যটি ধরিতে না পারিলে বেদপন্থী সমাজে লোকস্থিতির গূঢ় রহস্যটি বুঝা যাইবে না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজের আগাগোড়া যে একটি অবচ্ছেদহীন সূত্র ধরিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেটি ধরিতে পারিবেন না। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ব্যাপারটি একটা symbol; সমাজ মধ্যে আমাদিগকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, কোন্ উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে, তাহারই symbol. ঐ হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠানটির গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে কয়েক বারে নানা যজ্ঞের বিবরণ আপনাদিগকে সংক্ষেপে শুনাইয়াছি—অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ শুনাইয়াছি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দুধের আহুতি দিয়া সেই

দুগ্ধ কিঞ্চিৎ খাইতে হয়; পূর্ণিমাদি ইষ্টিযাগে পুরোডাশ আহুতি দিয়া তাহার অবশেষ খাইতে হয়; পশুযজ্ঞে পশুমাংস আহুতি দিয়া তাহার কিয়দংশ খাইতে হয়; সোমযজ্ঞে সোমরস দেবতাকে দিয়া সোমরসের অবশেষ পান করিতে হয়। ইহাই হবিঃশেষ ভক্ষণ। যজমান একা খাইলে চলে না; ঋত্বিক্ ও যজমানে একযোগে খাইয়া থাকেন। এই একযোগে খাওয়াই communion. ইহা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। গৃহস্থের সহিত একদিকে সমাজের অন্যদিকে দেবতার মিলন স্থাপনই এই communion. এই অনুষ্ঠান বিনা যজ্ঞে সম্পূর্ণ হয় না—ধরিতে গেলে এই অনুষ্ঠানেই যজ্ঞের সমাপ্তি। এই সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপক তাৎপর্য্য আছে। সামাজিক জীবনে সেই তাৎপর্য্য প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই তাৎপর্য্য অনুসারে সমাজ মধ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। আমি দেখাইয়াছি, এই অনুষ্ঠান এক হিসাবে মানব-সাধারণ অনুষ্ঠান। নানা জাতির মধ্যেই ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠান eucharist ভক্ষণ। খ্রীষ্টানদের মতে এই eucharist ভক্ষণের তাৎপর্য্য আমি যথাশক্তি আজ বুঝাইয়াছি। বেদপন্থী সমাজে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে আগামী বারে চেষ্টা করিব।

খ্রীষ্টীয় সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, এবং তাহার বহু পুরাতন বেদপন্থী সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহার তুলনা করিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন। এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট ধার করিয়াছেন কি না, সে প্রসঙ্গ আমি আদৌ তুলিব না। আমি সাদৃশ্য দেখাইয়াই নিরত হইব। তার পরে আমি দেখাইতে চাহি, এই অনুষ্ঠান অথবা এই অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য্য আমাদের বেদপন্থী সমাজ কিরূপ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই ব্যাপকতা বুঝিবার সুবিধা হইবে। সুবিধা হইবে বলিয়াই আমি খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম; নতুবা খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা উত্থাপনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। খ্রীষ্টানের নিকট যাহার নাম eucharist, বেদপন্থীর নিকট তাহার নাম ইড়া। এই ইড়ার অর্থ বুঝিতে হইবে। আপনারা জানিবেন, সঙ্কীর্ণ অর্থে এই ইড়া ভক্ষণে যজ্ঞের সমাপ্তি; কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই ইড়া ভক্ষণে মানব জীবনের সম্পূর্ণতা। মানবের গার্হস্থ্য জীবন এবং সামাজিক জীবন এমন কি মানবের আধিভৌতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন, মানবের পার্থিব জীবন এবং অপার্থিব পারমার্থিক জীবন—এক কথায় সমগ্র মানব জীবনের এই ইড়া ভক্ষণেই সম্পূর্ণতা এবং

সমাপ্তি এবং সার্থকতা। ইহাই আমাদের religion এবং ইহাই আমাদের ethics. এই ইড়া লক্ষণের অর্থ এবং তৎপরতা বুঝাইয়া বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি কোথায়, বেদপন্থী সমাজের গাঁথনি কোথায়, তাহা আমি বাহির করিতে চাহি। আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমি এই পরম তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি অর্পণ করিব। আপনাদিগকে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

স্থাপত্য-শিল্প।

৬

অহঙ্কারযোজনা দ্বারা যে সর্ব্বাবস্থায় কোনও সৌধের সৌন্দর্য্যরক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা দেখা গেল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সময়ে সময়ে ইহার দ্বারা উদ্দেশ্যহানি ঘটে। এখন চিন্তা করিয়া দেখা যাউক যে, সৌন্দর্য্য কোথায়? রস্কিন্ এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। যদিও এ যুগে সে সব কথা সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে গৃহীত হয় না, তথাপি এরূপ মহান চিন্তাশীল লেখক ও শিল্পীর কথা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা তাঁহার কথার অবতারণা করিলাম। তিনি বলেন যে,—সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ফিরিলে দেখিতে হইবে যে, কোন সৌধে মানুষের ক্ষমতার মহিমা কতটা প্রকটিত, আর সৌধের অঙ্গগুলি প্রকৃতি হইতে কতটা আকৃতিগত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বিতীয় কথাটি তিনি একটু বিশেষভাবে বলিয়াছেন। প্রকৃতি-সংস্থানে যাহা আমরা সচরাচর দেখি, সেগুলির আকৃতির অনুকরণকেই রস্কিন্ সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিরাট প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনন্ত প্রকারে আকৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়; কিন্তু সবগুলিই যে সৌন্দর্য্যবিধায়ক হইবে, এমন কোনও কথাই নাই। যে আকৃতিগুলির সহিত আমাদের সতত পরিচয়, স্থাপত্যে তাহারই অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। তিনি উদাহরণস্বরূপ fret workএর কথা বলিয়াছেন; সকলেই ইহা বিদিত আছেন যে, গ্রীক্ স্থাপত্যে fret workএর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; চীনদেশীয় স্থাপত্যেও ইহা আদৃত। সাধারণতঃ পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তুর আকৃতির সহিত ইহার আকৃতিতে কোনও সৌসাদৃশ্য নাই; অধিক অবস্থায় অপ্রকাশ্য বিস্মথ (Bismuth) নামক এক প্রকার ধাতুর দানা

(crystals) বাঁধিতে আরম্ভ হইলে এই আকারের দানা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই হিসাবে রস্কিন্ 'fret করা' অশোভন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথার তেমন যুক্তিবত্তা দেখা যায় না। প্রকৃতই fret অলঙ্কার কি সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বস্থানেই অশোভন? আমি ত এরূপ মনে করি না; বোধ হয়, অনেকেই আমার সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিবেন। সৌন্দর্য্য এরূপ বাধাবাঁধি সঙ্কীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; ইহার বাসস্থান অসীম। যদি সাধারণতঃ পরিদৃশ্যমান পদার্থের আকৃতির অনুকরণই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক হিসাবে স্থাপত্যের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সমান্তরাল বা তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত সরল রেখার ত স্থাপত্যে কোনও প্রয়োজনীয়তাই দেখি না; কেন না, সাধারণতঃ দৃশ্যমান প্রকৃতি-সংস্থানের মধ্যে সরল রেখার স্থান কোথায়? সমস্তই ত প্রায় চক্ররেখার খেলা। পত্র, পুষ্প, বৃক্ষকাণ্ড, শাখা প্রশাখা, বা তাহাদের শিরা উপশিরার কোন্‌টি সরল? আকাশের কোন্ মেঘখণ্ড, পর্ব্বতের কোন্ অংশ সরল রৈখিক সীমায় আবদ্ধ? অতএব, রস্কিনের নিয়মানুসারে সরল রেখা বা তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ত ব্যবহারই চলে না। কিন্তু ইহাতে কি স্থাপত্যের বিশেষ অঙ্গহানি হয় না? মুসলমান স্থাপত্যের কথাই আপাততঃ ধরা যাউক। মুসলমান প্রাসাদের গাত্রদেশস্থ যে চতুরস্র বা আয়তাকৃতি ক্ষেত্র গাত্রদেশের শোভাবৃদ্ধি করে, তাহা ত রস্কিনের নিয়মে বিশেষ অসুন্দর হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি প্রকৃত? কোনও সৌধবিশেষের নাম করিতে চাহি না, যে কোনও সৌধই ধরা যাইতে পারে—যেমন দিল্লীস্থ হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রাস্থ ইতিমদ্দৌলার সমাধি ইত্যাদি। রস্কিনের নিয়মানুসারে প্রাচীন গ্রীক্ বা রোম্যান্ সৌধগুলি সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নহে; এমন কি, বহুপরবর্ত্তী রেণাসাঁস যুগের রোম্যান্-শাখান্তর্গত সৌধগুলিও এই বিধির আদেশে বিগতশ্রী হইয়া পড়ে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালী দেশে ব্রানাটি ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য কর্ত্তৃক কল্পিত ও নির্ম্মিত সৌধগুলির বহির্ভিত্তিতে সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র দ্বারা অলঙ্কার-সম্পাদন যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই রস্কিনের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এই সূত্রটিকে গ্রাহ্য করিবেন না।

সচরাচর দৃষ্ট পদার্থগুলির আকৃতির অনুকরণেই যদি সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়, তাহা হইলে জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির ত কোনও মূল্যই থাকে না। কিন্তু সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির সামঞ্জস্য-বিধানে ও সাবধানতার সহিত ব্যবহার দ্বারা সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনেক স্থলেই ঘটিয়াছে।

জ্যামিতিক ক্ষেত্রমাত্রই যে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, এ কথা আমি কখনই বলিব না; তেমনই সচরাচর দৃষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থের আকৃতির অনুকরণেই যে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইবে, এ কথাও অগ্রাহ্য। যদি কোনও অট্টালিকার বহির্দ্দেশে জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আদর্শস্থলীয় "দাবা" খেলার ছক্ সদৃশ কোনও অলঙ্কারের যোজনা করা যায়, তাহা হইলে তাহা কখনই সুশোভন হইবে না; তেমনই, যদি কোনও স্তম্ভকে লতামঞ্জরী বা স্ক্রুর আকারে ক্ষোদিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইবে। স্তম্ভের কার্য্য-ভার বহন করা; এই জন্য ইহার নলাকৃতি হওয়া আবশ্যক; লতামঞ্জরীর আকারে স্তম্ভের নির্ম্মাণ করিলে অনেক অর্থব্যয় হইবে সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যহানি ঘটিবে। যাঁহারা বৃন্দাবনস্থ শেঠজীর মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গিয়োটো (Giotto) কর্ত্তৃক কল্পিত ফ্লরেন্সস্থ ক্যাম্পেনাইল্ (Campanile) যাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার স্ক্রুর (screw) আকারের স্তম্ভের কখনই অনুমোদন করিবেন না, কিংবা ইটালীয় গথিক-শাখান্তর্গত মন্ট্রিল্-কেথিড্রেলের, বা বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের অন্তর্গত কেরারা কেথিড্রেলের স্তম্ভ তাঁহাদের তৃপ্তিজনক বোধ হইবে না। বিস্ময়ের বিষয় এই, রস্কিন্ শেষোক্ত কেথিড্রেলের স্তম্ভগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই উক্তির প্রতিকূল।

আমরা দেখিলাম যে, কেবলমাত্র সচরাচর দৃষ্ট স্বভাবজাত পদার্থগুলির আকৃতির অনুকরণ দ্বারাই সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না; ইহার সীমা আরও বিস্তৃত; এবং আরও দেখিলাম যে, সময়ে সময়ে এ প্রকার অনুকরণে সৌন্দর্য্যরক্ষা বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আমার মনে হয় যে, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রকৃতি, বা বিকৃতি, বা তজ্জাতীয় কোনও পদার্থের মধ্যেই নিহিত নহে; ইহা কয়েকটি মানসিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেগুলি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

মানুষ কখনও একই রকম বৈচিত্র্যবিহীন পদার্থ দেখিতে পাবে না; তাহার তৃপ্তির জন্য চক্ষু সর্ব্বদা বৈষম্যের অন্বেষণে ব্যস্ত। মনে করা যাউক, একখানি ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করা গেল, এবং তাহার বহির্ভিত্তি বর্দ্ধিতাগ্র-বর্জ্জিত এক অবিচ্ছিন্ন লম্ব ক্ষেত্রস্বরূপ কল্পনা করা হইল; দূর হইতে ইহাকে ঠিক একটি বাক্সের মত দেখাইবে; কিন্তু যদি সেই ভিত্তিগাত্রে বিভিন্নতল-নির্দ্দেশকারী হিসাবে কর্ণিসের যোজনা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা আর বাক্স বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না; এবং যদি নীচেকার কর্ণিস্ বা ষ্ট্রীং-(string)-গুলিকে সর্ব্ব উপরের কর্ণিস্ অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে

বাটীটি আরও মনোহর হইবে; এবং প্রত্যেক কর্ণিসের কয়েক ফিট্ নিম্নে যদি ক্ষীণাকারে একটি বর্দ্ধিতাংশের যোজনা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাটীটি আরও মনোজ্ঞ হইবে, ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিলাম যে, মানব-মন এক নিরবচ্ছিন্ন সমতার প্রিয় নহে; বৈষম্যই তাহার প্রীতিকর। কিন্তু বৈষম্য প্রীতিপ্রদ বলিয়া ইহার যথেচ্ছাচার মন কখনই সহ্য করিবে না; সে ইহার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অনুসন্ধান করিবে। যথেচ্ছাচারিতার বিশৃঙ্খলা যেমন বিরাট প্রকৃতির মধ্যে অশোভন ও মহানিষ্টকারী, তেমনই ক্ষুদ্র সংঘের মধ্যেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশৃঙ্খলার কোথাও আদর নাই। যেখানে আমরা বিশৃঙ্খলাকে প্রীতিপ্রদ মনে করি, সেখানে আমরা প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলা-বিন্যস্ত বৈষম্যকেই বরণ করিয়া লই। এই নিয়মেই কোনও সৌধের বৈষম্যস্থাপক ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা না দেখি, তাহা হইলে কখনই ইহারা আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে না। পূর্ব্বে উদাহরণস্বরূপ দেখাইয়াছি যে, কর্ণিসের নিম্নে ক্ষুদ্রায়তনের বর্দ্ধিতাংশের যোজনা করিলে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া এইগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন তলে, বা ভিন্ন ভিন্ন তলের ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠে, কর্ণিস্ হইতে যে কোনও দূরত্বে সন্নিবিষ্ট করিলে সৌন্দর্য্যরক্ষার আশা করা যাইতে পারে না; বৈষম্যগুলিকে একটা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। গতিবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এগুলি একটা কেন্দ্রের অভিমুখী; সুতরাং বৈষম্যগুলিকে কেন্দ্রগ স্বরূপ স্থাপিত করা উচিত। সৌধের সহিত মানব-দেহের তুলনা বেশ সঙ্গত। মনে মনে যদি চিন্তা করা যায় যে, কমনীয়কান্তি নারী বা পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যথেচ্ছভাবে ও বিভিন্নপরিমাণে শরীরে সংযুক্ত, তাহা হইলে সেই নরনারী-মূর্ত্তি রাক্ষস-রাক্ষসীর মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এ স্থলে বৈষম্য বীভৎসতার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, সৌন্দর্য্যবিধানে শুদ্ধ বৈষম্যের সন্ধান করিলে চলিবে না, তাহাদের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিও বাঞ্ছনীয়।

বিষম অংশ বা খণ্ডগুলিকে মূলের সহিত নানা উপায়ে সংযুক্ত করা যাইতে পারে; স্থূলতঃ ইহাদের মধ্যে দুইটা শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—ক্রমিক উদ্গম ও আক্রমিক উদ্গম। প্রথমটি সাধারণতঃ কোনও সৌধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে প্রযোজ্য; যেমন ভিত্তিগাত্র হইতে কোনও কর্ণিস্ উদ্গত দেখাইতে হইলে ইহাকে সর্ব্বসমক্ষে সরলরৈখিক ক্ষেত্র হিসাবে বাহির করিয়া দেওয়া হয় না। মিস্ত্রীরা প্রথমে একটী বক্র ক্ষেত্রের সূচনা করে; ইহাকে তাহারা "ছাঁদন দেওয়া" কহে।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, প্রস্তর-স্থাপত্যে কর্ণিসের এইরূপ "হালর দেওয়া" সুবিধা-জনক নহে। কিন্তু আধুনিক ইষ্টক-স্থাপত্যে যাহা সরকারী স্থপতি মিষ্টার ক্রাউচের নামাঙ্কিত বলিয়া এ দেশে অত্যধিকপরিমাণে চলিতেছে, তাহাতে আমরা কর্ণিসের ক্রমিক উদ্গমের ব্যবস্থা দেখি না। ইহা সুন্দর, কি অসুন্দর, তাহা আমি বলিতে চাহি না; পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। এইবার আমরা মানবদেহস্থ স্কন্ধের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি। দেহ-কাণ্ডের যে স্থান হইতে বাহুর উদ্গম হইয়াছে, তাহা কেমন ক্রমিকভাবে অবস্থিত, একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। বাহু ও স্কন্ধের সীমানির্দ্দেশক রেখাটি বক্র রেখা না হইয়া সরল রেখা হইলে কিরূপ অশোভন দেখাইত, তাহা একটু সামান্য প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। ঠিক এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উড়িষ্যার স্থপতিরা তাঁহাদের বিমানশেখরের অগ্রভাগটিকে একটী বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন; কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনুষ্য-দেহ-কাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা এই অংশটির নাম রাখিয়াছেন,—"ঘাড় চক্‌ড়া"।

সৌধের যে অংশগুলি ক্রমব্যতিরেকে সহসা উদ্গত দেখা যায়, সেগুলির "অক্রমিক" সংজ্ঞা দেওয়া গেল; যেমন কোনও বাটীর গাড়ীবারাণ্ডা।

সৌধের অংশগুলির স্থাপন বা যোজনা আর এক পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ইহা কি, বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা কি, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে মানবদেহ-কাণ্ডের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। আমরা দেখি যে, মস্তকের উভয় পার্শ্বেই কর্ণ রহিয়াছে, এবং বক্ষঃস্থলের উভয় দিকেই বাহু রহিয়াছে। এক্ষণে যদি মস্তকের দুই ধারে না হইয়া এক ধারে কর্ণ যোজিত হইত, এবং দুই ধারে বাহু বিন্যস্ত না হইয়া এক ধারে হইত, তাহা হইলে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবের দেহ বিকট আকারের দেখাইত। কর্ণদ্বয় বা বাহু-দ্বয়ের পরিবর্ত্তে একটী কর্ণ বা বাহু দ্বারা যে শোভার বৃদ্ধি হয় না, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, মানব-মন অঙ্গযোজনায় বৈপরীত্য দেখিবার প্রয়াসী। বৈপরীত্য শব্দের অর্থ এ স্থলে এরূপ নহে যে, দর্শক অঙ্গটির দিকে ফিরিলে ইহাকে উল্টাভাবে দেখিবেন।

বৈপরীত্য যে সর্ব্বাবস্থায় সৌন্দর্য্যের কারণ নহে, তাহা আমি symmetry ব্যাখ্যা করিবার সময় ইরেক্‌থিয়নের উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। মুখে একটী নাসিকার অবস্থানই সঙ্গত; দুইটীতে শোভার বৃদ্ধি বা বিকাশের আশা করিবার কোনও কারণ নাই; কিংবা পদদেশের সন্নিকটে আর একটী মস্তক সন্নিবিষ্ট হইলে দেহের লাবণ্য অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

চক্‌মিলান বাটী যে এত শোভন বোধ হয়, তাহার অন্যতম কারণ,—বৈপরীত্য, বা contrast। অঙ্গনের উত্তর-দক্ষিণে, বা পূর্ব্ব-পশ্চিমে যে কোনও দুই পার্শ্বেই সমোচ্চ প্রকোষ্ঠশ্রেণী অবস্থিত বলিয়া শোভার বিকাশ হইয়াছে। এক্ষণে মনে করা যাউক, অঙ্গনের সম্মুখে ঠাকুরদালান, এবং তাহার দুই পার্শ্বে অনাবৃত ভূমিখণ্ড বিস্তৃত; অর্থাৎ, সম্মুখস্থ এক সারি প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইলে অঙ্গনে পঁহুছান যায়, এবং এই অঙ্গন বা অনাবৃত ভূমিখণ্ডের বামে বা দক্ষিণে কোনও প্রকোষ্ঠ নাই, এবং সম্মুখেই ঠাকুরদালান অবস্থিত; কোনও অট্টালিকা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইলে ইহাকে যে নিতান্ত সৌন্দর্য্যবিহীন দেখাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই।

বৈপরীত্যের কথা বলিতে গিয়া আর একটী বিষয় মনে আসিতেছে; তাহা এই যে, কোনও সৌধের বহির্বর্দ্ধিতাংশ বা moulding গুলির যোজনায় আমরা যে বৈপরীত্য ভাবের পরিচয় পাই, তাহার সকলগুলির সহিত ক্রমিক উদ্গমের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে স্থির করেন। এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করা যাউক যে, ইংরাজী অক্ষর Sএর আকারের কোনও mouldingএর যোজনা করা গেল; ইহাতে একটী বক্র রেখাকে আর একটী বক্র রেখার উপর উল্টাভাবে স্থাপিত করা হইল। ইহা কিন্তু বৈপরীত্যের উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইবে না; ইহা "ক্রমিক উদ্গম"-বিশেষ। একটী বক্র রেখা হইতে আর একটী বক্র রেখা ক্রমিক নিয়মানুসারে উদ্গত হইয়াছে। একটী বক্র রেখার উপর আর একটী বক্র রেখা স্থাপিত না করিয়া যদি রেখাদ্বয়কে পাশাপাশি স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে যে আকারের রেখা কল্পিত হইবে, তাহাতেই বৈপরীত্য প্রদর্শিত হইবে। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি; অনেকের ধারণা যে, কোনও বক্র রেখার পার্শ্বে আর একটী বক্র রেখা স্থাপিত হইলেই বৈপরীত্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। বৈপরীত্য বা contrast ব্যাপারে দুইটী বা অনেকগুলি একই আকারের বা সমস্থানব্যাপী বক্র রেখার ব্যবস্থা থাকা উচিত। জ্যামিতিক ভাষায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে যে, যে বিন্দুতে দুইটী বক্র রেখা মিলিয়াছে, সেই বিন্দু হইতে উভয়ের দুইটী স্পর্শিনী রেখার (tangent) অঙ্কন করিলে যেন তাহারা পাদরেখার (X axis) সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে।

আমরা দেখি যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র ছন্দের (Rhythm)

লীলা। দার্শনিক পণ্ডিত Herbert Spencer সর্ব্বপ্রকার গতিকেই ছন্দানুবর্ত্তিনী (Rhythmical) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থাপত্যের সৌন্দর্য্যবিধানে এই ছন্দের রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বের কথা বলিতে আমি ছন্দেরই আভাস দিয়াছি। যদিও এক্ষণে অনেকে সঙ্গীতের তাল, মান প্রভৃতির লোপসাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহা দ্বারা ছন্দেরই রক্ষা সাধিত হয়। এই যে ছন্দ, যাহা বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয়; অতএব কোনও বস্তুতে ইহার অভাব দেখিলে যে তাহা অশোভন বোধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কোনও বাটীর বহির্দ্দেশে দেখিলাম যে, স্তম্ভের শ্রেণী চলিয়াছে। ইহাতে আমরা মুগ্ধ হই কেন? মুগ্ধ হই এই জন্য যে, চক্ষুর আরাম হয়; এ আরামের কারণ ছন্দের উত্তেজনা, বা আবেগময়ী শক্তি। মাঝে মাঝে দেখি যে, আমার একবৎসরবয়স্ক শিশু পুত্র অর্থহীন "নাম্নু নাম্নু" শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দের কারণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখি যে, শিশুটি এই শব্দটির পুনঃপুনঃ আবৃত্তিজনিত ছন্দের আবেগময়ী শক্তিতে মুগ্ধ হয়। জ্ঞানহীন ভল্লুককেও এইরূপে আমরা "ঠুমুক ঠুমুক" নাচের ছন্দে আবিষ্ট করাইয়া আনন্দ উপভোগ করি। সঙ্গীতের ছন্দ যেমন সময়ের সমতাজ্ঞাপক, স্থাপত্যের ছন্দও তেমনই স্থানসমতাজ্ঞাপক। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা বলিতে পারি যে, কোনও সৌধের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতে হইলে তাহার অঙ্গগুলির যোজনা বা অবস্থান ব্যাপারে যেন ছন্দোরক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে।

সাধারণতঃ সরল রেখা অপেক্ষা বক্র রেখা দ্বারা শোভার অধিকতর বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, সরল রেখা দ্বারা দিব্য সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। এ কথার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি।

সৌন্দর্য্যবিধায়ক বক্র রেখাগুলি নানা আকারের হইতে পারে; বৃত্ত বা বৃত্তাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকারের বক্রতা-নির্দ্দেশক রেখার কল্পনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বৃত্তাংশ অপেক্ষা যে সমস্ত রেখার বক্রভাব মধ্যে একটী ক্রমিক ভাব বর্ত্তমান, অর্থাৎ যে সমস্ত রেখা ক্রমশঃ বক্র হইয়াছে, তাহারা অধিকতর সুন্দর। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যস্থাপত্যের উদাহরণগুলির মধ্যে

* First Principles. (Edited by William and Norgate)—p. 215.

উড়িষ্যার মন্দিরে উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, এ হিসাবে পাশ্চিমাত্য অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তের মন্দিরগুলি অধিকতর মনোজ্ঞ। মুসলমান স্থাপত্যেও এ বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আলেয়াবাদস্থ সিদি সায়েদের মস্জিদের জালায়ার কারুকার্য্য যিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। গুজরাটে আরও অনেক প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও পরীক্ষণ হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে যাহা Early Plantagenet এবং Later Plantagenet রীতি বলিয়া কথিত, তাহার জানালাগুলি যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমরা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক হিসাবে সরলরৈখিক ক্ষেত্র ও বক্ররৈখিক ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাইব। Westminster Abbey রূপ যে বিশাল ও সুবিখ্যাত সৌধগুলি বহু বর্ষ ধরিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের বিভিন্নাংশে এই দুইটী বিভিন্ন রীতির কেমন সুন্দর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহা দ্বারা আমরা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দুইটী পদ্ধতির আপেক্ষিক উৎকর্ষ বেশ বুঝিতে পারি। Westminster Abbeyর Tracery windowর কথা স্মরণ করিতে গিয়া মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় স্থাপত্যের Tree of Jesse নামক এক প্রকার সৌন্দর্য্যবিধায়ক শিল্পকার্য্যের কথা স্মরণে আসিতেছে। দ্রাক্ষাবৃক্ষের ক্রমিক বক্র শাখা-প্রশাখা হইতে কেমন কৌশলের সহিত ডেভিড্, সলোমন্ হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃক্রোড়স্থ ঈশার মূর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পুরাতন বাটী।

১

দিবাবসানে দুই বন্ধু একত্র মাঠ ভাঙ্গিয়া মল্লিকপুর গ্রামের দিকে যাইতেছিল। ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ। পথে লোকালয় বিরল। কেবল ধান্যক্ষেত্র, এবং বহু দূরে মল্লিকপুরের পুরাতন দেবালয়ের শুভ্র চূড়া একটী বৃহৎ নটবৃক্ষের পার্শ্বে সেই গ্রামখানির অতীত কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছিল।

এমন সময় আকাশে একটা পাখী উড়িয়া গেল।

'টি-টি—হুইট্—টি-টি—হুইট্!'

উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। 'ওটা কি পাখী নরেন?' দ্বিতীয় বন্ধু নরেন্দ্র চিন্তা করিয়া বলিল, 'বোধ হয় চাতক।'

প্রথম বন্ধু বিনোদলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমাদের দেশের মহৎ দোষ যে, কেহ কোনও বিষয়ের ঠিক খবর দিতে পারে না। আমাকে এক জন একটা জঙ্গলা গাছ দেখিয়ে বলেছিল, "এই তমাল।" কিন্তু পরে জানা গেল যে, তমাল আমাদের দেশে খুব কম। যে পাখীটাকে তুমি "চাতক" বল্‌ছ, সেটা চাতকও নয়, ভরতপক্ষীও নয়। ওটা বোধ হয় "খঞ্জন" পাখী।'

নরেন্দ্র। তুমি এক জন জীবতত্ত্ববিৎ, আর আমি পাড়াগেঁয়ে মূর্খ। আমি পক্ষিকুলের বড় একটা সন্ধান রাখি না।

বিনোদ। রাখা উচিত। গ্রামের সঙ্গে সহরের বিশেষ তফাৎ এই যে, গ্রামে পশু পক্ষীর বাস বেশী। সহরে মানুষ বেশী। আমার মতে, পশু পক্ষীর সঙ্গে ভাল আলাপ পরিচয় না হ'লে মানুষ চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এরাই নানাবিধ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ।

নরেন। (হাসিয়া) আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমি প্রতিবাসীদের খবর ভাল ক'রে সংগ্রহ করব।

উভয়েই যুবা। উভয়েই সুশ্রী। বিনোদলাল এক জন 'বিলাত-ফেরত' প্রতিভাশালী ব্যারিষ্টার। নরেন্দ্র গ্রাম্য জমীদার। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যায় আসে। শৈশবে উভয়ে একত্র স্কুলে ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিল।

বিনোদের পিতার সেই গ্রামে সামান্য একটু বিষয়-আশয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিনোদের মাতা কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। তিনি বিনোদকে লিখিয়াছিলেন,—'বাবা, মধ্যে মধ্যে পৈত্রিক ভদ্রাসনটা দেখ, যেন একেবারে ভূমিসাৎ না হয়।' কিন্তু বিলাত হইতে ফিরিয়া তিন বৎসরের মধ্যে বিনোদ তাহা দেখিয়া উঠিতে পারে নাই। একটা কারণ, বিনোদের মাতা বৃদ্ধা। তাঁহাকে দেখিতে বিনোদ মধ্যে মধ্যে কাশীধামে যাইত। আর একটা কারণ, বিনোদের স্ত্রী শিমলা পাহাড়ে তাহার পিতার সঙ্গে থাকিত। বিনোদ সেখানেও বৎসরে একবার করিয়া যাইত। আরও কারণ ছিল। বিনোদের পশার খুব জমিয়াছিল। বন্ধু বান্ধব জুটিয়াছিল। অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয় করিবার পক্ষে কলিকাতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান।

সম্প্রতি নরেন্দ্রের সহিত তাহার খুল্লতাতের হাইকোর্টে একটা মামলা বাধিয়া যাওয়াতে বিনোদের উপর সেই মামলা চালাইবার ভার অর্পিত হইয়া-

ছিল। প্রথম কাজ, সেই গ্রামখানির সীমা নির্দ্দিষ্ট করা। দ্বিতীয়, উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করা। এইবার সুবিধা পাইয়া বিনোদ নরেনকে সঙ্গে লইয়া মল্লিকপুরে উপস্থিত।

বিনোদ। আমার জন্ম এইখানে, সেটা বোধ হয় শুনে থাক্‌বে; বাল্য-কালের কতকগুলো কথা আমার এখনও মনে আছে। প্রথম, ঐ টি-টি-হুইট্ পাখীর ডাক্; দ্বিতীয় মন্দিরের পাশে ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ। তোমরা ও আমরা যেমন কলিকাতায় তীর্থযাত্রা করি, সেই রকম অনেক গ্রামের পাখী ঐ বটগাছে এসে একত্র হ'ত। তাদের অঙ্গভঙ্গী, নানা রকম কলরব, দ্বন্দ্ব ও সখ্যভাব এখনও আমার বেশ মনে আছে। বোধ হয়, তারা গ্রাম্য-জীবনে বিরক্ত হ'য়ে মধ্যে মধ্যে সেই গাছে সংসারের দ্বন্দ্বময় কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার ক'রে আপনাদের ধন্য মনে কর্ত্ত। এটা অবশ্য জীবের স্বভাব। ক্রমশঃ খুব জমকালোর মধ্যে ঢুকে পড়্‌তে না পার্লে, জীবনের সার্থকতা বুঝা যায় না। তাতে দুই একটা ধাক্কা খেতে হয়, সেও কবুল।

নরেন। সে কথা ঠিক। তৃতীয় জিনিসটা কি?

বিনোদ। কালো একটা বেরাল। তার জীবনের সার্থকতা কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারতুম না। তবে সে চুরী কর্ত্তে খুব মজবুত ছিল। চুরী করা যে পাপ, সে সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান নিশ্চয় ছিল না। কিন্তু চুরী করা যে খুব বাহাদুরীর কাজ, এবং তার মধ্যে যে বিজ্ঞানের অনেক সত্য নিহিত আছে, তা সে সময় অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। আমাদের পুরাণো বাড়ীতে থাক্‌বার ঘর একটাও আছে ত?

নরেন। আছে। আমি পরিষ্কার ক'রে রেখেছি।

বিনোদ আহ্লাদসহকারে বলিল, 'বেশ!'

২

একটা বিশ্ববিশ্রুত কথা আছে—'স্বর্গ'। অনেকে জন্মভূমিতে সে কথার প্রয়োগ করে। কেন?

ধর্ম্মশাস্ত্র বলে যে মানব স্বর্গবিচ্যুত কুমার। ঈশ্বরের অংশ। স্বর্গ প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু জন্মভূমি বাস্তব—প্রত্যক্ষ পদার্থ। যেখানে জীব জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই তার মুক্তি সম্ভব। যদি অবস্থায় অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়ায়, হয় ত এক দিন তাহাকে সেখানে আসিতে হইবে।

ভাঙ্গা ও জীর্ণ বাটীতে আসিয়া বিনোদ তার হাট কোটগুলি একটা

পুরাতন সিন্দুকের উপর রাখিয়া দিল। এক জন ভৃত্য বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর নাম কি রে?'

ভৃত্য। বনমালী। আমার বাপ্ কর্ত্তার খান্‌সামা ছিলেন। আপনি আমার দাদাবাবু।

বিনোদ মনে মনে ভাবিল, 'এ লোকটার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। দশ বৎসর পরে রাষ্ট্রতন্ত্রে এটা থাকিবে কি না সন্দেহ।' (প্রকাশ্যে) আমাদের একটা কালো বেরাল ছিল, সেটা কোথায়?

বনমালী। সেটা নাই। তাহার বাচ্ছা আছে।

বিনোদ। বাচ্ছাটা কোথায়?

বনমালী। ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ীতে।

নরেন। তুমি কি এই সব কথা নিয়ে সময় কাটাবে? আমাদের কাছারী-বাড়ী এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ পথ। সেখানে তোমার জন্য সব প্রস্তুত।

বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, 'নরেন, তুমি এখন যাও। আমি রাত্রি ন'টার সময় সেখানে গিয়ে খাব। পাল্কী পাঠিয়ে দিও। আমি ততক্ষণ চারি দিকে বেড়াব।

নরেন চলিয়া গেলে বিনোদ তাহাদের পুরাতন বাটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে বসিল। পুষ্করিণীতে জল নাই বলিলেও হয়। পার্শ্বে একটা অদ্ভুত রকম বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ। পুষ্করিণীর পাড়ে বহুবর্ষসঞ্চিত ছাইভস্ম। দুইটী গৃহের কপাট নাই। অঙ্গন আগাছা ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের উদ্যানে ঘোর অন্ধকার, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

বিনোদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কি অন্বেষণ করিতে লাগিল।

বনমালী। দাদাবাবু! কি খুঁজ্‌ছেন?

বিনোদ। আমি কতকগুলো চামেলী ফুলের গাছ এখানে লাগিয়েছিলুম, সেগুলো কই?

বনমালী। সেগুলোর শেকড় আছে, তবে অন্ধকারে বের করা শক্ত।

বিনোদ অবলীলাক্রমে সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিল।

'কাল প্রাতঃকালেই এগুলোতে জল দিতে হবে। মরলে স্বর্গে যেতে হয় জানিস্?'

বনমালী। হাঁ।

বিনোদ। সেখানেও আমাদের বাসস্থানের এই রকম অবস্থা। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণরা জল নিয়ে তর্পণ করে।

বনমালী। যদি জল শুকিয়ে যায়?

বিনোদ। তুই মস্ত দার্শনিক দেখ্‌ছি! আচ্ছা তোকে ব'লে দিই। জল শুকিয়ে গেলে পুষ্করিণীর সংস্কার ক'রে আবার জল দিতে হয়। তোকে আরও ভাল ক'রে বাড়িয়ে বুঝিয়ে দেব এখন। তুই একটা মশারীর যোগাড় কর্।

বনমালী। ভট্টাচায্যি মশাইয়ের বাড়ীতে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের দানের সেই মশারী এখনও আছে।

বিনোদ। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, পিতৃশ্রাদ্ধের একটা সার্থকতা আছে। ভট্টাচায্ না থাক্‌লে আজ এই মশার উপদ্রব এড়ানো দায় হয়ে পড়্‌ত।

বিনোদ মুক্তপদে একখানা মোটা ধুতি পরিধান করিয়া প্রতিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য খট্টাঙ্গে শয়ন করিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে দ্বাপরের হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণী একমনে তাহার সহিত একটা পুরাতন চরকায় যজ্ঞোপবীতের সূতা কাটিতেছিলেন। হঠাৎ আগন্তুককে দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাবা?'

বিনোদ। আমি ৺হরিনাথ বসুর পুত্র—শ্রীবসানাথ বসু।

ব্রাহ্মণী। ওমা! সে কি কথা!

ভট্টাচার্য্য খট্টাঙ্গ হইতে উঠিয়া বসিলেন।

বহু দিন রাত্রিকালে তিনি খট্টাঙ্গ ছাড়িয়া কখনও উঠেন নাই। পাছে বৃদ্ধকালে কোনও বিপদ ঘটে, তাই ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তোমার উঠে কাজ নাই, শুয়ে থাক্, এ আমাদের বিনোদ।'

ভট্টাচার্য্য গর্জ্জিয়া বলিলেন, 'আমার চশমাখানা নিয়ে এস। ওরে বিমলা! কোথায় গেলি রে, পুঁথির মধ্যে চশমাখানা রেখেছি, খুঁজে নিয়ে আয়!'

গর্জ্জনে ভট্টাচার্য্য-গৃহ কম্পিত হইল। একটী ষোড়শী নতমুখে চশমাখানি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার রূপে গৃহের ক্ষীণ দীপালোক উজ্জ্বল হইল।

ভট্টাচার্য্য। বিনোদ, বিনোদ—বাবা নিকটে এস। বিমলা বিবাহের সময় তুমি দু'শ' টাকা পাঠিয়ে দেবে বলেছিলে, মনে আছে? সেই বিমলা তোমার সম্মুখে। কিন্তু বাবা, বিবাহ এখনও ঘ'টে উঠে নাই।

বিনোদ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিল। বিমলা স্নেহভরা চক্ষুতে বিনোদকে দেখিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ খট্টাঙ্গে বিনোদকে বসাইলেন। বিমলা পান সাজিতে গেল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় এসে নেমেছ? সৌমা কোথায়? মার পত্র পেয়েছ?'

৩

বিনোদ। আমি আমাদের পুরাণো বাড়ীতে নেমেছি। রাত্তিরে সেখানেই থাকব।

বিমলা পান সাজিয়া বিনোদের হস্তে দিল। 'আজ আমাদের বাড়ীতে খেতে হবে।'

কন্যার সগর্ব্ব নিমন্ত্রণ শুনিয়া ব্রাহ্মণ একটু ফাঁপরে পড়িলেন। প্রথমতঃ, বিনোদ বিলাত-ফেরত; দ্বিতীয়তঃ, বিনোদের রসনার উপযোগী আহার তাঁহার গৃহে কোথায়?

কিন্তু বিনোদ তাঁহাকে চিন্তা করিবার সময় দিল না। 'আমি বিলাত-ফেরত', জান ত?'

বিমলা। তাতে কি আসে যায়?

বিনোদ। শুনেছি, স্বর্গে বিলাত-ফেরতের স্থান নাই। যদি থাকে, তবে আমার জন্য খাবার প্রস্তুত কর।

বিমলা। 'আপনি কি খেতে ভালবাসেন?

বিনোদ। যদি মনের কথা বল্‌তে হয়, তবে আমার পছন্দ—খুব মোটা চালের ভাত, কড়াইয়ের ডাল, ডাঁটা চচ্চড়ী, কই বাছের ঝাল ও অবশেষে একটু টক্, আর দুটো সন্দেশ।

বিমলা খুব আনন্দিত হইয়া হাসিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'বাবা, আমরা গরীব, বাস্তবিক ও ছাড়া আর কোনও যোগাড় নাই। তোমার কি ও সব ভাল লাগ্‌বে?'

ব্রাহ্মণী। তুমি ছেলেবেলা ওগুলো ভালবাস্‌তে। বোধ হয়, তাই মনে পড়েছে?

বিনোদ। অনেকটা তাই। যখন আমি কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে, তখন আমাদের সঙ্গে সেখানে এক জন ভারতবর্ষের লোক ছিল। হঠাৎ সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়্‌ল, তার দুদিন পরেই মারা গেল। মরবার আগে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, "দাদা! কিছু খেতে ইচ্ছা হয় কি?" সে সজলনয়নে কণ্ঠ-শ্বাসের জোরে বল্‌লে, "মৌরলা মাছের অম্বল।" আমরা অনেক কষ্টে গোটা

কতক ছোট মাছ সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সে বেচারা মরণের সময় ব্যক্ত করলে যে, তাতে পৌরাণিক মাছের স্বাদ নাই। হয় ত জন্মভূমির মাছটুকু পেলে তার স্বর্গে গিয়ে শান্তি হ'ত, কিন্তু কপালে ছিল না।

ভট্টাচার্য্য। দেখ বাবা! ধর্ম্ম কেমন জিনিস! মরণকালেও সঙ্গ ছাড়তে চায় না। এটুকু এ দেশের লোক এখনও বুঝতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণী। ক্রমে বুঝবে। এই যে এখন আমরা চরকায় সূতা কাটি, সেগুলি দশ নম্বরের। তার এক বাণ্ডিলের দাম ছিল দু টাকা, পাঁচখানা কাপড় ও তিন খানা শাড়ী হ'ত। এখন তার দাম দশ টাকা। দেশে ধর্ম্ম থাকলে কি কাপড়ের এত দাম বাড়ে, না হাটে লুটপাট্ হয়? এখন আমরা তুলোর চাষ তুলে দিইছি। বেরালেয় খাবার মত দুটুকুও মেলে না।

গৃহিণীর বিড়ালবাৎসল্য দেখিয়া বিনোদের 'কালো বেরালে'র কথা মনে পড়িল।

বিনোদ। মা, আমাদের সেই কালো বেরালের বাচ্চাটা কোথায়?

মা শব্দ কি মধুর! বিনোদ বোধ হয় মার কথা ভাবিতেছিল, তাই হঠাৎ সেই মধুর কথাটা উচ্চারিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী অশ্রু মুছিলেন।

বিমলা তখন খুব নিকটে আসিয়া বলিল, 'বিনোদ দাদা! সে কালো বেরালটা এখন আমি পুষি। তার গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দিইছি। এখন ঘণ্টার জন্য সে চুরী ক'রে খেতে পারে না।'

বিনোদ হাসিল। 'এটা সভ্যতার চরম সীমা। কিন্তু যারা চালাক্ হয়, খুব আস্তে আস্তে ঘণ্টার রব এড়িয়ে চুরী করে। সহরে আমরা সেই জন্য বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধি না। চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।'

বিমলা। এখন সেটা দেখতে খুব চমৎকার! আপনি বৌদিদির জন্য সিমলা পাহাড়ে পাঠিয়ে দিন।

বিমলা ইহা বলিয়া তাহার সপ্তবর্ষপালিত বিড়ালকে বিনোদের নিকট লইয়া আসিল। বোধ হয়, বিনোদের সঙ্গে তাহার কোনও অপূর্ব্ব সম্বন্ধ ছিল। বিড়াল নিঃশব্দে বিনোদের অঙ্কে গিয়া বসিল।

দ্বন্দ্ব কোলাহলময় সংসারের একটা বিজন কোণে সেই শান্তিময় কুটীরে বসিয়া বিনোদ কয়েক দিন পরে যে আনন্দ লাভ করিতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

নরেন কাছারীবাড়ী হইতে পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিল। বিনোদ ফিরাইয়া দিল। 'বাবুকে বলিও, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আমার খাবার তৈয়ারী হবে।'

তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারের পর বিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের মশারীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। 'আজ রাত্তিরে যদি সেটা একবার দেন, তবে মশার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাই।'

ভট্টাচার্য্য। নিশ্চয়। ব্রাহ্মণী! সে মশারীটা কোথায়?

ব্রাহ্মণী। সেটা লুকিয়ে রেখেছি। আজ কাল এখানে চোরের ভয় খুব।

সেই অন্ধকার রাত্রিতে পিতৃশ্রাদ্ধের মশারী স্কন্ধে, মিষ্টার বসু, এম-এ, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল বিজন আম্রকানন ভেদ করিয়া পুরাতন বাস্তভিটায় প্রবেশ করিলেন। বনমালী তাহার পুরাতন প্রভুপুত্রের পদসেবা করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিল। মশারী সত্ত্বেও বিনোদের নিদ্রার একটু ব্যাঘাত হইয়াছিল; কেন না, বিনোদ স্বপ্ন দেখিতেছিল।

৪

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া আমাদের দেশে একটা নূতন বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। বিধবা এবং বৃদ্ধ ৺কাশীধামে আশ্রয় লইয়া থাকে (ব্রাহ্মণ)। পরিবারের রাজা ও রাণী এবং তদীয় পুত্র কলত্র কলিকাতায় বাস করে, এবং মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয় করিতে দেওঘর, মধুপুর, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে ধনুর্ব্বাণ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় (ক্ষত্রিয়)। মাতুল, খুল্লতাত প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন দেশে বাস করিয়া নানাবিধ সাধু ও অসাধু উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে (বৈশ্য)। এক দল নীরবে চক্ষু মুদিয়া কলিকাতার বাটী পাহারা দেয়, এবং রোগ হইলে ডাক্তার ডাকিয়া আনে, এবং রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে (শূদ্র)।

পুরাতন বাস্তভিটার উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিনোদ তাহার মাতাকে একবার দেশে আসিতে পত্র লিখিল। মিসেস্ বসুর পিতাও সিমলা হইতে 'দিগ্বিজয়ী' কন্যাকে পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অচিরাৎ গ্রামে একটা 'হুলস্থূল' পড়িয়া গেল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় চরাচর যেমন শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, সকলে মনে করিল, সেই রকম একটা কিছু অবশ্যম্ভাবী।

বিনোদ ধনশালী। বিনোদের বন্ধু মল্লিকপুরের জমীদার। মামলা জিতিলে নরেন্দ্র বিনোদের সহিত একত্র হইয়া মল্লিকপুর নূতন করিয়া পত্তন করিবে। নরেন চট্টোপাধ্যায় সেই আশায় এখনও বিবাহ করে নাই। সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গল। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইবে। যৌথকারবার ও সমবায়-সমিতির সৃষ্টি করা হইবে। গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আসিবে। আর কাহাকেও মাইনাইন খাইতে হইবে না। কৃষির উন্নতিসাধন করা হইবে। গ্রামে অনেক-

গুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। নৈতিক উৎকর্ষের জন্য সকলের চরিত্রের অনুসন্ধান ও আলোচনার নিমিত্ত একটা গুপ্ত সমিতির অনুষ্ঠান করা হইবে। শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষার আগার নির্ম্মাণ করা হইবে। এই রকম নানাবিধ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হইয়া সকলে পথে ও মাঠে কানাঘুষা আরম্ভ করিয়া দিল।

বিনোদ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া জমীদারদিগের সম্পত্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়াছিল। উভয় পক্ষের বিবাদের কোনও মীমাংসাই হয় নাই। তবুও সাত দিন ধরিয়া বিনোদ একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ এক জন পত্রবাহক একখানা পত্র লইয়া বিনোদের হস্তে দিল।

'টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন ষ্টেশনে বসিয়া আছি, গাড়ী পাল্কী কিছু নাই। যত লোক আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমাকে ঘিরিয়া আছে এবং দৃষ্টিশর বর্ষণ করিতেছে। ভীষ্মদেবের মত আমি শরশয্যায় কাতর।—কোহিনূর।'

দেখিতে দেখিতে ষোল জন বাহক একটা পাল্কী লইয়া ছুটিয়া গেল। দুই ঘণ্টার পর কোহিনূর (মিসেস্ বসু) ভদ্রাসনের নিম্ববৃক্ষের তলে আশ্রয় লইল।

বিনোদ স্ত্রীকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এই আমাদের পুরাতন বাড়ী।

কোহিনূর। আমার অনেক দিনের সাধ,—এই রকম জায়গায় এসে দিন কতক কাটাই। চিরজীবন হ'লেও হানি নাই। তবে—

বিনোদ। তবে কি?

কোহিনূর। তবে আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। আমি যে রকম ক'রে পত্তন করব, তাতে তুমি বাধা দিতে পারবে না।

বিনোদ। আমার সে ইচ্ছা মোটেই নাই। ইচ্ছা হ'লে তুমি দোতালা ক'রে নিতে পার।

কোহিনূর। আমি ঐ নিমগাছের উপর একটা ঘর বেঁধে তপস্যা করব।

বিনোদ। তাতে আপত্তি নাই। মধ্যে মধ্যে একবার নীচে এসে দেখা দিও। এখন আহারের একটা বন্দোবস্ত কর। সরঞ্জাম প্রস্তুত।

কোহিনূর একখানা বঁটী লইয়া রন্ধনশালায় পটল কুটিতে বসিয়া গেল। বিনোদ একখানা চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ভৃত্য বনমালী সন্ধ্যা বাটিতেছিল।

কোহিনূর। সে কথাটা কত দূর?

বিনোদ। নরেন ম্যানাকে বিবাহ করিতে রাজি।

ম্যানা কোহিনূরের ছোট ভগ্নী। বিনোদের বড় ইচ্ছা, ম্যানার সহিত নরেনের বিবাহ হয়। তবে প্রকাণ্ড বাধা এই যে, নরেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু নরেন্দ্র বলিয়াছে যে, সে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

কথাটা শুনিয়া কোহিনূর সানন্দে বলিল, 'খুব চমৎকার! আজ নরেনকে খেতে বল।'

বিনোদ। তবে আমি একখানা চিঠি লিখি।

নরেন পত্র লিখিতেছিল। সহসা বনমালী বলিয়া উঠিল, 'বৌদিদির হাত কেটেছে।'

বিনোদ ছুটিয়া গিয়া দেখিল, কোহিনূর লাউ কুটিতে গিয়া তাহার হাত কাটিয়া বসিয়া আছে।

কোহিনূর। এগুলো আমাদের পক্ষে Extinct art। যেমন ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী জপ, আর দিদিমার চল্‌কা। এখন বাকি তরকারিগুলো কোটে কে?

বিষম সমস্যা। বিনোদ তার রুমালখানি ছিঁড়িয়া কোহিনূরের অঙ্গুলিতে জড়াইয়া দিল, এবং জল দিতে লাগিল।

বনমালী ছুটিয়া গিয়া ভট্টাচার্য্য-তনয়া বিমলাকে ডাকিয়া আনিল।

বনমালী। দাদাবাবু! বামুন দিদি এসেছেন, তিনি তরকারী কুটে দেবেন।

বিমলাকে রন্ধনশালার দ্বারে দেখিয়া কোহিনূর বিনোদের হস্ত হইতে অঙ্গুলি টানিয়া লইয়া বলিল, 'আমাকে এঁর সঙ্গে introduce ক'রে দেও।'

বিনোদ। ইনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মেয়ে বিমলা। আমাদের প্রতিবাসী।

৫

কোহিনূর। এত সুন্দরী প্রতিবাসিনী আছে, আগে জান্‌লে আমি তরকারী কুট্‌তে বস্‌তেম না। (বিমলার প্রতি) আমি কে জান?

বিমলা (হাসিয়া)। আমার বৌদিদি।

ইহা বলিয়া সে কোহিনূরের অঙ্গুলিতে জলসেচন করিল।

কোহিনূর। বেশী কাটে নাই, তবে উনি—

বিমলা। বিনোদ দাদা?

কোহিনূর। হাঁ, তোমায় বিনোদ দাদা মনে করেছিলেন যে, ভয়ানক কেটে গেছে, এটা তাঁর অপরিসীম ভালবাসার গুণে।

বিনোদ। তবে আমি চিঠিখানি লিখি গিয়ে। তোমরা তরকারী কুট্‌তে আরম্ভ কর।

বিনোদ চলিয়া গেল।

কোহিনূর। তোমার বিয়ে হয় নাই ত?

বিমলা। না।

কোহিনূর। বিয়ে হ'লে প্রথমে আঙ্গুলগুলো অথর্ব্ব হয়ে পড়ে। রুক্ষ হয়ে যায়। ভ্যাসিলিন্ মাখাতে হয়। শেলাই কর্ত্তে গেলে ছুঁচ ফুটে যায়। তরকারী কুট্‌তে গেলে হঠাৎ কেটে যায়। তবে কি জান? যত কষ্ট হয়, ততই দুঃখ উথ্‌লে উঠে, মরণের সাধ হয়। এই যে নিরিবিলি বনে এসেছি, এখানে রোগ শোক হ'লে দেখবার কেউ নাই।

বিমলা সাদরে কোহিনূরের কর তাহার করযুগলে আচ্ছাদন করিয়া বলিল, 'আমি ত আছি।'

অতিশয় স্নেহভরে সেই সত্যবাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, নচেৎ কোহিনূরের মত গর্ব্বিতা স্ত্রী তাহাকে কোলে টানিয়া আনিত না।

'আমি তোমার মত এক জন Sister of mercy চাই। দেখ! কলিকেতায় ও সিম্‌লা পাহাড়ে তোমাদের মত সুন্দরী, প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়। কেউ কাহাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে না।

বিমলা। কেন?

কোহিনূর। তারা এখনও শেখে নাই। যাদের বংশ খুব পুরাণো, যারা এককালে ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব রাখ্‌ত ও ঈশ্বরকে ভক্তি কর্‌ত, সেই সব লোকের মধ্যে দুটো একটা এখনও পারিজাত গাছের মত এখানে ওখানে পাওয়া যায়। বেশ। তুমি আমাকে তরকারী কোটা আর পুজো অর্চ্চনা কর্‌তে শেখাও, আমি তোমাকে সভ্যতার আবরণ শেখাব।

বিমলা। সভ্যতার আবরণ কি বৌদিদি?

কোহিনূর। মনের দুঃখ লুকিয়ে রেখে বাইরে অনেক রকম ভাব ভঙ্গীতে সকলের মন রাখার নাম সভ্যতার আবরণ।

বিমলা ইতিমধ্যে 'বৌদিদি'র চুল খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে বসিয়াছিল। কোহিনূর বলিল, 'আমি এখন এলো চুলেই থাকব। তুমি তরকারী কুট্‌তে থাক, আর আমি সভ্যতার আবরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি।'

বিমলা ক্ষিপ্রহস্তে এক একটা তরকারী লইয়া কুটিল, এবং ক্রমে সেগুলি সযত্নে নাখাইয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিল।

কোহিনূর। অনেকে বলে 'সভ্যতা'র ভঙ্গী মুদ্রাদোষ। কিন্তু আমার মতে তা নয়। আমাদের জীবনে একটা গভীর দুঃখ বরাবর থেকে যায়। জীবনের কি কর্ত্তব্য, তা জান্‌তে না জান্‌তেই মরণ এসে পড়ে। কোনও সাধই মেটে না, লাভের মধ্যে যেগুলোকে ভালবাসা যায়, সেগুলো হয় ত দাগা দেয়, কিংবা সংসার ছেড়ে যায়।

এই দারুণ দুঃখের মধ্যে বাইরের মানুষগুলো ভূত প্রেতের মত নৃত্য করে। দাঁত বের করে হাসে। আড়-নয়নে চায়। গল্প ও পদ্য রচনা করে। বিদ্যার পরিচয় দেয়। এই ভূতের দৌরাত্ম্য এড়াবার জন্য আমাদেরও অভিনয় শিখ্‌তে হয়। যদি ঈশ্বরের পদতলে পঁহুছানই আমাদের চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে যজ্ঞস্থল থেকে এই ভূতগুলোকে তাড়ানর যে মন্ত্র তাহারই নাম সভ্যতা। পূর্ব্বকালে যোগী ঋষি নির্জ্জনে গিয়ে সাধনা করতেন। এ কালে তা হবার যো নাই। চারি দিকে মানুষের মেলা। তোমাদের দেশে ম্যালেরিয়া হয় ত?

বিমলা (মৎস্য ভাজিতে ভাজিতে)। খুব।

কোহিনূর। তাই এখনও রক্ষা পেয়েছ। যদি কল্‌কেতায় থাক্‌তে, তবে ছত্রিশ জাতির নজর তোমার উপর পড়্‌ত। সে কালে সেই জন্য অবরোধ প্রথা ছিল। কিন্তু ঘরে বাইরে কোথায়ও রক্ষা নাই। তুমি বাইরে মাঠে ঘাটে বেরোও ত?

বিমলা। খুব।

কোহিনূর। তোমার দিকে কেউ চেয়ে থাকে না?

বিমলা। আমরা যে ব্রাহ্মণ।

কোহিনূর। আমি জানি যে, এক কালে ব্রাহ্মণ দেবতার মত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণের শত্রু হয়। আচ্ছা, জমীদারদের ছেলেরা তোমার দিকে কেউ চায় না?

কোহিনূর দেখিল, দুইখানা মাছ পুড়িয়া গিয়াছে। বিমলার কোমল হস্ত যেন ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল।

কোহিনূর দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বী লইয়া বসিল, এবং বাম হস্ত বিমলার স্কন্ধে রাখিয়া বলিল, 'বোন্, তোর মনের কথা আমাকে বল্ না। আমিও তোকে একদিন বল্‌ব।'

বিমলা কোহিনূরের স্পর্শে আকৃষ্ট হইল। একবার কোহিনূরের অতুলনীয় সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাস্তবিকই সে 'কোহিনূর'—গিরিগুহায়

লুকানো আলোক। তার শেষ কথার সঙ্গে স্বর্গের সংস্পর্শ ছিল, নচেৎ বিমলার আজ তাহার হৃদয়ের লুকানো কথা বলিবার এত সাধ হইল কেন?

বিমলা। জমীদারদের নরেন বাবু আমার দিকে মাঝে মাঝে চায়।

কোহিনূর। শুধু 'চায়' কেন? ভালবাসে ত? আমি তোমার দিকে চাই কেন? তোমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ব ব'লে।

বিমলা। বৌদিদি, মাছগুলো পুড়ে গেল যে।

কোহিনূর। তুই দুখানা পুড়িয়েছিস্, আমি সবগুলো পোড়াব। নয় ত ঠিক কথা বল্।

বিমলা লজ্জায় ধীরে ধীরে বলিল, 'সে একবার বলেছিল "বাসে", কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে, তা জানিনে।'

কোহিনূর। আচ্ছা, তুই এখন মাছগুলো ভাজ্।

৬

সন্ধ্যা। বিনোদ চিঠি লিখিয়াছিল। নরেন নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে। বিমলা অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া ও নানা রকম জলখাবার তৈয়ারী করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোহিনূর বিমলার চুল নূতন ধরণে বাঁধিয়া দিয়াছিল। বিমলা বাড়ীতে গিয়া মাতাকে বলিল, 'মা! বৌদিদি একটি লক্ষ্মী। তাঁর মত রূপ গুণ মানুষের হয় না।'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'বেঁচে থাকুক।'

ব্রাহ্মণ। ওরাই আমাদের এ দুর্দ্দিনে সহায়। জাত্ গেলে কি হয়? দেবতাদের কি জাতবিচার আছে?

ব্রাহ্মণী। তাও কি কখনও হয়। যদি যায়ই, তবে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জাতে উঠ্‌বে।

কোহিনূর ইতিমধ্যে ফুলের টব সাজাইয়া ও রঙ্গীন পর্দা খাটাইয়া পুরাতন বাটী সাজাইয়া লইয়াছিল। সান্ধ্যদীপ ঘরে জ্বালিয়া কোহিনূর স্বামিসন্নিধানে গেল। বিনোদ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া নরেনের মোকদ্দমার 'ব্রীফ' লিখিতেছিল।

কোহিনূর। নরেন মোকদ্দমা জিত্‌বে ত?

বিনোদ। নিশ্চয়। ম্যানার অদৃষ্ট ভাল।

কোহিনূর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া বলিল, 'চল, একবার ছাতে যাই।'

উভয়ে ছাতে গিয়া বসিল।

আকাশে একটা পাখী ডাকিয়া গেল,—'টি-টি-হুইট্'।

বিনোদ (চমকিয়া)। এটা সেই পাখী!

কোহিনূর। তোমার ছেলেবেলার পাখী?

বিনোদ (মুখচুম্বন করিয়া)। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

কোহিনূর। তোমার ডাইরিতে পড়েছিলুম। আচ্ছা, আনারের গাছে ঐ পাখী বাসা করে না?

বিনোদ (হাসিয়া)। সে আমার বাধ্য নয়।

কোহিনূর। আমার বাধ্য হবে। তুমি যাকে চাও, আমিও তাকে চা'ব। দু' জনে মিলে ডাক্‌লে সে আপনিই এসে পড়্‌বে। এক মন না হলে ঘর সংসার বাঁধে না। এই দেখ!—

কোহিনূর আকাশের দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'আয়! আয়! সোনার পাখী আয়!'

বৃক্ষের একটী ডাল হইতে পাখী ডাকিল,—'টি-টি-হুইট্'।

বিনোদ অবাক হইয়া অন্ধকারময় আম্রকাননের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কোহিনূর (সহাস্যে)। দেখ্‌লে ত? তোমার মত মূর্খ জগতে নেই। তুমি যাকে ভালবাস, সে স্বভাবতঃ তোমার কাছে ঘুরে বেড়াবে—নিশ্চয়। আমি তোমাকে সত্যি বল্‌ছি, ও পাখীটার বিয়ে হয় নাই। দু' দিনের মধ্যেই এই গাছে বাসা কর্‌বে। ওর বিয়েতে আমি দু' শো টাকা খরচ কর্‌ব।

বিনোদ কোহিনূরকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, 'আচ্ছা!'—

এমন সময় বাহিরে নরেন আসিয়া ডাকিল, 'বিনোদ!'

স্বামী স্ত্রী ছুটিয়া নীচে গেল।

কোহিনূর তার পোর্টম্যাণ্টো হইতে 'এসেন্স' লইয়া নরেনের রুমালে সেচন করিল।

'আজ আমার আঙ্গুল কেটে গিয়েছে, তাই 'শেকহ্যাণ্ড' কর্ত্তে পার্‌লুম না। নরেন্, কিছু মনে করিও না।'

নরেন্দ্র খুব দুঃখ প্রকাশ করিল। তাহাতে কোহিনূরের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া গেল।

কোহিনূর। কি কোমল মন তোমার! আর উনি একবার একটা উহ্ দুবে থাক্, আহাও করেন নাই!

বিনোদ। নিজের লোকের জন্য কে আবার দুঃখ প্রকাশ ক'রে থাকে?

কোহিনূর। পরের কাছেই যখন সুখ দুঃখের কথা, তখন আমি নরেনকে নিয়ে পুষ্করিণীর পাড়ে যাই।

উভয়ে গিয়া পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের প্রথম সোপানে বসিল।

নরেনের সহিত ম্যানার বিবাহ এক রকম স্থির হইয়া যাওয়া অবধি কোহিনূর নরেনকে অনেক কথা বলিত। আজ কিন্তু কোহিনূর ধর্ম্মকথা পাড়িল।

কোহিনূর। আচ্ছা নরেন, তোমাদের জমীদারীতে যারা মিথ্যে কথা কয়, তাদের তোমরা কি ক'য়ে শাস্তি দেও?

নরেন। সেকালে ভটচায্ ব্রাহ্মণরা তাদের একঘরে করত। এখন সত্য মিথ্যার বিচার বড় কেউ করে না।

কোহিনূর। এতে কি দেশের মঙ্গল হচ্ছে। আচ্ছা, মিথ্যে বল্‌তে বল্‌তে পশুর মত চেহারা হয়ে পড়ে, তা তুমি দেখছ?

নরেন। না।

কোহিনূর। আমি দেখেছি। আমাদের বেশী বয়স হলে' মুখের আর তেমন শ্রী থাকে না। মিথ্যা কথা ব'লে কদাকার হয়ে পড়ে।

নরেন। কি আশ্চর্য্য!

কোহিনূর। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। আমাদের প্রতিবাসী এক জন ভটচায্ আছেন, তিনি বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র জানেন?

নরেন (সাশ্চর্য্যে)। কেন বলুন ত?

কোহিনূর। তাঁর একটী মেয়ে আজ এসেছিল। তেমন সুন্দরী আমি ত দেখি নাই। নাম্‌টা ভুলে গেলুম—তোমার জানা আছে?

নরেন। একটা মেয়ে দোকালে দেখেছিলেম, কিন্তু তার নাম জানি না।

দূর হইতে বিনোদ ডাকিল, 'খাবার প্রস্তুত'। উভয়ে উঠিয়া গেল।

কোহিনূর পরিবেশন করিতে লাগিল। নরেন্দ্র তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া বলিল, 'চমৎকার রান্না। আপনি যে এত সুন্দর রাঁধেন, তা জানতুম্ না। জন্মে কখনও এমন রান্না খাই নাই।'

কোহিনূর 'হো হো' করিয়া হাসিল, 'তোমাকে খুব ঠকিয়েছি। এ রান্না-গুলি সব ঐ ব্রাহ্মণের মেয়ে বিমলার। আমি কেবল খানকতক মাছ পুড়িয়ে ভেজেছি। 'উনি' পোড়া মাছ ভালবাসেন। যার যেমন সখ।'

নরেনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

৭

বিনোদের অধ্যবসায় ও স্নেহের গুণে নরেন মামলা জিতিয়াছে। আজ মল্লিকপুরে মহা উৎসব ও উল্লাস। প্রজাগণ মুক্তহৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিল।

কারণ, নরেনকে সকলেই ভালবাসিত। অপর শরিকের উৎপীড়নে তাহারা দুই বৎসরাবধি গ্রামখানি ছাড়িয়া অন্যত্র বসতির আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু বিধাতার কৃপায় সে কষ্ট তাহাদের পাইতে হইল না।

মামলা জিতিয়া হাইকোর্টে বিনোদের খুব পসার জমিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, মল্লিকপুরের উভয় তরফই বিনোদের 'বাঁধা ঘর' হইয়া গেল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই বেশী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কোহিনূর স্নানের পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিমলা দৌড়িয়া আসিল।

ব্রাহ্মণী কতকগুলি পুরাতন বস্ত্র লইয়া কাঁথা শেলাই করিতেছিলেন। কোহিনূর নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণী। ওমা, এলো চুল কেন? বিমলা! চুল বেঁধে দে। কি সুন্দরই মা লক্ষ্মী আমার!

কোহিনূর। আজ গ্রামে এত ঘটা কিসের মা?

ব্রাহ্মণী। তুমি বুঝি জান না? অমাবস্যার দিন কালীপূজা হবে। ঐ যে জমীদারদের বাড়ীর নরেন; সে মামলা জিতেছে। নরেনের বাপ আমাদের যজমান ছিলেন, আজ আমাদের কত আহ্লাদ!

কোহিনূর। নরেন কি যজমান নয় মা?

ব্রাহ্মণী (দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে)। আজকাল কি লোকের ধর্ম্মে মতি আছে মা?

কোহিনূর। এ পূজার খরচ দেবে কে?

ব্রাহ্মণী। তোমাদের ভটচায্যি মশায়ই খরচ দেবেন। তাঁর যে কত আহ্লাদ! ছেলেবেলা তিনি নরেনকে কোলে ক'রে মানুষ করেছেন। তবে কি জান মা? প্রজারাই খরচ জুগিয়ে দেবে। তারা সকলে ব্রাহ্মণের বাধ্য।

কোহিনূর। মা! এখনও ঐ ভাব বজায় রাখ্‌তে পারলে দেশটা ধ্বংসের হাত এড়াতে পারে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে করম গোলমাল বেধে উঠেছে, আর আমাদের দেশে যেমন ছত্রিশ জাতি ও দলাদলি, এ সময় ধর্ম্মের একটা বাঁধনী

না থাক্‌লে সকলে পরস্পরকে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেল্‌বে। সকলেই যদি নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য ক'রে স্বাধীন হ'তে চায়, তবে আমাদের দেশের এই শেষ।

ব্রাহ্মণী। তোমরা চ'লে গেলে কি আর বাঁধনী থাক্‌বে? আগে সকলে দেশে থাক্‌ত, তখন দেশের কত শ্রী ছিল!

কোহিনূর। আমরা তাই মনে ক'রেই দেশে এসেছি।

ব্রাহ্মণী। তোমরা থাক্‌তে পারবে না। চারি দিকে দৈন্যদশা, জ্বর জ্বালা, জলের অভাব; বনবাদাড় ও ডোবা, চাষাভূসো লেখাপড়া জানে না, এর মধ্যে থাক্‌বে কি ক'রে?

কোহিনূর। মা! এই প্রজাদের উপার্জ্জনের অংশ নিয়েই ত দেশের অর্থ। সকলে সমান ভাবে থেকে পরস্পরকে সাহায্য কর্‌লে দৈন্যদশা থাক্‌বে না। সকলে মিলে চেষ্টা কর্‌লে জ্বর জ্বালা তাড়ান' আর জলের অভাব দূর কর্‌তে কতক্ষণ! বনবাদাড় ডোবা পরিষ্কার করা দু'দিনের কাজ। এখানে যেমন রোগে আমরা অপদার্থ হয়ে পড়ি, সহরে আর এক রকম রোগ আমাদের ঘিরে ফেলেছে। দশ জনের গোলমালের মধ্যে থেকে সেটা আমরা বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু সেখানে আমাদের কোনও কর্ম্ম নাই, কেবল নিজের আরামের জন্য ব্যস্ত। সেই আরামটুকু লাভ করতে গিয়ে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হই, আয়ুঃক্ষয় হয়ে আসে। এ রকম মরার চেয়ে বনবাদাড় ও জ্বর জ্বালার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মরা ভাল। সুস্থ সবল হতে না পার্‌লে, দেশের জল বায়ু ও মাটীর সঙ্গে নাড়ীর টান না থাক্‌লে, আমরা পরস্পরকে ভালবাস্‌ব কি ক'রে? ভবিষ্যতে আমরা একটা জাতি ব'লে মুখ তুলে দাঁড়াব কি করে'?

বিমলা কোহিনূরের চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কথাগুলি শুনিতেছিল। তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন সেও সেই কথাগুলি মধ্যে মধ্যে ভাবিত।

ব্রাহ্মণীকে নীরব দেখিয়া কোহিনূর একটা প্রস্তাব করিল।

'দেখ মা, এই কালীপূজো আমাদের পুরানো বাড়ীতে হ'লে কি হয়? আমি সব খরচ দেব। আমার শাশুড়ী লিখেছেন যে, তিনি তা হ'লে কাশী থেকে আস্‌বেন। কত লাগ্‌বে, দু তিন হাজার টাকা বৈ ত নয়?'

বিমলা। বৌদিদি! দু—তিন—হাজার! এত টাকা ত কখনও শুনি নাই, কেবল বইতে পড়েছি।

ব্রাহ্মণী। লক্ষ্মী মা! তোমার ইচ্ছে আর ভগবানের ইচ্ছে এক।

ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে ব্রাহ্মণকে খবর দিতে গেলেন। বিমলা সেই অবসরে লুকাইয়া 'বৌদিদি'র গণ্ডদেশে একটী নোটখাট কোমল চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইল।

চুল বাঁধা তখনও শেষ হয় নাই।

কোহিনুর মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বিমলা, সত্যিই তুই নরেনকে ভালবাসিস্?'

বিমলার মুখের কোনও উত্তর না পাইলেও বিমলার কম্পিত অঙ্গুলি কোহিনুরের কেশরাশির মধ্যে নীরবে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ বাহির হইতে স্কন্ধে একখানা গামছা বাঁধিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কোহিনুর চুল বাঁধিতেছে দেখিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন না। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বাহিরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বার হইতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! এ কথা কি সত্য?'

কোহিনুর অঞ্চলের এক কোণে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'সত্য! তবে আমরা ত প্রায়শ্চিত্ত করি নাই।'

ব্রাহ্মণ। মা! স্বার্থত্যাগই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা যদি দেশের ভাষা পরিত্যক্ত পুরানো বাড়ীতে ফিরে এসে ঈশ্বরী ঈশানীর পূজা কর, এর চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত আমি ত শাস্ত্রে খুঁজে পাই নে।

কোহিনুর অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া ভক্তিভরে দাঁড়াইল, এবং ব্রাহ্মণের মুখের দিকে নতনয়নে চাহিল।

'আপনি সকলকে খবর দিয়ে যোগাড় করুন।'

৮

গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, আজ নিশাকালে বসুজা মহাশয়ের পুরানো বাড়ীতে সকলের মঙ্গলের জন্য কালীপূজা হইবে। প্রত্যূষে উঠিয়া সকলে মাঠে ঘাটে কোলাহল করিতেছিল। যেন সকলের দেহের মধ্যে একটু প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল।

বিনোদ শয্যা হইতে তখনও উঠে নাই। এটা অত্যন্ত অন্যায় মনে করিয়া কোহিনুর বিনোদের গলা টিপিয়া তুলিল।

বিনোদ বাতায়নের মধ্যে সূর্য্যকিরণ দেখিতে পাইয়া সলজ্জে বলিল, 'তাই ত! অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছে।'

কোহিনুর তাহার আর্দ্র কেশ অঞ্চলে জড়াইয়া সগর্ব্বে বুঝাইয়া দিল যে, বহুদিন পরে আজ সে প্রাতঃস্নান করিয়াছে!

'আর একটা কথা। তোমার সেই পাখীটি নিমগাছে এসে' বাসা করেছে। কিন্তু একটা মজা দেখ নাই, তার বিয়ে হয়ে গেছে!'

বিনোদ। অসম্ভব! বিশ্বাস হয় না।

'আচ্ছা, তবে দেখ!'

ইহা বলিয়া কোহিনুর অঙ্গুলি দিয়া বৃক্ষের একটা ডালের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। সত্যসত্যই সেখানে দুইটী পাখী বসিয়াছিল

বিনোদ আহ্লাদে হাসিয়া খুন! কোহিনুর বলিল, 'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, আমি আজ কালীপূজোর সংযম করেছি।'

বিনোদ। তোমার এ কালীপূজোটা কি রকম দাঁড়াবে, বুঝতে পাচ্ছিনে। দু তিন হাজার টাকা খরচ হবে কিসে? এ দেশে মুড়ী মুড়কী ছাড়া আর কি পাওয়া যায়?

কোহিনুর। তোমরা কেবল আহারটাই দেখ। তুমি নিজেই খরচ করে দেখ, আমি সন্ধ্যার সময় সব বুঝিয়ে দেব।

তার পরেই কোহিনুর খুব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। বিমলাকে ডাকিয়া আনিল। গ্রামের অনেক কৃষকবধূ আসিয়া জুটিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাহিরে বড় দালানের নীচে জমীদার ও প্রজাগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উৎসবে যোগদান করিল।

বিনোদের মাতা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে বাটী আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। জমীদারদিগের 'বড়' গৃহিণী নরেনের মাতা বিনোদের মাতাকে পুনর্ব্বার দেখে দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া কথা কহিতেছেন।

এমন সময় কোহিনুর আসিয়া বলিল 'মা, পূজোর আয়োজনটা আপনি একবার ক'রে দিন, আমি ত ভাল জানিনে।' ইহা বলিয়া সে 'ক্যাশ'-বাক্সটি শাশুড়ীর পদতলে রাখিয়া দিল।

বিনোদের মা (জমীদার-গৃহিণীকে দেখাইয়া)। ইনি কি বলছেন, তা জান মা? নরেন নাকি জাতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার ভগ্নী ম্যানাকে বিয়ে করবে?

কোহিনুর। আপনারা কি পাগল হয়েছেন? আমি থাকতে তা হতে দেব কেন?

জমীদার-গৃহিণী কোহিনুরের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। এমন লক্ষ্মী বৌ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়।'

বিনোদের মাতা আহ্লাদে মুখ ভরিয়া হাসিলেন।

কোহিনূর। আমি নরেনের জন্য ভাল একটী পাত্রী খুঁজে বের করেছি। সন্ধ্যাবেলা তার কথা বলব।

সন্ধ্যাকালে নরেন্দ্র পুষ্করিণীর পাড়ে সেই অপূর্ব্ব উৎসবের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। নির্জ্জনে তাহার পশ্চাতে আসিয়া কে ডাকিল, 'নরেন!'—

নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, কোহিনূর।

কোহিনূর। নরেন, প্রতিমা দেখ্‌বে এস।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে কোহিনূরের সঙ্গে দেবীমন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

কোহিনূর নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, 'একটা মনের কথা তোমাকে আজ বলব। তুমি সে দিন মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে। এক দিন মনে করিয়াছিলাম, তুমি আমার ভাই, কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছ।'

নরেন। আমি অপরাধী। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

কোহিনূর। আছে। তুমি দেবীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে, বিমলাকে বিবাহ করিবে?

নরেন্দ্র কোনও কথা কহিল না।

কোহিনূর আবার বলিল, 'বিমলা তোমার স্ত্রী হইলে যত সুখী হব, এমন আর কিছুতেই হব না। আমার এক সময় সাধ হয়েছিল যে, তুমি আমার ভগিনীপতি হও। কিন্তু সে সাধের চেয়ে আরও একটা বড় সাধ আমার হয়েছে। সেটা দেশের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য। নরেন! প্রতিজ্ঞা কর।'

নরেন। আচ্ছা, তাই হবে।

কোহিনূর নরেনকে আরও কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। উভয়ের পবিত্র অশ্রুজল ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার সিক্ত করিল।

মঙ্গল-আরতি হইয়া গিয়াছে। বিনোদ জননীর সহিত মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া। বহু লোকসমাগমের মধ্যে নরেন্দ্র ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। এমন সময় একটী রমণী হীরকের নেক্‌লেস্ লইয়া ধীরে ধীরে প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য। মা! প্রণাম কর।

কোহিনূর সেই বহুমূল্য হীরকের অলঙ্কার দেবীর চরণে রাখিয়া প্রণাম করিল। অনেকে সেই ব্যাপার দেখিতে আসিল। তখন ব্রাহ্মণ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—'আজ আমাদের পূজা সার্থক।

তোমাদের একটা নূতন সংবাদ দি। আমাদের জমীদার উভয় সরিক মিলে এই গ্রামের উন্নতির জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করেছেন। সে টাকা কৃষকদের জন্য। আর সকলের এক বৎসরের খাজানা মাফ্ ক'রে দিয়েছেন। আরও একটা কথা, আমাদের বসুজা মহাশয়ের লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ তাঁর কণ্ঠের বহুমূল্য হার ধর্ম্মের জন্য এই মন্দিরে উৎসর্গ করেছেন। আজ হ'তে এই পুরানো বাড়ীতে নূতন কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন সকলকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হও।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

'সাম্রাজ্য' বা 'একতন্ত্র'।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সাম্রাজ্যের বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক প্রত্নবিদ্যাপারদর্শী প্রবিণনামা শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকরের "প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৯১৩ সালের "The Modern Review" পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশিপ্রসাদ জয়সওয়ালের "হিন্দু রাজনীতির সূচনা" নামক রচনা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

গত বৈশাখের "সাহিত্যে" আমরা যে 'সংঘ' বা 'গণতন্ত্রে'র আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেকের বিশ্বাস, সেই রাজ্যগুলি কুটিলধী চাণক্যের কূটজালে স্বাধীনতা হারাইয়া চন্দ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে এবং চন্দ্রগুপ্তই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সম্রাট্। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত ১৩২৪ সালের সাহিত্যে, (জ্যৈষ্ঠ, পৃষ্ঠা ১৩৬) এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও Vincent Smithএর ন্যায় বিচক্ষণ ঐতিহাসিকও এই প্রকার মতের পোষকতা করেন। সংঘগুলির পরিণতি সাম্রাজ্য এবং চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সম্রাট্ এই দুইটী মতই ঐতিহাসিক প্রমাণবিরুদ্ধ। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় দ্বিতীয় মতটীর আলোচনা করিব।

ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের একতন্ত্রের বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে যুদ্ধব্যাপার হইতেই একতন্ত্রের উদ্ভব হয়। আমাদের "রাজন্য" উৎপত্তিও পুরাতন গ্রন্থে এইরূপ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (ঐ. ব্রা. ১৪।১৭।) লিখিত আছে যে, "অসুরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেবগণ স্থির করেন যে 'রাজা' না থাকাই তাঁহাদের পরাজয়ের কারণ। তখন সকলের সম্মতিক্রমে এক জন 'রাজা' মনোনীত হইলেন। তাঁহার ন্যায় আরও অনেক রাজা বা "রাজবৃন্দ" ছিলেন (অথর্ব্ববেদ, ৩।৩।৩; ৩।১।৪)। সমস্ত প্রজার 'সমিতি'

একমত হইয়া তাঁহাকে মনোনীত করিতেন এবং তাঁহার উপাধি "রাষ্ট্রপতি"। 'দলপতি' বা 'জননায়কে'র পরিবর্ত্তে 'রাষ্ট্রপতি' উপাধির ব্যবহারে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ প্রাচীন কালেই 'রাষ্ট্র' বা 'রাজ্য' বোধ সকলেরই নিকট সুপরিচিত ছিল। সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থা দলবদ্ধ ভাবে অবস্থান (tribal stage), সভ্যতার উন্নতি ও স্ফুটতর বিকাশের সহিত 'রাষ্ট্র' বোধ (state conception) উদ্বুদ্ধ হয়। "ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায়" ইত্যাদি (অথর্ব্ববেদ ৩।১।৪।) হইতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত প্রজা একত্র মিলিত হইয়া "রাজা" নির্ব্বাচন করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) বর্ণিত বারানসীর পশ্চিমে ভারতরাজ্য, উত্তরে কোশলরাজ্য, যমুনার সন্নিহিত নৈমিষেন ও মৎস্যরাজ্য এবম্বিধ রাজ্যের দৃষ্টান্ত স্থল। মধ্যপ্রদেশে আর্য্যবিজয় ও আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপনের ফলে ঐ রাজ্যগুলি ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

রাজ্যস্থাপন ও উপনিবেশ উপলক্ষে আর্য্যগণ যখন দোয়াবে (Doab) অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলেন, তখন স্বভাবতঃ তাঁহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সকল অনার্য্য শূদ্রজাতির দৃষ্টান্তে তাঁহারাও রাষ্ট্রনীতিতে সাম্রাজ্যপন্থী হইয়া উঠিলেন। পঞ্জাবে এই অনার্য্য প্রভাব কম, ও মগধে বিশেষ প্রবল থাকায়, পঞ্জাবে না হইয়া মগধেই প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও সমৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। এই সাম্রাজ্যতন্ত্র দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম অংশে অর্থাৎ ইতিহাসপূর্ব্ব বা পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) এই সাম্রাজ্য, বৈদিক আদর্শের মহাভারতে বর্ণিত জরাসন্ধের সাম্রাজ্যের ন্যায় গঠিত হইত। এক জন সম্রাট, মহারাজ বা রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে আরও অনেক রাজা থাকিতেন। ইঁহাদের সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে স্বপ্রধান ছিলেন এবং উপরিতন সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন। দ্বিতীয় যুগের সাম্রাজ্যের গঠনরীতি বিভিন্ন। ইহাকে 'একাধিপত্য সাম্রাজ্য-তন্ত্র' নাম দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বযুগের স্ব স্ব প্রধান রাজগণের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন প্রদেশ এক জনের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য ইহার নাম 'একাধিপত্য' এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের একটী বৃহত্তর সমষ্টির ভিতরে অবস্থানের জন্য ইহার "সাম্রাজ্য" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত রাজ্যতন্ত্রের নাম "মহারাজ্য" এবং দ্বিতীয়টীর নাম "সাম্রাজ্য" দিলে ইহাদের গঠনের তারতম্য বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং এই তারতম্য প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাচী বা পূর্ব্বমগধের রাজ্যতন্ত্র "সাম্রাজ্য" ও মধ্যদেশের ও প্রথমোক্ত রাজ্যতন্ত্র "মহারাজ্য" বর্ণিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) ঐন্দ্রাভিষেক অধ্যায়ের "আসমুদ্রং একরাট্" এই সাম্রাজ্যবোধের আভাস বহন করিয়া আসে। "মহারাজ্য"-বোধের পরিণতি সাম্রাজ্যবোধে এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচ্য বা মাগধ সাম্রাজ্য। শূদ্ররাজ্যগুলি অধিকার করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃতির জন্য মগধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টা ও উদ্যমের চিহ্ন "আসমুদ্রং একরাট্ কথায় রহিয়া গিয়াছে। মগধসাম্রাজ্যই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সাম্রাজ্য। এখন ইহার প্রতিষ্ঠাপনের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে ৩২৫ শতাব্দীতে আর্য্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রস্থানে বিভাগ 'মধ্যদেশ' নামে পরিচিত। মনুর সময়ে ইহার উত্তরে

হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে প্রয়াগ ও পশ্চিমে বিনশন। বিনয়পিটকে বর্ণিত আবন্ত-দক্ষিণাপথে মহাকচ্চায়নের গমন হইতে জানা যায় যে, বৌদ্ধ পালিধর্ম্মপুস্তক রচনা কালে পূর্ব্বে প্রয়াগ ছাড়াইয়া কাজঙ্গল (কানিংহামের মতে বর্ত্তমান ভাগলপুর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে 'মজ্‌ঝিমদেশে'র উল্লেখ আছে। হর্ষচরিত ও পালিগ্রন্থ হইতে অবগত হই যে, মধ্যদেশের দক্ষিণে রাষ্ট্রবিভাগের নাম "দক্ষিণাপথ" ও উহার উত্তরে "উত্তরাপথ"। অঙ্গুত্তরনিকায় প্রভৃতি "ষোলস-মহাজানপদে"র উল্লেখ করিয়াছেন—অঙ্গ, মগধ; কাশী, কোশল; বজ্জী, মল্ল; চেতি, বংস; কুরু, পঞ্চাল; মচ্ছ, সুরসেনা; অস্সকা, অবন্তি; গন্ধার, কম্বোজ (Rhys David's Buddhist India দ্রষ্টব্য)। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেশের নাম, কতকগুলি দেশবাসীর নাম; কতকগুলি আবার জাতির নাম, যেমন বজ্জী ও মল্ল। দুইটী পরস্পর সন্নিহিত দেশের নাম একত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার অধিকাংশের বিবরণ পালিজাতক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে বজ্জী ও মল্লার উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, ঐ তালিকাভুক্ত দেশগুলি বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। জাতকের ভূমিকাতে মাত্র তাহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূল গল্পের ভিতর নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ, অন্ততঃ আর্য্য অধ্যুষিত ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল, এবং সময়ে সময়ে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। মগধের বার্হদ্রথবংশের ন্যায় ঐক্ষাকু বা কোশলরাজ, পঞ্চাল, কাশেয়, আয়ক, কুরু, মৌখিল প্রভৃতি রাজবংশ রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাদের উপর কোনও সম্রাট ছিলেন না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান ছিলেন এবং কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের একত্র সমাবেশ ও সমষ্টির ফলে এক বিপুলা সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় আমাদের আলোচ্য।

বুদ্ধের সময় চারিটী প্রধান রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়,—মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তি। পালি বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্য হইতে জানা যায় যে, অবন্তীর চণ্ডপ্রদ্যোৎ, বৎসের উদয়ন, কোশলের পসেনদি ও তৎপুত্র বিদূদ্ভ এবং মগধের অজাতশত্রু ও তৎপুত্র বিম্বিসার বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য, তাঁহারা পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন। এই সময় নির্দ্ধারণে আমরা পুরাণ হইতে অনেক সাহায্য পাই, তবে পুরাণের প্রমাণ বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। বুদ্ধের সমসাময়িক চারিটী রাজ্যের ভিতর যৌন-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। কথাসরিৎসাগরে কৌশাম্বীরাজ উদয়নের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে ইহার পিতার নাম শতানিক; ভাসের 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ইহাকে লইয়া রচিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাঁহার এবম্বিধ উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ও জয়ের আশা না থাকিলে নৃপতি সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবেন। কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি সুযোগ ও উদয়নের ন্যায় ক্ষমতা ফিরিয়া পাইতে পারেন।" মজ্‌ঝিমনিকায় এই রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণ মতে প্রদ্যোত অবন্তি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল। ভাসের গ্রন্থে তিনি মহাসেন নামে উল্লিখিত। কৌশাম্বীর উদয়ন অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন

এবং এই প্রদ্যোতের আক্রমণের ভয়ে মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহ নগর অল্পপরিসরে সঙ্কুচিত করেন (মজ্ঝিমনিকায় দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পসেনদি ও বিদূদভ কোশলরাজবংশের রাজা ছিলেন। পুরাণে বিদূদভ ক্ষুদ্রক নামে উল্লিখিত। আমরা পুরাণ হইতে জানি যে, বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মগধের রাজা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সিংহলের মহাবংশ আর একটী এবং আমার বোধ হয়, পুরাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ। এই মগধ রাজবংশের উপাধি নন্দ। বিম্বিসার-বংশের শেষ নৃপতি মহাবংশে নাগ-দশক নামে উল্লিখিত। মহাবংশে বিম্বিসারের উপাধি "সেনিয়" অর্থাৎ সেনাপতি। বিম্বিসার বৈশালীর বজ্জীদিগের সেনাপতি ছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে গঙ্গার ওপারে দূর করিয়া দিয়া মগধ অধিকার করেন ও রাজগৃহে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বিম্বিসার পরে অঙ্গ জয় করিয়া মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইরূপে বিম্বিসার ৮০,০০০ নগরে আধিপত্য বিস্তার করেন, (মহাবগ্গ দ্রষ্টব্য)। একটী বৌদ্ধ গ্রন্থমতে তিনি বৈশালী রাজকন্যা চেল্লনার পাণিগ্রহণ করেন ও "নহন-চুন্ন মূল্য" (স্নান ও পঙ্ক মূল্য) স্বরূপ কাশীপ্রদেশ লাভ করেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে এই কাশী লইয়া তাঁহার সহিত পসেনদির বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ হয়, পরিশেষে পসেনদি তাঁহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন ও ঐ কাশীদেশ দান করেন। মহাপরিনিব্বানসুত্ত হইতে জানা যায়, অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবিদিগকে পরাজিত করেন ও পাটলীগ্রাম দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ করেন। দীঘনিকায় ও মহাবংশমতে উদয়ভদ্র পিতা অজাতশত্রুকে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন; লিচ্ছবি, মল্ল, ও কোশলের কিয়দংশ মগধ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন ও রাজ্যের কেন্দ্রস্থান কুসুমপুর বা পাটলীপুত্রে রাজধানী সংস্থাপন করেন। নাগ-দশক এই বংশের শেষ রাজা। প্রজাসাধারণ এই রাজপরিবারের পিতৃহত্যা প্রভৃতি অসদাচরণে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং এই সুযোগে সেনাপতি শুশুনাগ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ইনি নাগ বংশেরই এক জন, তবে গৌণভাবে সম্পর্কিত। এই শুশুনাগ মগধের অধীশ্বর হইয়া পরে অবন্তি ও কাশী-কোশল জয় করেন। পরিশেষে বৎসরাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে শুশুনাগ পঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র কালাশোকের সময় রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মসংঘের অধিবেশন হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৩।২)। এই প্রসঙ্গে বার্ম্মীয় কিম্বদন্তী ও মহাবংশ দ্রষ্টব্য। তাঁহার পরে তাঁহার দশ পুত্র একত্র রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সিংহাসনচ্যুত করিয়া নন্দবংশ মগধের সিংহাসন লাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণ ও মুদ্রারাক্ষস হইতে অবগত হই যে, এই নবনন্দ একত্র রাজত্ব করেন। এইরূপে নয় জন অথবা দশ জন রাজার একত্র রাজ্যশাসনরূপ শাসনতন্ত্রের আলোচনা বারান্তরে করিব। পুরাণমতে মহাপদ্ম নন্দবংশের প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১০০,০০০ নিযুত সৈন্য বা ধনের অধিকারী ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার আখ্যা "উগ্রসেন" অর্থাৎ প্রচণ্ড সেনার প্রভু। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মগধ সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া কাশী-কোশল, অবন্তী এবং বৎসরাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ইহার পর যখন পুরাণে বর্ণনা দেখি যে, মহাপদ্ম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্ট বোধ হয় তিনি শুধু উত্তর

ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতেরও অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। অতএব উগ্রসেন মহাপদ্মই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌম সম্রাট্, একাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী।

পুরাণমতে মহাপদ্ম শূদ্রামাতার গর্ভজাত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ক্ষৌরকার উপপতির ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি নীচবংশোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য পুরাণকারগণ ঐ সময় হইতে কাল নিরূপণ করিয়া থাকেন, যেমন মহাপদ্মের সিংহাসনারোহণ হইতে গৌতমিতের জন্মকাল ১০৫০ বৎসর গত এবং তাঁহার সময় হইতে শেষ অন্ধ্র রাজা পুলুমবির সময় ৪৩৩ বৎসর। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই মহাপদ্মকেই Xandrames নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য মোক্ষমূলার অনুমান করেন যে, Xandrames শেষ নন্দের গ্রীক-ভাষান্বরিত নাম [Sanskrit Lit. p. 279]. ক্রমনন্দের নামমুদ্রিত এবং বৌদ্ধ চিহ্ন সম্বলিত কয়েকটী মুদ্রা হইতে মিঃ টমাস্ (Mr. Thomas) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নয় জন নন্দ একত্র রাজত্ব করেন, তাঁহাদের ভিতর ক্রমনন্দই প্রধান ও তিনিই Xandrames [cf. Elphinstone's History of India (1889) p. 151.] নবনন্দের একত্র-রাজত্ব রূপ সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রকারবিশেষ ঠিক করিতে না পারিয়া পূজ্যপাদ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ইতিহাসে নন্দ ও তাঁহার আট পুত্রকে ১০০ বৎসর রাজত্ব করাইয়াছেন এবং চন্দ্রগুপ্তকেই ভারতের প্রথম সম্রাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (cf. Hist. of India, Shastri p. 13)। এই হেতু তাঁহার সময়ের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় নাই। আমি দেখাইয়াছি যে, মহাপদ্মনন্দই ভারতের যথার্থ সর্ব্বপ্রথম একাধিপতি সম্রাট্; চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নির্ম্মিত সাম্রাজ্য হস্তগত করেন ও তাহাতে কেবল পঞ্জাব প্রদেশ যোগ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিকা (Indica), আনাবেসিস (Anabasis) ও প্লুটার্কের (Plutarch) মত এই সিদ্ধান্তের অনুকূল।

প্রাচ্য সাম্রাজ্যের আদিতে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার আভাস "আসমুদ্রং একরাট্" (ঐতরেয় ব্রা.) মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার চরম পরিণতি ও সার্থকতা উগ্রসেন-মহাপদ্ম শাসিত ভারতে "একৈশ্বর্য্যং অমাত্যঃ কারয়েৎ। [Arthashastra, p. 253.] হিমবৎসমুদ্রমুদীচীনং যোজনসহস্রপরিমাণমতির্য্যক চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রম্" ইহারই শেষ সাফল্য চন্দ্রগুপ্তের "হিন্দুকুশ হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল একাধিপত্য সাম্রাজ্য।" প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত পরে বলিতেন যে, আলেকসান্দার ইচ্ছা করিলেই মগধ জয় করিতে পারিতেন [cf. McCrindle's translation], কিন্তু পোরাস এ সম্বন্ধে আলেকসান্দারকে অন্যরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন [cf. Diodorus Siculus] এবং ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই মগধ সাম্রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকসান্দারের সিংহবাহিনীর হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল, বিশ্বজয়ী বীরকে মগধের দ্বার হইতে মুক্তচিত্তে, হতাশ-হৃদয়ে ফিরিতে হইয়াছিল।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হৃদয়-শ্মশান।

৬

[বিন্দুমাধবের কথা।]

১

আমার দুর্ভাগ্য কত দিন হইতে আমার অনুসরণ করিতেছিল—বলিতে পারি না। তবে আমার শৈশবেই আমার সহিত তাহার পরিচয়। কেন না, আমি শৈশবে পিতৃহীন এবং জ্ঞানলাভাবধি মাকে ভক্তি করিতে পারি নাই। যে পিতার স্নেহ সম্ভোগ করিতে না পায় এবং মাকে ভক্তি করিতে না পারে, তাহার মত দুর্ভাগ্য কে? শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আমি পিতাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিলাম। কখনও ভগবানে বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু সে বিশ্বাসের অভাবও জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে সর্ব্বদাই অনুভব করিয়াছি, আমি কখনও পিতার নিকট হইতে দূরে থাকি নাই। তিনি আমার হৃদয়ে—তিনি আমার জীবন জুড়িয়া—আমি কখনও তাঁহাকে হারাই নাই।

আমার স্বভাবতঃ স্বল্প ভক্তির কমণ্ডলু শূন্য করিয়া আমি পিতার পদেই প্রদান করিয়াছিলাম। মার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট রাখিতে পারি নাই। আমার মাতার হৃদয়ে পুরুষোচিত কঠোরতার আধিক্য ছিল, নারীজনোচিত স্নেহশ্রদ্ধার অভাবই লক্ষিত হইত। সেই অভাব আমি তাঁহার কাছ হইতে লাভ করিয়াছিলাম। মার স্নেহও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় ও কনিষ্ঠা ভগিনীতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল—মধ্যবর্ত্তী আমার জন্য অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই তাঁহার স্নেহ আমার শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বিশেষ যে পিতাকে আমি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতাম, তাঁহার প্রতি মার শ্রদ্ধার অভাব আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক বোধ হইত যে, মাকে আমি কিছুতেই ভক্তি করিতে পারি নাই। মার বিচারে পিতার অপরাধ—তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কেই সম্পত্তির ও পুত্র কন্যার সব ভার দিয়া গিয়াছিলেন; মাকে কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব দিয়া যান নাই। অথচ এই ব্যবস্থায় বাবা মার চরিত্রজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছিলেন—মা যে কিছুতেই কাহারও সঙ্গে বনাইয়া চলিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিয়াই তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ, যাহাই কেন হউক না—

আমি যে পুত্র হইয়া মাতাকে ভক্তি করিতে পারি নাই, তাহাতেই বুঝা যায় —আমি জন্ম দুঃখী।

কিন্তু সে দুঃখ তখন তীব্রভাবে অনুভব করিতে পারি নাই। কারণ, পিতামহী তখন সংসারের কর্ত্রী। পিতামহী সেকালের পাকা গৃহিণী—বাসুকী যেমন বসুন্ধরাকে মাথায় করিয়া আছেন—তেমনই ভাবে সংসার মাথায় করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিবার পূর্ব্বে গৃহে বেহ কখন তাঁহার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিত না—রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে ঠাকুরঘরের সব কাজ স্বয়ং করিয়া সংসারের কাজ করিতেন। ছেলেদের দুধ জাল দেওয়া হইতে কলেজের ছেলেদের ভাত দেওয়া, সব ব্যবস্থা করিয়া—পূজা শেষ করিয়া "স্বপাকে" খাইতেন। বিধবা পুত্রবধূ—আমার মা—তাঁহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রশংসনীয় বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে পিতামহীর স্নেহ ক্ষুণ্ণ হইত না। মনে আছে, মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে দ্বাদশীর দিন প্রাতে বিনিদ্র রজনীর অবসানে তিনি প্রথমেই মাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। মা আসিলে কাকীমাকে ডাকিয়া মার জন্য জলখাবার ওছাইয়া দিতে বলিলেন—বলিলেন, "কাল নিরম্বু আছে—আজ আমি মরিলে আজও ত মুখে জল দিতে পারিবে না।" পিতামহীর এই স্নেহও মার হৃদয়ে ভালবাসার উৎস মুক্ত করিতে পারে নাই। মার পিতামহীর স্নেহমন্দাকিনীর কূলে বাস করিয়া আমি কখনও মার স্নেহের অভাবও যেন বুঝিতে পারি নাই।

যে জন্মদুঃখী সেও সুখের আশা করে। নহিলে আমি সংসারে সুখী হইবার আশা করিলাম কেমন করিয়া? বাঙ্গালীর সংসারে ছেলে মেয়ের বিবাহ পরম্পরাক্রমে, যেন সংসারের স্বাভাবিক রীতিতে সম্পন্ন হইয়া যায়। তাই যখন আমার পালা পড়িল, তখন আমারও বিবাহ হইয়া গেল। সুন্দরী নাতবৌ লইয়া ঠাকুরমা দুই বৎসর কত আনন্দে রহিলেন—তাহার পর শয্যা লইলেন। সে-ই তাঁহার মৃত্যুশয্যা।

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর সংসার যেন "লক্ষ্মীছাড়া" হইয়া গেল। যিনি সব দিকে, সব কাজে দৃষ্টি রাখিতেন, তিনি নাই; যিনি সংসারের কেন্দ্র ছিলেন, তিনি নাই—সুতরাং সংসার থাকিবে কেমন করিয়া? সংসার যে ভাঙ্গিল—সে জন্যও প্রধানতঃ দায়ী আমার মা। তাঁহার বৈধব্যের জন্য পিতামহী যেন সর্ব্বদা তাঁহাকে স্নেহে আগুলিয়া থাকিতেন। তিনি কাহারও সঙ্গে

সহিতে পারিতেন না। জ্যেঠামহাশয় বিদেশে ওকালতী করিতেন—জ্যেঠাইমা কালেভদ্রে তথায় যাইতেন—বড় ছেলে মেয়েরা কলিকাতার সংসারেই থাকিত। প্রথম সারিলেন জ্যেঠাইমা। তাঁহার দুই পুত্রের কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার প্রয়োজন। উভয়েই কলেজের ছাত্রাবাসে গেলেন। জ্যেঠাইমা নির্বিরোধী লোক—গোল দেখিয়াই সরিয়া গেলেন—বলিলেন, "আমি কি মেজবৌর সঙ্গে ঝগড়া করিব? শাশুড়ী মরিতে না মরিতে একটা গোল হইবে—আমি বড়—লোক আমারই দোষ দিবে।" মা বলিলেন, "দিদির বরাবরই ইচ্ছা ছিল—স্বাধীন হয়েন; ভাশুর বড় মাতৃভক্ত, তাই এত দিন পারিয়া উঠেন নাই।" জ্যেঠাইমা ঠাকুরমার ছায়ার মত থাকিতেন—তাই তাঁহার স্নেহ হইতে আমিও বঞ্চিত হই নাই। মার ব্যবহারে জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলেন— মনে বড় দুঃখ পাইলাম। জ্যেঠাইমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে যাইয়া বলিলাম, "জ্যেঠাইমা, আমাকে লইয়া চল।" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "এও যেমন তোমার বাড়ী—সেও ত তেমনই। যখন ইচ্ছা যাইবে। আমার সুরেন নরেন অস্থিমে মুখে জল দিলে তাহাতেও যেমন তৃপ্তি হইবে, তুমি দিলেও তেমনই হইবে।" আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি চলিলে কেন?" এইবার জ্যেঠাইমা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; বলিলেন, "সে আমার অদৃষ্টের দোষ।" জ্যেঠাইমার গলাটা ধরিয়া আসিল—তিনি গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "বাবা তোমরা ত সবই বুঝ। মা মরিবার সময় বলিয়াছিলেন, সংসার যেন নষ্ট না হয়। আমারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে—তোমার জ্যাঠারও বয়স হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম, মার কথা রাখিতে পারিব। অদৃষ্টের দোষে হইল না—তা—তাহা না হয় না হউক—তোমরা সুখে থাক।"

জ্যেঠাইমা যেমন শান্ত ছিলেন—কাকীমা তেমন ছিলেন না। বিশেষ কাকার উপর মার রাগের ঝালটা অধিক পড়িতে লাগিল। জ্যাঠামহাশয় বিদেশে থাকিতেন—বাবার মৃত্যুর পর হইতে কাকাই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। কাজেই মার সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাপারে কাকার মতান্তর হইত। মা ক্রমে একটু অধিক মাত্রায় "উষ্মা" প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাকা সব সহ্য করিলেন —কাকীমার "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" যুক্তিও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। কিন্তু মন ভাঙ্গিলে সংসার জোড়া রাখা বিড়ম্বনা—সেই বিড়ম্বনায় কাকার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। সংসার নামে মাত্র এক রহিল—একান্নবর্ত্তি-পরিবারে অন্নটাই এক রহিল।

ইহার পরই বন্ধুদের সঙ্গে মার মনকষাকষি চলিতে লাগিল। কিন্তু মানুষ একটা অবলম্বন চাহে—বিশেষ দাদা দুর্ব্বল বলিয়া মার আশ্রয় কিছুতেই ত্যাগ করিতেন না—সেই জন্য বড় বধূর সঙ্গে তাঁহার মনের মিল না থাকিলেও "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" হিসাবে বনিত। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সংসার অশান্তির আগার হইল।

২

দাদার মত আমার প্রতি মার যেমন স্নেহের আতিশয্য ছিল না—আমারও তেমনই তাঁহার প্রতি ভক্তিভালবাসার আতিশয্য ছিল না। স্নেহের আতিশয্য এবং ভক্তিভালবাসার আতিশয্য উভয়ই মানুষকে দোষবিষয়ে অন্ধ করে। আমার পক্ষে তাহার কোনও কারণ ছিল না। কাজেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কারণে অকারণে মার যখন গোল বাধিত তখন ব্যাপারটা সব জানিতে পারিলে মার দোষের পরিমাণ নির্ণয়ে আমার বিলম্ব হইত না। সুতরাং সমস্ত ঘটনা যদি স্থির ও ধীর ভাবে আমার গোচর হইত, তবে কি হইত বলা যায় না। কারণ, আমি অশান্তির সংসারে বাস করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম। আমার মনে যে পারিবারিক সুখলাভের বলবতী বাসনাও ছিল, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, আমার স্ত্রীর বিষয়ে আমার বিশেষ দৌর্ব্বল্য ছিল—তাঁহার প্রতি আমার প্রেমের মাত্রাধিক্যই ছিল। তিনি দোষ করিলেও আমি তাহা মনে রাখিতে পারিতাম না। আমার কল্পনা তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া কত সুখাবাস-রচনার কল্পনাই করিত! তখন আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতিয়া বাহির হইয়াছি—চাকরী আমার পক্ষে দুর্লভ হইত না। চাকরী লইয়া যদি আমি বিদেশে যাইতাম, তবে আর কোনও আপদ থাকিত না। আমার স্ত্রী যদি আমাকে সব কথা শান্তভাবে যথাযথ বলিতেন, তবে হয় ত আমি সেইরূপ একটা ব্যবস্থাই করিতাম।

কিন্তু তাহা হইল না—মাও যত ফুটিতে লাগিলেন, আমার স্ত্রীও তত ফুটিতে লাগিলেন। বিরক্তির বাতাসে—মনান্তরের গারিতে—অশান্তির কিরণে ফুটিলে যেমন হয়, তেমনই হইতে লাগিল। আমার স্ত্রীর লাজুনাতিক্ত হৃদয় আমার সঙ্গে অপ্রিয় ব্যবহারেই আত্মপ্রকাশ করিত। যেন আমিই তাঁহার সমস্ত দুঃখের কারণ। আমারও জীবন তিক্ত হইতে লাগিল—আমার সুখের স্বপ্ন টুটিয়া গেল—আশার আলো নিবিয়া গেল। চাকরীর সন্ধান না করিয়া

ওকালতী করিবার আশায় আইন-বিদ্যালয়ে নাম লিখাইলাম। হয় ত ভুল করিলাম। কারণ, তখন যদি অশান্তির কেন্দ্র হইতে দূরে যাইতে পারিতাম, তবে হয় ত হৃদয়-শ্মশানে রাবণের চিতার মত অনির্ব্বাপিত বহ্নিদাহে দগ্ধ হইতে হইত না। তাহার পর নিঃসঙ্গ প্রবাসে—কত বিনিদ্র নিশায় সে কাজের বিশ্লেষণ করিয়াছি—তখন মনে হইয়াছে, আমার সে কাজের উদ্দীপক কারণ—অভিমান। হায় অভিমান—তুমি যেমন প্রেমকে মধুর কর, তেমনই তোমার প্রভাবে কত সময় প্রেমও পুষ্পিত হইতে পায় না। তুমি দুঃখের—কোথাও দুঃখের মধ্য দিয়া সুখের পথ বিস্তৃত কর—কোথাও দুঃখেই সব অবসান হয়।

আইন পড়িবার জন্য নাম লিখাইলাম—কিন্তু পাঠে মনোযোগ রহিল না। এমন কি মা ও দাদা কাহারও পরামর্শ লইলাম না বলিয়া তাঁহারাও অসন্তুষ্ট হইলেন। দাদার ব্যবহারে—আমার কাজে ঔদাসীন্যে সে অসন্তোষ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইত—মার ব্যবহারে তাহা ফুটিয়া উঠিল। মা বুঝিলেন, যাহার পক্ষে একটা বড় চাকরী সুলভ ছিল, সে যে সে পথ মাড়াইল না—সে নিশ্চয়ই স্ত্রীর "সুপরামর্শে।" ইহাতে মার বিরক্তির আরও একটু কারণ ছিল। পূর্ব্বে সংসারে স্বচ্ছলতাই ছিল—জ্যেঠামহাশয়ের উপার্জ্জন, কাকার বেতন ও ভাড়াটিয়া বাড়ীর ভাড়া সব ঠাকুরমার কাছে আসিত। তিনি সেই আয় হইতে ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া সঞ্চয়েও সমর্থ হইতেন। এখন জ্যেঠামহাশয়ের উপার্জ্জন আর সংসারে আসিত না—মরুনদীর প্রবাহের মত অন্য পথে গিয়াছিল; কাকার বেতনের পরিমাণ অল্প; বাড়ীর ভাড়া ও সঞ্চিত অর্থের সুদ হইতে জ্যেঠামহাশয়ের দুই পুত্রের ছাত্রাবাসের ও কলেজের খরচ দিতে হইত। দাদা চাকরী পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সামান্য বেতনে। এ দিকে আয় কম হইল—ওদিকে মার হাতটা "খরচের হাত"—তিনি সংসারের কাজে "গোছ" করিতে পারিতেন না, কাকীমাকেও কাজের ভার দিতে চাহিতেন না; সংসারের ব্যয় বাড়িয়া গেল। তাহার উপর আবার আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতি মার স্নেহের আতিশয্য—আদর-যত্ন অপেক্ষা "দেওয়া থোওয়া"তেই অধিক আত্মপ্রকাশ করিত; সেজন্যও খরচ বাড়িত। সুতরাং আমি চাকরী না লওয়ায় মা বিরক্ত হইলেন।

মার বিরক্তি আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার আরও তিক্ত করিয়া তুলিল—আমার স্ত্রী সেই তিক্ত ব্যবহার তিক্ততর করিয়া আমাকেই দিতে লাগিলেন—আমি সেই গরল পান করিতে বাধ্য হইলাম। আমি চাকরী লইয়া

বিদেশে গেলাম না—ইহাও আমার প্রতি আমার স্ত্রীর অসন্তোষের আর একটা কারণ হইল। তখনই অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি আমার সব ব্যবহারেই কুটিল উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, পাছে বিদেশে গেলে তাঁহার "থেঁতলানি" বন্ধ হয়—তিনি স্বস্তি পাইতে পারেন —সেই জন্যই আমি সকলের কাম্য চাকরী লইলাম না।

আমি সাধারণতঃ কোন কারণে বিচলিত হইতাম না—সদ্‌গুণ অনুশীলনে পুষ্ট করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই অভ্যাসলব্ধ কঠোরতার মধ্যে—মরু-ভূমিতে ওয়েসিসের মত—কোমল অংশ ছিল। তথায় সামান্য আঘাতে আমি বিচলিত—ব্যথিত হইতাম, সময় সময় আপনাকে সামলাইতে পারিতাম না। স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম আমার হৃদয়ের সেইরূপ একটি দুর্ব্বল ও কোমল অংশ, আর একটি আমার কন্যার প্রতি স্নেহ। যখন সেই অংশেই আমি পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইতে লাগিলাম, তখন আমার পক্ষে অধ্যয়নে মন দিবার পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশেষ আইন অধ্যয়নে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল না। কাজেই তিন বৎসর পরে যখন পরীক্ষার সময় আসিল, তখন আমি বুঝিলাম—পরীক্ষায় সাফল্যলাভ অসম্ভব। পরীক্ষা দিলাম এবং অকৃতকার্য্য হইলাম।

তখন পরীক্ষা দিতেও আমার আগ্রহ নাই—অসাফল্যের উত্তেজনাও আমার হৃদয়ে সাফল্যলাভ-বাসনা প্রদীপ্ত করিতে পারিল না। তখন আমি সব কাজে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি—যাহাকে লইয়া সুখশান্তির নন্দনরচনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহার নিকট কেবল দুঃখ পাইয়াছি। কেবল তাহাই নহে—আমার ও আমার পরিবারের প্রতি বিদ্বেষবিষোদ্গার তখন আমার স্ত্রীর নিত্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকারণ হইতে ক্রমে সে কাজ অকারণ হইয়াছে—অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। আমি যেন বারুদের স্তূপের মধ্যে বাস করিতেছিলাম—কখন কি হয় সেই শঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতাম—আমার স্নায়ুমণ্ডল নিরন্তর উত্তেজনার ফলে দুর্ব্বল ও উত্তেজনাশীল হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মারলব্রো তাঁহার পত্নীকে লিখিয়াছিলেন, তিনি শত্রুর বিরাট বাহিনীর অপেক্ষা তাঁহার পত্নীকে অধিক ভয় করেন। মারলব্রো সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আমাকে সর্ব্বদাই সেই ভয়ে থাকিতে হইত। এ অবস্থায় মানুষের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না—শত্রুরও যেন তাহা বুঝিবার দুর্ভাগ্য না হয়। যাহাকে "কাজের বাহির হইয়া যাওয়া"

বলে—আমি তাহাই হইলাম। আমি তাহা বুঝিতাম—বুঝিয়া দুশ্চিন্তায় আরও পীড়িত হইতাম; কিন্তু প্রতীকার করিবার প্রবৃত্তি প্রজ্বালিত করিতে পারিতাম না। কাজের অভাবে আপনার ক্ষমতা নষ্ট করা—সেও বিষম যন্ত্রণা। আমি সর্ব্বদাই শঙ্কায় উদ্বিগ্ন থাকিতাম—যাহাকে দেখিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল বাসনা, তাহাকে দেখিলে ভয় পাইতাম—পাছে আবার বিরক্তির বিস্ফোরক বিদীর্ণ হয়।

৩

এ কথা ত অস্বীকার করিতে পারি না যে, তখনও আমার স্ত্রীর প্রতি আমার প্রেম তেমনই ছিল। নহিলে—কোন্ আশায় আমি তাঁহার প্রিয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম? যে পাড়ের কাপড়—যে সুগন্ধ দ্রব্য—যে বর্ণের চিঠির কাগজ খাম তিনি ভালবাসিতেন, আমার জানা ছিল। আমি গোপনে সে সব সংগ্রহ করিয়া আমার আলমারীতে লুকাইয়া রাখিতাম; কখন তিনি দেখিতে পাইলে লজ্জা পাইতাম—কিন্তু তাঁহার উপহাসব্যঞ্জক দৃষ্টিতে লজ্জার স্থান বেদনা অধিকৃত করিত।

এই সময় আমার শান্তি ও সান্ত্বনা ছিল—আমার তিন বৎসরের কন্যা মুরলা—আর উপন্যাসপাঠ।

পর বৎসর পরীক্ষা দিবার সময় আমি পরীক্ষা দিলাম না। আত্মীয় স্বজনরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; মার বিরক্তি ক্রোধে আত্মপ্রকাশ করিল। আর আমার স্ত্রী?—সে কথা আর মনে করিব না। কিন্তু দূরে জ্যেঠাইমা বোধ হয়, আমার অবস্থা কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। আমি জ্যেঠামহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—বোধ হয় নানা অশান্তির মধ্যে তোমার অধ্যয়নের অসুবিধা হইতেছে; তোমার জ্যেঠাইমার ও আমার ইচ্ছা তুমি বৌমাকে লইয়া আমার কাছে আইস। তোমার সম্মতি জানিতে পারিলে তোমার জ্যেঠাইমা বা আমি এক জন যাইয়া তোমাদের আনিব। আমাদের লইতে আসিলে মার কথার ঝাল সহিতে হইবে জানিয়াও যে জ্যেঠামহাশয় এই পত্র লিখিয়াছিলেন—সে জ্যেঠাইমার জন্য, আর বোধ হয়, মৃত ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়া। কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। এই প্রস্তাবেই জ্যেঠামহাশয়ের ও জ্যেঠাইমার প্রতি যে সব কথা প্রযুক্ত হইবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না—সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সে পথ বন্ধ করা সঙ্গত মনে করিলাম। আর এক কথা—জ্যেঠাইমা যখন চলিয়া গিয়াছিলেন,

তখনও আমার দুর্দ্দশা পূর্ণ হয় নাই—এখন আমি সস্ত্রীক তাঁহার কাছে যাইলে আমাদের স্বামিস্ত্রীর অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া তিনি কি মনে করিবেন? এ দুর্দ্দশা আমি জানাইতে পারিব না—আপনার বেদনা আপনি সহ্য করিব—সহানুভূতিলাভের আশাতেও প্রকাশ করিতে পারিব না। জ্যেঠামহাশয়কে লিখিয়া দিলাম, আমি এবার মন দিয়া পড়িতেছি। মিথ্যা কথা লিখিলাম। সংসারে মিথ্যার মধ্যে বাস করিতাম—জ্যেঠামহাশয়ের কাছেও সত্য গোপন করিলাম। যিনি আমার জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করিতেও প্রস্তুত ছিলেন—তাঁহার কাছেও মিথ্যা বলিতে হইল।

৪

আমি অশান্তির কেন্দ্র হইয়া অশান্তিময় সংসারে বাস করিতে লাগিলাম। সংসারে অশান্তির ঊর্ম্মিমালা দিন দিন উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাকে ব্যথিত ও পীড়িত করিবার কৌশল আমার স্ত্রী যেন সযত্নে শাণিত করিয়াছিলেন। আমার কন্যার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই স্নেহের হানটুকুতেও আমাকে পীড়িত করিতেন। নানা অছিলায় তিনি মুরলাকে আমার কাছ হইতে দূরে রাখিতেন এবং আমারও পর করিয়া তাঁহারই আপনার করিতে প্রয়াস পাইতেন। আমি দার্শনিকোচিত চিন্তায় মনে করিতাম—তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ, মুরলা ত তাহার মার সম্পূর্ণ স্নেহ লাভ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে সে চিন্তা আপনার দৌর্ব্বল্য ও কাপুরুষতা গোপন করিবার আবরণ। আমার কন্যাকে আমার করিবার যে অধিকার, আমি সে অধিকার ন্যায়ত করিতেও সাহস করিতাম না। আর আমি যে মনে করিতাম, মুরলার বিবাহ না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি কর্ত্তব্যবন্ধনে বদ্ধ—সেও কাপুরুষতা। আমি তাহাই মনকে বুঝাইয়া রাখিতাম। কেন না, আমার মনে আশা ছিল—আমার স্ত্রীর প্রতি আমার অনাবিল প্রেম এক দিন জয়ী হইবে, সে দিন আমার স্ত্রী তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। হায় দুরাশা!

এই সময় আমার চক্ষু ফুটিল। সে দিন আমার কন্যা আমার কাছে আসিবার জন্য "বায়না" ধরিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমার সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহাতে বালিকার মনপরিবর্ত্তন না হইলেও, আমি শুনিয়া বুঝিলাম, আমার প্রতি এই ঘৃণার আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইলে—মাতৃমুখে নিত্য আমার নিন্দা শুনিতে অভ্যস্তা হইলে সে কখনই আমাকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না। এই

চিন্তায় যত ব্যথা পাইলাম, তত ব্যথা আর কিছুতেই কখন পাই নাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, আর কেন? আর কিসের আশায়—কোন্ আকর্ষণে সংসারে থাকিব?

কিন্তু কি করিব—যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছি, যে জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া ত সংসারের দ্বারে দাঁড়াইতে পারিব না। আপনার শক্তিতে আপনার জীবনোপায় করিব; আর আমার সংসারের উপর ভার না চাপাইয়া—যেমন করিয়া পারি মুরলার বিবাহের জন্য আবশ্যক অর্থের সংস্থান করিব। সেই সঙ্কল্প লইয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই মফঃস্বলে কোনও স্থানে চাকরী পাইলাম।

আর ফিরিব না—এমন কথা তখনও মনে করি নাই। তবে কবে ফিরিব, তাহাও স্থির করি নাই। "ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে—মরণং গোমতী তীরে"—তাহাতেই বা আমার আপত্তি কি?

পত্র লিখিয়া উত্তর লইয়া যাত্রার দিন স্থির করিলাম। কবে ফিরিব, স্থির ছিল না—তাই আপনার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া ও গুছাইয়া রাখিয়া যাইব। ক্রমে সে সব শেষ করিলাম। কখন গৃহত্যাগ করি নাই—পিতার স্মৃতিপূত—বাল্যের খেলাঘর—যৌবনের স্বপ্নমাখা—কত সুখ দুঃখের লীলাভূমি গৃহ—বড় দুঃখে সে গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছিলাম। মনের কোণে ব্যথার কাঁটা যখন তখন বিদ্ধ হইতেছিল।

ক্রমে ষ্টেশনে যাইবার সময় হইল। আমি যাইবার পূর্ব্বে একবার আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম—একবার সতৃষ্ণদৃষ্টিতে পরিচিত দ্রব্যাদির দিকে চাহিলাম—তাহার পর প্রাচীরে লম্বিত পিতার প্রতিকৃতির নিম্নে মস্তক ন্যস্ত করিয়া প্রণাম করিলাম। মনে হইল, বাবা তাঁহার হতভাগ্য পুত্রের মস্তকে তাঁহার স্নেহকরস্পর্শ দিলেন—সেই স্পর্শে আমার বুকের ব্যথা কমিয়া গেল। আমি অগাধ শান্তি পাইলাম।

আমি মাথা তুলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় "কাল বৈশাখী"র মত আমার স্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করিলেন—আমি যাইবার সময় একটা ঝড়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না কি চাকরী করিতে যাইতেছ?"

আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম, "হাঁ।"

ক্রোধদীপ্ত নয়নের দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আর আমাকে এই নরকবাস করিতে হইবে?"

উত্তরে অনেক কথা বলিতে পারিতাম—কিন্তু তত সময় ছিল না; আর এত দিন যদি সহ্য করিয়াছি, তবে যাইবার সময় আর উত্তর দিবার ইচ্ছাও ছিল না। আমি পকেট হইতে ঘড়ী তুলিয়া সময় দেখিলাম।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া আমার স্ত্রী সুর আরও একটু চড়াইয়া বলিলেন, "তোমার মত স্বার্থপর আর জগতে আছে কি?"

আমার হাসি আসিল—আমি যে স্বার্থকে পদদলিত করিতে দিয়াছি। আমিই স্বার্থপর! আমি বলিলাম, "যদি এক দিন আমার চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাই বুঝিয়া থাক—তবে আজ দুই কথায় সে স্বভাব পরিবর্ত্তনের আশা কর কেমন করিয়া?"

আমি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলাম।

আমার স্ত্রী বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, আমি হয় তাঁহার ব্যবহারে "নরম" হইব—নহে ত যে চেষ্টায় তিনি কখন সফলকাম হইতে পারেন নাই, আজ তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইবে—আমিও সমানভাবে জবাব দিয়া তাঁহার অপ্রিয় কথার প্রবাহমুখ মুক্ত করিয়া দিব। আমার হাসিতে ও উত্তরে তিনি জ্বলিয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—নিষ্ফল আক্রোশের আতিশয্যে তাঁহার ক্রোধপ্রদীপ্ত নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "তাহা ত বলিবেই। গোষ্ঠীতে কাহারও ত লজ্জা নাই!"

তখনও আমি পিতার প্রতিকৃতির সমক্ষে দাঁড়াইয়া—বিদায়ের কালে সেই প্রতিকৃতি প্রণাম করিতে আসিয়াছিলাম। সেই অবস্থায়—আমি যাহা পবিত্র বলিয়া পূজা করি, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি—আমার জন্য আমার দেবতার লাঞ্ছনা! আমি মনে করিতাম, এত দিন সহ্য করিয়া করিয়া ক্রোধ জয় করিয়াছিলাম। আজ বুঝিলাম, তাহা নহে। দারুণ উত্তাপে তরল পদার্থ যেমন ফুটিতে থাকে, আমার হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য তেমনই ফুটিতে লাগিল। আমি বহু কষ্টে নির্ব্বাক রহিলাম। পাছে আর নির্ব্বাক থাকিতেও না পারি, সেই ভয়ে সবেগে আমার স্ত্রীর পাশ দিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দারুণ তাপে যেমন পদার্থের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—এই ব্যাপারে তেমনই আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর ফিরিব না।

নামিয়া যাইতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে মুরলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কবে আসিবে?"

তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলাম। পকেটে আমার

আলমারীর ও টেবিলের চাবি ছিল—তাহাকে দিয়া বলিলাম, "আমি আর ফিরিব না। আলমারীতে যাহা কিছু আছে তুমি লইও।"

আমি আর ফিরিব না, শুনিয়া বালিকার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই—পাছে আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা না থাকে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি তাহাকে নামাইয়া দিয়া নিম্নতলে আসিলাম। তখন গাড়ীতে আমার জিনিস তোলা হইয়াছে। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে যাইব?" আমি বলিলাম, "না।"

আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। মা বলিলেন, "পৌঁছিয়া টেলিগ্রাম করিও।" শিয়ালদহে যাইবার কথা—আমি হাওড়ায় যাইয়া প্রথমে যে ট্রেণ পাইলাম, তাহাতেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলাম।

৫

তাহার পর? তাহার পর এই পাঁচ বৎসর লক্ষ্যহীন ভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। লক্ষ্যহীন! কিন্তু এক লক্ষ্য ছিল—আমি মুরলার বিবাহের ব্যয় সংগ্রহ করিব। তাহা করিয়াছি। চারি বৎসরে সে জন্য যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে কখন অধিক দিন এক স্থানে থাকি নাই। কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই স্থানান্তরে যাইয়া বাড়ীতে মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া আসিয়াছি। এমনই ভাবে চারি বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়াছি।

তাহার পর—যে লক্ষ্য ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইল—জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য—কোনও আকর্ষণ নাই। এই এক বৎসর দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া বেড়াইয়াছি। তীর্থে গিয়াছি শান্তি পাই নাই—মন্দিরে গিয়াছি দেবদর্শনের ইচ্ছাও হয় নাই—কাজের অভাব যেন আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যখন যাতনা দুর্ব্বহ হইয়াছে, তখন পিতার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিখানি মস্তকে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিয়াছি। তাহাতেই একটু শান্তি পাইয়াছি।

শেষে—দুর্ব্বহ জীবনভার হইতে মুক্তিলাভের আশায় আত্মঘাতী হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাল্যকালের বন্ধু—যৌবনের সখা তুমি—তুমিই আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছ। তুমিই আমার হৃদয়-শ্মশানে চিতানল নির্ব্বাপিত হইতে দিলে না। কেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

২

অতি প্রাচীন কাল হইতে ইব্রিয় জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের অন্যতম শাখা ইহুদীদের মধ্যে এক্ষণেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। নোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী লেমকের (Genesis 4—19) দুই স্ত্রী এবং যাকোব (Genesis 29) ও দায়ুদ রাজার বহু পত্নী ছিল। ইব্রিয়-জাতীয় মহাপুরুষ আব্রাহামের Malkah, Bala ও Phelegash, এই তিন শ্রেণীর পত্নী ছিল। "মালকা" অর্থে (1 Kings 10—1) মহিষী ও Bala বালা অর্থে (1 Kings 17—17) গৃহিণী বা পত্নী, এবং ফেলেগাশ অর্থে দাসী-পত্নী। আব্রাহামের জ্যেষ্ঠা পত্নী "সারী" (Genesis 17—15) অর্থাৎ কুলীনা, পরে "সারা" অর্থাৎ মহিষী (Genesis 17—15) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বংশরক্ষার্থ যে "হাজারা"কে (১) (Genesis 15—4, 16—3) আব্রাহাম বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই "হাজারা" জায়া বা গৃহিণী, এবং "কটুরা" নাম্নী পত্নী দাসী-শ্রেণীর (Genesis 25—1, 6) অন্তর্গতা ছিলেন।

বহুবিবাহ।

আর্য্যদের বহুবিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩য় পঞ্চিকা, ১১শ খণ্ড) উত্তমজাতীয়া সবর্ণা পত্নী "মহিষী", মধ্যমজাতীয়া "বাবাতা", এবং অধমজাতীয়া "পরিবৃক্তা" বলিয়া অভিহিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত পত্নী থাকার কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭ম পঞ্চিকা, ১১শ খণ্ড) পাঠে অবগত হওয়া যায়।

রাজা দশরথের মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, এই তিন শ্রেণীর (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৪।৩৫) পত্নী ছিল। ঋগ্বেদের ১০।১০৫।৮ ঋকের সপত্নীপীড়ন ও ১০।১৪৫ সূক্তের সপত্নী-বশীকরণ ও দূরীকরণ মন্ত্র ও চেষ্টা দ্বারা প্রাচীন বৈদিক কালের বহুবিবাহ ও সপত্নীদ্বেষের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ইব্রিয় নারীর সপত্নীপীড়ন, দ্বেষ এবং যন্ত্রণা দিয়া সপত্নী-দূরীকরণ, আব্রাহাম পত্নী সারা ও হাজারার বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি। রাণী কৈকেয়ী জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা দশরথ দ্বারা যে প্রকার রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, আব্রাহাম-পত্নী সারাও তদ্রূপ

(১) "Ha'-ujra'ka" This is thy reward.—*Ranjatus Safa, Page 140.*

আব্রাহাম দ্বারা সপত্নী হাজারার পুত্র ইস্মায়েলকে জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মরুভূমিতে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। রাজা দশরথ যে প্রকার রামচন্দ্রের বনবাসে, তদ্রূপ আব্রাহামও ইস্মায়েলের নির্ব্বাসনে, অসুখী (Genesis 21—11,12) হইয়াছিলেন।

বাগ্দান।

আর্য্য জাতির ন্যায় ইব্রিয় জাতির বিবাহে পূর্ব্বেই বাগ্দান কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। বাগ্দান হইলেই সেই কন্যা অর্দ্ধপত্নীরূপে গণ্যা (Deuteronomy 22) হইত। আবেস্তা গ্রন্থে প্রাচীন পারসীকদের বাগ্দান (Vendedad 15/32—32) প্রথার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বয়স।

প্রাচীন ইব্রিয় জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইব্রিয়-কন্যা রেবেকার যৌবনকালে ইসহাকের সহিত (Genesis 24—16) বিবাহ হইয়াছিল। রাহেল ও লেয়া পূর্ণবয়স্কা হইয়া যাকোবের সহিত (Genesis 29) বিবাহিতা হন। প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ ছিল না। যৌবনকালে আর্য্যকন্যার বিবাহ হইত। ঋগ্বেদের ১০।৮৫।২১,২২ ও ১০।১৪০।৯ ঋকে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রাচীন পারসীক-কন্যাগণের পূর্ণ বয়সে (Khorda Avesta 49—2) বিবাহ হইত।

বিবাহের লগ্ন ও ক্ষণ।

ইব্রিয় জাতির বিবাহ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম, এই চারি বারে প্রশস্ত (Smith's Dictionary of the Bible) বলিয়া গণ্য ছিল। দিবাভাগে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। সন্ধ্যা কি রাত্রিতে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত (Genesis 29 ও Matthew 25—5) হইত। "গুরু-শুক্র-বুধেন্দূনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ",—আধুনিক উদ্বাহ-তত্ত্বের এই বচন দ্বারা প্রাচীন আর্য্য জাতির বিবাহ যে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম, এই চারি বারে সম্পন্ন হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। "বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা সাৎ পুত্রবর্জ্জিতা", উদ্বাহ-তত্ত্বের এই শ্লোক দ্বারা, দিবাভাগে কন্যার বিবাহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য ও অমঙ্গলজনক, তাহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীনকালে দিবাভাগেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত। আমরা কিন্তু যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ইহা সমর্থিত হয় না। কালিদাসের সময়েও যে রাত্রিকালে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তাহা আমরা কুমারসম্ভবের ৭।৬ শ্লোকে "মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু", অর্থাৎ চন্দ্রযুক্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের যোগ ঘটিলে, এবং ৭।৯৫ শ্লোকের "ধ্রুবেণ ভর্ত্রা

ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন ; সা দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নমন্ত্য, ব্রীড়নবতী কথম্ স্যাদিতি।" অর্থাৎ, প্রিয়দর্শন প্রতি ধ্রুব নক্ষত্র দেখিতে বলিলে গৌরী লজ্জাবশে মুখ উন্নমিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে বলিলেন, 'দেখিয়াছি'। ইহা দ্বারা বিবাহ-কার্য্যের আরম্ভ ও শেষ যে রাত্রিতেই হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত, যাহাতে রূপক ভাবে সূর্য্যার বিবাহ-উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বাদশ আদিত্য অর্থাৎ সবিতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, বিষ্ণু মার্ত্তণ্ডাদি সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে অন্য কোনও মূর্ত্তিকে কন্যা-সম্প্রদানকারিরূপে স্থাপিত না করিয়া সবিতাকে কন্যাকর্ত্তৃরূপে পরিচিত করা হইয়াছে, তাহা ১০।৮৫।৯ ঋকের "সবিতাদদাৎ" ও ১৩ ঋকের "প্রাগাৎ সবিতা" দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি। সকলেই জানেন, উদয়ের পূর্ব্ব অবস্থায় সূর্য্য-মূর্ত্তিই সবিতা নামে পরিচিত। ১।৩৫।১০ ঋকের "হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ স্ববাঁ যাত্ব-র্বাঙ্। অপসেধন্রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ"। অর্থাৎ, "হিরণ্য-পাণি প্রাণদাতা সুনেতা হর্ষদাতা সবিতা অভিমুখ হইয়া আসুন, সেই দেব রাক্ষস ও যাতুধানদিগকে নিরাকরণ করিয়া প্রতি রাত্রি স্তুতিপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করুন।" ২।৩৮।১ ও ৬।৭১।৪ ঋকের "উদ্বয়ং দেবঃ সবিতা" এবং ৫।৮১।২ ঋকের দ্বারা বুঝিতে পারি, উদয়ের পূর্ব্ব অবস্থার সূর্য্য মূর্ত্তিই সবিতা নামে অভিহিত। তৎপরে উদয় হইতে (১০।১৭।১।১ ঋক) পূষা, ভগ, অর্য্যমা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির আগমনকাল। এই সবিতা কন্যাকর্ত্তৃরূপে পরিচিত হওয়ায় প্রাচীন বৈদিক সময়েও বিবাহকার্য্য যে রাত্রিতে, অন্ততঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী "জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়া মুদ্বহেদ্যদি" (উদ্বাহ-তত্ত্ব) অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা থাকিতে অগ্রে কনিষ্ঠার বিবাহ দূষণীয়। ইহুদি জাতির মধ্যেও এই প্রকার প্রথা ছিল। যাকোবের সহিত লেয়ার বিবাহকালের কথোপকথন—"লাবন কহিল, জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্ত্তব্য" (Genesis 29—26) ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ।

জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠার বিবাহ অকর্ত্তব্য।

প্রাচীন পারসীকদের মধ্যে বিবাহকালে কন্যাকে কিছু পরিমাণ শুল্ক দান করিবার প্রথা ছিল। আবেস্তা শাস্ত্রে (Khord Avesta, 49) ইহার উল্লেখ আছে। আর্য্য জাতির বিবাহকালে বরকে শুল্ক নামে কিছু পরিমাণ অর্থ কন্যাকে দিতে হইত। "কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং

মোহর ও শুল্ক।

ব্রিয়েত যদি শুল্কদঃ। দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে।" (মনু ৯।৯৭) অর্থাৎ, বিবাহার্থ যদি কেহ কোনও শুল্ক দিয়া বিবাহের পূর্ব্বে গতাসু হয়, তবে কন্যা সম্মত হইলে, উক্ত শুল্কদাতার কনিষ্ঠের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে।" মনুসংহিতা-রচনার পূর্ব্বেও শুল্কপ্রদান-প্রথা প্রচলিত ছিল।

"নানুশুশ্রম জাত্বেতৎ পূর্ব্বেষ্বপি হি জন্মসু। শুল্কসংজ্ঞেন মূল্যেন ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥" (মনু ৯।১০০) অর্থাৎ, পূর্ব্ব কল্পেও শুল্কচ্ছলে গোপনভাবে স্বীয় কন্যা বিক্রয়-করিবার কথা শুনা যায় নাই।

বিবাহকালে কন্যাকে শুল্ক (মোহর) প্রদান প্রাচীন কাল হইতে ইব্রিয় সমাজে প্রচলিত আছে। ইহা হিব্রু ও আরবীতে 'মোহর' নামে পরিচিত। বাবেল-বাসী প্রাচীন সেমীয়দের মধ্যেও মোহর দিবার প্রথা (Assyria and Babylon 46) প্রচলিত ছিল। কন্যাকে শুল্ক বা মোহর-প্রদান ব্যতীত বর পক্ষ হইতে ইব্রিয় কন্যার অভিভাবককে উপঢৌকন (Genesis 24—53) দিবার প্রথা ছিল।

ইব্রিয় বর শোভাযাত্রা করিয়া কন্যার পিত্রালয়ে (Genesis Jeremiah 25—10) গমন করিত; সঙ্গে গান বাদ্য (Genesis 31—27) থাকিত। বর কন্যার পিত্রালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে কন্যা-পক্ষ হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক আলোক-হস্তে (Matthew 25-1-10) বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইত।

শোভাযাত্রা।

বৈদিক কালেও আর্য্য বর শোভাযাত্রা করিয়া বিবাহ করিতে যাইত। ইহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৬—১৩ ঋক পাঠ করিলে বুঝা যায়। রামায়ণের যুগেও (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৩।৩৮) বিবাহে গীত বাদ্য হইত।

বৈদিক বিবাহের শোভাযাত্রার মশাল বা Torch থাকিত, তাহা ১০।৮৫।৪৮ ঋকের "অগ্নিরা আসীৎ পুরোগব" দ্বারা জানা যায়।

প্রাচীন কালে আর্য্য জাতির বিবাহে বর ও কন্যার সহচর ও সহচরী থাকিত। ইহা কুমারসম্ভব ৭।১৯ ও রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৪।৫ শ্লোক, এবং ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৬,৯ ঋক পাঠে জানিতে পারা যায়। ইব্রিয় বরের সহচর (Judges 14—11) ও কন্যার সহচরী (Matthew 25—1, John 3—29) থাকিত। স্বামীর আলয়ে গমনকালে ইব্রিয়-কন্যার সঙ্গে সঙ্গে দাসী (Genesis—26—11, 29—23) এবং সহচরী (Psalms 45—14) যাইত।

সহচর ও সহচরী

ইব্রিয়-কন্যা বিবাহদিনে স্নান, তৈলমর্দ্দন, নববস্ত্র-পরিধান (Ruth 3—3, Psalms 45—8) করিত। আর্য্য-কন্যাকেও বিবাহের পূর্ব্বে 'অভ্যঞ্জন' বা তৈলাদিমর্দ্দন (১০।৮৫।৩৪ ঋক) এবং "সূর্য্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাত্ররৈতি পরিষ্কৃতম্" (১০।৮৫।৩৬ ঋক) এবং "জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ" (৪।৩।২ ঋক) অর্থাৎ কন্যাকে উত্তম বসন পরিধান করিতে হইত, ইহা জানা যায়। ইহার বিশদ বর্ণনা কুমারসম্ভবের ৭।২—১১ শ্লোকেও আছে।

স্নান ও অভ্যঞ্জন, নববস্ত্র-পরিধান।

ইব্রিয়-কন্যার কেশবিন্যাসের বর্ণনা Isaiah 3—24 পদ পাঠে অবগত হইতে পারি। ইব্রিয় নর-নারীর নানা প্রকার কেশবিন্যাসের বর্ণনা বাইবেলের বহু পদে দৃষ্ট হয়। বিবাহকালে ইব্রিয়-কন্যার হস্তে এক-খানি দর্পণ দেওয়া (Isaiah 3—23) হইত। ইহা ধাতু-নির্ম্মিত ছিল। আর্য্য-কন্যাও বিবাহদিনে কেশবিন্যাস করিত। ইহা ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৮ ঋকের "ওপশ" অর্থাৎ কবরী (খোঁপা) ও কবরীর (ওপশ) কাঁটা বা অলঙ্কার "কুরীর" শব্দ হইতে জানা যায়। দত্ত মহোদয় 'ওপশ' শব্দের অর্থ—রথের অভ্যন্তরভাগ ও গ্রিফিথ uncertain বলিয়াছেন। উভয়েই বলেন,—'কুরীর' শব্দের অর্থ—কুরীর নামক ছন্দ। ঋগ্বেদের ১০।১৩০ সূক্তে ও অন্যান্য স্থলে অনেক ছন্দের নাম-উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কুরীর' নামক কোনও ছন্দের উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে আমরা বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত একমত। ১০।৮৫।৮ ঋকের "প্রতিধে" শব্দের অর্থ দর্পণ কি চক্রাশ্রয়, তাহা আলোচনা-যোগ্য। যে ঋকে 'ওপশ' ও 'কুরীর' ইত্যাদি সাজ-সজ্জার বর্ণনা আছে, তাহার সংস্রবে চক্রাশ্রয়ের উল্লেখ না হইয়া দর্পণের উল্লেখ হওয়াই সঙ্গত। আর্য্য-কন্যার হস্তেও বিবাহকালে দর্পণ দেওয়া (কুমারসম্ভব ৭।২৬) হইত।

কেশবিন্যাস ও দর্পণ-ধারণ।

"চিত্রিরা উপবর্হণম্ চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্" (১০।৮৫।৭ ঋক) এই ঋকের 'উপবর্হণ' শব্দের অর্থ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় উপঢৌকন ও গ্রিফিথ উপাধান অর্থাৎ বালিশ বুঝিয়া, তাহার অনুবাদে Pillow করিয়াছেন। এই ঋকটি কন্যার বিবাহকালীন সাজ-সজ্জা-সম্বন্ধীয়। উক্ত ঋকের 'অভ্যঞ্জন' শব্দের অর্থে তৈলাদি-মর্দ্দন বুঝায়। যে ঋকে তৈলাদিমর্দ্দন আছে, তাহার সংস্রবে, কিংবা বিবাহকালে বালিশের (Pillow) কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, বুঝিতে পারিলাম

Saharon ও শেখরশ্রী।

না। পরবর্ত্তী অন্যান্য ঋকে পৃথকরূপে উপঢৌকনের উল্লেখ দেখা যায়। 'বর্হ' অর্থে দীপ্তি পাওয়া, কিংবা ময়ূরপুচ্ছ। যাহা উপরে বা ঊর্দ্ধে ময়ূরপুচ্ছাকারে দীপ্তি কিংবা শোভা পায়, তাহাই "উপবর্হণ"। ইহাতে মস্তকের মুকুট বা তত্তুল্য কিছু বুঝায়। সায়নাচার্য্য অন্যত্র (১।১৭৪।৭ ঋকে) "উপবর্হণ" শব্দের অর্থ শয্যা, এবং গ্রিকিথ covering করিয়াছেন। কালিদাস হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনায় বরের মস্তকালঙ্কার অর্থাৎ "শেখরশ্রী"র উল্লেখ (কুমারসম্ভব, ৭।৩২) করিয়াছেন। ইব্রিয় বর ও কন্যার মস্তকে ও ললাটে বিবাহকালে এক প্রকার মুকুট থাকিত। হিব্রু ভাষায় ইহা "Saharon" (Isaiah 3—18) নামে পরিচিত। ইব্রিয়-জাতীয় ধর্ম্মপ্রচারক আব্রাহামের বংশধর ও অনুসরণ-কারী হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীদের দ্বারা যে সমস্ত ইব্রিয় ও আরবীয় আচার ব্যবহার ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, বিবাহে এই "Saharon"-এর ব্যবহার তন্মধ্যে অন্যতম। উত্তর-বঙ্গের মুসলমান সমাজে ইহা "সেহেরা" নামে পরিচিত।

ইব্রিয়-কন্যা বিবাহকালে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিত। ইহার উল্লেখ Psalms 45—8 Isaiah 3—20 পদে আছে। সুগন্ধি দ্রব্য কোনও আধারে বা কৌটায় (Isaiah 3—20) রাখা হইত।

সুগন্ধি ব্যবহার

আর্য্য-কন্যা বিবাহে চন্দন ও অগুরু দ্বারা চর্চ্চিত হইত। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে সুগন্ধি দ্রব্য (রামায়ণ, আদি, ৭৩—২১—২২) ব্যবহৃত হইয়াছিল। কালিদাস হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনায় অগুরু ও তালের নামক গন্ধদ্রব্যের উল্লেখ (কুমারসম্ভব ৭।৪—১৫) করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৭ ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধে 'অভ্যঞ্জন' ও তৎপূর্ব্ব ঋকে বস্ত্রাদির উল্লেখ আছে। ঐ ৭ম ঋকে "দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ" কথা দৃষ্ট হয়। 'কোশ' শব্দের অর্থ দত্ত মহোদয় কোশ, এবং গ্রিকিথ Treasury (ধনাগার) করিয়াছেন। কোশ শব্দের অর্থ ধনাগার ও সুগন্ধি পাত্র, দুই-ই হইতে পারে। এ স্থলে সুগন্ধি পাত্রই গ্রহণ করা উচিত। ইব্রিয় ভাষাতেও কোস (Kos) শব্দের অর্থ পাত্র বটে।

ক্রমশঃ।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহমেদ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। বৈশাখ। এই সংখ্যায় তিনটি গান ও একটি কবিতা আছে। কবিতা বাঙ্গালা মাসিকে এমনই বহুসংখ্যক মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে যে, 'তত্ত্ববোধিনী'র মত বর্ষীয়সী পত্রিকাও 'যেমন-তেমন চাকরী-ঘি-ভাতের মত-যেমন-তেমন-কবিতার বুদ্বুদ'-মার্কা ওজরাপঙ্কমের মায়া অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 'আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে' নামক ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথম দুই কলি চলনসই। শেষ তিন ছত্র সুরাভাসের প্রতিধ্বনি। সর্বশেষ ছত্র পাদপূরণার্থ টানিয়া বোনা। স্বরলিপির 'হরি তোমা বিনা' ইত্যাদি গানেও কোনও বিশেষত্ব নাই। 'মেঘের মালা'র নমুনা—'নীলিমায় যে পড়নে লুটে সুরে যাবে এই প্রাণ।' বাস্তবিক মাসিক-পত্রগুলি যেন কবিতা-রচনার কসরতের ক্ষেত্র হইয়াছে। 'মায়ের রূপে ভরেছে ভুবন' সূচীপত্রের ইঙ্গিত অনুসারে 'প্রবাসী পদচ্ছায়া'। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, ইহাতে প্রবাসী নখচ্ছায়াও নাই। 'কেশবচন্দ্র ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ে' সেকালের অনেক কথা আছে। 'নারায়ণ' ইহার কি টীকা করেন, দেখা যাক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রাচীন স্মৃতিকথা' সুখপাঠ্য। বাঙ্গালা সাহিত্য ইহা দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করিবে। চরিত-বিভাগে বাঙ্গালা-সাহিত্য এখনও অভ্যন্ত দীন। বিদেশের মহাপুরুষ ও কর্মবীরগণের জীবন-কথা বাঙ্গালায় সঙ্কলিত হইলে আমরা উপকৃত হইব। শ্রীরামেন্দ্র মাষ্টার ও শ্রীকিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৈয়াসিকী ন্যায়মালা'র অনুবাদ করিতেছেন। ইহা তত্ত্ববোধিনী'র উপযুক্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ' বহুদিন পূর্বে লিখিত। তাঁহার কৃতী পুত্র কিতীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে তাহা পড়িবার অবকাশ দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই প্রবন্ধের ৬১শ পৃষ্ঠার পর—বত্রিশ পৃষ্ঠায়—অন্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—'সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড, গোড়া নাই, আগা।' ইহাও সেইরূপ। 'আকর্ষণে'র আরম্ভটা আছে, শেষটা নাই। আর একটার গোড়া নাই, শেষটা আছে। শ্রীনিবাসাচার্য বেদান্ততীর্থের 'তন্ত্রের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। বেদান্ততীর্থ মহাশয় সুপণ্ডিত, নৈয়ায়িক, এবং তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী। তন্ত্রই তাঁহার জীবনের ব্রত। এরূপ বিশেষজ্ঞের রচিত ইতিহাসে আমরা নিশ্চয়ই তন্ত্রের ধারাবাহিক পরিচয় পাইব। পর্যায়ক্রমে একটি কথা বলি,—বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন,—'তন্ত্রের মন্ত্রবিশেষ মনুপাসিত বলিয়া পরিচিত; সুতরাং মনুর সময়েও উহা প্রচলিত ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়।' তন্ত্রসারে 'মনুপাসিত' বলিয়া পরিচিত, অতএব মনুর সময়েও প্রচলিত ছিল, এ সিদ্ধান্ত কি প্রামাণ্য? ফ্রান্সের 'রনাজন' হইতে চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক যে পত্র লিখিয়াছেন, 'তত্ত্ববোধিনী'তে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। আমরা মুদ্রিত করিলাম।—'এবারে শীত উত্তর ফ্রান্সে কাটিয়েছি। শীতে কষ্ট কিছুই হয় নি। যাক্, একটা প্রকৃতির ভিন্ন চিত্র দেখা গেল—এ দেশে যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে, কিন্তু কঠোরতারও অভাব নেই। এ দেশের লোকের চরিত্র কঠিন, কষ্টসহিষ্ণু করে তোলবার জন্য প্রকৃতির এই কঠোরতা। এদের সঙ্গে থেকে আমাদের চরিত্রেরও একটু পরিবর্তন ঘটেছে—কষ্টে আর কাতর হই না। কোন বাধা আর আমাদের বিঘ্ন ঘটায় না—কষ্টে পড়লে মানুষকে কতটা সহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং বিলাসত্যাগী হতে হয় তা শিখ্‌ছি। মানুষকে বাঁচতে হলে

তাকে কতটা Struggle করতে হয় তার এই প্রথম শিক্ষা হল। আজকাল পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতি বাঁচবার জন্যে নিজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে প্রকাশ রাখবার জন্য চেষ্টা করছে—শুধু যে জাতিগুলি, তা নয়; প্রত্যেক সম্প্রদায়ও নিজের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করছে। সকলেই এখন Egalite (equality) আর Fraternitea (fraternity) জন্য চেষ্টা করছে। সব চেয়ে যারা নিম্নশ্রেণীর লোক, তাদের উৎকণ্ঠাই বেশী। তারা আর তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, তারা সমাজে একটা ভাল জায়গা খুঁজছে। এই ত গেল Social অবস্থা, পলিটিক্যাল জগতেও সমতার দ্বন্দ্ব চলছে। ছোট-বড় অধীন-স্বাধীন সব জাতিই একটা Equal footing খুঁজছে। একটা জাতির কতটা দায়িত্ব, তাকে পৃথিবীতে সম্মান বজায় করে থাকতে হলে কতটা স্বার্থত্যাগ, কত পরিশ্রম করতে হয়, তা এই দেশকে দেখলেই বেশ দেখা যায়। আর আজকাল ফ্রান্সে সব জাতির সমাবেশ—প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু দেখবার আছে—জাতি-চরিত্র-শিক্ষার এক মহাসুযোগ।'

সবুজ পত্র। বৈশাখ। প্রথমে শ্রীরবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্রথিত গল্প 'মুক্তি'। ইহা কবিবরের নব-রচিত ছন্দে সহজ কথায় লেখা। ছোট জীবনের ছোট কথা, কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, ইহাই ত মানব-জীবনের বড় কথা। বিশ্বের একটা সনাতন স্মৃতি করুণার লেখায়, চিন্তার রেখায় এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিতা, রূপক, সমস্যা প্রভৃতি নানা উপাদানে 'ভারতবর্ষ' নামক যে প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন, তাহার উপসংহার এই—'এই যে তিন মহাজাতি—এই যে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান—এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন মহাজাতিকে মন্থন করে, কত হলাহলের পর কবে কোন্ অমৃত উঠবে তা কে জানে? তবে অমৃত যে একদিন উঠবেই, সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।' তথাস্তু।—'ক্ষত্রিয়'কে ক্ষত্রিয় করিবার কারণ কি? এ ঘানানের সঙ্গে যে অর্থের সংযোগ আছে। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 'নব-বিদ্যালয়ে' বেলজিয়মের 'নব-ইউনিভার্সিটী'র এক জন অধ্যাপক Faria de Vasconcellos কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নব-বিদ্যালয়ের পরিচয় অধ্যাপকের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। যাঁহারা দেশের কথা ভাবেন, তাঁহাদিগকে প্রবন্ধটি পড়িতে বলি।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। বৈশাখ। শ্রীজলধর সেনের 'ছোট গল্প' পড়িয়া লেখকের বাহাদুরী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইহা 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনে পঠিত' হইয়াছিল! এই প্রবন্ধ জলধর বাবু সম্মিলনে পড়িয়াছিলেন, এবং সত্যেন্দ্র বাবু তাহা 'সম্মিলনে' ছাপিয়া দিয়া জলধরবাবুকে জব্দ করিলেন! জলধর বাবু এই প্রবন্ধে প্রথমে 'গল্পের বৈজ্ঞানিক লক্ষণ' নির্দ্দেশ করিয়াছেন! তাহার পর ছোট গল্পের চৌহদ্দী বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই লক্ষণ ও চৌহদ্দী তুলনারহিত, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। জলধর-বাবু চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই; মধুকরের মত নানা ফুলের মধু সংগ্রহ করিয়া এই ছোট-গল্প-প্রবন্ধচক্রে সংগ্রহ করিয়াছেন; এমন কি, পাঁচকড়ি বাবুর 'কথাটা কি জানো'ও বাদ যায় নাই। তবে জলধর বড় বিনয়ী, তাই 'জানেন' করিয়া দিয়াছেন। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?' শ্রীমতী সরলা দেবী 'রামপ্রসাদের পদাবলী' প্রবন্ধে প্রধানতঃ গুরু ও গুরুমন্ত্র

সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।—বীজমন্ত্রের রূপবিকাশক শক্তি আছে। লেখিকা বলেন,—'শব্দের রূপবিকাশক শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও আজকাল নানা অনুসন্ধানলব্ধ ফলপ্রাপ্তি হইতেছে। Science class এ বিবিধবর্ণ শব্দের দ্বারা গালিম তাঁর জ্যামিতিক রূপগঠনের experiment অনেক ছাত্রই দেখিয়াছেন। আবার অবিধিবদ্ধভাবে উচ্চারণের দ্বারা কাচের দণ্ড ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়, ইহাও দেখা গিয়াছে। হিন্দুদের রাগ রাগিণীর রূপকল্পনা এবং শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, এই ধারণা যে সমূলক হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এখন আমরা মানিব। অনিয়ত শব্দের দ্বারা যদি কাচের জিনিস ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তবে দেবর্ষি নারদ একবার অনেকগুলি মনুষ্যদেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন, এ পৌরাণিক কাহিনীও যে সত্য হইতে পারে, তাহাও বোধ হয় আমরা এখন স্বীকার করিব। অধ্যাপক Tyndall এর শিষ্যা Mrs.—Watts Hughes তাঁর—"Voice Figures" নামক গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের দ্বারা যে নিয়ত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অঙ্কিত করা যায় তাহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি একটী ডুগ্‌ডুগীর মত জিনিসের বিস্তৃত চর্ম্মের উপর বহুল Lycopodium এর রেণু ছড়াইয়া তাহার সঙ্গে একটী নল সংযুক্ত করিয়া একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রের মুখে ভিন্ন ভিন্ন Pitch ও Rythm সংযুক্ত ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এই ধ্বনিতে Lycopodium পরাগগুলি স্পন্দিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রচনা করে। ইহার ফলে Lycopodium এর পরাগের দ্বারা পশু, পক্ষী, সাপ, নদী, পাহাড়, বাড়ী, বৃক্ষ ও ফলফুল রচিত হয়। একবার হঠাৎ তাঁহার গানের ফলস্বরূপ একটী Lily পুষ্প রচিত হইল। তিনি অনেক দিনের সাধনায় ও অধ্যবসায়ে ধরিতে পারিয়াছেন কোন্ নিয়ত-স্বর-সংযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করিলে পরাগগুলি Lily র আকার ধারণ করিবে। আমাদের প্রাচীন মন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌গণও এই কথাই বলেন। বিভিন্ন উচ্চারণের ফলে আকাশে শব্দের দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন রূপের সাধন হয়। সেই বিধি অনুযায়ী ধ্বনিবিজ্ঞানের দ্বারা ঋষিরা বৈদিক মন্ত্র ও বীজমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। যিনি সেই ধ্বনিবিজ্ঞানজ্ঞ তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যে সে নহে। ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা ইষ্টদেবতার রূপ পরিচ্ছিন্ন হয়, এবং সেই রূপে মহাচৈতন্যের চৈতন্যশক্তির অধিষ্ঠান হয়। * * উপসংহারে লেখিকা বলিয়াছেন,—আমাদের আর্য্য সাধনা ও জ্ঞানের সমন্বিত রূপের মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি, গুরুর বদলে অতিবিজ্ঞতার দেখা হইয়া কথায় কথায় বলি,—Gurudom এর প্রশ্রয় দিব না—তখন কখন কখন মনে হয়, হয় ত রামপ্রসাদের ভাষায় আমরা—সোনা ফেলে রাং নিয়েছি, রাঙ্গার দরে সোনা বেচেছি।' ইহা কি আমাদের প্রতিঘাত? ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া? এই সংখ্যায় 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস-শাখার সভাপতিত্রয়ের অভিভাষণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির 'স্বাগতম্' প্রকাশিত হইয়াছে।

সৌরভ। বৈশাখ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার টলষ্টয় হইতে 'তীর্থযাত্রী'র অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদে ভাষার জড়তা আছে, কিন্তু তথাকথিত ছোট গল্পের অপচার অপেক্ষা বিশ্বসাহিত্যের এই সকল সৃষ্টির অল্প-পরিচয়ও আমরা সমাজের ও সাহিত্যের পক্ষে হিতকারী ও উপকারী বলিয়া মনে করি। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসের 'বৈদিদি' নামক কবিতার প্রথমার্দ্ধে

'ফাল্গুনে'র ছবি উপভোগ্য। শেষাংশের 'বৌদিদি' টানিয়া বোনা; 'চন্দন' 'সুরুমে'র কবির যোগ্য নয়। 'নেপালী দরবারে'র প্রথম প্যারায়—'নেপালে প্রায় সকল জিনিসই সস্তা।' তাহার পর, অরূপক ইতিহাস।

সন্দেশ। বৈশাখ। 'অনেকটি রঙিন চিত্র' নামক রঙীন ছবিখানি চমৎকার। শ্রীমতী সুখলতা রাও-এর 'আকাশের আলো' নামক কবিতাটি বেশ হইয়াছে। 'তারকাসুর' সুলিখিত পৌরাণিক গল্প। 'নিমন্ত্রণ' চন্দ্রমল্লিই ছোট গল্প। 'হো' ও হো জাতির উপকথা 'পেরাল আর কুমার' সুপাঠ্য। 'উটপাখী' পড়িয়া সন্দেশের পাঠকেরা যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবে। 'আশ্চর্য্য আলো' সহজ ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'আবোল তাবোল' আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য বটে। 'সন্দেশে'র পাঠকপাঠিকারাই ইহার যাচাই করিবে। বাহিরের 'প্রাড্‌বিবাক' এ ক্ষেত্রে অনর্থক!

ভারতী। এই সংখ্যায় 'ভারতী' একত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল।—দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, সরলা ও হিরণ্ময়ী এই ভারতীর পুরস্ত্রী ছিলেন; এই ভারতীর পীঠে কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-সাধনার সূচনা। সেই ভারতী। 'ভারতী' পূর্ব্বগৌরবের স্মরণে, পূর্ব্বপথের অনুসরণে ধন্য হউক।—সে স্মৃতির বাধা পরিপন্থী, তাহা বর্জ্জন করিয়া—'ভারতী' আবার নব-ভারতের নূতন আশার ছটায়, মহিমায় মণ্ডিত হউক।—প্রথমে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অরুণিমা'—একখানি ছবি। একটু 'হলুদিনা' আছে, অবশিষ্ট সমস্ত 'ভস্মিমা'। ইহা বোধ হয় ইথরে আঁকা, তাই সবটা দেখিতে পাইলাম না। চিত্র বোধ হয় নিরবলম্ব, তাই অরুণিমা ত্রিশঙ্কুর মত পটের মধ্যপথে দোদুল্যমানা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যবধ্বনি' কি ভয়ঙ্কর! ইহা 'কবিতায় কৃত্রিমতার জয়ধ্বনি' বটে। উপস্থ ভাবটি কষ্টকল্পনায় অত্যন্ত 'আড়ষ্ট' হইয়া পড়িয়াছে। শুরু-চণ্ডালীর এত সমারোহ, এত বৈভব আর কখনও একত্র দেখিয়াছি কি? স্বেচ্ছাচারিতার 'ভস্মার ডিণ্ডিমে' ও 'খুন-সুঠন-রত, ক্রূর-নিষ্ঠুর যত' নৃত্যদোষের তাণ্ডবে কবি-কল্পনার এমন দুর্লভ বৈভব 'মাঠে মারা গিয়াছে।' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যন্ত্র-সরস্বতী' মুন্সীয়ানার কুতুব-মিনার। বহুকাল বাঙ্গালা মাসিকে এমন উপভোগ্য রচনা পড়ি নাই। ছন্দোবর্ণন, বিচারশক্তি ও অনুশীলনের বেতনে এই নিবন্ধটি যেমন সমৃদ্ধ, সত্যনির্দ্দেশেও তেমনই সফল হইয়াছে। ইহাতেও মুদ্রাদোষ আছে, কিন্তু 'অলমো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।' চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মনস্তাপ ক্ষুধা' সুপাঠ্য গল্প।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রূপ-রেখা' সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ। 'ভাব-রূপকে গোচর করবার শক্তি কেবল বস্তুতে নেই, কিন্তু কেবল রেখাতে আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তিতে বাস্তবিকতা নেই বল্লেও চলে। * * বুদ্ধদেবের ভাব-রূপ—চোখ দুটির নত-রেখায়, মৌন ঠোঁটে আনন্দের একটু তরঙ্গিত টানে—এখানে সজীব হয়ে দেখা দিয়াছে।" চিত্রকলার অনুরাগিরা এই প্রবন্ধে অনেক ইঙ্গিত ও চিন্তার উপাদান পাইবেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নদিনের দাগা' বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। পদ্য-গদ্য অবশ্য নূতন নয়; গল্পগুলির রচনা-রীতি সম্পূর্ণ অভিনব। নমটি শেষ করিতে করিতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে। অত্যন্ত সহজ ভাবে, নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর মর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীঅরুণানিবাস

বন্দ্যোপাধ্যায় 'লুকানো ছবি' টানিয়া বাহির করিয়া বাজারে লাহির করিয়াছেন। এ উন্মত্ত-প্রলাপ যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'নূতন আলো' নামক ছবিখানির কল্পনায় কবিত্ব আছে। আলো-ছায়ার সমাবেশেও নিপুণতা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' বরযাত্রী ঠকানো প্রশ্নকে ঠকাইয়া দিয়াছে। শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ম্যালেরিয়া-নিবারণের একটি দৃষ্টান্ত' আমরা সকল বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বৈশাখে' একটি বিফল অবহেলিকা। ইনি বেশ ছবি আঁকেন—

'আগুনের সর্ব্বাঙ্গে আবরিয়া শীর্ণ কলেবর বৈশাখ এসেছে নামি।'

তার পর, এলাইয়া পড়েছে প্রান্তর ক্লান্তির বুকে।' খুব ঘন রূপক। কিন্তু অচল নয়। কিন্তু 'ভ্রমে-ফুলে মধু আসে।' তার পর, 'কল্পনার ক্রমবিকাশ সহীন হইয়া উঠিয়াছে।' 'পথের ধূলার তলে অনলের দাহন ঘুমায়।' তার পর, সেই 'দাহন' পরবর্ত্তী পাঁচ লাইন ধরিয়া 'অলক্ষ্য চুমুকে ধরণীর উরসের নিভৃত সরস করি নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া দান অফুরন্ত হউক, কবির কল্পনা ঘটোধ্বী বটে। বাঙ্গালা কবিতায় যাহা দেখা যায় না, অথচ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালার প্রাণ একদিন কবিতায় মুখর হইত, সেই 'চাষাকে বৈশাখের রৌদ্রে প্রান্তর 'পিপাসায় একান্ত অধীর' দেখিয়া ছুটিয়া যাইতে হয়, কিন্তু কবি-তৎক্ষণাৎ সম্মুখে অবোধ্য-কাব্যি-কুহেলিকার যবনিকা বিস্তৃত করিয়া দিলেন। সত্যই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, 'চাষার নাগাল পালাম না লো সই!' বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব ক্ষুরধার বটে, কিন্তু এমন কবিতায় বঙ্গিলে কদিন টিকিতে? 'পড়িল ভেড়ার পৃষ্ঠে ভাঙ্গে হীরার ধার' মনে আছে ত? এমন কবিকূট রচনা করিয়া আমাদিগকে আশাভঙ্গের বেদনায় পীড়িত করিবার কারণ কি? শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর 'মাতা মন্থ' পড়িয়া বিদ্যারত্ন উমেশচন্দ্রের জন্য দুঃখ হয়। তাঁহার 'মাতা মন্থ' ইহার কাছে কোথায় লাগে? রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল উপভোগ' আশ্চর্য্য। আজকাল তাঁহার অনেক লেখাই বুঝা যায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্যোত্তমের এ সম্প্রদায়ের রচনায় হস্তস্ফুট হয় না। 'শিষ্যবিদ্যা পত্নীয়সী'।

প্রতিভা। 'স্বাগতম্' শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের উচ্ছ্বাস। ক্ষণস্থায়িকতা আছে। বৈশাখের 'নব্য-ভারতে' শ্রীরোহিণীকুমার গোস্বামী লিখিয়াছেন,—'তিনি 'পদ্মা পারের' যাত্রীকেই বরণ করিলেন, আর যাহারা 'সারাপুল' হইয়া আসিয়াছেন—ময়মনসিংহ, কুমিল্লা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু কহিলেন না।' শ্রীননীমোহন সেনের 'সাগর-সঙ্গম' শেষ হইয়াছে। 'শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!' শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'ধারক পাখী' উল্লেখযোগ্য। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নের 'প্রাচীন সঞ্চার' তথ্যপূর্ণ। ইহাই এবার 'প্রতিভা'র মান রাখিয়াছে। 'মনের পাখী' অসম্পূর্ণ। তথ্যনির্দ্দেশেও শিরোনামে কবিতা। শ্রীকালিদাস রায়ের কুইনাইন আছে। গৌড়ীয় কবিতা-ব্যাধির ঔষধ নাই।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	৭	নিন্দুক	নিন্দক
৭১	৯	প্রতিকা	পঞ্জিকা
৭৯	২	সর্ব্বনা	সর্ব্বদা
৭৫	১১	সিমলোন	সিমলোন
৭৫	২৪	পঞ্জিকা	পঞ্জিকা

চির-সুন্দরী।

১

নিভৃত হৃদয়-মাঝে একদা জাগিলে কবে—
হে চির-সুন্দরি!
চাহিলে অপাঙ্গে বুঝি, বিশ্বের মানস তাই
উঠিল মুখরি'।
পিক-পাপিয়ার কণ্ঠ দিলে তুমি পূর্ণ করি'
নিজ কণ্ঠ-গীতে;
সৌন্দর্য্য-সম্পদ তব মুষ্টি-মুষ্টি ছড়াইয়া—
দিলে চারি ভিতে।

২

হরিণীর নেত্রে দিলে কজ্জলে আঁকিয়া তব
নয়ন-সুষমা;
তোমার অধর-রাগ দিলে নব কিশলয়ে,
অয়ি নিরুপমা!
কেশগুচ্ছে দিলে রচি'— কলাপীর পুচ্ছভার
চন্দ্রক-মালায়;
তন্বী দেহলতা দিলে মাধবীরে অনুরাগে
হে দেবি, লীলায়!

৩

তব ভাবে মুগ্ধ কবি অন্তরে বাহিরে খুঁজি
না পায় আভাস।
তুলিকায় চিত্রকর তোমারে চিত্রিতে নারে,
ভাস্কর নিরাশ।
কাব্যে, পটে—কোথা তুমি? মর্ম্মরে গড়িবে কেবা
তোমার মোহিনী?

কবি-ভাব্য তব রূপ, শিল্পীর অনধিগম্য
তোমার মহিমা!

৪

দিকে দিকে ব্যষ্টি-রূপে তোমারে দেখিতে পাই,
সমষ্টি কোথায়?
সমস্ত জীবন ধরি' করিনু তপস্যা তব,
তবে কি বৃথায়?
কোথা তুমি—কোথা তুমি, জন্ম-জন্ম খুঁজিয়াছি,
কোথা চির-প্রিয়া!
দেখা দাও পূর্ণরূপে, দেখা দাও স্বর্গ-মর্ত্ত্য
হৃদয় ব্যাপিয়া।

৫

অন্তর হইতে এস অন্তরাল ছিন্ন করি'—
হে চির-সুন্দরি!
সর্ব্বেন্দ্রিয় পূর্ণ করি'— সর্ব্বৈশ্বর্য্যে মূর্ত্ত হ'য়ে—
এস বক্ষে ধরি'!
এই স্পর্শে ধন্য হোক্ আমার জীবন-জন্ম—
আমার সাধনা!
এই রূপে মিলে যাক্, চরিতার্থ হোক্ মোর
কল্পনা—কামনা।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত-ঔষধ।

১

উপক্রমণিকা।

অনেক দিন পূর্ব্বে সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিব মনে করিয়াছিলাম। যে ভাবে প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলাম যে, তাহা সকলের মনঃপূত হইবে না। কারণ, তন্ত্র ও বিজ্ঞানের জটিল সংস্কার মধ্যে প্রবেশ করা একটা যন্ত্রণাময় ব্যাপার। এত কথা পাড়িতে হয় যে, তাহার শেষ

নাই, এবং সেগুলি বুঝাইতে হইলে নিজের অজ্ঞতা প্রবলভাবে অনুভূত হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে প্রবন্ধটি লিখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়াছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনাতে আশাটুকু আবার উদ্দীপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক জন বৃহৎ-পরিবার-বিশিষ্ট বন্ধু বহু বৎসরাবধি ডাক্তারের ও ঔষধের খরচে মহাক্লিষ্ট ও সন্তপ্ত হইয়া একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ও খানকতক বড় বড় পুঁথি সংগ্রহ করিয়া নিজেই চিকিৎসাবিদ্যা-পারদর্শী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার 'হাত-যশ' দেখিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে ঔষধ লইতে যাইতাম। সম্প্রতি একটু 'নক্সভমিকা'র দরকার হওয়াতে প্রাতঃকালে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া ডাকিলাম, 'দাদা, বাড়ী আছ ত?'

বন্ধু। ব্যাপারখানা কি? Constipation?

আমি। ঠিক। একটু Nux দরকার।

বন্ধু। আচ্ছা, তুমি একটু বসিয়া থাক।

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার শয্যাগৃহ হইতে একটি ক্ষুদ্র হার্ম্মোনিয়ম লইয়া তাহার সহযোগে একটা রাগ ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। আমার বোধ হইল, যেন আমার শরীরে সেটা Nux-Vomica'র কাজ করিতেছে। তিনি সেটা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন, 'আমি ঔষধের বাক্স সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছি।'

আমি (আশ্চর্য্য হইয়া)। 'কেন বলুন ত?'

বন্ধু। অনেক রকম ব্যাধি এবং গোলমাল কেবল গানেই সারিয়া যায়। সুতরাং আমার মতে বাটীর সকলকে ক্রমাগত ঔষধ না খাওয়াইয়া গান শিখানই উৎকৃষ্ট উপায়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, হানিমান-প্রবর্ত্তিত অনেকগুলি Mental and moral remedies কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রাগরাগিণীর মত। উভয়ের ফল একই, বরং ইহাতে খরচ কম।

আমি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া যাওয়াতে তিনি Organon, Kent's Materia Medica, Clarke's Materia Medica, Hughes, Farington, Allen প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় পুঁথি বাহির করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথাগুলি আমার মনে লাগিতে আরম্ভ করিল।

এমন সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্র সুধীর আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর ভয়ানক কোপন স্বভাবের বালক বলিয়া প্রখ্যাত, এবং তর্ক, দ্বন্দ্ব ও কলহে

খুব 'নিরুদ্যম'। কিন্তু এবার তাহার ধীর ও নম্র চেহারা দেখিয়া আমি বন্ধুকে বলিলাম, 'সুধীর সম্পূর্ণ বদলে গেছে।'

বন্ধু। হাঁ। পরজ রাগিণী অভ্যাস ক'রে। পূর্ব্বে আমি Ferrum phos, Chamomilla প্রভৃতি নানা-রকম ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু পরজ রাগিণীর মত ফল হয় নাই।

আমি। কথাটা বেশ, কিন্তু ঐ রাগিণীগুলি শেখায় কে?

বন্ধু। দেখিয়া শুনিয়া, সঙ্গীতের কেতাব পড়িয়া অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। নিজের সময় না থাকে, বাটীর মেয়েছেলেদের শিখাইলে চলে। কিন্তু এক জনের বেশী অভ্যাস ভাল না, কারণ সেটা 'Proving'-এর মত দাঁড়াইয়া যায়।

আমি বাটী ফিরিয়া কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে বোধ হইল যে, উহাদের মধ্যে অন্ততঃ খানিকটা সত্য নিহিত আছে। সেই অবধি মধ্যে মধ্যে কোনও ব্যারামের লক্ষণ হইলে দুই একটা রাগিণী 'গুন্ গুন্ করে' গাহিতাম, এবং উপকার পাইলে টুকিয়া লইতাম।

অবশ্য বলা বাহুল্য যে, আমার Provingsগুলি অতিশয় কাঁচা রকমের; কিন্তু তথাপি এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল-রোগ-শোক-পরিপূর্ণ সংসারে যদি কাহারও উপকার হয়, এই জন্য কথাগুলি এই প্রবন্ধে পাড়িয়াছি। কোনও উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে ইহা আরও সরস হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সঙ্গীত-তত্ত্ব।

(১) উপক্রমণিকা।

(২) সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি।

ক। 'মনের মতো' সুর।

খ। লক্ষণের তারতম্য।

গ। রোগের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ, এবং একটি উদাহরণ।

(৩) রাগরাগিণীর চেহারা—এবং তাহার সহিত Homeopathic Provingsএর সাদৃশ্য।

(৪) রাগরাগিণীর পরিবার—এবং কোন ঔষধের শ্রেণীভুক্ত।

ক। একান্নবর্ত্তী পরিবার।

খ। সধবা ও বিধবা রাগিণী।

গ। রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতির পরিচয়।

ঘ। পোলিটিক্যাল এবং সামাজিক রাগরাগিণী।

ঙ। কোরাস্, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি।

(৫) রাগরাগিণীর সংশোধন। (Principles of Social reconstruction).

ক। মিশ্র রাগিণী, জাতিভেদ।

খ। নূতন রাগিণী।

গ। প্রতিষেধ (antidotes)।

ঘ। Complementary রাগিণী।

(৬) দেহতন্ত্র।

ক। তানপুরা, গলা, পিয়ানো প্রভৃতি।

খ। রাগিণী কোথায় গিয়া পঁহুছে।

গ। আহার প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

ঘ। অনুপান।

ঙ। স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ।

(৭) তাল ও ছন্দ।

ক। প্রাকৃতিক রেখা lines, triangles, squares etc—curves and ellipses and circles.

খ। ভক্তিতত্ত্ব।

গ। দুর্ঘটনা—Cramps, Collapse and Convulsions. বিঘ্ন-বিরহ। with power to add to their number.

(৮) সঙ্গীত ও অ্যালোপাথি। যদি ক্রমে লিখিতে লিখিতে উৎসাহ বাড়িয়া উঠে, এবং অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার হয়, (সম্ভাবনা খুব কম) তবে অবশেষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব। সময়-সাপেক্ষ।

২

সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি।

জড়বিজ্ঞান দ্বারা সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করাই সাধারণ উপায়। অর্থাৎ, অমুক সুরগুলি হার্ম্মোনিয়মে কিংবা পিয়ানোতে ধ্বনিত করিলে, এবং সেগুলির মাত্রা ও লয় অমুক ভাবে বিন্যস্ত করিলে, অমুক গান অমুক প্রকারে গীত হয়, এবং তাহার মধ্যে অমুক ভাব বেশ প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাই পাশ্চাত্য

মত। পাশ্চাত্য মতে 'রাগিণী' বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু গানের নাম আছে, এবং সেই গানে অমুক ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, 'রাগিণী' বড়িয়া লওয়া মানবের আয়ত্তাধীন, এবং দশ জনে যদি বলে যে, তাহাতে ভাববিশেষ সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া উচিত। ডাক্তারী ভাষায় আমরা ইহাকে 'অ্যালোপাথি' মত বলিতে পারি। অর্থাৎ, অসুস্থ দেহযন্ত্রকে কতিপয় ঔষধ দ্বারা নির্জীব অবস্থায় পরিণত করিয়া, যদি তাহারই প্রভাবে স্বাস্থ্যের বিধান করা যায়, তবে সেই ঔষধগুলি অনেকটা 'মুমের' কাজ করে। দেহতত্ত্ব লইয়া 'অ্যালোপাথি'র সমস্যা।

কিন্তু আরও একটা মত আছে। 'রাগ' ও 'রাগিণী'র সরঞ্জাম বিশ্বের মধ্যেই আছে, এবং যুগে যুগে তাহার ক্রমবিকাশ হইতেছে। তাহাদের বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তাহার মধ্যে মানসিক লক্ষণই প্রধান। কতকগুলি নির্দিষ্ট রাগরাগিণী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, মনের উপর তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রভাব বর্তমান, এবং সেই প্রভাবের গুণে কতকগুলি ভাব স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে। যদি মন, কিংবা মনের বশবর্ত্তী হইয়া দেহযন্ত্র কোনও কারণে বিকল অথবা অসুস্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহার লক্ষণাবলী পরীক্ষা করিলে, 'কোন্ রাগিণীর মতো', তাহা স্থির করা যাইতে পারে, এবং হয় ত তাহা দ্বারা মন এবং দেহকে সুস্থ অবস্থায় পরিণত করিবার উপায় বাহির করা যায়।

এ মতের নাম 'হোমিওপ্যাথি' বলিলে চলে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত ইহার পার্থক্য বিশেষরূপে এখনও বুঝান হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র কতকগুলি ঔষধের প্রভাব মানবশরীরে পরীক্ষা করিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যে সকল বিশেষ মানসিক লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলি রোগেও সেই লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং সেই মানসিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে, দেহের বাহ্য রূপও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। এমত স্থলে সেই রোগের লক্ষণানুযায়ী ঔষধ সেবন করিলে, মন এবং দেহের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে।

অ্যালোপাথিক মতে কোনও ব্যক্তিগত লক্ষণের (individualism) বিচার হয় না। রোগীর মানসিক লক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। স্বাস্থ্য গড়িয়া লইতে হইলে ব্যক্তিগত লক্ষণকে চাপিয়া দিতে হইবে, এবং যে রকম করিয়া শরীরকে রক্ষা করিলে দশ জনে বলে—'ইহাই স্বাস্থ্য',

তাহাই করা সকলের কর্ত্তব্য। রোগী যদি ফ্লানেল ব্যবহার করিতে না পারে, তাহাকে অভ্যাস করাইতে হইবে, নচেৎ তাহার সর্দ্দি সারিবে না। কুইনাইন খাইয়া যদি রোগীর ধনুষ্টঙ্কার ঘটে, তথাপি ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনাইনের দরকার। রাগিণীর সম্বন্ধেও তাহাই। আমি যে কয়টা সুর দিয়া বিরহ-যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছি, তাহাই দশ জনের অনুমোদিত, এবং তাহাতেই তোমার বিরহ-যন্ত্রণা ঘটা উচিত, নচেৎ তুমি অসভ্য ও হেয়। তোমার ব্যক্তিগত লক্ষণের মধ্যে বিরহ-যন্ত্রণা না থাকিলেও, ঐ রাগিণীতে তোমার সেই যন্ত্রণা প্রকাশ হওয়া উচিত। অনেকের হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সভ্য-সমাজে তাহাই হইবে।

কিন্তু 'হোমিওপ্যাথি' মতে কুইনাইনের লক্ষণাক্রান্ত রোগীকেই কুইনাইন দেওয়া উচিত। যাহার 'বিরহ-যন্ত্রণা' মনোগত সংস্কারের মধ্যে নাই, তাহার পক্ষে সে যন্ত্রণা অযথাভাবে উত্তেজিত করিলে, তাহার কোনও ফল দর্শায় না, বরং রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা বিকল হইয়া পড়ে। মনস্তত্ত্ব লইয়াই হোমিওপ্যাথির সমস্যা। ব্যক্তিগত লক্ষণ দেখিয়া সে রোগ নির্ণয় করে, এবং সেই লক্ষণের অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিলে, উহার মতে,—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত রাগ রাগিণীর সহিত হোমিওপ্যাথির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এবং সেই সাদৃশ্য হইতে হয় ত আমরা সঙ্গীততত্ত্বের কিংবা সঙ্গীততন্ত্রের মূলে উপনীত হইতে পারি। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, যদিও চরক প্রভৃতি ঋষিগণ রোগের মূলে মনের সহিত সুস্থপ্রকৃতি আত্মার সম্বন্ধ বিচার করিয়া গিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী ঔষধেরও বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই ঔষধগুলি কি করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এ, অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আমাদের দেশের ঔষধশাস্ত্রও গুরুমুখী বিদ্যা। কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রের বহুলভাবে প্রচার হওয়াতে আমরা তন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ। রাগ রাগিণীর 'রূপ' ও 'মানসিক লক্ষণ' অনেক পুঁথিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাদের একটা চিত্র আছে। 'হোমিও-প্যাথিক্' ঔষধতত্ত্বেও সেই রকম অনেকগুলি চিত্র পাওয়া গিয়াছে। রোগীর অবস্থা ও 'রূপ' সেই লক্ষণগুলির অনুযায়ী। রাগিণীর মধ্যে ঋতুর প্রভাব ও [illegible]

হইয়াছে। রাগ রাগিণীরও যেমন 'ব্যক্তিগত সংস্কার' প্রধান, হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরও তাহাই।

তবে কেহ মনে যেন না করেন যে, রাগরাগিণীর প্রভাব ও হোমিওপ্যাথির প্রভাব একই। আমরা সঙ্গীততত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া কেবল স্থূল ভাবে কতকগুলি লক্ষণের বিচার করিয়া রাগরাগিণীর মূলে উপনীত হইতে চাহি। এবং হয় ত সেই ভাবে বিচার করিলে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। ভ্রমাত্মক উপমান (False analogy) প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু উপমা দ্বারা অনেক সময় (Inductive process) আমরা সত্যের পথে উপস্থিত হই।

সেই জন্য বলা গিয়াছে যে, প্রথমতঃ আমরা হোমিওপ্যাথিক উপায়ে সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা করিব, এবং সেই আলোচনার মধ্যে অনেক ঔষধবর্গেরও কিংবা অন্য রকম কথার উল্লেখ করিলে ক্ষতি নাই। তবে একটা বিষম প্রমাদ এই যে, ঔষধের প্রভাব যে ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে, রাগরাগিণীর প্রভাব সে ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। সুতরাং কেবল বিচার দ্বারা আমরা সঙ্গীততত্ত্বের মূলে উপনীত হইতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা খুব কম। এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনও গুণগ্রাহী ব্যক্তি স্বীয় মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারেন, তবে আমাদের কাঁচা কথাগুলির মধ্যে দুই একটা পাকা বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত পূর্ব্বসংস্কার অনেক সময় এই পথের বিষম বাধা। অনেকের পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোনও 'ফল দর্শে না'। কিন্তু যাহাতে 'ফল দর্শে', সেই রকম উপায় অবলম্বন করিলে, দর্শিতে পারে। অনেকের মন রাগরাগিণীর দ্বারা মোটেই টলে না, অথচ তাহারা 'একতরফা' বেসুরা চীৎকার করিয়া পাড়া মাতায়। অনেকের মনে হয় যে, ভৈরব রাগে যেন উষার ভাবসঞ্চার হইতেছে, কিন্তু অনেকের তাহা সন্ধ্যাবন্দনার মত মনে হয়। এই সকল জঞ্জাল সত্ত্বেও সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা অনেকের নিকট হৃদয়গ্রাহিণী হইতে পারে।

ক। 'মনের মতো' সুর।

যেটা যাহার পক্ষে খাটিলে সে আনন্দ লাভ করে, সেটা তাহার 'মনের মতো'। আমরা শাস্ত্রে 'আত্মার' কথা শুনিয়াছি। যদি দার্শনিক ভাবে

আত্মার প্রতিকৃতি। মনের আনন্দ দেহেরও স্বাস্থ্যচিহ্ন। দেহ, মন ও প্রাণের সাম্যাবস্থা দেখিয়া আমরা 'আত্মা'র ভাব উপলব্ধি করি। আয়ুর্ব্বেদের মতে বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থা দৈহিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি। মনের বিকৃতি উপস্থিত হইলে হয় ত তাহাদেরও একটার বিকৃতি হইতে পারে; কিন্তু মনের সেই বিকৃতি সত্ত্বেও যদি দেহের কোনও ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, লোকটা 'অমুক ধাতে'র লোক। সে তাহাতেই সুস্থ থাকে। আমার পক্ষে সেটা অসম্ভব। অনেকে পরজ রাগিণী শুনিয়া চটিয়া যায়; আর এক জন তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে 'এফ্ সুয়ে' গাহে; আর এক জন 'ডি শার্প্' না হইলে সুরের গোলমাল করিয়া বসে। এই জন্যে সকলে বলে যে, সুরের standard সকলের পক্ষে সমান নয়। বিচারের standardও সেই রকম। স্বাস্থ্যের standardও তথৈবচ। ডারউইন ও স্পেন্সার জীব-জগতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত কামপ্রবৃত্তিমূলক। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনেচ্ছা। সাংখ্য বলিবেন, প্রকৃতি ও পুরুষের আকর্ষণজনিত প্রভাব। ভক্ত বলিবেন, ঈশ্বর ও জীবের মিলনেচ্ছা, এবং প্রণবের বহু ভাবই সঙ্গীত। কথাগুলি ভলাইয়া দেখিলে একই। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, সুরের কোনও পরিমাণ নাই। যাহা 'তোমার মনের মতো', তাহা লইয়াই সুর আরম্ভ।

কিন্তু তোমার মনটার লক্ষণগুলি না দেখিলে যেমন ঔষধ নির্ণীত হয় না, সেই রকম তোমার পক্ষে কোন সুর খাটিবে, তাহার নির্দ্ধারণের উপায় তোমারই হাতে।

স্বভাবজ শারীরিক ধ্বনিই যে সুর, তাহা নহে। কোকিলের ধ্বনি তাহার পক্ষে সুর হইতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার প্রাণবায়ু যাহাতে স্থির হইতে পারে, মন মুগ্ধ হইয়া যাহা অবলম্বন করে, এবং দেহ যাহাতে সুস্থ-ভাব ধারণ করে, তাহাই আমার সুর। চিন্তা করিয়া দেখিলে, জগতে এমন লোক বিরল, যাহাদের দেহ ও মন সম্পূর্ণ সুস্থ। রোগই আমাদিগের চিরন্তন দৈনিক অবস্থা। প্রাণবায়ুর বৈকল্যই তাহার মূল। সুতরাং প্রাণবায়ুর সহযোগে যে ধ্বনি সঞ্চারিত হইলে আমরা তন্ময় হইয়া আনন্দ লাভ করি, তাহাই আমাদিগের পক্ষে সুর। ঔষধ যেমন স্বাস্থ্যলাভের উপায়, সুরগুলিও তেমনই।

যদিও সুরের কোনও standard নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ইহাই যে, Tomlinson

বলেন যে, ইহা একটা বিধি, 'Law'। সেই বিধির অনুগামী না হইলে আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। তাহাই সকলে বলেন, এবং দেখিয়া থাকেন যে, চলিত সাতটা সুরই সেই সর্ব্ববাদিসম্মত রাস্তা। পরে দেখা যাইবে যে, সুর যে সাতটাই হইবে, তাহার কোনও বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহার বিশেষ অর্থ আছে। সাতটা ভাঙ্গিয়া একুশটাও করা যায়, কিংবা সাড়ে তিনটি করিলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু এই পথটা যে 'মনের মতো', তাহার একটা বাহ্য লক্ষণ দেখা যায়। যে সুর হইতেই আরম্ভ করি না কেন, যদি প্রাণবায়ুর গতিবিশেষের উৎপত্তি করিয়া উচ্চগ্রামে সেই সুরে আবার মিশিতে পারি, তবেই 'মনের মতো' হইবে; নচেৎ নহে। আর একটা কথা, এহেন ঘটনা একটা পরিধির বিকাশ না হইলে সম্ভবে না। অর্থাৎ, চক্রাকারে পূর্ব্বস্থানে উপনীত হওয়া ভিন্ন আর কোনও গতি নাই। যদি বল যে, রক্রভাবে বহুদূর গিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হানি কি? কিন্তু 'কসরৎ' করিয়া দেখুন, সেটা 'মনের মতো' হইবে না। পরিধির মধ্যে একটা কেন্দ্র আছে নিশ্চয়। তাহার সহিত প্রাণশক্তির টানাটানি আছে বলিয়া বেশ বোধ হয়, এবং সুরে থাকিতে হইলে আমাকে গ্রহবর্গের মত সেই কেন্দ্র-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান হইতে হইবে। Plato প্রভৃতি মহাত্মারা এই গতি লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীতের মূলে (music of the spheres) উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু আপাততঃ মূলের কথা না পাড়িয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সর্ব্ববাদিসম্মত সুরগুলি আমাদিগের প্রকৃতিগত, নচেৎ আমাদিগের 'মনের মতো' হইল কি করিয়া। আমাদিগের উৎপত্তি সৌরজগৎ হইতে। সেই জগতের যাহা বিধি, তাহা যে আমাদের স্বভাবতঃ 'মনের মতো' হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আরও একটা কথা। এই সুরের পরিধির পথে যখন আমরা কেন্দ্রগত শক্তিকে বেষ্টন করিয়া চলিয়া যাই, তখন যে ভাবে আমরা অগ্রসর হই, তাহারও মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণ আছে। সাধারণতঃ সা রে রে গ গ ম প্রভৃতি ব্যবধান আমাদের 'মনের মতো'। তাহার ব্যত্যয় হইলে আমাদের ভাল লাগে না। সুতরাং ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য আছে। আমরা বলি যে, ঠিক সেই ব্যবধানমত অগ্রসর না হইলে সুর বেসুরা হইয়া যায়। যেন সুস্থ শরীরে রোগের সঞ্চার হয়। অতএব সুরে থাকিয়া নানাবিধ রাগরাগিণীর সঞ্চার করিতে হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়া অন্য উপায় নাই।

সকলেরই জানা যে, কোনও বিশেষ [illegible]

কেহই স্বীকার করিবেন না, এবং এক জনের শরীরে যে কেবল একই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও ঠিক নহে। কথাটা এই যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুরের যে 'কাঠাম', তাহা বিবিধ রোগের সঞ্চারে বিভিন্ন ভাবে বিকল হইলেও, সেই 'কাঠাম' দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই হোমিওপ্যাথী মত। রাগরাগিণী সম্পর্কেও তাহাই। একই 'ঠাটে' অনেক রকম রাগরাগিণীর সঞ্চার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'ঠাট' বেসুরা হইলে তাহাকেই সাম্যাবস্থায় আনিতে হইবে। অন্য ঠাট বাঁধিলে কোনও ফল নাই। সন্ধ্যা যদি সন্ধ্যার ভাব ছাড়িয়া অন্য ভাবে বিবর্ণ হইয়া যায়, ভারতবর্ষে যদি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ লোকের যদি উদরাময় হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগকে নূতন 'ঠাটে' বাঁধিয়া সুন্দর ও সুস্থ করিবার কোনও পথ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। একই উপায় —পূর্ব্ব স্বধর্ম্মের কিংবা সুরের সঞ্চার। স্বধর্ম্মে থাকিয়াও ব্যাধির সঞ্চার হয়। অন্যের সংনিশ্রণ তাহার একটি কারণ। কিন্তু পরধর্ম্মের ঔষধযোগে স্বধর্ম্ম কখনও প্রকৃতিস্থ হয় না। 'মনের মতো' হয় না।

খ। লক্ষণের তারতম্য।

সুর এমনই পদার্থ যে, বিশ্বজীবকে স্বভাবতঃ আকর্ষণ করে। সঙ্গীতের যথার্থ বিকাশস্থলে জীব হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া পরস্পরের সহিত সখ্য-সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়। সুরের ভিত্তিই একতা। এই জন্য শাস্ত্র বলেন যে, সুরের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী অপূর্ব্বভাবে নিহিত।

এখন আমরা সুর ছাড়িয়া 'বেসুর' কিংবা ব্যাধির দিকে তাকাইতে পারি। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, সকলেরই একটা ব্যক্তিগত Standard সুর আছে। সেটা তাহার পক্ষে 'সা'। হয় ত Continental Standardএর সঙ্গে তাহার মিল নাই; অর্থাৎ, আমি স্বভাবতঃ যে সুরে গাহিলে আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহা হয় ত হার্ম্মোনিয়মের কোনও সুরের সঙ্গে 'খাটে না'। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি 'বেসুরা' হইতে পারি না। তবে 'বেসুরার' ক্ষেত্র কোথায়? তাহার উত্তর ইহাই যে, আমার ব্যক্তিগত Standard বিস্তার করিতে গিয়া যদি 'সা'র সহিত 'রি' 'গ' 'ম' প্রভৃতির সম্বন্ধ ঠিক না রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমি বেসুরা। আমারও ভাল লাগিবে না, অন্যেরও লাগিবে না। মনে করুন, একটি শিশুর পা দুখানি খুব ছোট। তাহার পিতামহের পা দুখানি খুব বড়। উভয়ের মিল নাই। তাহাতে, অর্থাৎ Standardএর পার্থক্যে কিছু আসে যায় না। শিশু যদি তাহার স্বাভাবিক ছন্দের বশবর্ত্তী হইয়া পা দুখানি [illegible]

যেমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যলক্ষণপূর্ণ, বৃদ্ধেরও নিজের পা সম্বন্ধে তেমনই। উভয়ে যদি এক সঙ্গে হাঁটিতে চেষ্টা করে, তবে হয় ত এমন একটা ব্যবধান পাওয়া যাইবে যে, বৃদ্ধও মনের আনন্দে শিশুর সহিত হাঁটিতে পারে। কিন্তু উভয়েরই পক্ষে যদি গতিবিস্তারের দোষ থাকে, তবে 'harmony' এবং 'chord', উভয়েরই বিকৃতি হইয়া পড়ে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সুর বজায় রাখিলে বহু ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়। রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব থাকে না, ব্যাঘ্রে ও হরিণে এক ঘাটে জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করে, শাক্ত ও বৈষ্ণব একাসনে বসিয়া হাস্য করে। সুর বিশ্বপ্রেমব্যঞ্জক। সত্য কথা যে কহে, তাহাকে আমরা তৎক্ষণাৎ ভালবাসি, তখন জাতিবিচার করি না। হিংসা-দ্বেষ-শূন্য, কিংবা করুণার ভিখারী অনাথ আতুরের সম্বন্ধেও তাহাই। সুরের প্রধান কর্ম্ম একতা-সংস্থাপন, সভ্য-সংস্থাপন, মানবধর্ম্ম-সংস্থাপন। সঙ্গীতে পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়, তাহার অর্থ কি?

কিন্তু সুরের বিকৃতি হইলে, যে বিধিবদ্ধ সত্য ও সৌন্দর্য্য, এবং তাহার সমবাদী আভ্যন্তরিক দৈবীবাণী আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহার প্রতিঘাতে একটা মহাক্লেশময় অবস্থার উৎপত্তি হয়। তাহাকেই আমরা ব্যাধি বলি। রাগিণীর অবধি নাই, কিন্তু রাগিণীর মধ্যেও যদি সেই দোষ ঘটে, তবে যে ভাবের রাগিণী, তাহার সেই ভাব বিকৃত হইয়া পড়ে।

রাগরাগিণীর বিকৃতি হওয়ার অর্থ কি? মনে করুন, মূলতানী নামক রাগিণীতে নিম্নলিখিত সুর কয়টা আছে।

সা রি গ ম, প ধ নি র্সা

যদি আমি উহাকে, সা রি গ ম প ধ নি করিয়া দিই, তবে বেসুরা কোথায় হইল? মূলতানী রাগিণী না থাকুক, অন্য একটা রাগিণী হইতে পারে না কি?

আমি বলিব যে, হইতে পারে না, কেন না, 'ধ' এবং রি (কোমলের) মধ্যে সমবাদিত্ব (harmony) সম্ভবে না। মূলতানীর একটা 'ঠাট্' আছে। এবং তাহার সুরের arrangementএর মধ্যে harmony আছে। গায়িবার সময় যদি কেবল রি, গ, ন,গুলিই বেসুরা হইয়া যায়, তবে ত তাহা স্বতন্ত্র কথা। এটা শারীরিক ব্যাধি (organic)। কিন্তু যদি গ-(কোমল-)কে জোর করিয়া 'গ' (সম্পূর্ণ) করিয়া বসি, তবে কাহারও ভাল লাগিবে না। এটা সম্পূর্ণ স্নায়ুবিকার, প্রাণবায়ুর বিরোধী (Nervous disorder)।

আমাদিগের শরীরেও দেখিতে পাই যে, ব্যাধির দুই প্রকার লক্ষণ আছে।

খঞ্জ, বধির প্রভৃতি হওয়াও এক প্রকার ব্যাধি। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সখ্য ঘটিয়া গেলে পরবর্ত্তিকালে সুরের গোলমাল হয় না। মনে করুন, আমার সেতারের একখানা পর্দা সরিয়া গিয়াছে। সেটাকে যদি তাহার পূর্ব্ব স্থানে সরাইয়া আনা অসম্ভব হয়, তবে অন্য পর্দাগুলিকে ততটুকু সরাইয়া দিলে, 'ঠাটে'র বিকৃতি ঘটে না। এটা অস্ত্রচিকিৎসার মত। কিন্তু Harmony একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুর মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, মন তাহাতে সুস্থভাবে 'ঘটস্থ' থাকে। আমাদের নৈতিক ও মানসিক বিকারের দিকে লক্ষ্য না করিলে সেই Harmonyর অভাব বুঝা যায় না।

যাহার যেটুকু স্বাভাবিক লক্ষণ, সেইটুকুর তারতম্য ঘটিলে সে মনে করে যে, তাহার একটা রোগের সঞ্চার হইয়াছে। একটা লোক স্বভাবতঃ খুব বিমর্ষ। তাহার পক্ষে হঠাৎ আনন্দিত হইয়া হাস্যপরিহাস করা রোগের লক্ষণ। কাহারও স্বভাবতঃ ক্ষুধা কম, তাহার হঠাৎ ক্ষুধার সঞ্চার হওয়া রোগের লক্ষণ। এ স্থলে 'বিমর্ষ ভাব' ও 'ক্ষুধাহীনতা'ই তাহাদিগের স্বাস্থ্যের 'ব্যক্তিগত' লক্ষণ। সকল জাতিরই, সভ্যই হউক কিংবা অসভ্যই হউক, নিজের নিজের বেশভূষার মধ্যে একটা Harmony আছে; সুতরাং জাপানীদিগের ক্ষুদ্র চক্ষু এবং পদতল, এবং তাহাদের চিত্রের জলন্ত রং ও কারিকুরি দেখিয়া আমরা খুসী হই। কিন্তু Harmony রক্ষিত না হইলে তৎক্ষণাৎ আমরা বলি, 'রোগে ধরিয়াছে'। মাথায় টিকি রাখিলে হ্যাট ও নেক্‌টাই, বেসুরা বলিয়া বোধ হয়। টিকি যে 'ঠাটে' সুরে বলে, নেক্‌টাই সে ঠাটে বেসুরা বলিয়া বোধ হয়। রাগরাগিণী সম্বন্ধেও সেইরূপ।

তবে বৈলক্ষণ্য ঘটিলে কিংবা রোগের সঞ্চার হইলে উপায় কি? 'হোমিওপাথি' মতে যে লক্ষণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার উপযোগী ঔষধ দিলেই আবার সুরের সঞ্চার হইবে। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' কেন? উত্তর,—বিষের দুঃখ বিষেই বুঝে। তুমি যদি দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠ, তবে অন্য একটি লোক সেই রকম করিয়া কাঁদিলে তুমি সান্ত্বনা পাইবে। যদি তোমার 'বিরহে'র ব্যামো হইয়া থাকে, তবে অন্য একটি বিরহীর দুঃখ দেখিয়া তোমার বিরহ দূর হইবে। তবে কি ঔষধ এবং রাগিণী রোগের উৎপত্তি করে? তাহার উত্তর যে, রোগের উৎপত্তি করে না, লক্ষণের উৎপত্তি করে, ভাবের উৎপত্তি করে। তোমার ভাবের সহিত যদি যে ভাব মিলিয়া

যায়, তবে Harmonyর গুণে তোমার কুলক্ষণগুলি দূর হইয়া আবার পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য লক্ষণ ফিরিয়া আসে। হোমিওপ্যাথির ভিত্তিই সহানুভূতি। রাগ-রাগিণীর মধ্যে আমরা 'সম্বাদী' ও 'বিবাদী' সুর দেখাইয়া তাহার পরিচয় দিয়া থাকি।

গ। ভাবের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ ও তাহার একটি উদাহরণ।

একটা কোনও ভাববিশেষের উৎপত্তি হইলে দেহযন্ত্র বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। 'কথা' ও 'সুরে'র পরিবর্ত্তন ঘটে। একটু চেষ্টা করিয়া সেগুলি টুকিয়া লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন, সেই অবস্থায় যদি কোনও সুর কিংবা রাগিণী সেই ভাবকে কিঞ্চিৎ কিংবা অতিশয় উত্তেজিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বের সুস্থ অবস্থায় আমার দেহ ও মনকে লইয়া আসে, তবে তাহা একটা Proving অর্থাৎ পরীক্ষার স্থল হইয়া পড়ে। অথবা, কোনও একটি রাগিণীর প্রভাবে যদি আপনার সুস্থ মন ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহার লক্ষণগুলি টুকিয়া লইলে অনেকটা 'Proving'এর কাজ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিগত পূর্ব্বসংস্কার বিশেষভাবে জানা উচিত। কারণ, অনেক সময় Secondary actionগুলি আমাদের Primary বলিয়া ভ্রম হয়। ক্রমে সুরে চৈতন্য হইলে এক জন লোক Medium হইয়া পড়ে। সে অবস্থার Proving সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। কিন্তু সঙ্গীতের এক জন Medium পাওয়া শক্ত কথা।

আপাততঃ মোটামুটি একটা ভাব লইয়া দেখিলেই চলিবে। মনে করুন, সে ভাবটা 'বিরহ'। বিরহের অর্থ, মিলনের অভাব। কাহার সহিত মিলন? বিরহ জিনিসটা Action না Reaction?

যদি মিলনের বস্তু (object) আমার কল্পনার মধ্যে না থাকে, তবে দার্শনিক ভাষায় তাহা subjective বিরহ। আমি মিলন চাহি, কিন্তু যাহার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা কি, সেটা ঠিক বলিতে পারি না। ইহাকে আধ্যাত্মিক বিরহ বলিতে পারা যায়। 'বসন্ত ঋতু' বিরহের বিখ্যাত সময়। সূর্য্য উত্তরায়ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমগ্র প্রকৃতির একটা ব্যাকুলতা আমরা লক্ষ্য করি। সে ব্যাকুলতা বিরহ-ব্যাকুলতা কি না, তাহার বিচার করা আমাদিগের সাধ্যাতীত। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সে অবস্থা Reaction বলিয়া বোধ হইবে। ষড়ঋতুর মধ্যে জ্বর-ভাবের বিশেষ একটি লক্ষণ পাওয়া যায়—

১। শৈত্য (Chilly stage)—কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাস।

২। উষ্ণতা (Heat)—ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ।

৩। ঘর্ম্ম (Sweating)—আষাঢ় হইতে আশ্বিন।

প্রকৃতির এই রকম বাৎসরিক একটা বিরাট জ্বরভাব হইয়া থাকে। আমাদের ইহাতে সাধারণতঃ কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র দেহে যখন দৈনিক ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়, তখন ক্লেশটা বেশ বুঝিতে পারি, এবং প্রথম কম্পের পর উষ্ণতা যখন আসিয়া পড়ে, তখন আমরা বলি, Reaction আরম্ভ হইয়াছে। বৃহৎ দেহে সেই রকম Reaction যে হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। কিসের Reaction? অবশ্য ঋতু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, 'প্রখর সূর্য্যকরের'। দারুণ শীতে প্রকৃতি নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, তখন সূর্য্যের অভাব কিংবা বিরহ ঘটিলেও ব্যাকুলতা দেখাইবার শক্তি নাই। বসন্তকালে তাহার Reaction হয়, এবং ক্রমে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে মিলন হইয়া পড়ে। এটা objective বিরহ। সূর্য্য object। বিরহের রাস্তা একটা Elliptical orbit। সূর্য্যের ব্যবধানের তারতম্যে বিরহ ও মিলনের ভাব।

এই যে বিরহ প্রকাশ করিবার রীতি কিংবা বিধি (law), ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, এবং মানবদেহে তাহার লক্ষণ বেশ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক অথবা Subjective বিরহে সেটা অন্য আকার ধারণ করে। তাহা পরে বক্তব্য। ব্যক্তিগত বিরহ, কিংবা objective বিরহ সবিরাম জ্বরের মত। কিন্তু সবিরাম জ্বর সকলই এক প্রকার নয়। লক্ষণগুলি দেখিয়া তাহার ঔষধ কিংবা সুর ঠিক করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত বিরহের কোনও কালাকাল নাই। বার মাসই বিরহযন্ত্রণা চলিতে পারে; কারণ, উহা নায়ক ও নায়িকার অভাবসাপেক্ষ। সেই জন্য বিরহের সাধারণ লক্ষণ—দৈহিক এবং মানসিক—(কারণ, মানবের মন আছে) আমাদিগের দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিক যুগে বৈষ্ণব কবিগণ বিরহের কতকগুলি লক্ষণ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বিদ্যাপতি

(বর্ষাবিরহ) 'বরখিয়ে পুন পুন আগি দহন জনু'।	(burning sensation—in spite of rainy showers)
(বসন্ত—ঐ) 'চাঁদ-চন্দন তনু অধিক উতাপই'।	(aversion to cold—which produces burning)
'কোকিল কলরব কর দেই ঝাঁপল কাণ'।	(oversensitiveness to noise)

'অস সব বিষসম লাগয়ে মোই'।	(burning)
'অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তনু নাসা'।	(difficult of breathing dyspnœa)
'অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন রেহা'।	(prostration and anæmia)
'অঙ্গুলকি আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি। হার ভেল অতি ভার'	(œdematic-swelling and sensation of weight)
'বিনা অবলম্বনে উঠিতে না পারই দেখি আয়লু চলি রজনী-অবসানে'।	(extreme prostration and midnight aggravation 1 to 2 A. M)

জ্ঞানদাস

(বর্ষাবিরহ) 'সাম শাঙনে আশা নাহি জীবনে বরখিরে জল অনিবার'।	(fear of death)
'বিরহিণী-হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক'।	(anguish of the heart)
দারুণ বিরহ জর	(excessive heat)

গোবিন্দদাস

'শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে সতত সন্তাপই গাতে' 'অহনিশি উৎপত মোর'।	(aversion to cold air—wants wrapping up) (lachrymation—before ulceration of cornea)
'কুকরি রোই ধনি' 'একে বিরহানল, [illegible]'	(sweating stage—burning continues)

'দিনে দিনে ক্ষীণ তনু' (prostration)

'চন্দন পরশে চমকি ধনী উঠই'। (oversensitiveness to cold)

'শীতল পবন, মোহে নাহি ভায়ত'। (aversion to cold air)

এখন Arsenicএর symptoms (লক্ষণ)গুলি Materia Medica হইতে বাছিয়া বাহির করিলে দেখিতে পাইবেন—

Anxiety—restlessness—prostration—burning—midnight aggravation 1 AM—2 AM—Anguish not from pain of the body—but mental—heart anguish—followed by prostration—burning ameliorated by heat—relieved by warmth—wants wrapping up—Dyspœna—Puffness—heated in walking—During chill thirst for hot drinks, During heat small but frequent drinks of cold water which aggravates symptoms, During sweat large drinks of cold water—lachrymation—conjunctivitis—Fever—chill violent but irregular—ইত্যাদি।

অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে, বোধ হয়, উপরোক্ত বিরহের লক্ষণগুলি কবিকুলের কল্পনা। কিন্তু তাহা আমরা বলিতে পারি না। পাঠকবর্গের মধ্যে হয় ত অনেকের বিরহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগের উপর বিচারের ভার ফেলিয়া দিলাম। হয় ত তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলিবেন যে, এ কালের বিরহ, উল্লিখিত বৈষ্ণবী বিরহ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। একালের বিরহে হয় ত তৃষ্ণার আধিক্য বেশী, অথবা হাত পা ফুলিয়া উঠে না। কিন্তু পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, প্রকৃতির ক্রমবিকাশে মানবের ব্যক্তিগত লক্ষণের তারতম্য ঘটিয়াছে। সেটুকুর দিকে লক্ষ্য করিলে সন্দেহ মিটিয়া যাইতে পারে। এ কালের বৈষ্ণব (অন্ততঃ এক অংশ) কুক্কুট ও ছাগ প্রভৃতির মাংস আহার করিয়া থাকেন; রীতিমত মোজা, জুতা ও ফ্লানেলের গলাবন্ধ ব্যবহার করেন, এবং মোটরকারে আরোহণ করিয়া দুই বেলা বায়ুসেবনে কিংবা পলিটিক্সের চর্চ্চা করিতে বাহির হন। এমতাবস্থায় বৃন্দাবনী বিরহ ও কলিকাতার বিরহের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। একটা গাভীকে আর্সেনিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করিলে যে লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, একটা রামছাগল কিংবা কুক্কুটের বেলায় ঠিক সে রকম পাওয়া সম্ভবে না। কিন্তু তাহা হইলেও broad symptomsগুলি যায় কোথা? সেগুলি (১) অতিশয় স্নায়বিক অবসাদ, (২)

অথচ অস্থিরতা, এবং (৩) দ্বিপ্রহর রাত্রিতে লক্ষণগুলির প্রাবল্য। সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা, কিন্তু অধিক জলপানে অরুচি, (৪) মৃত্যুভয় ও হৃদয়ের দারুণ ক্লেশ।

এখন দেখা যাউক, দ্বিপ্রহর-রাত্রির সময় কোন্ রাগিণীর মধ্যে এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়। এক জন সেকালের কবি ('কবিতে কবিতে বিরহের ছড়াছড়ি পূর্ব্বকালে ছিল) অনেক দেখিয়া শুনিয়া বেহাগ রাগিণীতে বিরহের একটী গান বাঁধিয়াছিলেন, এবং সেটা বঙ্গদেশে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল একটা typical গান বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

'সখি আমায় ধর ধর'—ইত্যাদি এই বেহাগের একতালা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শুনিয়া এক কালে অনেকে বিরহের জ্বলন্ত ছবি অনুভব করিয়াছিল, এবং এমন কি অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত।

দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় অনেক রাগিণী গেয়। যেমন পরজ, কিংবা কালাংড়া, কিংবা রামকেলী ইত্যাদি। কিন্তু বেহাগের মত কোনটারই prostration এবং restlessness নাই। বেহাগের ভয়ানক নির্জ্জীব ভাব। পরজ, কালাংড়া, রামকেলী প্রভৃতি গ হইতে রি কোমল বেশ স্পর্শ করিয়া নিম্নে আসে। বেহাগ তাহা পারে না। সে গ হইতে একেবারে স্বরের নীচে নিষাদে আসিয়া বিলীন হইয়া যায়। উঠিবার সময় অনেক চেষ্টা করিয়া উপরের নিষাদে উপস্থিত হয়, কিন্তু সেখান চড়া সুরে উঠিতে গেলে শ্বাসরোধের মত হয়, কম্প হয়, আবার পঞ্চমে আসিয়া বিশ্রাম লয়। শঙ্করাও মধ্যরাত্রির রাগিণী, কিন্তু সে ভূপালীর ন্যায় শক্তিসম্পন্ন।

যদি কোনও সঙ্গীতজ্ঞ লোক থাকেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, অন্য কোনও রাগিণী বেহাগের ন্যায় খাঁটী বিরহের ভাব প্রকাশ করিতে পারে কি না। হৃদয়ের দারুণ ব্যথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবসাদ, তৃষ্ণার উদ্রেক, এমন কি, আন্তরিক প্রদাহ, আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে অন্য কোনও রাগিণীতে আছে কি না সন্দেহ। এমন কি, এক জন ভক্ত প্রাণের সেই অসীম ব্যাকুলতা সহ্য করিতে না পারিয়া, 'তুমি বিনা কে প্রভু! সঙ্কট নিবারে' (fear of death) একেবারে গায়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

'আর কেহ নাই যে সহায়'
এই ভব-অন্ধকারে।

'অন্ধকারে' কেন? Kentএর Materia Medica উল্টাইয়া দেখুন (Ars. relieved by darkness)। অন্ধকার ভিন্ন সে চিত্তব্যাকুলতার শান্তি নাই, অথচ সেই অন্ধকারে এক জন সহায় চাই।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

৩

বিবাহকালে আর্য্য-কন্যার হাতে বালা ও নাকে নথ অবশ্য-ব্যবহার্য্য। হাতের বালা ও নাকের নথ সধবার লক্ষণ। ইব্রিয়দের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ১০।৮৫।৬ ঋকে যে 'স্যোচনী' শব্দ আছে,

স্যোচনী ও নেজেম।

দত্ত মহোদয় তাহার অর্থ দাসী, এবং ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদক Griffith সাহেব *lad* অনুবাদ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় অনেক আলোচনার পর 'স্যোচনী' শব্দের অর্থ নথ (সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩২০) গ্রহণ করিয়াছেন। হিব্রু বা ইব্রিয় ভাষায় নাকের নথ Nezem (নেজেম) নামে পরিচিত। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে 'স্যোচনী' নথ হওয়াই সঙ্গত।

ঋগ্বেদে আর্য্য-কন্যার ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের নামের অধিক উল্লেখ না থাকিলেও, দেবতাদের পরিধেয় অলঙ্কারের নাম দ্বারা প্রাচীন আর্য্যকন্যাগণ কি কি নামের অলঙ্কার ব্যবহার করিত, তাহা জানিতে পারা যায়। আর্য্য ও ইব্রিয় অলঙ্কারগুলির নাম আমরা তুলনা দিয়া উল্লেখ করিতেছি। যে প্রকার আর্য্যদের বা মরুৎগণের (৫।৫৮।২ ঋক), তেমনই দেবপুত্রক ইব্রিয়দের দেবগণের (Isaiah 30—22) অঙ্গেও অলঙ্কার থাকিত। বৈদিক কালে নববধূরা পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত (৯।৪৬।২ ঋক) হইয়া স্বামিগৃহে যাত্রা করিত। বরও নানাপ্রকার বসন ভূষণে (৫।৬০।৪ ঋক) সজ্জিত হইত। বৈদিক মরুৎগণের ন্যায় প্রাচীন ইব্রিয় পুরুষগণও নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। ইহা Genesis 41—42, Judges 8—24, 26, এবং 2 Samuel 1—10 পদ-পাঠে অবগত হওয়া যায়। যে প্রকার ইব্রিয় বর যাজকীয় সাজসজ্জা দ্বারা (Isaiah 61—10) সজ্জিত হইত, সেই প্রকার আর্য্য বরও 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বিশেষ কোনও শ্রেণীর ঋত্বিকের ব্যবহার্য্য পাত্রসজ্জা পরিধান করিত।

বরম, ভূষণ।

বৈদিক হাতের বালা বা বলয়, যাহা ঋগ্বেদের ৫।৫৮।২ ঋকে 'খাদি' নামে পরিচিত, হিব্রুতে তাহা 'খাখ' (khakh) নামে (Exodus 35—22) অভিহিত। ইহা প্রাকৃতে 'খাড়ি'; বাঙ্গালায় খাড়ু। পায়ের যে মল ঋগ্বেদের ৫।৫৭।১১ ঋকে ঐ 'খাদি' নামে অভিহিত, তাহাই khaliya (খালিয়া)

অনেক জায়গায় দেখিবেন, বিরহী ও বিরহিণীর গৃহে দীপ জ্বালিলে তাহারা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শীতল বায়ু চাহে, কিন্তু তাহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এবং সেই প্রদাহেও উষ্ণতা পছন্দ করে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নির্জ্জীব ভাব সত্ত্বেও বেহাগের ফল Reaction। খানিকক্ষণ ধরিয়া ভাঁজিলেই শরীরে নব-জীবনের উন্মেষ হয়। পরজ প্রভৃতিতে শক্তির প্রাবল্য থাকিলেও, ফলে অবসাদ। কিন্তু বেহাগে অবসাদের ফলে অবশেষে শান্তি ও উৎসাহ। পরজ গায়িয়া আপনি শীঘ্রই 'এলাইয়া' পড়িবেন, বেহাগে উত্তরোত্তর বল পাইতে থাকিবেন।

Arsenicও তাই। সেই জন্য Cholera caseএ আর্সেনিক Reaction উৎপত্তি করিবার জন্যই প্রযুজ্য। চটাপট্ Arsenic দিলে case খারাপ হইয়া যায়।

যদি রীতিমত পরীক্ষা করিতে চাহেন, তবে আমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজেই দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে বেহাগ আরম্ভ করুন। যদি আপনি সুরজ্ঞ না হন, তবে কেবল আপনার চেষ্টাতেই 'সকলে' পলাইয়া গেলেও বিরহের উৎপত্তি। আর যদি সুরজ্ঞ হন, তবে 'সকলে' আপনার ন্যায় বিরহে মাতিয়া উঠিবে। কিছুক্ষণ পরেই জলতৃষ্ণা আরম্ভ ও বিষম অবসাদ। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, ছোট ছোট ছেলেপুলে এবং স্ত্রীলোকেরা বেহাগ শুনিয়া শীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং মধ্যে মধ্যে অল্পপরিমাণে জল পান করে। একটি ছেলে একবার বলিয়াছিল, 'আমার ভয় কর্‌ছে'। অনেকে অসাড় হইয়া পড়ে। কিন্তু অসাড় হইলে যদি আবার—

স গ প নি

ক্রমাগত ধ্বনি করিতে থাকেন, তবে দেখিবেন যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে বল পাইবে। ২৫ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে আমার একটি বন্ধু এককালে বাস করিতেন। তিনি অধিক অধ্যয়নে রাত্রি জাগিয়া ও বিদেশস্থা নববিবাহিতা স্ত্রীর অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে Nux দিয়া কোনও উপকার প্রাপ্ত হই নাই। মধ্যে Natrum carbও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু একদিন বেহাগ রাগিণীর আলাপ শুনিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়া গেল, এবং তৎপরেই তিনি বি.এ. পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

নামে (Hosea 2—13) ইব্রিয়দের নিকট পরিচিত। গলদেশের বলয়াকৃতি অলঙ্কার (বর্ত্তমান হাঁসুলি), যাহা ঋগ্বেদে ঐ 'খাদি' নামে (৭।৫৬।১৩ ঋক) উল্লিখিত, ইব্রিয়দের নিকট তাহা 'খাদস' (Songs 1—10) নামে পরিচিত। বৈদিক 'রুক্মা' (৫।৫৪।১১ ঋক) বা গলার চন্দ্রহার, যাহা বক্ষে সুশোভিত হইত, ইব্রিয়গণ তাহাকে 'রাবিদ' (Genesis 41—42) বলিতেন। বৈদিক 'নোচনী' (১০।৮৫।৬ ঋক) অর্থাৎ নথ ইব্রিয়দের নিকট 'Nezem বা নেজেম' (Genesis 24—22, 30) নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের ৫।৫৩।৪ ঋকের 'স্রক্ষু' বা মালার সঙ্গে আমরা ইব্রিয় 'Sharshah' অর্থাৎ মালার (Exodus 28—22) তুলনা করিতে পারি। স্রক্ষু বা মালা যে প্রকার বৈদিক মরুৎগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার, তদ্রূপ Sharshah ইব্রিয় যাজক-শ্রেণীর ব্যবহার্য্য (Exodus 28) অলঙ্কার। আধুনিক নোলক ও ইব্রিয় 'নেজিকত' (Judges 8—26) একই অলঙ্কার। বৈদিক 'অংকান' (৫।৫৫।৬ ঋক) বা রক্ষা-কবচের অনুরূপ ইব্রিয় 'এতসাদা', যাহা যুদ্ধে পতিত শৌলের বাহুতে (2 Samuel 1—10) ছিল, তাহা একই বস্তু। দেবতা মরুৎগণের পবিত্র উষ্ণীষ 'শিপ্র' (৫।৫৪।১১,১।৯৩,৮।২৯।২ ঋক) যাহা বৈদিক কালে ঋষিগণও ব্যবহার করিতেন; তাহার সঙ্গে ইব্রিয় যাজক-শ্রেণীর ব্যবহার্য্য পবিত্র উষ্ণীষ (Sanif) সানিফ্ (Isaiah 3—23, Exodus 28—4, Zekria 3—5) সহ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। নেপাই-করা চোগা (cloak) জাতীয় পশমী 'শামুল' নামক বৈদিক (১০।৮৫।২৯ ঋক) পোষাক, যাহা আর্য্য বর ও যাজকগণ পরিধান করিতেন; তাহার সঙ্গে ইব্রির বর ও যাজক-শ্রেণীর ব্যবহার্য্য-পশমনির্ম্মিত উপরে পরিধেয় চোগা-জাতীয় Simlaa সিমলা (Genesis 9—23, 35—2) নামক পরিচ্ছদের অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈদিক "ঔর্ণাম্র" (৫।৫২।৯ ঋক) নামক (ঊর্ণা) পশমী বা সূক্ষ্ম জাতীয় বস্ত্রের সঙ্গে ইব্রিয়দের মসলীন (সূক্ষ্ম) জাতীয় 'Sadin' (সাদিন) নামক (Isaiah 3—23, Proverbs 31—24) বস্ত্রের তুলনা করিতে পারি। অতি প্রাচীন য়িহুদী জাতীয় ঐতিহাসিক Josephus নিজ গ্রন্থে (1—216) এই জাতীয় বস্ত্র 'chithone' নামে পরিচিত করিয়াছেন। New Testment-এ ইহা 'chiton' (Mark 14—63) নামে উল্লিখিত আছে। এই Sadin নামক বস্ত্র প্রাচীন বাবেলবাসীর নিকট 'Sindu' সিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকদের নিকট 'Sindon' সিন্দন (Hibbert Lectures by Prof. Sayce) এবং

আরবীয়দের নিকট 'সন্দুস' 'Sandus' (কোরাণ সুরা দোখান ৫২ আয়েত) নামে পরিচিত। কোরাণ মরিফে ইহা স্বর্গীয় পোষাক বলিয়া কথিত। বৈদিক মরুৎগণের অংসদেশের ভূষণ 'এতা' (১।১৬৬।১০ ঋক) সহ ইব্রিয় যাজক-শ্রেণীর (Genesis 33—4,5) এবং কানান-দেশীয় পৌত্তলিকদের প্রতিমার ব্যবহার্য্য অলঙ্কার 'এদি'র তুলনা চলে।

বিবাহকালে আর্য্য-কন্যা চক্ষুতে 'অঞ্জন' (১০।১৮।৭) দিত। ইহা ঋগ্বেদে সধবার লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্রিয়-কন্যাও বর কিংবা পরি প্রতীক্ষায় চক্ষুতে কজ্জল ধারণ (2 Kings 9—30) করিত, এই কজ্জল হিব্রুতে Kohl নামে পরিচিত।

অঞ্জন ও কজ্জল।

ইব্রিয় জাতির বিবাহে কন্যা-সম্প্রদান (Genesis 29—23) আবশ্যক ছিল। বৈদিক কাল হইতে আর্য্যদের মধ্যে কন্যা-সম্প্রদানের প্রথা প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৯ ঋকের "সবিতা দদাত" দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৩৬ ঋকের "গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা" ইত্যাদি বাক্যে পাণিগ্রহণ প্রথার প্রমাণ রহিয়াছে। রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৩।২৭ শ্লোকেও পাণিগ্রহণের প্রমাণ আছে। প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যেও সম্প্রদান-প্রথা (Khorda Avesta 49) ছিল।

সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণ।

ঋগ্বেদের ১০।৮৫।২৪—২৫ ঋক পাঠ করিলে আর্য্য-বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে গ্রন্থি-বন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইব্রিয় জাতির বিবাহেও গ্রন্থি-বন্ধনের প্রথা ছিল। হিব্রু ও আরবীতে উহাকে 'আকদ্' বলে।

গ্রন্থি বন্ধন।

ইব্রিয় বর নিজ হস্তের অঙ্গুরী কন্যার বাম হস্তের তর্জ্জনীতে-পরাইয়া দিত। অধুনা আর্য্য বর ও কন্যার মধ্যে পরস্পর মালা-বদল হয়।

অঙ্গুরী ও মালা বদল।

আর্য্য-কন্যাকে বিবাহান্তে "বীরপ্রসবা ভবেতি" (কুমারসম্ভব, ৭।৮৭) অর্থাৎ বীরপুত্রপ্রসবিনী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইত। বৈদিক কালেও "বীরসূর্দেবকামা" (১০।৮৫।৪৪ ঋক) অর্থাৎ, বীর-পুত্র-প্রসবিনী হও, এই প্রকার আশীর্ব্বাদ প্রচলিত ছিল। "রুস্তমের ন্যায় বীর পুত্র হউক" এই বলিয়া প্রাচীন পারসীক জাতির ধর্ম্ম-যাজক বিবাহান্তে দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ (Khord Avesta 49—6) করি-

আশীর্ব্বাদ।

তেন। এই প্রকারের আশীর্ব্বাদই বিবাহান্তে ইব্রিয়-কন্যাকে প্রদত্ত হইত। পিতা বথুয়েল ও ভ্রাতা লাবন কর্ত্তৃক রেবেকাকে প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ "সহস্র সহস্র লোকের জননী হও, তোমার বংশ আপন বৈরিগণের নগর অধিকার করুক" (Genesis 24— 0) দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি।

ইব্রিয় জাতির বিবাহে বাসরগৃহ (Psalms 19—5) থাকিত। ইব্রিয় বাসরগৃহ যে হাস্যামোদের স্থান, তাহা Joel 2—16 ও John 3—29 পদ পাঠে বুঝা যায়। আর্য্য বাসরগৃহের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। "ক্ষিতিবিরচিতশয্যাং কেতুকাগারমাগাৎ" কালিদাসের এই বর্ণনাই (কুমারসম্ভব, ৭।৯৪) তাহার প্রমাণ।

বাসরগৃহ।

১০।৮৫।১৩ ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ এই, "অঘাস্থ হন্যন্তে গাব্যোর্জ্জুন্যোঃ পর্য্যুহ্যতে"। দত্ত মহোদয় সম্পূর্ণ ঋকের অর্থ করিয়াছেন—"মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়; অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়", এবং ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক Griffith 'হন্যন্তে' শব্দের অর্থ 'Slain' বুঝিয়া, "In *Mugha* days are oxen slain, in *Arjunis* they wed the bride", এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি টীকায় বলেন,—বিবাহভোজের জন্য গো-বধ হইত। মঘা ও ফল্গুনী শব্দ ঐ ঋকে নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।২।১১) "ফল্গুনী ইন্দ্রের নক্ষত্র, ইন্দ্রের অপর নাম অর্জ্জুন, এ জন্য উক্ত নক্ষত্রদ্বয় অর্জ্জুনী নামেও কথিত হয়", এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী-গ্রহণ সঙ্গত কি না, ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে, অর্জ্জুনী শব্দ ঋগ্বেদে অন্যত্র কোথায় কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা আবশ্যক। ঋগ্বেদের অন্যত্র ১।৪৯।৩, ৫।৮৪।২ ঋকে 'অর্জ্জুনি' ও ১।১২২।৫, ৩।৩৯।২, ৭।৫৫।২, ৯।৬৯।৪, এবং ১০।৭২।৩ ঋকে 'অর্জ্জুন' শব্দ আছে। দত্ত মহোদয় ও Griffith, উভয়ে তাহার অর্থ আলো, শুভ্র, উষা, এবং উজ্জ্বল গ্রহণ করিয়াছেন। ১০।৮৫।১৩ ঋকের অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী বুঝিতে হইলে, কোন্ ফল্গুনী বুঝিতে হইবে? পূর্ব্বফল্গুনী কি উত্তরফল্গুনী? দুই ফল্গুনীর একত্র উদয় ও আগমন অসম্ভব। প্রাচীন কালে পূর্ব্বফল্গুনীতে বিবাহ প্রশস্ত ছিল না। উত্তরফল্গুনীতে বিবাহ-লগ্ন স্থির হইত। যদি অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী সঙ্গত হয়, তবে তাহা বিবাহ-লগ্নের জন্য। বিবাহ-উপঢৌকনের গাভীগুলি লইয়া লইবার, কিংবা বিবাহ উপলক্ষে গাভীগুলিকে

বিবাহভোজ ও গো-হনন।

বধ করিবার শুভক্ষণ মঘা ও ফল্গুনী লগ্নের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা বিচার-সাপেক্ষ। ১০।৮৫।১৩ ঋকের উক্ত 'অঘা' পাঠ গ্রহণ না করিয়া যদি 'মঘা' পাঠ গ্রহণ করা যায়, এবং তাহার অর্থ মঘা নক্ষত্র গ্রহণ করা চলে, তাহাতেও অর্থ সঙ্গত হয় না। প্রাচীন কালে, অন্ততঃ রামায়ণের যুগেও, 'পূর্ব্বফল্গুনী' কি 'মঘা' নক্ষত্রে বিবাহ প্রশস্ত ছিল না। রামায়ণে দেখি, "মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো। ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু॥" (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭১।১৪) অর্থাৎ, অদ্য মঘা নক্ষত্র, তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করুন; অন্যত্র, "উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ। বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ॥" (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭১।১৪) অর্থাৎ, পরশ্ব দিবস উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে, ঐ দিবস বিবাহ অতি প্রশস্ত; যে হেতু মনীষীরা বিবাহ বিষয়ে ভগদৈবত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কালিদাসও হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনায় "মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু" (কুমার-সম্ভব, ৭।৭) শ্লোকে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হরগৌরী কি সীতার বিবাহ পূর্ব্বফল্গুনী কি মঘা নক্ষত্রে হয় নাই। অধিকন্তু প্রাচীন ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ তাহা অপ্রশস্ত বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন কালে মঘা নক্ষত্রে বিবাহ কি বিবাহসম্পর্কিত কোনও কার্য্যই হইত না। রমেশচন্দ্র দত্তও সায়নাচার্য্যের অর্থানুযায়ী সবিতৃ-দত্ত উপঢৌকনের গাভীগুলিকে মঘা নক্ষত্রে সোমগৃহে তাড়াইয়া ও অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফল্গুনীতে গাভীগুলিকে বহিয়া লইয়া যাওয়া হইলে, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী তিন দিন পর্য্যন্ত বহিয়া কিংবা তাড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনটি শুভদিন কি জন্য আবশ্যক হইত, ইহা সমস্যাপূর্ণ বটে। উপঢৌকনাদি বিবাহ-অন্তে দিবার প্রথা রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৭৪ সর্গে দৃষ্ট হয়। Griffithএর অর্থানুযায়ী মঘাতে গো-বধ, এবং ফল্গুনীতে বিবাহ কার্য্য হওয়া গ্রহণ করিলে, বর ও অভ্যাগতাদি কি বিবাহ-লগ্নের তিন দিন পূর্ব্বেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইত? অধিকন্তু মঘা নক্ষত্র ত বিবাহ কার্য্যের কোনও শুভদিন বা লগ্ন নহে। গো-বধ জন্য কোনও শুভ লগ্নের আবশ্যক ছিল কি না, তাহাও বিচারযোগ্য। ফলতঃ, 'অঘা' পাঠের পরিবর্ত্তে 'মঘা' গ্রহণ করিয়া, তাহাই বিবাহ কি তৎসম্পর্কিত কোনও লগ্ন সাব্যস্ত হইলে, পরবর্ত্তী অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী-গ্রহণের কোনও সার্থকতা থাকে না, এবং অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী বুঝিয়া তাহাই বিবাহ-লগ্ন স্থিরীকৃত হইলে, 'অঘা' অর্থে মঘা-গ্রহণ

নিতান্তই অসমীচীন হইয়া পড়ে। বিবাহ কি তৎসম্পর্কিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার লগ্ন স্থির জন্য তিনটি তিথি নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে যে দেবতাকে 'অপ্পা' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে, ঠিক সেই দেবতা সামবেদে (২।৯।৩।৫।১) 'অঘা' নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের 'অপ্পা' ও সামবেদের 'অঘা', উভয়েই পাপ-দেবতা। সামবেদের (২।৯।৩।৬।১) 'অঘাহর' অর্থে Sin-Remover। ঋগ্বেদের ১।৪২।৪, ৬।৭২।১০ ঋকের 'অঘশংস' অর্থে অনিষ্টকারক, ৮।৪৭।২—৫ ঋকের 'অঘা' অর্থে পাপ ও ১০।১০২।১০ ঋকের অঘা অর্থে Griffith *evil* করিয়াছেন। ৭।১৯।৫ ঋকে অঘা অর্থে পাপ। ১।১৮৯।৫ ঋকের 'অঘা' অর্থে হিংসুক, দুষ্ট, ইত্যাদি।

এক্ষণে ১০।৮৫।১৩ ঋকের 'অঘ' অর্থে পাপ, অনিষ্ট ও অস্ অর্থে ক্ষেপণ, মোচন গ্রহণ করিয়া 'প্রায়শ্চিত্তে বা পাপমোচনার্থ বধ্য গাভীগুলিকে উষার (অর্জ্জুনী) আগমনে বা প্রত্যুষে লইয়া যায়', এই অর্থ করিলে কত দূর সঙ্গত হয়, তাহা বিচারসাপেক্ষ। বিবাহদিনের প্রভাতে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য প্রাচীন কাল হইতে (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭১।২৩,৭২।২১) প্রচলিত আছে।

বৈদিক কালে ব্রাহ্মণ ও মাননীয় অতিথির সেবার জন্য (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১ম পঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড) গো-বৎসা বা গাভী বধ হইত, জানা যায়। বৈদিক কালে দেবগণের জন্য গাভী আহুতি (Burnt offering) হইত, ঋগ্বেদের বহু ঋকে তাহার উল্লেখ আছে। হিন্দুস্তানদের বিবাহ কালে নাপিত দ্বারা যে "গোর্গেয়" ইত্যাদি গো-বন্ধন ও তদুত্তরে বর দ্বারা যে মুক্তিবচন আওড়ান হয়, ইহা অবশ্যই কোনও প্রাচীন প্রথার স্মৃতি। গো-বন্ধন হইত কেন? গো-বধ নিষিদ্ধ হইবার পরে কি ঐ মুক্তিবচনের সৃষ্টি হয় নাই?

ইব্রিয় জাতির মধ্যেও গো-বৎস-বধ দ্বারা মাননীয় অতিথির সম্মাদর হইত। আব্রাহামের তাঁবুতে আগত স্বর্গীয় দূতের সেবায় (Genesis 18—7) গো-বৎস বধ হইয়াছিল। প্রাচীন ইব্রিয় জাতির বিবাহ-ভোজে (Genesis 29—22) গোবধ (Matthew 22—4) হইত। ইব্রিয় জাতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য যজ্ঞে যে গোবধ করিত, তাহা এক হইতে তিন বৎসর বয়স্কা ও সুলক্ষণা Heifer বৎসতরী (Genesis 15—9, Numbers 15—1, Dewteronomy 21—3—6) হওয়া আবশ্যক ছিল। এই প্রকার যজ্ঞে ষাঁড়, কি বৃদ্ধা গাভী, কিংবা অন্য পশুর বধ অবিহিত। আর্য্য জাতির ন্যায় প্রাচীন ইব্রিয়গণও অন্য পশু অপেক্ষা সুলক্ষণা গাভীকে পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। ইব্রিয় জাতির Co-

venant Ark বা নিয়ম-সিন্দুক, যাহাতে যিহোবা-দত্ত অনুশাসন-প্রস্তর থাকিত, সেই Ark বা সিন্দুকের শকট বহন জন্য অন্য পশু কিংবা ষাঁড় নিযুক্ত না হইয়া "কখনও গোয়ালী বহন করে নাই, এমত দুই দুগ্ধবতী গাভী (1 Samuel 6—7) নিযুক্ত হইত।" ঋগ্বেদের ১০।৮৫ সূক্তে বর্ণিত সূর্য্যার রূপক বিবাহের শকট বহন-জন্য (১১ ঋক) দুইটি গরু নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই প্রকার বহু আর্য্য আচার-পদ্ধতির সহিত ইব্রিয় আচার অনুষ্ঠানের সৌসাদৃশ্য আছে। পাঠকগণের বিরক্তিভয়ে আর কথা না বাড়াইয়া ক্ষান্ত হইলাম। শেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমি এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র ঋক্‌গুলির অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

হৃদয়-শ্মশান।

গ

[ধরানাথের কথা।]

১

কথা শেষ করিয়া বিন্দুমাধব উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও উঠিলাম। কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার দিনান্তের কনক-কিরণ পান করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। চন্দ্রোদয় হইয়াছে—যমুনার বালুবিস্তারের উপর সে কিরণ আস্তরণের মত বিস্তৃত হইয়া আছে—অদূরে কুদসিয়া বাগে বৃক্ষশাখায় বিনিদ্র ময়ূর কেকারবে আপনার আবাসের সন্ধান দিতেছে; মধ্যে মধ্যে মাথার উপর দিয়া বলাকাশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে—তাহাদের পক্ষাহত পবনে শন্ শন্ শব্দ শুনা যাইতেছে।

উঠিয়াই বিন্দুমাধব এমন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল যে, তাহার ব্যবহারে আমি একটু শঙ্কিত হইলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার সে আশঙ্কা দূর হইল—'নিগমুধি' শ্মশানে আসিয়া বিন্দুমাধব স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মানসিক চাঞ্চল্য সময় সময় দৈহিক চাঞ্চল্যেও আত্মপ্রকাশ করে। দৈহিক অবসাদে সে চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। তাই কিছু দূর দ্রুত বালুকাস্তৃত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বোধ হয়, বিন্দুমাধব একটু স্থির হইয়াছিল।

নিগম্বুধি দিল্লীর বৃহৎ শ্মশান—যমুনার বক্ষের উপর অবস্থিত। আমরা যখন তথায় উপনীত হইলাম, তখন দুইটি শব দাহ হইতেছে। দিল্লীর শীতে অগ্নিসেবন সুখজনক—যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছে, তাহারা চিতার কাছে বসিয়া আছে। বিন্দুমাধব একটি চিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "ইহার সকল অশান্তির অবসান হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "কে বলিতে পারে?"

"কেন?"

"যদি এই দেহের সঙ্গে সব শেষ হয়—ইহকালের পর যদি পরকাল না থাকে।"

"ইহকালেই সে এত বেদনা ভোগ করিয়াছে যে, পরকালের কল্পনাতেও বিন্দুমাধব যেন শিহরিয়া উঠিল—"পরকাল কি আছে?—থাকিতে পারে?—তুমি বিশ্বাস কর?"

আমি বলিলাম, "প্রমাণে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অনুমানে?"

"অনুমানেই বা বিশ্বাসের কারণ কোথায়?"

"নহিলে ভালবাসিয়া তোমার এ বেদনার নিদান কিরূপে নির্ণয় করিব?"

বিন্দুমাধব দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার পর উত্তেজিতভাবে বলিল, "না—ইহার পর আর কিছু নাই—কিছু নাই।"

আমি সে কথায় আর কিছু না বলিয়া বলিলাম, "রাত্রি হইয়াছে—চল, যাই।"

বিন্দুমাধব আপত্তি না করিয়া আমার সঙ্গে চলিল। পথে আমি তাহাকে শান্ত দেখিয়া বলিলাম, "কাজের অভাব তোমাকে আত্মঘাতী করিতেছে—কিন্তু জগতে কি কাজের অভাব আছে?"

সে বলিল, "আমার কাজ!"

"তোমার—আমার সকলেরই কাজ আছে। যে ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত করিয়া তুমি এত কষ্ট পাইতেছ, সে ভালবাসা কেন অনাথ আতুরকে প্রদান কর না! যে স্নেহের প্রতিদানে পাছে শ্রদ্ধা না পাও—এই আশঙ্কায় সংসার-ত্যাগী হইয়াছ, সেই স্নেহ কেন স্নেহের অভাবে পীড়িতদিগকে দাও না!"

বিন্দুমাধব কোনও উত্তর দিল না।

আমি বলিলাম, "আমি চিকিৎসাব্যবসায়ী—যে জরা, মৃত্যু ও ব্যাধি দেখিয়া বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন—সেই জরা মৃত্যু ব্যাধির সহিত আমার পরিচয় প্রতিদিনের। আমি দিন দিন

তাহার নূতন—বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মানুষের আরও কত কষ্ট আছে। মানুষ সেবা শুশ্রূষা—ঔষধ পথ্য না পাইয়া পথের পার্শ্বে শৃগাল কুক্কুরের মত মরিয়া থাকে; শিশু দুগ্ধের অভাবে প্রাণ হারায়। আমাদের যাহার যেটুকু অবসর—যেটুকু শক্তিসামর্থ্য, তদনুসারে আমরা তাহার অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারি।"

বিন্দুমাধব জিজ্ঞাসা করিল, "তাহাতে কি মানুষ শান্তি পাইতে পারে?"

আমি বলিলাম, "আমরা স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত—কিন্তু সুখ স্বার্থে নাই; বোধ হয় পরার্থে তাহা লাভ করা যায়।"

বিন্দুমাধব ভাবিতে লাগিল।

২

স্ত্রীকে সকল কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "কোনরূপে বিন্দুমাধবের স্বজনগণের সন্ধান করা যায় না?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"কোনও কোনও মানুষের স্বভাব এই যে, তাহারা না হারাইলে কিছুরই মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে পারে না—হারাইলে তবে বুঝিতে পারে। দেখিতেছি, ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই সেই প্রকৃতির লোক। কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে উভয়েরই শিক্ষা হইয়াছে। সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামী যেমন তাহার অভাবপূরণ করা অসম্ভব বুঝিয়া আত্মঘাতী হইতে গিয়াছিলেন—স্ত্রীও তেমনই এত দিনে নিশ্চয়ই নারীজীবনের সর্ব্বপ্রধান সম্বল স্বামীর অভাব বুঝিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি যে একটা প্রকাণ্ড দার্শনিক হইয়া উঠিলে!"

"দেখিবার চক্ষু থাকিলেই মানুষ দার্শনিক হয়—তোমাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তোমরা দেখ রোগী। এখন সে সব কথা যাক—বিন্দুমাধবের স্বজনগণের সন্ধান করিবার উপায় কি?"

"উপায়ের মধ্যে এক দেখি, বাঙ্গালার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া।"

"তাহাই কর।"

"তথাস্তু।"

৩

কিন্তু পর দিন প্রাতে আর বিন্দুমাধবকে পাইলাম না। প্রত্যূষে সে আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল—তখন একাধিক ট্রেণ দিল্লী ষ্টেশন হইতে

যায়। যাইবার সময় সে আমার দ্বারবানের কাছে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছিল—

"ধরানাথ, তোমার স্নেহের ও তোমার পত্নীর যত্নের জন্য তোমাদিগকে যে ধন্যবাদ দিয়া যাইতেও পারিলাম না—ইহাতেই বুঝিবে—আমার দুর্ভাগ্য এখনও আমাকে অব্যাহতি দেয় নাই। ইংরাজী একটি কবিতায় পাঠ করিয়াছি—যে জীবনের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শেষে পান্থাবাসে সাদর অভ্যর্থনা পায়, সে সে কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। আমি কিন্তু জীবনের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া বিজন পথে কেবল কষ্ট পাইয়া তোমার পান্থশালায় আসিয়া নূতন জগতের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমার প্রেমসুখসমুজ্জ্বল গৃহে আসিয়া আমি জগৎকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসে লজ্জানুভব করিয়াছি। তোমরা সুখে থাক।

"তুমি যে আমাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছ—তাহারও কি কোনও কারণ ছিল? কে বলিবে?—জগতে জ্ঞাত অতি সামান্য—অজ্ঞাত অনেক। সে দিন শ্মশানে তুমি আমাকে নূতন কর্ত্তব্যের সন্ধান দিয়াছ। আমি তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। যদি তাহার সন্ধান পাই—যদি তাহাতে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারি, তবে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আরও অধিক মনে করিব।

"তোমাদের আমি কখনও ভুলিতে পারি না।

"স্নেহবদ্ধ বিন্দুমাধব।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম—হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিলাম। আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমার স্ত্রী বলিলেন, "সন্ধান করিবে না?"

আমি বলিলাম, "করিব। কিন্তু তাহার সন্ধান পাইবে না।"

"কেন?"

"তাহাকে আর সংসারের পিঞ্জরে পূরিতে পারিবে না—সে আর বন্ধনে বদ্ধ হইবে না।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "হয় ত সেই ভাল। কিন্তু আমরা সংসারের মায়ায় বদ্ধ—সংসারের বাহিরে চাহিতেও জানি না; তাই আমাদের মনে হয় সব আশা—সব আকাঙ্ক্ষা—সব কাজ সংসারের কেন্দ্রেই আবদ্ধ; যে সে কেন্দ্র ত্যাগ করে, সে লক্ষ্যহীন হইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করে।"

"বিন্দুমাধবেরও তাহাই হইয়াছে। সংসারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া সে কেবল দুঃখই পাইয়াছে। সে দুঃখ এত তীব্র যে, সে আত্মঘাতী হইয়া তাহার দাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এবার সে সংসারের বাহিরে —নূতন কর্ত্তব্যের সন্ধানে গিয়াছে। যদি সফলকাম হয়—তবেই মঙ্গল।"

"তাহাই হউক। যে ভালবাসা বিলাইয়া দিতে না পারিয়া তিনি হৃদয়স্থিত উৎস-বারির বেগে পর্ব্বতের কম্পনের মত বেদনাচাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছেন, সেই ভালবাসা বিশ্বমানবের কল্যাণে প্রযুক্ত হউক।"

"হাঁ—মুক্তির পর যে বন্ধন, সে ত মধুরই—

"যা'র কেহ নাই, তা'র সব আছে।
সমস্ত জগৎ মুক্ত তা'র কাছে।
তা'রি তরে ফুটে রবি শশী তারা
তা'রি তরে ফুটে কুসুম গাছে।"

বিন্দুমাধবের সন্ধান করিলাম; কিন্তু সন্ধান পাইলাম না। সে যেমন অতর্কিতভাবে আসিয়াছিল, তেমনই অতর্কিতভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু চিহ্ন রাখিয়া গেল আমাদের হৃদয়ে তাহার প্রতি স্নেহে—তাহার দুঃখে সহানুভূতিতে।

আমার স্ত্রী একবার বলিলেন, "তবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হইত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"যদি আবার কখনও সন্ধান পাও।"

"তখন যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব—তখন করিব।"

"সেই ভাল।"

বিন্দুমাধব লিখিয়া গিয়াছিল, আমাদিগকে ভুলিতে পারিবে না। আমরা তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না।

৪

দুই বৎসর কাটিল। বিন্দুমাধবের স্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে অপনীত হইল না। ফটো লওয়া আমার একটা সখ ছিল। আমি তাহার একখানি ফটো লইয়াছিলাম। আমরা কত দিন সেই প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহার কথা লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার স্ত্রী বলিতেন—"তাহার স্ত্রীকে দেখিতে আমার প্রবল কৌতূহল হয়। মানুষের জীবনে কত ভুলই হয়—আর ভুলের পরিণাম কিরূপ বেদনাদায়ক হইতে পারে!"

দুই বৎসর পরে এক দিন এক জন বাঙ্গালীর গৃহে আমার রোগী দেখিবার ডাক আসিল। ভদ্রলোকটির বড় কয়লার কারবার—কারবারের জন্য তিনি বৎসরে প্রায় আট মাস দিল্লীতে থাকিতেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কখন তাঁহার গৃহে চিকিৎসা করিতে আহূত হই নাই।

যাহার চিকিৎসার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম, সে একটি বালিকা। তাহার অসুখ—বিষণ্ণতা ও তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য। তাহার ম্লানমুখে বিষাদের ব্যাপ্তি দেখিলে দুঃখ হয়—সে বয়সে তাহা একান্তই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আমি বালিকার ব্যাধির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সে যখন শিশু, তখন তাহার পিতা সংসার ত্যাগ করেন; তদবধি বালিকা খেলা ত্যাগ করিয়াছে—তাহার শিশুসুলভ চপলতা অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিষণ্ণভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে বয়সে সাধারণতঃ বঙ্গদেশে মেয়ের বিবাহ হয়, তাহার সে বয়স হইয়াছে; কিন্তু তাহার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার পিতার জ্যেষ্ঠতাত তাহার বিবাহ দিতে সাহস করিতেছেন না। মেয়েটি তাঁহার বড় আদরের—যদি শ্বশুরালয়ে তাহার এই ভাবের জন্য তাহার লাঞ্ছনা হয়! গৃহস্বামী বালিকার মেসো মহাশয় তাহাকে দিল্লীতে আনিয়াছেন—যদি নূতন স্থানে আসিয়া তাহার ভাবান্তর হয়।

আমার কেতাবী বিদ্যার বাহিরে—চিকিৎসকের অভিজ্ঞতায় আমি কখনও এরূপ রোগের সহিত পরিচিত হই নাই। তাহার কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থায় লোকের কাজের একান্ত অভাব হয় না—মানুষ নিঃসম্বলও হয় না। আমি সে কথা গোপন না করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলাম; সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "আমার মনে হয়, বিবাহের পর প্রেমের ভেষজে—অপত্যস্নেহের ঔষধে এ ব্যাধি দূর হইতে পারে।"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু সাধারণতঃ যে অবস্থায় বাঙ্গালীর ঘরে নববধূকে কয় বৎসর কাটাইতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠতাত ইহার বিবাহ দিতে ভয় পাইতেছেন।"

বিন্দুমাধব!—আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই কি মুরলা?"

গৃহস্বামী যেন চমকিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ! আপনি জানিলেন কেমন করিয়া?"

"বিন্দুমাধব আমার সহপাঠী—বন্ধু। দুই বৎসর পূর্ব্বেও সে আমাকে দেখা দিয়া গিয়াছে।"

গৃহকর্ত্তা কোনও কথা না বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—গৃহিণীকে সংবাদ দিতে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রবেশদ্বারটি ভেজাইয়া দিলেন। বুঝিলাম, এক জন স্ত্রীলোক দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনি কোথায় বিল্বমাধবের সন্ধান পাইয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "এই দিল্লীতে।"

"সে কি?"

কি সূত্রে—কিরূপে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ, সে কথা বলিব কি না, ভাবিতে লাগিলাম। গৃহকর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি সংবাদ দিলে একটি পরিবারকে অনন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। অনুগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান বলিয়া দিউন।"

আমি বলিলাম, "এখন আর তাহার সন্ধান জানি না—সে আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে।"

"কোথায় গিয়াছে?"

"তাহা জানি না। সে নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে কয় দিন তাহার বাল্যবন্ধুর গৃহে থাকিয়া গিয়াছে। আর কিছুই জানি না।"

এবার দ্বারান্তরাল হইতে মহিলার মৃদু অথচ কৌতূহলকম্পিত কণ্ঠ শ্রুত হইল, "কেমন করিয়া আমরা তাহার সন্ধান পাইব?"

আমি বলিলাম, "সন্ধানের কোনও উপায় জানিলে আমি কখনও তাহার সন্ধান লইতে বিরত থাকিতাম না।"

তাহার পর গৃহকর্ত্তাকে আমি বলিলাম, "আজ আমার সময় নাই—পরে আপনাকে তাহার সহিত আমার সাক্ষাতের কথা বলিব। আপনি একবার মুরলাকে ডাকিয়া আনুন।"

মুরলা আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "মা, আমি তোমার বাবার বাল্যবন্ধু—তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বেও একবার আমাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন। তোমাকে আমার বাড়ী যাইতে হইবে।"

বালিকার নয়ন যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কোথায়?"

"তাহা জানি না।"

বালিকার পাণ্ডুমুখে নিবিড়তর পাণ্ডুতা পরিব্যাপ্ত হইল—তাহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল। সে আর কোনও কথা বলিল না।

আমি উঠিলে গৃহকর্ত্তা আমাকে "কি" দিতে আসিলেন। বড় রাগ হইল; বলিলাম, "বিন্দুমাধবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা শুনিয়াও আপনি আমাকে 'কি' দিতে চাহিতেছেন?"

লোকটি বেশ সপ্রতিভভাবে বলিলেন, "তাহাতে কি?—ব্যবসা।"

"ব্যবসা করিলে কি মনুষ্যত্ব রাখিতে নাই?"

"কিন্তু ব্যবসা অমন ব্যবস্থায় চলে কি?"

"মানুষ হইলে তাহার চলে। কিন্তু যাহারা কয়লার ব্যবসা করিয়া মনের বর্ণটাও সেইরূপ ময়লা করিয়াছে, তাহাদের চলে না।"

তিনি তবুও টাকা লইয়া হাত বাড়াইতেছেন দেখিয়া একটু বিরক্ত হইলাম, —বলিলাম, "মহাশয়, মুখের উপর বলিতেছি—কিছু মনে করিবেন না; আপনি একদম উজবেক। এমন কাজ কিন্তু আর কখনও করিবেন না।"

বাড়ীতে আসিয়াই গৃহিণীকে সব কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি মুরলাকে আনিলে না কেন?"

আমি বলিলাম, "আনিব বলিয়া আসিয়াছি। এখন তাহারা পাঠাইলে হয়।"

"হাঁ। তুমি যেরূপ মিষ্ট কথা বলিয়া আসিয়াছ, তাহাতে সন্দেহ হয় বটে। আচ্ছা—আমিই যাইব।"

"সে কি? তাহারা যদি ভাল ব্যবহার না করে?"

"না করে—না-ই করিবে। আমার গায় ত ফোস্কা পড়িবে না। আর তাহারাও ত মানুষ বটে। কেন কুব্যবহার করিবে?"

৫

মধ্যাহ্নের পরই গৃহিণী যখন গাড়ী আনিতে হুকুম দিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

তিনি বলিলেন, "মুরলাকে আনিতে যাইতেছি।"

তিনি তথায় যাইয়া কি উপায়ে বাড়ীর কর্ত্তার কর্ত্তায় অর্থাৎ গৃহিণীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন, তাহা জানি না। তবে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুরলাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। পরে তিনি বলিলেন, বিন্দুমাধবের আবির্ভাবের ও অন্তর্ধানের সব কথাই তিনি তাঁহাদের বলিয়া আসিয়াছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "পেটে কথা ত থাকিবার উপায় নাই।"

"মনের কথা মনেই আটক রাখিয়াই ত তোমরা যত গোল কর। প্রমাণ—

তোমার বন্ধুটির দুর্দ্দশা। তোমাদের মত আমরাও যদি মনের কথা মনেই রাখি, তবে সংসারে বাস করাই দুষ্কর হইবে।"

"তবে যত পার কথা কও।"

"কথা কহিতে তোমরাও কম নহ। তবে তোমাদের কথা হয় বাজে কথা—নহে ত বাঁকা কথা।"

আমি হারি মানিলাম।

সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে মুরলা আমাদের বাড়ী আসিত—সন্ধ্যার পর গৃহিণী তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাসীর কাছে রাখিয়া আসিতেন।

মাসী মুরলাকে যতই আদর যত্ন করুন না, সে তাঁহার কাছে একটু কুণ্ঠিত-ভাবেই বাস করিত, এবং কলিকাতা হইতে তাহার "বড় দাদা" (বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠতাত) সে কবে ফিরিবে জানিতে চাহিলেই লিখিত—"আমাকে লইয়া যাইন।"

আমার স্ত্রী এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি মাসীমার অপেক্ষা দাদাকে ভালবাস। মাসীমা ত তোমাকে খুব স্নেহ করেন!"

মুরলা সরলতার অবতার। সে কোনও ভাব গোপন করিত না—বলিল, "মাসীমা খুব স্নেহ করেন: কিন্তু তবুও আমি বড়দাদাকে যত ভালবাসি, তাঁহাকে তত ভালবাসিতে পারি না।"

"কেন বল দেখি?"

"বোধ হয় মাসীমা আমার মার ভগিনী, আর বড়দাদা আমার বাবার জ্যেঠা বলিয়া।"

বাস্তবিক মুরলার পিতৃভক্তি দেখিয়া আমার কেবল বিন্দুমাধবের পিতৃভক্তি মনে পড়িত—সে বিষয়ে পুত্রী পিতার মনোভাবের উত্তরাধিকারিণী। আমার বসিবার ঘরে বিন্দুমাধবের যে প্রতিকৃতি ছিল আমি সেখানি দেখাইয়া মুরলাকে বলিয়াছিলাম, "ঐ তোমার বাবার ছবি।" শুনিয়াই মুরলা উঠিয়া সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে মস্তক নত করিয়াছিল—বাহ্যজ্ঞানশূন্যবৎ বহুক্ষণ সেই অবস্থায় ছিল। যখন সে মুখ তুলিয়াছিল, তখন তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে। আমার স্ত্রী তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলে—তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া যেন বুকভাঙ্গা বেদনার মুরলা বহুক্ষণ কাঁদিয়া যেন কিছু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।

এক দিন মুরলা আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা, আপনার কি মনে হয়? বাবা কি আবার আপনাদের কাছে আসিবেন?"

আমি বলিলাম, "হয় ত আসিবেন। আসিলে আমি তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি আসিবে?"

মুরলা এ প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিল—সে আসিতে নাও পারে, এমন সন্দেহ কি কেহ করিতে পারে? সে বলিল, "আসিব না?"

"আসিবে বই কি। কিন্তু মা, তত দিনে তোমার বিবাহ হইবে। তোমার শ্বশুরবাড়ীর সকলের মত লইয়া তখন তোমাকে আসিতে হইবে।"

মুরলার মুখে বেদনার ও শঙ্কার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কাকা, বাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদের কাছে আমি ত বাস করিতে পারিব না!"

আমি তাহাকে নিঃশঙ্ক করিবার জন্য বলিলাম, "সে কি, মা—তাঁহারাই উদ্যোগ করিয়া তোমাকে তোমার বাবার কাছে আনিবেন।"

কয় দিনের মধ্যেই মুরলা আমাদের একান্ত আপনার হইয়া গেল। আমার পত্নীর আন্তরিক স্নেহে সেও তাহার স্বাভাবিক সঙ্কোচ পরিহার করিয়া তাঁহার সঙ্গে আপনার মনের কথা বলিত। সে সরলভাবে সব কথা ব্যক্ত করিত। তাহাতে আমরা বুঝিতাম, বিন্দুমাধব যেমন তাহার পিতাকে দেবতার আসনে উন্নীত করিয়াছিল, সেও তেমনই তাহার পিতাকে দেবতা মনে করিত। ইহার মধ্যে উত্তরাধিকার কতটুকু ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে তাহার পিতার কথা বলিতে ভালবাসিত—পিতার একখানি প্রতিকৃতি আমার কাছে চাহিয়া লইয়াছিল—আমি তাহার পিতার বন্ধু বলিয়া আমাকে ভালবাসিত—আমার স্ত্রী তাহার পিতার জন্য দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন বলিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। মার প্রতি তাহার আকর্ষণ ছিল না।

৩

কিন্তু মুরলা অধিক দিন দিল্লীতে থাকিল না। সে যে তাহার বড়দাদাকে লিখিয়াছিল—"আমাকে লইয়া যাউন"—সেই কথাতেই তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি যখন শুনিলেন, বিন্দুমাধব দিল্লীতে আসিয়াছিল, তখন—যদি কোনরূপে তাহার সন্ধান করিতে পারেন, সেই আশায়—তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিয়াই আমার বাড়ীতে আসিলেন এবং আমি যে বিন্দুমাধবকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছি, সেই জন্য বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাতে আমাকে ডুবাইয়া

দিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কখন শোধ করা সম্ভব নহে।"

উত্তরে আমি বলিলাম, "বিন্দুমাধব যে ভাবে আমার কাছে আসিয়াছিল, প্রতিদিন বহু লোক সেই ভাবে আইসে। তাহাদের চিকিৎসা করাই আমার কাজ—সেই জন্যই আমি বেতন পাই। তবে সে আমার বাল্যবন্ধু, সেই জন্য শেষে আমি তাহাকে কাছে রাখিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য—তাই তাহাকে রাখিতে পারি পাই—সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু—ভ্রাতৃবৎ—আপনি আমাকে 'আপনি' বলিলে আমি বড় লজ্জা পাই।"

তিনি বলিলেন, "কি জান, বাবা, আজ কালকার ছেলে তোমরা—বিশেষ তুমি বিলাতফেরৎ—আমার সঙ্গে পরিচয় নাই—তাই তোমাকে 'আপনি' বলিয়াছি। কিছু মনে করিও না।"

তাঁহার স্নেহ দেখিয়া মনে হইল—বোধ হয়, বিন্দুমাধবও এমনই স্নেহশীল—এ স্নেহ সে দিতে চাহিয়াও দিতে পারে নাই। আর তাহার পত্নী—সে হেলায় কি রত্নই হারাইয়াছে!

বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠতাত আমার কাছে সব কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "আমার সঙ্গে তাহার আর দেখা হইবে না। যখন মনে করি, সে কত কষ্টই পাইতেছে—তখন বুকের মধ্যে যেন জ্বলিতে থাকে। তখন মনে হয়, তাহার পিতা যে পূর্ব্বেই লোকান্তরে গিয়াছে—সে তাহার সৌভাগ্য-পরিচয়। আমি বড়—আমাকে রাখিয়া সে চলিয়া গেল—সব ব্যথা আমার জন্যই রাখিয়া গেল!"

ইহার পর তিনি আর অধিক দিন দিল্লীতে রহিলেন না—মুরলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিলাম, ভাল বর দেখিয়া তিনি মুরলার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করেন। গৃহে যে পরিবেশমধ্যে তাহার বিমর্ষতা উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে পরিবেশ পরিত্যাগ করিলে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাহার ব্যাধি দূর হইবার সম্ভাবনা; তাহার পর নূতন সংসারে—পতির প্রেমে ও সন্তানের প্রতি স্নেহে সে সুস্থ হইতে পারে।

তাহার পর বিদায়ের দিন আসিল। মুরলা যাইবার দিন আবার আমার স্ত্রীকে বলিল, "কাকীমা, যদি কখনও বাবার সন্ধান করিতে পারেন, আমাকে জানাইবেন।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "মা, সে কথা তোমায় আর বলিতে হইবে না।"

আমার গৃহ হইতে যাইবার সময় মুরলা আবার তাহার পিতার প্রতিকৃতি-খানিকে প্রণাম করিল; তাহার পর আমাদের কাছে বিদায় লইল।

সে কয় দিনের জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু কয় দিনেই সে আমাদের এত আপনার হইয়াছিল যে, তাহার বিদায়ে আমরা একান্তই আপনার জনের বিদায়বেদনা অনুভব করিলাম। আমার স্ত্রীর মুখভাবে আমি তাঁহার মনের ব্যথা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কোনও কথা বলিলাম না—পাছে সহানুভূতির সঞ্চারে বেদনা অশ্রুর উৎস মুক্ত করে। মৃতসন্তান প্রসূতির স্তন্য বাহির হইতে না পাইয়া যেমন মাতৃস্তনে বেদনা উৎপন্ন করে, বুঝি বন্ধ্যা নারীর স্নেহও তেমনই বাহির হইতে না পারিয়া তাহাকে পীড়িত করে।

সন্ধ্যার পর ট্রেণ। আমি ষ্টেশনে যাইব শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন—"আমিও যাইব।"

ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় পথে গাড়ীতে তিনি পুনঃ পুনঃ রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

মুরলাকে লইয়া তাহার মাসী পাবিজাতের সঙ্গে আমার স্ত্রীর বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার বান্ধবীর নিকট হইতে বিন্দুমাধবের পারিবারিক অনেক কথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

'বৈরাজ্য' না 'প্রজাতন্ত্র'।

Le Sage বলিয়াছেন—"Truth is a stubborn thing." এমন এক সময় ছিল, যখন সংস্কৃত ভাষার বর্ণজ্ঞানবিহীন স্কচ্ দার্শনিক ডুগালড্ ষ্টুয়ার্ট (Dugald Stewart) বিশেষ গবেষণার সহিত একটী পুস্তকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, গ্রীকবীর আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পরে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে ধূর্ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত। ডব্লিনের আর এক জন বিচক্ষণ আচার্য্য অতিশয় পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত মতটীর সমর্থন করেন। (Macdonell—Hist. Sans. Lit. p. 2.)। অন্য দিকে ঐতিহাসিকবর Keigtley কষ্টস্বীকার করিয়া তাঁহার 'ভারতের ইতিহাস' লিখিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, এবং তাহাতে যত প্রকাশ করিয়াছেন

যে আলেকজান্দারের পূর্ব্বে ভারতে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রই প্রচলিত ছিল, তদ্ভিন্ন শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না (Thom. Keightley Hist. of Ind., 1847, p. 5.)। ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত রীতির প্রবর্ত্তনের সহিত এইরূপ দায়িত্ববোধশূন্য এবং মতগুলি নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ইউরোপীয় মনীষীগণ—অন্ততঃ যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে ভারতের পুরাতত্ত্বে প্রামাণিকরূপে পরিগৃহীত—তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, প্রজাতন্ত্র প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক আলোচনায় মনস্বী F. Guizotএর উপদেশবাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—'একটী দেশের সহিত দেশান্তরের প্রত্যেক অংশে সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্য সম্ভবপর নহে; সুতরাং তুলনামূলক সমালোচনায় বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক' (Embassy to the court of St. James in 1840)। আমেরিকা, গ্রেটবিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত, কিন্তু ইহাদের রাষ্ট্রগঠন কতক অংশে পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং ভারতের প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের অপর একটী আধুনিক প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সহিত সর্ব্বাংশে তুলনা করা সমীচীন হইবে না। এরূপ স্থলে আমাদের দেখা উচিত যে, বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মূল ও ভিত্তি,—সমুদয় প্রজাপুঞ্জ অথবা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক রাজ্যশাসনের অধিকার আছে কি না। কারণ, ইহাই প্রজাতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত প্রমাণ।

আরিয়ানের আনাবেসিস্ (Arrians Anabasis) গ্রন্থে দেখিতে পাই, যখন আলেকজান্দার দিগ্বিজয়-সূত্রে নীসা (Nysa) নগরীতে উপস্থিত হইলেন, তখন নীসার নাগরিকগণ আকুফিস (Acuphis) ও ৩০ জন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে নিজেদের প্রতিনিধিস্বরূপ আলেকজান্দারের নিকট প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের নগরটীকে স্বাধীনতা হইতে রক্ষিত করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন—'ডাওনিসাসের সময় হইতে আমাদের নগরী স্বাধীন, আমরা কাহারও বশ্যতা স্বীকার করি নাই, এবং আমাদের রাজকার্য্য স্বায়ত্তশাসিত।' আলেকজান্দার তাঁহাদের ও নগরীর স্বাধীনতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং তাঁহাদের রাজকার্য্য, শাসননীতি প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রমূলক কুলীনসম্প্রদায়ের (aristocratic republic) হস্তে নিবদ্ধ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন (E. J. Chinnock, Anabasis p. 244-247)। আনাবেসিসে ব্রাহ্মণগণ স্বাধীন জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (ibid. p. 301)। মেগাস্থিনিসের মতে,—'যদিও কতকটী রাজ্যে রাজতন্ত্র একেবারে লোপ পায় নাই, আলেকজান্দারের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে অধিকাংশ নগরই প্রজাতন্ত্রমূলক রাজ্যব্যবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছিল' (Ancient Ind. Megasthenes and Arrian, McCrindle p. 39)। ইণ্ডিকা (Indica) আরও দেখাইয়াছে যে, 'ডাইওনিসস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ৬৪৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং সংখ্যায় তাঁহারা ১৫০ জন ছিলেন; তবে এই সময়ের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (সম. সাময়. ভারত, ৩য় খণ্ড, ২০ পৃঃ, সমাজতন্ত্র)। কিন্তু অধ্যাপক রীস্ ডেভিড্‌স্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় যে সকল কুলীন-সম্প্রদায়-শাসিত রাজ্যতন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহাদের বিষয় এ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ও সাহিত্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির সহিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র সকল প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। (Buddhist Ind. Chap I.)। এই প্রজাতন্ত্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনার অভাব দেখিয়া সহৃদয় Rhys Davids মহোদয় তাহাদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের স্বাভাবিক বিদ্বেষই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, এবংবিধ আলোচনায় যে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির মূলে 'সমিতি'। বৈদিক যুগের আর্য্যসমাজ কতকগুলি 'জন' বা জাতিতে বিভক্ত ছিল। এই সকল জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক সকল 'বিশঃ' নামে পরিচিত, এবং এই নাম হইতেই 'বৈশ্য' শব্দটীর উদ্ভব হইয়াছে। 'বৈশ্য' শব্দের অর্থ 'বিশঃ' বা সাধারণ লোকের এক জন। এই সমস্ত বিশঃ একটী স্থানে একত্রিত হইয়া (সম্—ই + ক্তি) রাজ্য ও প্রজাসংক্রান্ত সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করিতেন, এবং তাঁহারাই 'সমিতি' নামে পরিচিত হইতেন। এই 'সমিতি'তে সমস্ত 'বিশঃ'ই উপস্থিত থাকিতেন; অন্ততঃ উপস্থিত বলিয়া অনুমিত হইতেন, সুতরাং 'বহু কর্ত্তৃক অল্পসংখ্যকের মনোরঞ্জন' এবং 'একের দ্বারা অনেকের মত-জ্ঞাপনের প্রথা' (principle of representation) তখনও প্রচলিত হয় নাই।

কিন্তু এইরূপ একটী জনবহুল বৃহৎ সমিতিতে রাজ্যশাসনকার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়া সুকঠিন; সুতরাং 'সমিতি' হইতে ক্ষুদ্রতর 'সভা'র উদ্ভব হইল। অথর্ব্ববেদে 'সমিতি' ও 'সভা' দুই ভগিনী-রূপে বর্ণিত হইয়াছে (অথর্ব্ব বে ৭ম. ১২)। সমস্ত 'বিশঃ' 'সমিতি'তে সাধারণভাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন, 'বিশঃ' বা 'অভিজন' কর্ত্তৃক মনোনীত অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিবর্গ 'সভা'তে সেই সকল বিষয়ের বিশদ পরামর্শ ও রাজ্য-সংক্রান্ত অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই 'সমিতি' ও 'সভা'র উপস্থিত সভ্যবর্গ বাগ্মিতা খ্যাতি লাভের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। 'আমার প্রতিপক্ষ যেন তর্কে জয়ী হইতে না পারেন। আমার বিপক্ষের তর্কশক্তি পরাভূত করুন।' 'আমার বক্তৃতায় যেন সকলে প্রীত হন, আমার বক্তব্য সমর্থিত হয়।' ইত্যাদি (অথর্ব্ব. বে. ২য়, ২৭)। সুতরাং 'সমিতি'র সার্থকতা 'সভা'র সম্পন্ন হইল; জনতা হইতে একের, বহু হইতে অল্পের প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা বলবতী হইল। এই ব্যবস্থাই প্রজাতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এই প্রতিনিধি-প্রথা সমিতিযুগে একেবারে অজ্ঞাত ছিল, বলা যায় না; কারণ, 'গ্রামণি' বা গ্রামনেতা নানা ব্যাপারে তাঁহার গ্রামের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তবে সমিতি-যুগের অঙ্কুর সভায় সম্যক্ বিকাশ লাভ করিল।

কুরু, কম্বু, বভ্রু প্রভৃতি এই 'জনঃ'র দৃষ্টান্তস্থল। ইহারাই সমবেত ভাবে 'পঞ্চজনাঃ' নামে অভিহিত। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, আপনাদিগকে একই আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আমাদের দেশে একটা আছে—'পাঁচ জনে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' এই 'পাঁচ জন' 'পঞ্চ-জনে'র স্মৃতি বহন করিতেছে।

'পাঁচ জনে'র আধুনিক অর্থ 'সকলে একত্রিত হইয়া'। পুরাকালে 'পঞ্চ-জন' আর্য্য-অধ্যুষিত ভারতের 'একত্র সম্মিলিত সকলে'র প্রতি প্রযুক্ত হইত (শতপথ ব্রা. ১৩।৭।৪।১৪)। প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের আদিম আভাস ও নিদর্শন আমাদের আধুনিক গ্রাম্য 'পঞ্চায়ত'। হিন্দু জাতির উৎপত্তির সহিত পঞ্চায়তের উদ্ভব, ভারতে বেদের ন্যায় ইহা আবহমান কাল প্রচলিত; প্রজাতন্ত্রমূলক পঞ্চায়ত হিন্দুর সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক জীবনের প্রতি স্তর, প্রতি অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

'সমিতি' ও 'সভা' রাষ্ট্রশাসনে প্রতিষ্ঠিত। উদ্দেশ্য ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যহেতু বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রশাসন পরিদৃষ্ট হয়। ইতিবৃত্তবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়াস্‌ওয়াল্ (Modern Review) এবং পুরাতত্ত্বপারদর্শী অধ্যাপক ভাণ্ডারকর (Carmichael Lec. IV) এইরূপ অনেকগুলির নাম করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের 'চরণ' ও 'পরিষৎ'; ধর্ম্মাধিকরণসম্পর্কীয় 'সভা' ও 'মন্ত্রিপরিষৎ'; অর্থনীতির 'সম্ভূয়সমুত্থান' ও 'পূগশ্রেণী'; ধর্ম্মবিষয়ে 'সংঘ' (ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন)। গ্রামশাসনে বৈদিক যুগের 'গ্রামনি' হইতে বর্ত্তমান গ্রাম্য 'পঞ্চায়তে'র, এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, সভাপতি ও সভার অধীনে সংঘবদ্ধ নগর সমুদয় হইতে 'শ্রেষ্ঠী'র উদ্ভব (উত্তর-ভারতের 'নগরশেঠ' ও 'জগৎশেঠ' উপমাস্থল) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই পঞ্চায়ত হইতে কালক্রমে সমৃদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের প্রজাতন্ত্রগুলি আলেকজান্দারকে পদে পদে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মহাভারত ও স্মৃতির অম্বষ্ঠ আলেকজান্দারের অভিযানের সময়ে পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু কানিংহামের মতে, তাহারাই চন্দ্রগুপ্তের অধীনে পরে গ্রীকৃগণকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত জয়াসওয়াল অম্বষ্ঠদিগকে পঞ্জাবের আরোড়ে জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ 'ক্ষত্রিয়' নামে যে প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহারা অর্থশাস্ত্রের 'ক্ষত্রিয়'। কিন্তু শ্রীযুক্ত জয়াসওয়াল্ 'ক্ষত্রি', পঞ্জাবের 'ক্ষত্রি' ও সিন্ধুদেশীয় Xathroi অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। মহাভারতে ক্ষুদ্রক ও মালবদের প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গুজরাটের যাদববিগের মধ্যে প্রজাতন্ত্র বহু কাল হইতে প্রচলিত ছিল। ইহা 'স্বরাজ্য' বা 'স্বরাট্' নামে অভিহিত হইত। এই 'স্বরাট্' শব্দ হইতেই 'সুরাট্' ও 'সুরাষ্ট্র' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারতে কৃষ্ণ যাদব প্রজাতন্ত্রের এক জন অধিনায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কৃষ্ণকে সম্রাট্ ও রাজগণের সভায় উপস্থিত দেখিয়া শিশুপাল যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের 'রাজা' উপাধির অভাব অন্যতম। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কৃষ্ণ একটী স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন এবং তদানীন্তন রাজগণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলিকে বিশেষ সুনজরে চক্ষে দেখিতেন না। সুরাটের দক্ষিণে ভোজ আর একটী প্রজাতন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সুরাট্ ও ভোজের উল্লেখ আছে। '* * * স্বারাজ্যায়ৈব তে অভিষিঞ্চন্তে স্বরালিত্যেনানভিষিক্তানা চক্ষত * * *'। '* * * রাজা সো ভৌজ্যায়ৈব তেঽভিষিঞ্চন্তে ভোজেত্যেনানভিষিক্তানা চক্ষত * * *'।

ঐত. ব্রা. ৭।৩।১৪। উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্রের শাসনরীতি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বৈরাজ্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। '* * * জনপদা উত্তরকুরব এতন্তমমন্ত্রা ইতি বৈরাজ্যায়ৈব তেহভিষিচ্যন্তে বিরালিত্যেনানভিষিক্তানা চক্ষতে (ঐত. ব্রা. ৭।৩।১৪।)। এই 'রাজবিহীন' রাষ্ট্র বা 'বৈরাজ্য' ও 'স্বরাজ্যে'র প্রজাতন্ত্র-প্রকৃতি স্ফুটতর করিবার জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহাদের সহিত মধ্যদেশ, বিশেষতঃ প্রাচীর (মগধ) সাম্রাজ্যের তুলনা করা হইয়াছে। Rhys Davids তাঁহার Buddhist India পুস্তকে (Chap. I. II) বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এ স্থলে তাহাদের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রজাতন্ত্র-সম্পর্কীয় অনেক ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে। বারান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

এ স্থলে এই প্রজাতন্ত্রগুলির পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় প্রাচীন রাজনীতিক ব্যবস্থাপকেরা প্রজাতন্ত্রগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন-রীতির প্রতিকূল না হইলেও, কার্য্যতঃ ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। আলেকজান্দারের অভিযানের সময় ইঁহারা শৌর্য্যবীর্য্য ও সৎসাহসের সহিত যা স্ব স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা স্বাধীন জাতির উচিত ও তাহাদিগেরই পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। একটীর পর একটী আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মগধের প্রধান সচিব বস্‌সকর এই সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রজাতন্ত্রগুলির আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে চাণক্য আরও ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য প্রথম হইতে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল যে, এই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রগুলিকে প্রথমতঃ পদদলিত করিয়া তাহাদের সমষ্টিতে একটী প্রবল বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবেন। ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিয়া, তিনি ভেদ, প্রলোভন, প্রতাপ প্রভৃতি যে সকল অপূর্ব্ব কূটনীতির কূটিল জালে আবদ্ধ করিয়া, নির্ম্মম নির্দ্দয়ভাবে এই সকল প্রজাতন্ত্রের সংহার ও মাগধ সাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করেন, প্রতীচ্য জগতের 'মেকিয়াভেলী' পরবর্ত্তী যুগের সাম্রাজ্য-প্রয়াসীর উপকারার্থ তাঁহার সার্থকনাম কৌটিল্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন যে, জার্ম্মাণী হইতে উক্ত পুস্তকের সুন্দর সংস্করণ বাহির হইয়াছে (A. Hillebrandt., Prof. Dr. Jolly)।

এইরূপে ক্রমে হিন্দু সাম্রাজ্যগুলি লোপ পাইয়াছে। বিক্রম-সংবতের ৩০০ বৎসর পরেও সিন্ধু ও পঞ্জাবে দুই একটি বর্ত্তমান ছিল, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানার মালবেরা প্রজাতন্ত্র-শাসনের অধীনে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক-আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে প্রজাতন্ত্রগুলি হিন্দুর সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক সমন্বয়-প্রয়াস ও সাম্রাজ্য-কল্পনার গর্ভে অদৃশ্য হইল।

গ্রীক ইতিহাস পাঠ করিলে গ্রীক প্রজাতন্ত্র ও হিন্দু প্রজাতন্ত্রের মধ্যে এক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়ের একই সময়ে তিরোভাব ঘটে, তবে ধ্বংসের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদের সহিত নিজেদের রাষ্ট্র ও সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তন

ও সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিতে না পারায়, গ্রীক প্রজাতন্ত্র মাসীদোনীয় ও রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল (Grote's History of Greece) কিন্তু ভারতীয় প্রজাতন্ত্র অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। গ্রীস প্রজাতন্ত্রের নাশে সমগ্র দেশ বিচ্ছেদের পদদলিত হইল ; কিন্তু হিন্দু প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস ও সাম্রাজ্যের উদ্ভবে বিজেতৃগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইল।

সাম্রাজ্য-প্রচেষ্টার অপরিহার্য্য ফল ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের কল্যাণে পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর প্রজাতন্ত্রের মূল স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আগ্রহ ও উৎসাহের স্রোত বহিতেছে। ভারতেও ইহার সূচনা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে একটী তথ্য ঐতিহাসিকের সম্মুখে উপস্থিত করা অসঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশে 'সমিতি'র আভাস, 'সভা'র অঙ্কুর, গ্রাম্য 'পঞ্চায়তে'র কলেবরূপ স্বায়ত্তশাসন আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। (cf. Public Administration of India—Dr. P. N. Banerjee, Chap I) বহু বিদেশীয় জাতি বহুবার ভারত-বিজয় করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ প্রজার অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রাজ্যশাসন-রীতির মূল ব্যবস্থাগুলি মগধ সাম্রাজ্য, মৌর্য্যসাম্রাজ্য, মুসলমান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সকলের ভিতর বরাবর সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে, এবং স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্যসম্প্রদায় বা পঞ্চায়তের ভিত্তির উপর এই ব্যবস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক র‍্যাপ্সন যথার্থই বলিয়াছেন—'Local Government thus forms the very basis of all political systems in India (Ancient India E. J. Rapson, p. 96). Rapson-এর আর একটী কথা —'কতকগুলি বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্যসম্প্রদায় লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও সেই রাজ্যগুলির একত্র সমবয় দ্বারা সাম্রাজ্য গঠিত হইত। স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্যসম্প্রদায় বা পঞ্চায়তগুলি নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ক্ষুদ্র রাজ্যের ও বৃহত্তর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইত। সুতরাং সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। তাহাদের মূল প্রজাতন্ত্র পূর্ব্ববৎ চলিত। (Ibid. p. 111) এই মতটী শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে সভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গত মাসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টীর পরিচয় দিয়াছেন।

পরিশেষে ইউরোপীয় স্বায়ত্তশাসন ও আমাদের দেশের পুরাগত স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাশ্চাত্য দেশে একত্রিত কেন্দ্রীভূত শাসন-ক্ষমতা (centralised power) ক্রমে বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে ও বিষয়ে ভাগ করিয়া দিতে দিতে (process of decentralisation) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসন লাভ হয়। আমাদের দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রবিষয়ক রীতিনীতি পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্য পঞ্চায়তের আদর্শে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং এই আদর্শেই ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভবপর।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মক্কা-ভ্রমণ। * (১)

১

১৩১৪ সালে আমি মুসলমান জাতির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তীর্থ মক্কা ও মদিনায় গিয়াছিলাম। আমার এই 'হজনামায়' তাহারই বৃত্তান্ত লিপিতেছি। যদিও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ আমার এই 'হজনামা'র সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না; তথাপি ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

যদি বঙ্গভাষায় লিখিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীরা মক্কা ও মদিনার কথা এবং মক্কা-মদিনা যাইবার পথের বিবরণ সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার এই 'হজ-নামা' ফার্সী ভাষায় লিখিত হইল; সুতরাং বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী-সমাজে ইহার আদর হইবার সম্ভাবনা অল্প। তবে ভরসা এই যে, যদি কখনও কেহ আমার এই 'হজনামা' বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করেন, তাহা হইলে আমার আশা পূর্ণ হইতে পারে।

বঙ্গভাষায় 'হজনামা' লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যাঁহাদের আগ্রহে ইহা লিখিত হইল, তাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু ও ফার্সী। পরন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আমার দখল নাই। বঙ্গদেশে 'মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষা'র আদর আছে বটে; কিন্তু ঐ ভাষার 'আদর-কদর' যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, "হজনামা" আপাততঃ ফার্সী ভাষায় লিখিত হউক।

প্রায় এক বৎসর কাল আমি মক্কা-মদিনায় ছিলাম। তত্রত্য মুসলমান সমাজের সকল স্তরেই মিলিয়া মিশিয়া, ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছি; বুঝিয়াছি; এবং শিখিয়াছি। তাহা হইতে ভারতীয় মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের যাহা জ্ঞাতব্য, তাহাই কেবল এই 'হজনামা'য় লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে এ দেশের লোকের কোনও উপকার হইবে কি না, তাহার বিচারের ভার পাঠকপাঠিকাদিগকে অর্পণ করিলাম।

মক্কা-মদিনার ভ্রমণকাহিনী লিখিবার পূর্ব্বে, 'হজ' সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। ঈশ্বরের বাণী কোরাণ, এবং শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার বাণী হাদিস, চারিটী ধর্ম্মকার্য্যকে 'ফর্জ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-কার্য্য (অর্থাৎ compulsory) বলিয়া ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। প্রথম, নমাজ; দ্বিতীয়, রোজা; তৃতীয়, হজ; এবং চতুর্থ, জাকাৎ।

---

* বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম পীর (গুরু) চব্বিশ-পরগণা নিবাসী শাহ সুফী মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিকী সাহেবের ফার্সী ভাষায় লিখিত 'হজনামা' নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটী—নমাজ ও রোজা, সকল মুসলমানেরই পালনীয়। শেষ দুইটী—হজ্ব ও জাকাৎ, ধনবান মুসলমানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানমাত্রই—স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে, নিয়মিতভাবে নমাজ পড়িতে ও রোজা করিতে বাধ্য। যাঁহারা ধনবান মুসলমান, তাঁহাদের পক্ষে নমাজ ও রোজা সম্বন্ধীয় আদেশ ত অবশ্য-পালনীয় বটেই; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে জাকাৎ ও হজ্বের আদেশও পালন করিতে হয়।

যে সকল মোস্‌লেম উপদেষ্টা, মোসলমানদিগকে ধন-দৌলতের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ দান করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, মুসলমানদিগের পক্ষে যদি ধন-দৌলত অনাবশ্যক বিবেচিত হইত, তাহা হইলে হজ্ব ও জাকাৎ তাঁহাদের 'ফর্জ' হইত না। কারণ, গরীব হওয়াই যদি মুসলমানদিগের সম্মানের বিষয় হইত, তাহা হইলে, মুসলমানদিগের জন্য চারিটী ফরজ নির্দ্দিষ্ট হইত না, নিশ্চয়ই দুইটী ফরজের ব্যবস্থা হইত।

মুসলমানদিগের নমাজ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথম, ওক্তিয়া নমাজ। প্রত্যহ পাঁচবার এই নমাজ পাঠ করিতে হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একবার; মধ্যাহ্ন-তপন যখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়ে, তখন একবার; অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে একবার; সূর্য্যাস্তের সময় একবার; এবং রাত্রিকালে একবার। এই নমাজ মসজিদে উপস্থিত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে পড়াই উত্তম। নিজ নিজ বাড়ীতে পড়িলেও দোষ হয় না।

দ্বিতীয়, সাপ্তাহিক নমাজ; অর্থাৎ জুমার নমাজ।—প্রত্যেক শুক্রবারে এই নমাজ পাঠ করিতে হয়। পাড়ার, গ্রামের ও মহাল্লার প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানই স্থানীয় জামে মসজিদে সমবেত হইয়া, দ্বিপ্রহরের সময়, এই নমাজ পড়িতে বাধ্য। এই নমাজের প্রারম্ভে খোৎবা-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

তৃতীয়, দুই ঈদের নমাজ। এই নমাজ ফর্জ নহে; ওয়াজেব। প্রায় ফরজের তুল্য। এক মাস রমজানের রোজার পরবর্ত্তী দিন প্রথম ঈদ্। ইহাকে ঈদ্-উল-ফিতর বলে। দ্বিতীয়, ঈদ্ বকর-ঈদ্। সাধারণতঃ লোকে ইহাকেই অজ্ঞতাবশতঃ বকরি-ঈদ্ বা বকরীদ বলিয়া থাকে। ইহার আর একটী নাম, ঈদ-উল-আজ্‌হা। এই ঈদল-আজ্‌হার দিন মক্কায় হজ্ব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার নমাজ আছে; তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চান্দ্র মাসের হিসাবে মুসলমানদিগের বৎসর গণিত হয়, এবং দ্বাদশ মাসে

মুসলমানদিগের বৎসর ধরা হয়। দ্বাদশ মাসের নাম যথা মোহার্‌রম, সফর, রবিউল্-আউওল্, রবিউল্-আখের, জমাদিউল্-আউওল, জমাদিউল্-আখের, রজব, শাবান, রমজান, শওয়াল, জিল্‌কদ্ ও জিলহিজ্জা। ত্রিশ দিনের অধিক, এবং ২৯ দিনের কম কোনও মাসই হয় না। মোট ৩৬০ দিনে বৎসরের গণনা হয়। ইহার মধ্যে ১০০ দিন রোজা করিতে হয়। তন্মধ্যে রমজান মাসের ৩০ দিন (কখনও কখনও ২৯ দিনও হইয়া থাকে), এক মাস ফর্জ রোজা, এবং অবশিষ্ট ৭০ দিনের রোজা নফল। ধর্ম্মশাস্ত্রে, প্রত্যেক মাসে ছয়টীর হিসাবে, এবং মোহার্‌রম মাসে দশটী নফল রোজা করিতে হয়।

'জাকাৎ' সম্বন্ধে শাস্ত্রের ব্যবস্থা এইরূপ যে, যাহারা ধনবান, তাহাদের সঞ্চিত ধনের ৪০ অংশের একাংশ গরীবদিগকে দান করিতেই হইবে। রমজান মাসের সপ্তবিংশ দিবসের মধ্যে যে কোনও এক দিন, ঐ অর্থ দান করিতেই হয়। যাহারা কারবারী, তাহাদের গৃহে অথবা গুদামে মৌজুদ মালের (বাজার দরে) মূল্য ধরিয়া, তাহার মধ্য হইতে উক্ত ৪০ অংশের একাংশপরিমাণ টাকা দান করিবার ব্যবস্থা আছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের এই ব্যবস্থা ও আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহার শাস্তি অতি ভয়ানক। ইসলাম-ধর্ম্মশাস্ত্রে এই জাকাৎই সদ্ব্যয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কেবল জাকাৎ দিয়াই ধনবানের পরিত্রাণ নাই; তাঁহাকে হজ্জ বিধিও পালন করিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি বিভিন্ন নামের কত সভাসমিতি হইয়াছে, এবং হইতেছে। কিন্তু আবহমান কাল হইতে 'ইসলাম' এই 'কংগ্রেসে'র সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু যাহারা ধনবান নহে, তাহারা যদি পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় হজ্জ ব্রত পালন করিবার সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে পুণ্যের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে। হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, "হজ্জ-ব্রত-পালনেচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, পরে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্টপরিমাণে ভূসম্পত্তি রাখিতে হইবে, পরে নিজের সঙ্গে সেই পরিমাণ অর্থ লইতে হইবে, যে পরিমাণ অর্থ সঙ্গে থাকিলে গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন-কালের মধ্যে কাহারও দ্বারস্থ বা গলগ্রহ হইতে না হয়। ভিক্ষুকের জন্য হজ্জ 'ফর্জ' হয় নাই।"

মক্কা-ভ্রমণকাহিনী বা হজ্জ-যাত্রা-কাহিনীর পাঠকগণের যে যে বিষয় জানা আবশ্যক, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। এইবার কথারম্ভ করি।

অদ্য ৫ই রমজান (২৭শে আশ্বিন, ১৩১৪।) আমি আজ পাঁচ দিন 'ফর্জ'

রোজার উপবাস পালন করিতেছি। গত বৎসর দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমি এ বৎসর নিশ্চয়ই হজ্জ-ব্রত-পালনার্থ মক্কায় গমন করিব। সে কারণ শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে, অদ্য হইতে প্রতিবেশী, আত্মীয়, পরিবারবর্গ, পরিচিত ব্যক্তি প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইতে আরম্ভ করিলাম। যদি ভ্রমক্রমে কখনও কাহারও অন্তরে ব্যথা দিয়া থাকি, প্রত্যেকের নিকট সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। যদি আমার অন্তরে কেহ কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যথা দিয়া থাকে, শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে তাহাকেও ক্ষমা করা আবশ্যক; এই জন্য যথাসাধ্য সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের দোষ ত্রুটী ক্ষমা করিলাম। এই ভাবে ১৬ই রমজান (৮ই কার্ত্তিক, শুক্রবার) পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন কাটিয়া গেল।

১৭ই রমজান (৯ই কার্ত্তিক) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই, মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, পুত্র, কন্যা ও জামাতা প্রভৃতি পরিবারভুক্ত সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাড়ীর বাহির হইলাম। এই সময় শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে, হজ্জ-ব্রত-পালনের 'নিয়ত' অর্থাৎ 'মনন' সম্পন্ন করিলাম। মৃত্যুকালে যে ভাবে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয়, এই সময়ও সেই ভাবে বিদায়-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা-পালনে কোনও ত্রুটী করিলাম না। বেলা দশটার সময়, মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলযোগে কলিকাতায় পঁহুছিলাম।

২৯শে রমজান (২১শে কার্ত্তিক) পর্য্যন্ত, দীর্ঘকালের জন্য প্রবাস-যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সকল ক্রয় করিতে, বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্রাদি লিখিয়া শেষ বিদায় লইতে, এবং কলিকাতাস্থিত আত্মীয়বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শেষ বিদায় লইতেই কাটিয়া গেল।

১লা শওয়াল পবিত্র ঈদ্-উল-ফিতরের নমাজ পড়া হইল। কেহ হাসিমুখে, কেহ অশ্রুপূর্ণনয়নে আমার নিকট বিদায় লইলেন। সমস্ত দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। রাত্রি প্রায় আটটার সময়, আমার বাসার সম্মুখে একখানি হাওয়া-গাড়ী আসিয়া লাগিল। জানা গেল, ঐ গাড়ী কলিকাতার শ্রেষ্ঠ-ধনী, এবং আমার প্রধান ভক্ত গোলাম হোসেন কাসেম আরিফের। আরিফ সাহেব আমাকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আমি প্রায় প্রস্তুতই ছিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ীতে উঠিলাম, এবং হাবড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

ক্রমশঃ।

অনুবাদক—আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

আলোচনা।

'বিলাসী'র পরিচয়।

ইদানীং 'বাঙলা' সাহিত্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্প একঘেয়ে হইলেও গল্প ত বটেই। গল্প যদি গল্পই হয়, তবে ত কোনও কথাই থাকে না; কিন্তু বর্ষণের চেয়ে গর্জ্জনের ভাগ বেশী হইলে স্বভাবতঃই আপত্তি উঠে। গত বৈশাখের 'ভারতী'তে উক্ত লেখকের 'বিলাসী' গল্প বাহির হইয়াছে। গল্পটী আত্ম-কাঁহিনী। কাহিনীর আখ্যানভাগ এই,—মৃত্যুঞ্জয় মিত্র এক পল্লীগ্রামের প্রান্তে আম-কাঁঠালের বাগানে একটা 'পোড়ো' বাড়ীতে একা থাকিত। বাগানের ফলকরের আয়ে তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা স্বচ্ছলভাবে চলিত। সে নিজে রাঁধিয়া খাইত। মোটাপড়াতেও সে অবশ্যই অমনোযোগী ছিল না, দুই ক্রোশ দূরে এক ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত। গল্পের বক্তা তাহাকে চিরদিনই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছেন! মৃত্যুঞ্জয়ের 'বাপ-মা ভাই-বোন' কেহই ছিল না। গাঁজাখোর, গুলিখোর ইত্যাদি বিশেষিত তাহার এক 'জ্ঞাতি খুড়া' ছিলেন। খুড়া তাহার খোঁজ লইতেন না, কিন্তু তাহার বাগানখানির দিকে তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মৃত্যুঞ্জয় তিন মাস কাল রোগে ভুগিল; কিন্তু যদিও সে গ্রামের অনেককে অনেক দিন অর্থসাহায্য করিয়াছিল, তথাপি গ্রামের কোনও ভদ্র ব্যক্তি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিল না। স্বার্থপর খুড়ার ত কথাই নাই। কিন্তু বিষমানবের প্রতিষ্ঠাভূমি এই বিধাতার রাজ্যে—যেখানে মেথর, চোর, চণ্ডাল, মালবৈদ্য প্রভৃতি উদার-হৃদয় ব্যক্তির অভাব নাই, সেখানে—একটা লোক বিনা সেবা-শুশ্রূষায় শুকাইয়া মরিতে পারে না। কাজেই বিলাসী নামে এক সাপুড়ের মেয়ের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার ফলে মৃত্যুঞ্জয় বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিয়া যখন উঠিল, তখন সে তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবেই। অর্থাৎ, সে বিলাসীকে 'নিকা' করিল, এবং তাহার 'ছুতে জাত' যাইতে লাগিল। এ সংবাদে সে গ্রামের তাবৎ ভদ্রলোক চটিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানবাড়ীতে গেল, গিয়াই মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে শিকল লাগাইয়া বিলাসীকে বেদম প্রহার করিল, প্রহারের চোটে আধ-মরা করিয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন শয্যাগত মৃত্যুঞ্জয় আর কি করিবে? সে বন্ধ ঘরের রুদ্ধ দ্বারে উপর্য্যুপরি সবলে পদাঘাত করিল, আর শ্রাব্য, ও অশ্রাব্য কত কি বলিল। তাহার পর কিরূপে, কত দিন পরে, এবং কাহার সাহায্যে রুগ্ন মৃত্যুঞ্জয় ঘরের বাহিরে আসিল, তাহা কল্পনায় বুঝিতে হইবে। তথাপি মৃত্যুঞ্জয় ঘরের বাহির হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত; নতুবা বৎসরখানেক পরে গ্রামের ক্রোশ দুই দূরে মাল-পাড়ায় একটা কুটীরের দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। মৃত্যুঞ্জয়কে যখন দেখা গেল, তখন সে মালবৈদ্যের ব্যবসা করিত, অর্থাৎ পয়সা লইয়া লোকের বাড়ীতে সাপ ধরিত, যে সে গাছের শিকড় বিক্রয় করিয়া পয়সা রোজগার করিত। লোক ঠকাইয়া পয়সা লইতে বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিত, বাধাও দিত; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় 'নগদ টাকার' লোভ সামলাইতে পারিত না। যাহা হউক, শেষে

এক দিন এক গোয়ালা বাড়ীতে সাপ ধরিতে গিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কামড়াইল। মৃত্যুঞ্জয় মরিল। বিলাসীই বা বাঁচিবে কিরূপে, বাঁচিলে ত আর 'ট্রাজিডী' হয় না! কাজেই সে সাত দিনের মধ্যে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিয়া সতী-লোকে যাত্রার 'ফ্যাশান'টা বুঝি তখনও উঠে নাই!

ইহাই হইল গল্প। কায়স্থ-সন্তানের সহিত মালবৈদ্য-কন্যার বিবাহ সমাজধর্ম্ম ও সামাজিক রুচির তরফ হইতে সমর্থনযোগ্য না হইলেও, রূপ ও গুণের মোহের হাত এড়াইতে কয় জন পারে? যাহা সত্য ও স্বাভাবিক, তাহার চিত্র সংস্কারের চক্ষে যতই কুৎসিত হউক, আধুনিক গল্প-উপন্যাস এত বাঁধা-ধরা নিয়ম মানে না। এই বাঁধা-ধরা নিয়ম না মানিবার হেতুবাদে কেহ কেহ যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা জানি। সম্প্রতি কোনও প্রবীণ সাহিত্যরথী ইহাকে 'সাহিত্যের বলবান লক্ষণ' বলিয়াছেন। কিন্তু 'নীতি-ধর্ম্মের কিংবা সাহিত্যের বা সমাজের তরফ হইতে কোনরূপ অনুরোধ, উপরোধ, গঞ্জনা কিংবা ভাড়নায় এখন কোনও কাজ দেখিবে না'—এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অদৃষ্টবিধাতার দোষ দিয়া মুক হইয়া থাকা কদাচ সঙ্গত নহে। গল্প-উপন্যাসে বিশিষ্ট সমাজের বিধি-নিষেধ না মানা দোষের বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু কোনও সমাজের রূপ বিকৃত করিয়া দেখাইবার অধিকার কোনও ঔপন্যাসিকের নাই। তিনি তাঁহার কবিত্বশক্তির নিকটা ঢাকিয়া রাখুন, এমন কথা বলিতেছি না; আমরা তাঁহার পূর্ণ রূপ দেখিতে চাহি। গল্প-উপন্যাসের অল্পপ্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু খেয়ালের রাজ্যেও বস্তুর বুদ্ধি আছে, পুষ্টির আশা নাই। মালবৈদ্যকে, কায়স্থের কেন, ব্রাহ্মণেরও মাথায় তুলিতে পার; অধমেও উত্তমের গুণের অভাব নাই, তাহা দেখাইতে পার; কিন্তু গায়ের জোরে উত্তমকে ঠেলিয়া নামাইয়া অধমকে ঠেলিয়া তুলিলে লেখকেরই চিত্তবিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির জাতীয় সাধনার কথা ভাবিতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও দেখিতে হয়। মালবৈদ্যের কন্যা সেবাধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় কায়স্থ-সন্তানের জীবনরক্ষা করিয়া সমাজে সেবাধর্ম্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া দিল, বেশ কথা; কিন্তু ইহাতেই কি পল্লীগ্রামের পল্লীবাসী তাবৎ লোকের উপর চটিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়? বিলাসীর লেখক তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এক জনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁকু বাঁধিয়া উপুড়-চড়ী পড়ে, একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু এ কালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' কতগুলি পল্লীর সহিত লেখকের পরিচয় আছে, জানি না; কিন্তু আমাদের পল্লীবাসী পাঠক সহজেই বুঝিবেন, পল্লী-বিষয়ে লেখকের জ্ঞান কত দূর সঙ্কীর্ণ। আমরাও পল্লীগ্রামে প্রতিপালিত হইয়াছি, সমগ্র ভারতের না হউক, কয়েকটী জেলার বহু পল্লীগ্রামের সহিত আমাদেরও পরিচয় আছে, সহরেরও অভিজ্ঞতা আছে। আমরা এমন পল্লীগ্রাম একটীও দেখি নাই, যেখানে রোগ বা অন্য রূপ বিপদে উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু কেহই কাহারও খোঁজ লয় না, বা কিছুমাত্র সাহায্য করে না। অনেক ক্ষেত্রে পাড়াশুদ্ধ লোকও জুটিয়া থাকে। বিশেষতঃ, মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় দাতা ও পরোপকারী ব্যক্তির সেবার অভাব পল্লীগ্রামে হয় না। তবে যদি মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীর ন্যায় কোনও নীচকুলোদ্ভবা রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে সে যতই

ঔপন্যাসিকের হউক, স্বভাবতঃই সাধারণের বিরক্তিভাজন হন। ইহাই সাধারণ পল্লীসমাজের অবস্থা। পল্লীর সকল ব্যবস্থাই ভাল, আর সহরের সকল ব্যবস্থাই মন্দ, এমন কথা আমরা বলি না। দোষ পল্লীসমাজেও আছে, সহরেও আছে। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতির নিদর্শন পল্লীসমাজে এখনও যে পরিমাণে আছে, সহরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। সহরের কৃত্রিম সভ্যতা তিলে তিলে পল্লীসমাজকে ক্ষয় করিতেছে, মানবসভ্যতার আদর্শকে খর্ব্ব করিতেছে। সে সকল কথার আলোচনার স্থান ইহা নহে। তথাপি লেখকের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সহরে বাড়ীর পাশে বাড়ী—কেহ কাহারও খোঁজ লয় না; রোগে ডাকিলে ডাক্তার ডাকিলে, রোগ যতই উৎকট হয়, ডাক্তারের 'ভিজিট' ততই বাড়ে; অড়ী-বড়ীর দেশের পল্লীসমাজেও সহরের পাশ করা ডাক্তারদের এই অত্যাচার দেখা যাইতেছে। সহরে মরিলে সহজেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি না, জানি না; কিন্তু পল্লীসমাজের আদেশে পাঁচ জনের সহিত ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে, এবং আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইলে, 'মিউনিসিপালিটী'র মেথরের গাড়ীতে পুণ্যাহীরহ হইতে হয়, সহরের এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আর পল্লীগ্রামে? বাসী-মড়া গ্রাসে পড়িয়া থাকিলে দেবসেবা হয় না, এই সংস্কারে সমাজের 'অশিক্ষিত' ব্যক্তিরাই গ্রাম হইতে শীঘ্র মৃতদেহ সরাইবার ব্যবস্থা করে। দুই জন ওজন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেও আর পাঁচ জন খোলায় এ কাজ করে। ইহা এই কলি-যুগেরই কথা।

'বিলাসী'র লেখক পল্লীগ্রামের হিন্দু বিধবাগণকেও অবথা আক্রমণ করিয়াছেন। কোনও ব্রাহ্মণ-বিধবার পদস্খলন অসম্ভব নহে। পল্লীগ্রামেও নহে, সহরেও নহে। পল্লী-গ্রামের কোনও 'ছোট বাবু' না হয় বার-ইয়ারী পূজা বাবং কিছু দান করিয়া, বা ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিয়া তাঁহার বিপথগামিনী বিধবা-ভ্রাতৃজায়াকে 'চল' করিয়া লইলেন, আর সহরের 'ছোটবাবু' সমাজকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বিপথগামিনী বিধবা-ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া মোটর-গাড়ীতে বসিয়া সমবে এবং অসময়ে হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়া, সতীত্বকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? অর্থবত্তাই বেশীর ভাগ। কিন্তু ঐ অর্থবত্তাই ত পাপকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। পল্লীবাসী যে ছোটবাবুর অর্থবল নাই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া যাহাতে বিপথে যাইতে না পারে, সেই চেষ্টাই করিতে হয়।

'বিলাসী'র লেখক গল্প লিখিতে বসিয়া এক একটী সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু কোনও সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন নাই। 'বোধ করি', 'মনে হয়' প্রভৃতি কথার আশ্রয়ে উপদেশের জবডাক পিটিয়াছেন। তাঁহার একটী সমস্যা এই,—ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানীকে বিবাহ করিয়া মেথর হয়, কিন্তু মেথর ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ হয় না কেন? ইহা জাতিবিচারের কথা। জাতিবিচার অর্থে উচ্চ নীচকেই বুঝায়। জাতি-বিচার হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার দোষ যাহাই থাকুক, কলঙ্ক মোচনের পথ নিরুদ্ধ করিবার জন্য, এ ব্যবস্থার কেন, পৃথিবীর কোনও উন্নতজাতির সমাজের কোনও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। সমাজে থাকিয়াই উচ্চ হইতে গেলে সমাজের বিধি-

ব্যবস্থাগুলিও না মানিলে চলে না। সকল সমাজেই এ বিষয়ে একমত। সমাজের অধিকাংশ লোকই যদি বেশী পৌরুষের বশ হয়, তবে মনোযোগ বিধিব্যবস্থাকে ভঙ্গ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সমাজের বিধিব্যবস্থা মানিয়াও কি হৃদয়-ভ্রমের শোধন পাওয়া যায় না? 'আমার মনে হয়, দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া বিবাহ করিবার রীতি'তে—দেহসর্বস্ব প্রেমের আগাড়ের দিকে যে শকুনির দৃষ্টি প্রখর, তাহার হৃদয়-মনের সাম্যের সৌরভ বাড়াইয়া তুলিবার জন্য পরলোকে যে অপরূপ অর্ঘ্যাহরণ সঞ্চয় করে, এমন অনাচার এখনও পাওয়া যায় নাই। আর, বিবাহকে যাহারা উপহাস করিয়াছিল, 'বাপুজের মেয়েটী যখন একটী পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল-তিল করিয়া ক্ষয় করিয়াছিল, তাহার তখনকার সে সৌন্দর্য্য কথাবার্ত্তা' দেখে দেখিতে না পাইলেও, তাহারা [illegible] ভোগ করিতেছে, 'বিলাসী'র লেখক তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই; পারিবার আশাও নাই। তবে আর গল্প লিখিতে বসিয়া মামুলী বাজে কথা আওড়াইয়া লাভ কি? লেখকের মতে টিঁ কিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নহে। টিঁ কিয়া না থাকাও যে চরম সার্থকতা নহে, তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? এই প্রসঙ্গে 'এডুকেশন্ গেজেট' বলিয়াছেন, 'মোটে পড়িয়া ভবিষ্যৎ ভূলিও হিন্দু যদি ধর্ম্ম, সমাজ, কুলাচার প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ না করিয়া ডোম-সেবক-সাপুড়ে বিবাহ প্রবর্ত্তিত না করিল, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া কি ফল—সে ভয়ানক দুঃখময় ভাবনা; কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজ, এবং ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধও এই প্রকার দুর্নীতির প্রচারেতেও কাটাইয়া টিঁ কিয়া থাকিবে। মূলের ভৌতিক অপরূপের কথা অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া নিবেদন করিলে নিবেদন ভাষায় 'বটতলা' হইতে ছাপা হইত। এখন প্রচারকের— এইমাত্র প্রভেদ।'

লেখকের আর একটী বক্তব্য—শিক্ষাসমস্যা। মফস্বলগ্রামের প্রতিদিন চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে হইলে, তাহাতে সে ভদ্রশ্রেণীর ছেলে উঠিতে পারে নাই। ইহাতেই শিক্ষাসঙ্কটের কথা উঠিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, 'চার-ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই।' ইহাতে বুঝা যায়, যে সকল গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, লেখক সেগুলোকেও সহ্য করেন। তাহা নহেন; কিন্তু কোনও গল্পলেখকের অভিযোগে সরকার বাহাদুর প্রতি গ্রামে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন না, দেশের বার্ষিক আয়-ব্যয় দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পুত্রকে 'উচ্চশিক্ষা' দিবার জন্য অনেক পুত্রের পিতা বা অভিভাবক পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হন, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু তথাপি প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে যে সকল ছাত্রাবাস আছে, উহাতে যত ছাত্র থাকে, তাহাদের ভূলনায় পুত্রের শিক্ষার জন্য যাঁহারা সহরবাসী হন, তাঁহাদের সংখ্যা কত অল্প, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। লেখক ইহাকে 'বাজে কথা' সাব্যস্ত করিয়াছেন। তথাপি পত্নীটী ফেলাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহাকেই বলে গল্পজন। তাহার পর রসিক কতটুকু, দেখা যাউক। গল্পের শেষাংশে মৃত্যুঞ্জয়ের অন্তিম অবস্থার কথাই দেখা যায়, তথাপি সে যে গ্রামের স্কুলে পড়িত, সেইখানেই না থাকিয়া প্রতিদিন 'চার-ক্রোশ পথ হাঁটা' ত্যাগ করে নাই কেন, তাহার কোনও

আরও গল্পটার মধ্যে নাই। যে মৃত্যুঞ্জয় একটা লোকের—হউক সে বিলাসী, বা বিলাসী, বা বিনোদিনী—গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতে পারিয়াছিল, দোকানের খাবার কিনিয়া ইহাকে উহাকে খাওয়াইত, কত ছাত্রের বেতন দিত, সে আমবাগানে 'পোড়ো' বাড়ীতে পড়িয়া থাকিলে কেন?—বিলাসীর পিতাকে বাগানে রাখিলে, এবং বাগানের ফলকর বন্দোবস্ত করিবার সময় নিম্নে বৎসরে দুই এক মাস বাগানে থাকিলে তাহাকে অবশ্যই চিরদিন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে হইত না। কিন্তু লেখক মৃত্যুঞ্জয়ের পঠদ্দশাতেই বিলাসীর দাদা তাহার হৃদয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অশ্রু করাইবার লোভ সামলাইতে না পারিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রটা জীবন আবর্তের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কি সুন্দর চরিত্রাঙ্কন! লেখক সাপুড়ের মেয়েটীকেও যেখানে সেখানে টানাটানি করিয়াছেন; বিলাসীকে এতই পতিগতপ্রাণা করিয়াছেন যে, যখন গ্রামের বহু লোক তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া হিচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখনও সে নিজের প্রাণকে তুচ্ছবোধ করিয়া স্বপ্ন পতির আহারের জন্য ব্যস্ত। নতুবা বিলাসীকে সতী সাজান হয় না। ইহাকেই বলে—অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বিলাসী যাহার হৃদয় ভিলে ভিলে জয় করিয়াছিল, এবং যে জয়ের আনন্দে লেখক গল্প লিখিতে বসিয়া পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ের মূল্য কতটুকু? বিলাসীকে লাভ করিবার আগে মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয় কেমন ছিল? দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে তাহার গোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়, কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে গেলে আর তাহার গল্প—বিলাসীকে পাওয়ার পর—মৃত্যুঞ্জয় দশ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না'। বলা বাহুল্য, তখনও তাহার বাগানখানি খাপরের খুড়া দখল করে নাই। কুবৃত্তির তাড়নায় নদীর স্রোতের মত যাহার হৃদয় নীচের দিকেই নামিয়া আসে, তাহাকে পদ্মাসনে ঠেলিয়া তুলে না। কি অবিচার!

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তি।

১

এক সময় মাষ্টার মহাশয় দু' পাঁচ টাকা গ্রাহ্যই করিতেন না; মাষ্টারের বন্ধুদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি এখনও তাঁহার নিকট অন্ততঃ দু' এ টাকাও না ধারেন। কিন্তু তাগাদার অভাবে সে টাকা তামাদী হইতে বসিয়াছে জানিয়াও তিনি তাগাদা করিয়া কাহারও মনে লজ্জা দিতে লজ্জিত। হেন মাষ্টারকে আজ কি না সামান্য চারিটি টাকা দেনার জন্য এ কথা শুনিতে হইল! ইহা কি তাঁহার প্রিয় ছাত্র সুধীরের প্রাণে সহ্য হয়

কাজেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাল সে যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার এ দেনা পরিশোধ করিবেই করিবে। উঃ! আজ যদি তাহার সেই অনেক দিনের জমান টাকা কয়টা থাকিত, তাহা হইলে কেহ কি তাহার সম্মুখে মাষ্টার মহাশয়কে এত করিয়া বলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাও যে আবার মা (কাকীমা) ধার লইয়াছেন। যাহা হউক, কাল সে যেমন করিয়াই পারুক, মাষ্টার মহাশয়ের গত মাসের পাওনা মাহিনাটা আনিবেই আনিবে।

সুশীল মাষ্টারের বেদনাক্লিষ্ট মুখখানির দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া সমবেদনা-পরিপূর্ণ ক্ষোভমিশ্রিত স্বরে বলিল—"আচ্ছা, আপনি অমন লোকের কাছে ধার করেন কেন?"

মাষ্টার আপনার প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ দুঃখের মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "কি করি বল্, অভাবে মানুষ সব-ই করে।"

"বেশ ত, আপনিই না হয় অভাবে পড়েছেন, কিন্তু 'ও' ত এমন কিছু অভাবে পড়েছে ব'লে বোধ হয় না, মা'র জন্যে এমন ক'রে ব'লে গেল।"

"তা ব'লে ভাববে কেন? ও পাবে।"

"তা' পেলেই বা—আপনিও ত কত লোকের কাছে পাবেন, কৈ, আপনি ত কাউকে এমন ক'রে বলেন না—আর ও এমন ক'রে ব'লবে কেন?"

নিজের মনে যাহা উঠিত, সে কথা বলিতে সুশীল কখনও ভয় পাইত না। এমন কি, সে এই মাষ্টারটিকে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী ভয় করিলেও উচিত বলিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতেও ছাড়িত না। মাষ্টার ইহা বেশ বুঝিতেন, এই জন্যই আজ তাহার তর্ক এই স্থানেই বন্ধ করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "ও পাবে, তা ও যদি বলে ত আমি আর কি কর্ব বল্?" সত্য সত্যই সুশীলের তর্ক বন্ধ হইল—সত্যই ত, তাহার টাকা শোধ করা ভিন্ন তিনি আর কি করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, আজ ত ১৫ই, দাদা মাইনে পাবে—কাল আমি যেমন ক'রেই হোক্, আন্বই আন্ব। আর কাকাবাবু যদি বলেন, "ওরা ভাড়াটা দিক্, তবে দোবো; আজ আমি এখনি গিয়ে বল্ছি—" এই বলিয়া সে নিজের বহিগুলি গুছাইয়া লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন মাষ্টার বলিলেন, "না রে—ঝগড়া করিস্‌নে, সেকালে আবার মারধোর খাবি, একেই ত—"

"হাঁ, মার খাবে না আরও কিছু—আপনার এখন দরকার পড়েছে, দেবেন না কেন? নৈলে আপনি ত এক সময় অমনিই বাড়ীতে গিয়ে পড়িয়ে এসেছেন—

তখন ত কৈ কিছু বলতেন না—" বলিতে বলিতে সুশীল ক্ষুদ্র মেসের একটী অর্দ্ধমলিন সিট্ ত্যাগ করিয়া চটী জুতার শব্দ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র বিভূতিভূষণ ওরফে 'মাষ্টার মশাই' বেচারী বালিশে হেলান দিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিল,—সেই এক দিন গিয়াছে! যখন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন। তখন সে কি না করিয়া বেড়াইয়াছে? অন্য বিষয় যেমনই হউক, কিন্তু একটী বিষয়ে তাহার জলন্ত সাক্ষী—এই চৌদ্দ বৎসরের সুশীল, তাহার এই সঙ্ঘের ছাত্রটী! হায়! কে জানিত, আজ তাহাকে এই ছাত্রের নিকটেই সামান্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ইহারই জন্য লজ্জায় সে আর সুশীলের বাড়ী মাথা গলাইতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২

বিভূতির প্রকৃত সঙ্গী বলিতে যে ছিল, তাহার নাম ফকীর। বোধ করি ফকীরের অবস্থাটা কতকটা তাহারই মত বলিয়াই বিভূতি তাহার হৃদয়ে বন্ধু-ভাবে স্থান পাইয়াছিল।

আজ সন্ধ্যার পরে ফকীর আসিলে বিভূতি তাহাকে সঙ্গে লইয়া ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে বেড়াইতে চলিল; উদ্দেশ্য—যদি দারিদ্র্যের অপমানজনিত দগ্ধ হৃদয়টা বন্ধুর মিষ্ট বাক্যালাপে কিছুক্ষণের জন্যও প্রফুল্ল থাকে। বিশেষতঃ, আজ আর তাহাকে দত্ত-বাড়ীর প্রাইভেট্ টিউটারীর রেগুলার এটেন্ডেন্স্ দিতে হইবে না—সে ছাত্রের অসুখ করিয়াছে।

সারপেনটাইন্ লেনের একটী মোড় পার হইয়াই সুশীলের দাদা সন্তোষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে বোধ হয় নিজেদের ইভনিং ক্লাবে যাইতে ছিল। বিভূতি মন হইতে লজ্জাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া জড়িতকণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া নম্রভাবে বলিল, "সন্তোষ! শোন ভাই—আজ মাইনেটা পেয়েছ কি? যদি পেয়ে থাক, তা হ'লে ক্রমে যাতে আমাকে দেওয়া হয়, কাকাবাবুকে বোলো না ভাই—এক ভদ্দর লোক পাবে—বড় তাগাদা ক'চ্ছে।"

সন্তোষ মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে কোনও আফিসে কেরাণীগিরী করে। ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্তই যাহার বিদ্যা শেষ, এমন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে আমকালকার

দিনে ইহাই কি যথেষ্ট নহে? যাহা হউক, এই ২০৲ টাকার ভিতর সে কোনও মাসে ১০৲ টাকা, কোনও মাসে বা খুব জোর ১২৲ টাকা নিজের অভিভাবক কাকাবাবুর হাতে দিয়া বাকী টাকা নিজের হাতখরচের জন্য রাখে। এ মাসে সে একটী ভাল জামার অর্ডার দিয়াছিল, সুতরাং এবার সে কাকাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, ৮৲ টাকার বেশী দিতে পারিবে না। এখন বিভূতির কথা শুনিয়া বোধ করি কাকার এ মাসের আর্থিক অবস্থাটার কথা ভাবিয়াই বলিল, "হ্যাঁ, মাইনে পেয়েছি বটে, কিন্তু কাল তোমাকে দেওয়া হয় কি না, ঠিক বলতে পারি না।" বিভূতি লজ্জিত হইয়া বলিল—"আচ্ছা, তবুও একবার 'কাইণ্ড্‌লি' তাঁ'কে ব'লো। বিশেষ দরকার।" "আচ্ছা, ব'লবো এখন"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; একটীও বাজে কথা বলিল না।

এই সময় বিভূতির হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কি যেন করুণ সুরে বলিয়া উঠিল, হায়, সময় কি পরিবর্ত্তনশীল! এমন এক দিন ছিল, যখন এই সন্তোষ বিভূতিকে কত সম্মান করিয়া চলিত। পিতৃমাতৃহীন অসহায় ভাইটীর পড়া বলিয়া দিবার কেহ ছিল না দেখিয়া সন্তোষ আহ্লাদের সহিত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহার মাষ্টারী করিত বলিয়া সে কতই না কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাকে লজ্জায় ফেলিত। আর আজ?

কর্ত্তীর তাহাকে মৌনভাবেই খানিক পথ চলিতে দেখিয়া বলিল, "একে-বারেই যে চুপ ক'রলি?—বল, তার পর কি হ'ল।—ভাবনা ত আছেই, তাই ব'লে সব সময় ভাবা ত ঠিক নয়।"

না, ভাবিয়া আর কি" বলিয়া বিভূতি "তার পর" কি হইল, তাহাই বলিতে লাগিল।—

৩

রাত্রিকালে আহারে বসিয়া সন্তোষ প্রদীপের আলোকে মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে কাকীকে বলিল, "দেখ কাকীমা, তোমাদের জ্বালায় আমার রাস্তায় বেরুন দায় হ'য়ে পড়ছে দেখ ছি—"

কাকীমা বলিলেন, "কেন রে, কি করেছি আমরা তোর?"

"তা' ত বটেই—আজ আমি কতকগুলি ভদ্দর লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কইছিলুম, এমন সময় তোমাদের মাবের মাষ্টারটী মাইনের তাগাদা ক'রলে, ব'লে—'কি হে আজ না তুমি মাইনেটা পেয়েছ? যা হোক্, কাল যেন আমার গত মাসের মাইনেটা দেওয়া হয়; ব'লো তোমার কাকাকে।" তার পর

সন্তোষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ভাই ছাই তাদের কাছ থেকে আমাকে একটু তফাতে ডেকে বল্, তা নয়, তাদের সামনেই তাগাদা! কেন, টাকা দিলে কি আর অন্য মাষ্টার পাওয়া যায় না?"

সুশীলও দাদার পাশে আহার করিতেছিল। সে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র হইলে কি হয়, দাদাকে চিনিতে তাহার কিছুমাত্র বাকী ছিল না। যে দিন হইতে মাষ্টার ম'শায় যাহিনা লইতে আরম্ভ করিয়াছেন, দাদা যে সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছে, ইহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। এখন দাদার কথা শুনিয়া সে কোনও মতেই দাদার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে মনে মনে বলিল,—মস্ত মিথ্যে, মাষ্টার মশায় কখনই এমন ক'রে এ কথা বলেন নি—এতে যে তাঁর নিজেরই বেশী অপমান। এইরূপ ভাবিয়া সে দাদার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিল, "কোন্ জায়গায় এ কথা বলেছেন তিনি?"

ভ্রাতার প্রশ্নের ভঙ্গী শুনিয়া দাদা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিল। বাম হস্তে ভাইয়ের মাথায় একটা মাঝারি রকমের চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি?"

মাষ্টারের হাতে মার খাইলে তাহার মনে কোনও কষ্ট বা রাগ হয় না, কিন্তু তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়স হইয়াছে, তথাপি দাদা আজ অনেক দিনের পরে তাহার গায়ে হাত তোলায় সে রাগে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বিশ্বাস আবার কি, তুমি মিথ্যে কথা ব'লছ।"

দাদা আর নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই ভাইকে আচ্ছা করিয়া দু' এক ঘা দিতে গেল। কাকীমা—"ওঠ, তোর আর খেতে হ'বে না" বলিয়া পশ্চাৎ হইতে সুশীলের দুই বগলে হাত দিয়া তাহাকে দাঁড় করাইলেন। সুশীল আর অধিক মার না খাইলেও, দাদা যে আবার সক্রোধ হাতেই তাহাকে মারিতে আসিল, এই কথা ভাবিয়া রাগে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। সে চীৎকার করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু মাষ্টার ম'শায়ের উপদেশগুলি মনে পড়ায় আর তাহা পারিল না—যে যেন জোর করিয়া তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল।

তাহার পর আহারান্তে সন্তোষ—"কাল গিয়ে লাগিও, আমাকে মেরেছে" বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কাকী বুঝিলেন, আজ রাত বারটার পূর্ব্বে সে বাড়ী ফিরিবে না।

এতক্ষণ সুশীল গুম্ হইয়া বসিয়াছিল; এখন দাদা বাহির হইয়া গেলে কাকীমা

মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আমি বল্‌বই ত, দেখো তুমি, আমি নিশ্চয়ই বল্‌ব।"

কাকী সন্তোষকে ভাল রকমই চিনিতেন, বলিলেন, "না বাবা, আর বলা-বলিতে কাজ নেই—আবার মামলোর কর্‌বে—ওর সঙ্গে কে পারবে, বল?"

কাকীর উপর রাগ করিয়া সুশীল রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না মা, তুমি জান না—কেন শুধু শুধু তাঁর নামে দোষ দেবে? তুমি কি মনে কর, দাদা যা বল্‌লে—সব সত্যি; তিনি কি সেই রকম লোক?"

কাকীর একটী ছেলে হইয়া মরিয়া যাইবার পর, সুশীলের বিধবা মা যখন তাহাকে তিন বছরেরটী রাখিয়া মারা যান, তখন হইতেই কাকী তাহাকে লইয়া মানুষ করিতেছেন। এখন সুশীলের শেষ কথা শুনিয়া বিভূতির হাসিমাখা মুখখানি তাঁহার মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপস্থিত দুরবস্থার কথাও মনে পড়ায় তাঁহার মুখখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন "সে কি আর আমি বুঝিনি বে—কি করি বাবা, আমারও যে কপাল ভাঙ্গা, ঐ পাড়াটা আছে ব'লেই ত যা হোক্ ক'রে খেয়ে না খেয়ে সংসারটা চলে যাচ্চে—ওর যদি চাকরী থাকত—" একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুশীলের মুখ পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন—তুই বিভূতিকে আমার নাম ক'রে বলিস্, ওরা ভাড়াটা দিলেই দোবো—আর এ সব কথা কিছু বলিস্‌নে, মনে কষ্ট পাবে—"

সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, তা হ'বে না—টাকা কাল চাই-ই।"

মা বলিলেন, "তবে তুই ওঁকে বলিস্, আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ব না।"

আর সুশীল দমিল না, কহিল—"আচ্ছা, আমিই বল্‌ব।"

৪

পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়া গেল, তথাপি আজ সুশীল আসে না কেন? তবে কি বেচারী টাকার জন্য জিদ্ করায় মার খাইয়াছে, কিংবা টাকা না পাওয়ায় লজ্জায় আজ আর পড়িতেও আসিবে না? ইত্যাদি নানা চিন্তায় বিভূতি ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষটা সে আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। ছাতে আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্য রহিল রাস্তার উপর—কখন সুশীল আসিবে। হঠাৎ সিঁড়ি হইতে চটীর টিচিট্ শব্দ তাহার কাণে গেল। কি জানি, কেন তাহার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস

করিয়া উঠিল—সে যে এতক্ষণ তাহারই আশাপথ চাহিয়াছিল! তাড়াতাড়ি বিভূতি ছাড় হইতে নামিয়া আসিল; দেখিল, আগন্তুক ফকীর। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার পর, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ আবার প্রফুল্ল হইল;—সে দেখিল, ফুলীলও আসিতেছে। কিন্তু আজ তাহার মুখখানি এত ভার কেন? সে যেন মনে মনে কত কি ভাঙ্গা গড়া করিতেছে। তবে কি টাকা—না না, সে যে বই রাখিয়াই পাঁচটী টাকা তাহার হাতে দিল; তবে কি? বিভূতি কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

টাকা পাঁচটী তাহার হাতে দিয়াই সে বলিল, "কাল আপনি দাদাকে টাকার কথা বলেছিলেন?" বিভূতি তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ—কেন রে?"

এ কি! তবে কি দাদার—কথাই সত্য নাকি! সত্য হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ সে মায়ের কাছে মুখ দেখাইবে কি করিয়া—ছিঃ ছিঃ, মাষ্টার মশাই যে এ কাজ করিতে পারিবেন, এ ধারণা যে তাহার মনে এতটুকুও স্থান পায় নাই। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"যা' হোক্ মা বলেছেন, আর কক্ষণও আপনি দাদাকে মাইনের তাগাদা কর্‌বেন না—দাদা ত আপনাকে মাইনে দেয় না।"

হা অদৃষ্ট! তাহার নাম তাগাদা! মাষ্টার লজ্জিত হইয়া বলিল, "না না, তাগাদা আর এমন কি করা হয়েছে।"

"না হয়নি আবার! পাঁচ জন ভদ্দর লোকের সামনে যে রকম ক'রে বলেছেন, তারই নাম ত তাগাদা।"

কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় হইলেও মাষ্টারের এখন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি? কে বল্লে, আমি তাকে লোকের সামনে তাগাদা করেছি?"

"করেছেন ত। দাদা বল্লে ত, সে ক' জন ভদ্দর লোকের সঙ্গে কথা কইছিল, আপনি গিয়ে বলেছেন—'কি হে, আজ না মাইনে পেয়েছ, যা হোক্ কাল যেন আমার মাইনেটা দেওয়া হয়'—"

এতক্ষণে বিভূতির মুখে হাসি ফুটিল, বলিল, "ভুই ভুল শুনেছিস্ গাধা—ভোপাকার!"

তবে কি তাহার ধারণাই সত্য—তাহাই হউক, তাহা না হইলে সে আজ বাড়ী ফিরিবে কোন্ মুখে! সে কহিল, "হুঁ, আপনি ও কথা বলেছেন, দাদা বল্লে—"

এইবার বিভূতির ছাত্রের প্রতি অত্র রাগ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আজিকার পূর্ব্বের ঔদ্ধত্যের কথা মনে পড়িল। রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"সে ব'লেছে —তুই শুনিছিস্?"

শুধু শুনিয়াছে! সে এ কথা বিশ্বাস না করায় তাহাকে যে মার পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছে, সেই কথাটাই তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মাষ্টারের মন এতই সরল যে, এ কথা তিনি বিশ্বাসই করিতে পারিতেছেন না। এ হেন মাষ্টারের চরিত্রে দোষারোপ করিতে দাদার মুখে একটু আট্‌কাইল না? ছিঃ ছিঃ, ইহাতে তাহার যে লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে। মুহূর্ত্তে এই কথাগুলি মনের মধ্যে ভাবিয়া লইয়া দাদার প্রতি রাগে অন্ধ হইয়া সে জোর করিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, আমি শুনিছি—আমি ভজিয়ে দেব, চলুন।"

বালক নিশ্চয় ভুল করিয়াছে—কি শুনিতে কি শুনিয়াছে। ইহাও কি সম্ভব! এরূপ মিথ্যা বলিয়া সন্তোষের লাভ কি? আর, সে এ কথা বলিবেই বা কি করিয়া? যাহা হউক, কিন্তু তাহার ছাত্রের পক্ষে এরূপ ভুল করা ত বড় অন্যায়। না, এরূপ কাজে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। বিভূতি এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় ফকীরও বলিয়া উঠিল, "না না, খোকা; তুমি ভুল শুনে থাকবে—এ কথা সে কি বলতে পারে? আমি ওর সঙ্গে ছিলুম, তোমার দাদা হয় ত সেই কথা বলেছে। ছিঃ, তুমি কি হে, তোমার দাদা এ কথা শুনলে বলবে কি?"

সে যে এই কথার জন্য, ঠিক্ এই কথারই জন্য, মার পর্য্যন্ত খাইয়াছে, আর ইহারা বলিতেছেন, সে ভুল করিয়াছে—ইহা কি ভুল করিবার কথা! যাহা হউক্, মার খাওয়ার কথাটা বলিলে বোধ করি ইহারা আর বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু এ কথা সে বলিবে কেমন করিয়া? প্রথমতঃ, লজ্জা। কিন্তু বিনা দোষে সে মার খাইয়াছে শুনিলে মাষ্টার মশাই যে অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন, সুতরাং সে এ কথা কেমন করিয়া বলিবে? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "না—আমি ভুল ক'রিনি।"

মাষ্টার আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, "এবার মার খাবি কিন্তু।"

বালক শক্ত হইয়া বলিল, "বেশ ত, মারুন না।"

তাহার এরূপ ঔদ্ধত্য মাষ্টার আর কোনও মতেই মার্জ্জনা করিতে পারিল না। জীবনে এ ভাবে তাহার সুমুখে এ কথা বলা, সুশীলের এই প্রথম। ইহার উপ-

যুক্ত শাসনের বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহার কান মলিয়া তাহার বইগুলি তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বালক গুম্ হইয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৫

সুশীল বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিল, দাদা আফিস্ হইতে বাড়ী আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া সবেমাত্র আহারে বসিতেছে; দেখিয়াই তাহার গা জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "চল না, আজ একবার দেখি, কাল যে বড় তাঁর নামে দোষ দিচ্ছিলে"—এই বলিয়া তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

ভ্রাতার মূর্ত্তি দেখিয়াই দাদা দমিয়া গিয়াছিল। কাল তাহার কি যে দুর্মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, কাল হইতে তাহার মনে যে তিলমাত্র শান্তি নাই। সে স্তব্ধ হইয়া সুশীলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

মা বাহিরে আসিয়া ছেলের মূর্ত্তি দেখিয়াই ব্যাপারটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন; তাড়াতাড়ি সুশীলের হাত ধরিয়া নম্রভাবে স্নেহের কণ্ঠে বলিলেন, "তুইও যেমন বাবা, ওকি সত্যি ব'লেছে রে, এই এতক্ষণ ও আমায় ব'লছিল, সব মিথ্যে কথা—দেখ্‌লে তুই মাষ্টারের নিন্দে শুনে কি করিস্।" সুশীল মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না, ও কথা আমি শুনব না—আমিই বুঝি শুধু শুধু দু'দিক থেকে মার খেয়ে মরব? আজ আমি মাষ্টার ম'শায়কে গিয়ে ঐ কথা ব'লতে তিনি বিশ্বাসই কর্‌লেন না, শেষকালে আমি জোর ক'রে ব'লতে আমাকে মারলেন—তবু ত আমি মারের কথা বলিনি।" মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "চুপ কর্ বাবা, চুপ কর্।"

কাণ্ডটা যে এত সহজে মিটিয়া যাইবে, এ যন্ত্রণা সন্তোষ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ভাগ্যে বিভূতি সুশীলের কথা বিশ্বাস করে নাই! তাহা না হইলে সে তাহার কাছে মুখ দেখাইতে পারিত না। আর ধন্য তাহার কাকীমাকে! কৈ সে ত তাঁহাকে বলে নাই, সে কাল যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা—অথচ কাকীমা কেমন ভাবে এত বড় কাণ্ডটা এক কথায় মিটাইয়া দিলেন। কাকীমার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল!

এই সময় কাকীমা নিজের আঁচলে বালকের মুখখানি মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "যাই হোক্, সন্তোষ! তোর তামাসার জন্যেই কিন্তু সুশী আমার দু'দিক থেকে মার খেলে—এবার কিন্তু ওকে একটা ভাল জামা তৈরী ক'রে দিতে হ'বে।"

সন্তোষ এত বড় একটা সঙ্কোচের হাত হইতে অনেকটা নিঃসঙ্কোচে পরিত্রাণ পাইয়া ভ্রাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই চল্ আমার সঙ্গে, আমি যে কাপড়ের ছাপা করতে দিয়েছি, তোকেও তাই দোব।"

সুশীল শুধু হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘটনার পরে সুশীল আর যে বিপ্রদ্ধে কোনও কথা তুলে নাই, তবে মাষ্টার ম'শায় এক দিন কেবল ওরূপ ভুল করিলে তাহার ফলে যে কত কি ঘটিতে পারে, এই সম্বন্ধে তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু এ কথা সে সন্তোষকে ব'লে নাই—কি জানি, সে যদি ইহার জন্য ভাইকে মারধোর করে।

সে যাহা হউক, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই দিন হইতে সন্তোষ যেন একেবারেই মাষ্টারের প্রতি বিমুখ হইয়াছে। পূর্ব্বে বরং দেখা হইলে অন্ততঃ দু'-একটাও কথা কহিত, কিন্তু আজ কাল সে তাহাকে রাস্তার এক কোণ দিয়া চলিতে দেখিলে, ও কোণ দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। তাহার কারণ কি? বিভূতি এমনই কি অন্যায় কাজ করিয়াছে, যাহার জন্য সে তাহাকে এত ঘৃণা করে?

এ বিষয়ে বিভূতি অনেক ভাবিয়াছে, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। এক দিন রাত্রিতে সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, হয় ত বা সে দিন সে সুশীলকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলে, সুশীল বাড়ী গিয়া নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, আর সেই কথা সন্তোষও শুনিয়াছে।

আজ শনিবার। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় সন্তোষ আফিস্ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; সঙ্গে বোধ করি তাহারই আফিসের দুই তিন জন ভদ্রলোক ছিলেন। বহুবাজারের মোড়ের কাছে বিভূতিকে আসিতে দেখিয়াই সন্তোষ তাড়াতাড়ি ঘাড় গুঁজিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে বিভূতি ডাকিল, "কি হে সন্তোষ যে, কেমন আছ?" সন্তোষ যেন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মাথা হেঁট করিয়া কোনও গতিকে উত্তর করিল, "কেটে যাচ্ছে এক রকম।" এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি আবার আফিসের বন্ধুদের সঙ্গে আসিয়া মিলিল। এই সময় সন্তোষের মুখ চোখের অবস্থা এমন হইল যে, এক জন বলিয়া উঠিল, "কি হে, মহাজন না কি?"

সন্তোষ শুষ্কমুখে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

* * *

কিছুক্ষণ হইল, সুশীল বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আকাশে কয়েকটী তারা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্তের ফুরফুরে বাতাস দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। আজ মেসের অধিকাংশ লোকই বাড়ী গিয়াছেন। বিভূতির ঘরে কেবল সে আর কবীর বসিয়া সন্তোষের কথাই কহিতেছিল, এমন সময় সন্তোষ, আজ অনেক দিনের পরে, একেবারে ঝড়ের মত সেই ঘরে ঢুকিয়া, বিভূতির প্রায় মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া এক দমে বলিতে লাগিল, "হাঁ হে বাবু, তুমি কি একেবারে লর্ড নবাব হ'য়ে পড়েছ যে, ম'শায়কে রাস্তায় দেখ্‌তে পেলেই চোরের মতন ঘাড় গুঁজে রাস্তা চল্‌তে হ'বে?—কেন, আমি তোমার কি ক'রেছি বল ত? নয় ত তোমার নামে মিথ্যে ক'রেই দু'টো কথা ব'লেছিলুম, আর সুশে সে কথা বিশ্বাস ক'রেনি ব'লে তাকেও না হয় একটা চড় মেরেছিলুম—সে আমার ভাই, তার গায়ে হাত তোলবার কি আমার অধিকার নেই?"

বিভূতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বলছ হে তুমি, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।" সন্তোষ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তা' আর পারবে কেন, বেশ মজায় আমার ওপর নিজের আধিপত্যটা খাটিয়ে যাচ্ছ কি না! বেশ, আমি মিথ্যে ব'লতে তোমার যদি এতই রাগ হ'য়েছিল, ত তুমি কোন্ আমায় দশ ঘা—মেরেছিলে—এমন চুপ ক'রে, যেন কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি এম্‌নি ক'রে থাকবার কি দরকার ছিল? আমি কিন্তু আর তোমার সঙ্গে এক ভয়ে পথ চল্‌তে পারব না—না কখনও পারব না—"

এতক্ষণে কবীর ও বিভূতি ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বাগচী বি-এ।

গল্প-সাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী।

ইদানীং বাঙ্গালায় কতিপয় সাহিত্যসেবক যুগ-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন পথ চলিতেছেন, যেখানে তাঁহাদের নিজেদেরই প্রাণ সাড়া দিতেছে না; কারণ, যুগের ঘরিবর্ত্তনের ঢেউ মনের পরিবর্ত্তনের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য বেশী। বর্ত্তমানে তাঁহারা যে তত্ত্বের দরিয়ায় ভেলা ছাড়িয়াছেন, সে ভেলা বানচাল হইবার আশঙ্কা পদে পদে,—দরিয়ার বিক্ষোভ দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। সমুদ্রে পাড়ি দিতে হইলে সমুদ্রের অবস্থা ও ভেলার ব্যবস্থা দুইই অনুকূল হওয়া আবশ্যক। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে এই লক্ষ্য করা উচিত।

পরিবর্ত্তন জগতের ধর্ম্ম, জগৎবাসীর ধর্ম্ম। বাঙ্গালী জগৎছাড়া নহে; বাঙ্গালীর পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী পরিবর্ত্তন-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। ভবিষ্যতে কি হইবে, কি না হইবে, তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন, কিন্তু আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের চলাচলের চেয়ে আকাশের কুসুমের দিকেই যে সকল অজ্যোতিষীদের লক্ষ্য বেশী, তাঁহারা যে কল্পনানেত্রে ভবিষ্যতের সুখের পট—ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশ দেখিয়া, আত্মবিস্মৃত হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছি। বিষয় ও চরিত্রাঙ্কন লইয়াই—উপন্যাসকে 'উপন্যাস' ভাবিয়াই উক্ত উপন্যাসের আলোচনা করিয়াছি; অনাবশ্যকবোধে তত্ত্বের কথা বলি নাই। এখন শুনিতেছি, উহার মধ্যে নাকি এমন একটা প্রচণ্ড তত্ত্ব আছে, যাহার জন্য সম্প্রদায়বিশেষের নিকট উক্ত পুস্তকের এত আদর।

বাহ্য রূপ দেখিয়াই সাধারণে বস্তুর দর করে, কিন্তু বাহ্য রূপই বস্তুর সর্ব্বস্ব নহে। যে ব্যক্তি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বেড়ায়, ঘরে হয় ত তাহার অগাধ ধন আছে; আবার যে ব্যক্তি বাহিরে বাহিরে সমৃদ্ধির পরিচয় করে, ঘরে হয় ত তাহার দারিদ্র্যের সীমা নাই। এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি উঠিতে বসিতে দেশের কথায় মাতিয়া উঠেন, লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁহার মমতা নাই, দরিদ্রের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় গলে

* সাহিত্য—ভাদ্র, ১৩২৪।

না, মজ্জমান ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' বলিয়া ডুবে সরিয়া দাঁড়ান। এ রকম ঘটনা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। 'অব্রতা'র খাতিরে সে কথা এ প্রসঙ্গে 'ধামা-চাপা' দিলাম।

যে গ্রন্থকে আমরা উপন্যাস বলিয়াই তরল সাহিত্য ভাবি, তরল সাহিত্য ভাবিয়া তত্ত্বকথা ভাবি না, হয় ত তাহা তত্ত্বের পাকা ইমারত। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। আমরা যখন ব্যক্তিকেই—আসল কি নকল—চিনিতে পারি না, তখন ব্যক্তির স্বার্থশূন্য দানে-সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ছায়া দেখিয়া 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' মনে করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। অজ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞানীদের কথা স্বতন্ত্র। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক রূপে যদি তাঁহার উপন্যাসে ভারতীয় চিন্তার উৎস খুলিয়া দিয়া থাকেন, ভালই ত। আজ তাঁহার প্রাণের কথা অবুঝের দল বুঝিতে না পারিলেও, পরবর্ত্তিকালে তাহাদের বংশধরেরা বুঝিবেই, এই সান্ত্বনায় ঔপন্যাসিক অবিচল থাকিতে পারেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকাব্যে কবিসুলভ বহু তত্ত্বকথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি তত্ত্ব-প্রচারী গীত অবুঝ (নির্ব্বোধ) ও সবুঝ (সুদিনান তত্ত্বজ্ঞানীর) দলকে সমভাবেই আনন্দ দিয়াছে। বাকীগুলি লইয়াই যত গণ্ডগোল। অবুঝ দলের মতে সেগুলি একেবারেই 'নিধুর টপ্পা'। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, সেগুলিও তত্ত্বের আমমত্ত। অর্থাৎ সে সকলই জীবাত্মা ও পরমাত্মার টানাটানি। কোন্ কথাটা সত্য? কল্পনা-জগতে টপ্পার স্থান নাই, তত্ত্বজ্ঞানীরা সপ্রমাণ করিতে পারেন কি? টপ্পা কি শুধু বাস্তবেরই গাছে ফলে? কল্পনা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে কবি সকল ক্ষেত্রে inspired হন না, aspiredও হন। বাঙ্গালার অপূর্ব্ব বরেণ্য কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অবশ্যই inspirationএর ফলপ্রসূত নহে, যদিও অলঙ্কারের গুণে কাব্য হিসাবে তাহা অমর ও অক্ষয়। কবি এ জগতের মায়ামোহ ঠেলিয়া তুরীয়জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই, সাধারণ মানুষের দশ দশা আছে, কবিও সকল ক্ষেত্রে দুর্দ্দশার হাত এড়াইতে পারেন না। কি কাব্যসাহিত্যে, কি গল্পসাহিত্যে, কবি কোথায় কোন্ দশাকে আশ্রয় করিয়া 'আত্মপ্রকাশ' করেন, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নাকে নাকে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না!' ও নিধু বাবুর 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে!' এই দুইটী গীতের কথাই ধরা যাউক। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উভয়

গীতেই পাওয়া যায়। পরমাত্ম-সম্বন্ধী প্রেমের ঘোষণা করিলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ রূপ কল্পনা করিলে, 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ' টপ্পাটারও সুরুচিপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়। 'প্রাণেশ্বর' বা 'প্রাণেশ্বরী' শব্দে রুচিবাগীশদের ঘোরতর আপত্তি থাকিলেও, 'প্রাণ' অবশ্যই উপেক্ষণীয় নহে। আর 'মহীমণ্ডল'? 'বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন' করিবার স্থানই ত মহীমণ্ডল! নিধু বাবুর আর একটী প্রসিদ্ধ গীত—'অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা?' ইহার পাশে রবিবাবুর 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?' গীতটীকে বসাইলে একই ভাবের তোতনা দেখা যায় না কি? ইহাতেও বিরহ, উহাতেও বিরহ। দ্বিতীয়টী অপার্থিব প্রেমের আকুলতা হইতে পারে, কিন্তু প্রথমটী যে পার্থিব প্রেমেরই আবিলতা, এমন কথা কেহ হলপ লইয়া বলিতে পারেন না। উক্ত গীতের রচনাকালে নিধু বাবুর মনে পরমার্থজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল কি না, আজ তাহা কে বলিতে পারে? ইহার এবং উহার বিরহের মধ্যে প্রভেদ,—একটীতে কবি সরলভাবে প্রণয়পাত্রের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছেন; অপরটীতেও কবি আত্মসমর্পণ করিতেছেন, প্রণয়পাত্রের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু এমনই ভাবে, যেন আত্মমর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রথমের কবি বলিতেছেন, 'ওগো, আমার প্রাণ ত তোমারই হাতেই, আমায় রক্ষা কর,—তুমি আমারই হইয়া আমার জীবন রক্ষা কর।' দ্বিতীয়ের কবি আত্মবলিদানে অনিচ্ছুক, হৃদয়-সর্ব্বস্বের নিকট মাথা নত করিতে নারাজ, অথচ প্রেমের আগ্রায় মাথা নত না করিলে বিরহটা মাঠে মারা যায়। তাঁহার কথা, 'বড় জোর বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, আমার যাহা কিছু আছে, সকলই তোমাকে 'উইল' করিয়া দিয়া, বাউল সাজিয়া বরং বিরহের তথ্থাগে দহিব, তবু মরিব না, মরিব না।' তথাপি প্রথমটী খাঁটী টপ্পা, আর দ্বিতীয়টী একেবারেই পরমার্থসঙ্গীত! কেন? 'মাঝে মাঝে' কোনও কোনও ধর্ম্মমন্দিরে এই ভাবে টপ্পায় তত্ত্বকথা ভাঁজিতে গেলে তত্ত্বজ্ঞান শিকায় উঠে, মনের মধ্যে তত্ত্বের খিচুড়ী টগ্‌বগ্ করে। কবি প্রতিভার অবতার হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কল্পনার দাস। কবি যখন কল্পনা-রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন ইন্দ্রিয়লালসা তাঁহার চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার না হইতেও পারে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া গীতিকবিতার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। গল্প-সাহিত্যের সম্বন্ধেও আমাদের ইহাই বক্তব্য। কবি কোথাও নিজেকে নিধুর মত সহজেই ধরা দেন, কোথাও বা স্বয়ং অন্তরালে

বাহিরের কৌতুক দেখেন। কল্পনার রাজ্য সেই একই। যেখানে সেখানে তত্ত্বের দোহাই দিতে গেলে লোকে শুনিবে কেন?

'ঘরে বাইরে'র কথা বলিতেছিলাম। পূর্ব্বে বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে সবুজ পত্রের সম্পাদক মহাশয় এই উপন্যাসের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও প্রতিধ্বনির বিরাম নাই। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথার উত্তর দিব? বিশেষতঃ যিনি 'ওগো, তোমরা কবিকে চেন নাই, আমরা চিনিয়াছি' বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, সে রকম সাহিত্যরসিকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবুর মতে 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে এত বড় একটা তত্ত্বকথা থাকিলে গ্রন্থখানিকে—তাহার অন্যান্য ত্রুটী সত্ত্বেও—বাঙ্গালী আমরা আমাদেরই ঘরের জিনিস বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারিতাম। তুলনায় এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সাদৃশ্যকল্পনাই রূপক। রূপ হইতে রূপকের উৎপত্তি হইলেও, ভাবেও রূপকের স্থান আছে। কাচের সহিত মণির, বা রজ্জুর সহিত সর্পের, বা তুষারধবল গিরিভূমের সহিত ধ্যানী মহাযোগীর যে সাদৃশ্যকল্পনা, তাহার উৎপত্তি রূপে, ভাবে নহে। কিন্তু যখন একটা মানুষের সহিত একটা দেশের সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, তখন উভয়ের সাদৃশ্য রূপের বাহিরে ভাবের গণ্ডীতে পড়ে। রূপেই হউক, আর ভাবেই হউক, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর তুলনা করা যায়, তাহাদের বস্তুগত, গুণগত, বা ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া সাদৃশ্য দেখাইতে না পারিলে রূপক হয় না, রূপকথা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের জলবায়ু বা গাছপালা বা কীট পতঙ্গ বা পাহাড় পর্ব্বতের সহিত অবশ্যই একটা মানুষের রূপগত সাদৃশ্য দেখান যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের সমষ্টিগত কর্ম্মজীবনের সহিত উপন্যাসের কোনও নায়কের কর্ম্মজীবনের সাদৃশ্য দেখাইলে যে ভাবগত রূপকের সৃষ্টি হয়, শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু সেই শ্রেণীর রূপকের কথা বলিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত নিখিলেশের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের, সন্দীপের সহিত নবীন ইউরোপের ও বিমলার সহিত বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সাদৃশ্য আছে, বা নাই।

রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ সমাজধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মকে ছাড়িয়া বিশ্বধর্ম্মের দিকে অতিযাত্রায় ঝুঁকিয়াছে। প্রাচীন ভারত আত্মপ্রীতির সহিত পরপ্রীতির

সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছিল। যে রকম সহিষ্ণুতা মানুষকে কর্ত্তব্যবিমুখ করে, নিখিলেশের মত জড়ভরত করে, প্রাচীন ভারত সে রকম সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিখিলেশকে পরিবারবিমুখ করিয়া, আত্মসর্ব্বস্বময় করিয়া, সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিয়া তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের চিত্র নহে। প্রাচীন ভারত নিখিলেশের মত আত্মরক্ষায় অত্যধিক ঝোঁক দেয় নাই। প্রাচীন ভারত যে স্বজনরক্ষার মহিমা প্রচার করিয়াছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহারই ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যে দেশরক্ষার মন্ত্রের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই ভারতীয় আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর সন্দীপের চরিত্র। উহাতে ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার পূর্ণ রূপ ফুটে নাই। ইউরোপীয় স্বাদেশিকতায় সমদর্শনের অভাব আছে, জাগতিক প্রীতির সহিত দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য নাই। অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়াও নিজের শ্রীবৃদ্ধি করিব, ইহাই ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার মূল মন্ত্র। বর্ত্তমানে জর্ম্মাণ জাতি অক্ষরে অক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় (Patriotism) স্বাদেশিকতাকে পৈশাচিক পাপ বলিয়াছেন। উৎকট স্বার্থের উত্তেজনা পাপ ত বটেই; কিন্তু স্বাদেশিকতায় ইউরোপ ইন্দ্রিয়লালসায় ছট্‌ফট্ করিতেছে বলিলে, ইউরোপের যথার্থ চিত্র আঁকা হয় না। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য অতি তীব্র বলিয়াই, ইউরোপের এত কালের জাতীয় সাধনা শুধু তাহাকে সন্দীপের মত কামোন্মত্ত করিয়াছে বলিলে, ইউরোপের প্রতি ত অবিচার করা হয়ই, অধিকন্তু যে স্বাদেশিকতায় ভারত আজ জাগিয়াছে, তাহারও প্রতি সুবিচার করা হয় না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আমরা ইউরোপের যে অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইতেছি, সন্দীপের মত ইন্দ্রিয়লালসায়—উদ্দাম ভোগপ্রবৃত্তির আঁস্তাকুড়ে—তাহার উদ্ভব অসম্ভব। যাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পাপের কারণ আছে, ঔপন্যাসিক কি শুধু তাহার জঘন্য পাপের দিকটারই সৌন্দর্য্য দেখিবেন? যদি দেখেন, তবে আমরা বলিতে বাধ্য, সে ঔপন্যাসিক সত্যের পূর্ণ রূপ দেখেন নাই। তাহার পর বিমলা। এক দিকে কবিবরের চিত্রিত ঝুঁটা ইউরোপ, অপর দিকে কবিকল্পিত প্রাচীন ভারত, তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ভারতের কুৎসিত মূর্ত্তি—ভোগবিলাসিনী ঐ বিমলা। ঘরমুখো বাঙ্গালীকে—যাহারা বিশ্বধর্ম্মের অপেক্ষা দেশধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে—ইউরোপ বা প্রাচীন ভারতের সহিত পরিচয়স্থাপন করিতে হইলে ইতিহাসের

পাতা উল্টাইতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতকে চিনিবার বহু সুযোগ তাহাদের আছে। বিমলাকে কারোন্মত্ত সন্দীপের গ্রাস হইতে কাড়িয়া লইয়া নিখিলেশের ক্রোড়ে বসাইতে পারিলে তাহাদের অনেকেই সুখী হইতে পারে, কিন্তু দেশ ও কাল বুঝিয়া তাহাদিগকে যে আশার জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের লক্ষ্য যাহাই হউক, এবং যে দিকেই হউক, বর্ত্তমানে তাহার জীবন অগ্নিপরীক্ষার দিন, স্নেহলতার মত নহে, সীতারই মত। বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মজীবন বিমলা-জীবনের মত মলিন নহে। 'বন্দে মাতরং' মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর বাণী আজ অসমুদ্রহিমাচল প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দেশ-মন্ত্রের মাহাত্ম্যে নবীন ভারত জাগিয়াছে, বিরোধের মধ্যে মিলন চাহিতেছে, স্থির ভাবে বিশ্বরাজ্যে সে তাহার স্থান খুঁজিতেছে,—কুলটা বিমলার মত নহে। নবীন ভারতের ভাব আরও ব্যাপক, কিন্তু পবিত্র।

ইহা ত গেল রূপকের ব্যাখ্যা, বা রূপকথা। কবিবর রবীন্দ্রনাথ মূক-মুখে ভাষা দিবার পক্ষপাতী হইলেও, এ তত্ত্বের প্রচারে অস্থাপি মূক। তিনি তাঁহার কোনও রচনার উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না, বলেন—তিনি জাল বুনেন। সে কথা সত্য হইলে, সে জাল সফরীর আশ্রয় হইতে পারে, আমরা কদাচ সুখী হইতে পারি না। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ এ বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, আমরা তাঁহারই দান যোগ্য চাই।

রূপকের ভিত্তিতে 'ঘরে বাইরে' সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও, 'ঘরে বাইরে'র একটা উদ্দেশ্য আছে। 'ঘরে বাইরে'র উদ্দেশ্য—আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি—ব্যক্তিকে বিশ্বের দিকে টানিয়া আনা। ব্যক্তিও উপেক্ষার বস্তু নহে, বিশ্বও উপেক্ষার বস্তু নহে; কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্যক্তি তাহার সমাজধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে বিশ্বের বাজারে বিশ্বমানব হইবে? Individualismএর অর্থ Microcosm হয় হউক, ব্যক্তি তাহার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতে পারে, খুঁজুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সে তাহার পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারে না। ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যক্তির পূজা যদি দোষাই না হয়, তবে সমাজের পূজাও দোষাই হইতে পারে না; কারণ ব্যক্তি ত সমাজেরই অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা মনে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার।" ব্যক্তি আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের ফলে গৃহে আলো জ্বালিতে

পারে, কিন্তু তাহাকে পরিবার, সমাজ ও দেশের যে ধাপগুলি বহিয়া উঠিতে নামিতে হইবে, সেই সিঁড়ি যদি অন্ধকার থাকে, তবে সে আলোর সার্থকতা কতটুকু? রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে আমরা ব্যক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই, বিকাশ দেখি না। বিমলায় ও বিনোদিনীর চরিত্রে যদি ঔপন্যাসিক আমাদিগকে ব্যক্তির আত্মবিকাশ দেখাইবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালী অবশ্যই বলিবে, 'উহা আমার ঘরের ছবি নহে, উহা অনন্ত কাল বিলাতী ফ্রেমে বাঁধা থাকুক, আমি উহা চাহি না।' বিনোদিনীকে ক্ষুব্ধহৃদয়ে কাশীধামে পাঠাইয়া দিয়া, এবং বিমলাকে বাহিরের পাপ হইতে জোর করিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া যদি কবিবর ব্যক্তির আত্মবিকাশের একটা সোজা পথ বাহির করিয়া থাকেন, তবে 'বিকাশ' শব্দের অর্থের গোলে পড়িতে হয়। বিমলা বা বিনোদিনীর মত কেবল জন্মাধিকারে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম। এই মনুষ্যত্বলাভের জন্যই মানুষ সামাজিক যে তিষ্ঠানের অধীন হইয়া গীর্জ্জায় বা ব্রহ্মমন্দিরে, মসজিদে বা চণ্ডীমণ্ডপে যায়। ব্যর্থ-প্রণয়মূলক নভেল পড়িয়া মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব জানিতে পারা গেলে, ব্যক্তির আত্মবিকাশের বা আত্মোন্নতির পথ সরল হইলে, জগতে পাপ পুণ্যের মধ্যে ব্যবধান থাকে না; শ্লীলতার বিচারের আবশ্যকতা থাকে না, ভোগবিলাসে, ইন্দ্রিয়ের সত্য উপভোগে দুনিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিকাশের অর্থ যাহাই হউক, সাহিত্য যুগে যুগে আমাদিগকে আত্মোন্নতির পথ দেখাইতেছে; বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মানবজাতির হিতের জন্য কতই নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন; আর ঔপন্যাসিক তাহারই এক কণা সংগ্রহ করিয়াই 'সাহিত্যে যুগধর্ম্ম' ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইলে কাহার না হাসি পায়?

পরিশেষে, যাঁহারা ব্যক্তির নামে গলিয়া যান, আর সমাজের কথায় আগুন হন, তাঁহাদিগকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—'সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোষ এই —বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার

না করার সব বৃথা হয়।' এ বিষয়ে যাঁহাদের মতভেদ নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, —ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজের পূজা করা; যাহাতে সমাজশক্তি দুর্ব্বল না হয়, এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যের সেবা করা। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে জীবনের বিশ্লেষণ চাহেন, জীবনের সৃষ্টি চাহেন না। আবার পাপ-জীবনের বিশ্লেষণেই তাঁহার দক্ষতা অপার।

শ্রীকাশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যাসপাতি ও নবন্যাস।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রচিত।]

ফলে ন্যাসপাতি ও সাহিত্যে নবন্যাস, উভয়ই প্রায় একরূপ বলিয়া 'মালুম' হয়। অধিক দূর 'উপমেয় উপমান' টানিয়া একটা উদ্ভট কাণ্ড করিতে চাহি না, ন্যাসপাতি খাইয়া ও নবন্যাস পড়িয়া যাহা বোধ হয়, তাহাই বলিলাম। মিষ্টান্ন, জলীয়, অধরের মুখে সুখ-রোচক, চিবাইতে ও চুষিতে ভাল;—ন্যাসপাতি চাটনীতে চলে। ন্যাসপাতি আহারকালে উপাদেয়, কিন্তু আসল আহার্য্য নয়; নিছক ন্যাসপাতি খাইয়া মানুষ বাঁচে না; নয় কখন ন্যাসপাতি চিবাইলেও ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না;—কেবল দাঁত টকিয়া যায়।

নবন্যাসে ন্যাসপাতির সব কয়টী গুণই বিদ্যমান;—মধুর, মোলায়েম, জলে ও অম্লে ভরা, নবন্যাস অধ্যয়নে উপাদেয়, কিন্তু আহার্য্য নয়; উহা মুখরোচক, আবার অন্ন-বিস্তর উত্তেজক! ন্যাসপাতি আহারের অপেক্ষা পানের অধিকতর মুখপ্রিয় 'পরম রমণীয়' চাট; নবন্যাসে "নিমকী গোছের" নেশা হয়। জ্বর-বেতার-জিহ্বা-পীড়িত জনের নিকট ন্যাসপাতির নেহাত আদর; যৌবন-জোয়ারের ভরন্ত গাঙ্গে ভ্রান্ত তরী ও উচ্ছৃঙ্খল যুবক যুবতীর কাছে, নবন্যাস "নির্ব্বাণ-মুক্তি"। ন্যাসপাতিতে রসের ন্যায় ঝঝও আছে; নবন্যাসে "রস-কষ" অবশ্য দুইই আছে। এদের উভয়ের মধ্যে সার না থাকুক, শাঁস পর্য্যাপ্তপরিমাণেই আছে; কিন্তু সে শাঁস খাইবার নয়, চিবাইয়া ও চুষিয়া ফেলিবার। শাঁস আছে, আঁসও আছে; কিন্তু আঁটি বড়-একটা নাই; যদি একটু থাকে, তাহা আঁসেরই একটা জটিল "জড়িবুটী"।

ন্যাসপাতি যখন একটা ফল, তখন অবশ্যই তাহার প্রয়োজন আছে

নবন্যাস যখন সাহিত্যের অন্তর্গত, তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রয়োজনীয়। তবে, প্রয়োজন প্রয়োজন হইলেও, প্রয়োজনমাত্রেই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। ন্যাসপাতি নিত্য প্রয়োজনীয় নয়; উহার সাময়িক আবশ্যকতা বর্ষাকালও আছে। ন্যাসপাতি চিবাইয়া ও চুষিয়া ফেল, কিন্তু গিলিও না। প্রবন্ধাদি পড়িবে, পড়; কিন্তু তাহাতে পড়িও না। আস্বাদ ও অনাসক্ত থাকিয়া উহা উপভোগ করিতে পার, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ও আসক্ত হইলেই বিপন্ন হইবে। মুখপ্রিয় পদার্থমাত্রেরই আকর্ষণ বড় বেশী। কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত আসক্তি অনিষ্টই ঘটায়। ন্যাসপাতির মুখ-প্রিয়তার মত নবন্যাসের মনোজ্ঞতা আছে; কিন্তু একের অতিরিক্ত আদরে যেমন উদর বিগড়ায়, অপরের অনিয়ন্ত্রিত অধ্যয়নে তেমনই মস্তিষ্ক খারাপ হয়।

নবন্যাসের নানারূপ ব্যাখ্যা। নবন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য নিশ্চয়ই উচ্চ দরের। কিন্তু ন্যাসপাতি প্রস্তুত করিতেও প্রকৃতি দেবীর প্রচুর শিল্প-নৈপুণ্য জাগিয়াছে। তবুও ন্যাসপাতি ন্যাসপাতি বই আর কিছুই নহে। নবন্যাসের বিশ্লেষক তাহাতে বিবিধ বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন; তাহার অণু পরমাণুর ভিতর হইতে এক একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাহির করিতে পারেন: নবন্যাসিক নিজে যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, মনোযোগক তাহা 'সরেজমীনে' খাড়া করিতে পারেন; এ সবই সত্য। এ সবই আবার শিল্প-নৈপুণ্য। শিল্পীর শিল্প, যে পক্ষেই হউক, সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু কেবল শিল্প-নৈপুণ্যে আর তাহার প্রশংসায় প্রকৃত সংসার চলে না, জীবন-বুদ্ধোপযোগী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-গঠনোপযোগী শিক্ষা হওয়া সম্ভবে না।

হইতে পারে, নবন্যাস কোনও কালে পূর্ণতায় পঁহুছিবে; অথবা কোনও কোনও হস্তে প্রায় পঁহুছিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ নবন্যাস নিঙড়াইয়া, প্রধানক্রমে, কি পাওয়া যায়?

পাওয়া যায় রমণী-হৃদয়। রমণী-হৃদয় নিশ্চয়ই অতি উত্তম পদার্থ। কিন্তু কেবল হৃদয়ই রমণীর যথাসর্ব্বস্ব নয়। পরন্তু নবন্যাসে অখণ্ডভাবে রমণী-হৃদয়ের সবখানিও পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় কেবল সেই অংশটা, যে অংশটা দিয়া প্রেম করিতে হয়। রমণী-হৃদয়ের এই অংশ নবন্যাসের অধিনায়ক, উপপাদ্য ও একান্ত বিষয়ীভূত। তা, এখনকার ইংরেজী বা ফরাসী নবেলই হউক, আর বাঙ্গালা নবন্যাসই হউক। রোমান্টিক বা রিয়ালিষ্টিক নবেলই হউক। মনোবিজ্ঞানের যতই বড়াই কর, আর মানব-প্রকৃতি-বাদের

যতই লড়াই কর,—তোমার অসীম লম্বাই চৌড়াই ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও উহা প্রেমের অভিনয় বই আর কিছুই নয়। আর সেই পিরীতই বা কি? প্রণয়, প্রেম, পরশমণি, ভালবাসা;—পূত, পবিত্র, উচ্চ, উত্তম। কিন্তু তাহাকে যত উচ্চেই উঠাও, আর তাহাতে যত পবিত্রতাই মিশাও,—তাহা সর্ব্বথা শারীরিক,—শরীরের সহিত মনের যতটা সম্বন্ধ, তাহা (উপন্যাস অত্যুৎকৃষ্ট হইলে) সেই পরিমাণে মানসিক; তাহা মোটের উপর যুবক যুবতীর দৈহিক সম্বন্ধের স্বপ্ন, সোপান, সাধ, সোহাগ, বা আকাঙ্ক্ষা, এবং উত্তেজনা;—তাহা পরেও নহে,—পরিণয়ের পূর্ব্বেই প্রেম করা। কিন্তু কেবল প্রেম ও পরিণয়ে মনুষ্য-জীবনের সব লেঠা চুকিয়া যায় না; লেঠা সবে আরম্ভ হয়। অথচ নবন্যাসের কথা সেইখানেই শেষ। প্রথমতঃ, প্রণয়; তাহার পর পরিণয়; বস! নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত প্রকৃত জীবনে আরও অসংখ্য ব্যাপার আছে, তাহা নবেলিষ্টির নিকট অতি সাধারণ, অতএব উপেক্ষিত। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সংযম, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, ব্রত, নিয়ম, বিনয়, নম্রতা, দৃঢ়তা, দয়া দাক্ষিণ্য, সম্ভ্রম-জ্ঞান, এ সবই নবন্যাসিকের হিসাবে, রমণী-জীবনে অতি তুচ্ছ, সাধারণ, সুতরাং সহজসাধ্য, তৃণাপেক্ষাও লঘু। নবেলী নায়ক নায়িকার যাহা কিছু কঠোর কর্ত্তব্য ও জীবনের কার্য্য, তাহা ভালবাসা (Sexual love) ও তাহার আনুষঙ্গিক ভাব, আর ভাবুকতা। বিদেশীয়, বিজাতীয় ও বীভৎস ভাবে ভোর হইয়া, দু'দশ বার, "হরিবোল" দিলে, বা "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" বলিলেই, কিস্তিমাৎ। কোনও কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। ভুবন হিন্দুপন্থী! ঔপন্যাসিক আর্য্যভাবে ভোরপুর! আমরা এ আর্য্যামীকে অবজ্ঞা করি। এরূপ হুজুগে হিন্দুয়ানী আমরা চাই না। ইহা প্রবঞ্চনার নামান্তর, নহে ত খাঁটী প্রবঞ্চনা। কিন্তু ইহাও তবু আধুনিক নবন্যাসের নির্ম্মল ও উৎকৃষ্ট অংশ। অধিকতর অপকৃষ্ট অংশের কথা আজ আর কিছু বলিলাম না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা।—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। সর্ব্বপ্রথমে 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র একাদশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণ। হীরেন্দ্রনাথ এই নিবন্ধে অনেক কাজের কথার অবতারণা করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের আলোচনা বাঙ্গালীর অবশ্যকর্ত্তব্য। হীরেন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য—প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে

—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, সমস্ত আশা ভঙ্গ হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, রাণাডে, গুরুদাস, ভাণ্ডারকর, প্রফুল্লচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবর্গের মত উদ্ধৃত করিয়া হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিপাদ্যের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের শিখরিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েক জন অতিমানুষও চাই—দেশের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বালম্ব স্বনিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রজন্ত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প, নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান।' ইহার আনুষঙ্গিক আর একটা বড় কথা আছে। বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন বা সাধন করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না; বাঙ্গালীর 'ভাব'কেও আমাদের শিক্ষার 'লক্ষ্য'—সাধনার বস্তু না করিলে, শিক্ষা এ দেশে কখনও মানুষ গড়িতে পারিবে না। শুধু 'শিক্ষা' নয়, ছাত্রজীবনে শিক্ষিত বিষয়ের 'অনুশীলন' চাই। পৃথিবীর যে সকল দেশ মানুষ গড়িয়াছে, এবং গড়িতেছে, তাহারা শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হয় না, ছাত্রের জীবনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যাহাতে মুদ্রিত হইয়া যায়, অন্তর্শীলনে দেশাত্মবোধ যাহাতে জাতির উত্তরপুরুষের চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। আমরা বুঝি, জাতীয় ভাষায় জাতীয় ভাবের সাধনাই জাতীয় শিক্ষা। স্বদেশী ভাষার বক্ষ্যা শিক্ষার প্রভাব-বিস্তার জাতীয় কল্যাণের কারণ হইতে পারে না।—এ দেশে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় এই যে, যাঁহারা শিক্ষার নায়ক, এবং যাঁহারা শিক্ষার ফলভাগী, তাঁহাদের স্বার্থের সামঞ্জস্য নাই। পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—স্বাধীনতার বরপুত্রের সৃষ্টি। এ দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি গোলামীর বরপুত্র সৃষ্টি করিতেছে। সত্য, সাহস, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, জাতির কল্যাণে আত্মবিসর্জ্জনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, স্বদেশী ভাবে, তত্ত্বে, অবদানে শ্রদ্ধা, জাতির স্বার্থেই আত্মবুদ্ধি, আধুনিক শিক্ষিতে দেখিতে পাই না। ইহার কারণ, আমাদের তোতাপাখীরা রাম-নাম শিখিবারও অবকাশ পায় না, র‍্যাস্‌পের নাম মুখস্থ করিয়াই ডিপ্লোমা পায়। যাহা আমাদের জাতীয় কল্যাণের সাধন হইতে পারে, তাহাই আমাদের শিক্ষা-বিভাগের পক্ষে বিভীষিকার বস্তু! এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে যাহা হইবার, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।—'শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী' হীরেন্দ্র-

নাথের পূর্ব্ব-কথিত প্রতিপাদ্যের পরিশিষ্ট।—'আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আলোপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিত্তস্রোতকে আবার গতি দান করিবেন।' কিন্তু বিদেশীয় ভাবধারা ও চিন্তাস্রোতই যে জাতির জীবনের অবলম্বন, তাহাদের সমাজে 'ঐরূপ শক্তিধরে'র উদ্ভব—'নিয়মের ব্যতিক্রম' সম্ভব হইতে পারে, স্বাভাবিক নিয়মে এমন ত আশা করা যায় না।—হীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণে শিক্ষাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহা অবশ্য অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু সাহিত্য অত্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। হীরেন্দ্রনাথ ভাষার কথাও কহিয়াছেন, কিন্তু তাহা এক বিন্দু। আমাদের সাহিত্যে কামের—দুর্ব্বল, ক্লিন্ন, কুৎসিত কামের ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ হইতেছে। কামায়নে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে। নীতি মুমূর্ষু। সদাচার পৈশাচিক তাণ্ডবে পিষ্ট। লালসা ও হিংসার সৃষ্টিই 'আর্ট' হইয়া উঠিয়াছে। যিনি এই নূতন পূজার বড় যজমান, যিনি তাঁহার 'নারায়ণে'র মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসনে যষ্ঠি ও মদনের যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের আঁস্তাকুড় ঘাঁটিয়া পুরোহিত খুঁজিয়া আনিতেছেন, এবং 'ঘনপিশিতপিণ্ডে' ও 'সাসব-চষক'-তুল্য 'লালায়িত মুখে' ঠাকুর-ঠাকরুণের জন্য তথাকথিত 'আর্টে'র নৈবেদ্য রচনা করাইতেছেন, সেই চিত্তরঞ্জন যে সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সেই সম্মিলনের সভাপতি বেদান্ত-রত্ন হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে সাহিত্যের এই ভীষণ, ভয়াবহ, কুৎসিত কুষ্ঠের কথা তুলিলেন না! ইহা যে সাহিত্য-বিগ্রহের গলিত কুষ্ঠ, 'আর্টে'র 'ক্যান্সার', যাদুবের রক্তদুষ্টি, তাহা নব-ভাবের ভাবুক, জাতীয়তার সাধক, সাহিত্যের পথভ্রান্ত পথিক চিত্তরঞ্জনকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না? যে কামের কলুষ-মন্ত্রায় বঙ্গ-সাহিত্য ডুবু-ডুবু, বাঙ্গালা ভেসে যায়, তাহাও বেদান্তরত্নের দার্শনিক-দৃষ্টি অতিক্রম করিল! সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের অভিভাষণ শুধু 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'র প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ইহা দুর্ব্বোধ্য, দুষ্পাচ্য, দুঃসহও বটে। মনে পড়ে, শশাঙ্কমোহন যখন কবিবর নবীনচন্দ্রের কলিকাতার আবাসে, কবিবরের সহধর্ম্মিণীর ঘনবলয়েলমুগ্ধা দুগ্ধফেনোজ্জ্বল দৃষ্টি'র স্নেহকিরণে দীপ্ত হইয়া তাঁহার কিশোরের উচ্ছ্বাস 'সিন্ধুসঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইতেন। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ!' সেই কিশোর কবি পাকিয়া শুকাইয়া এমন ঝুনো হইয়াছেন যে, তাঁহার পদ্য ধ্বনিভাষণেও দন্তস্ফুট করিবার যো নাই! শ্রীকালীকৃষ্ণ নিষ্কাস্তসাত্রী কবিতায় 'নবজীবন ভিক্ষা' করিয়াছেন। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈর্ঘৃণ্য'। আমাদের দেশে পুরাতন গান গাহিয়া ভিক্ষা করিবার প্রথা আছে। ভিক্ষার এই নূতন গান শুনিয়া মনে হইতেছে, সে পদ্ধতিই প্রশস্ত। ইনি উপসংহারে খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিয়াছেন,—'ওগো নবীন জীবন লইতে মাগিয়া ওগো এসেছি।' 'মাগিয়া' কেন, 'কাড়িয়া' বলিলেই সঙ্গত হইত! এক বুড়ী 'ওগো'ই ইঁহার কবিতার প্রধান সম্বল। শ্রীআবদুল কাদীম মোহম্মদ নাসরুদ্দীনের 'বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'আমার বাংলা' কবিবর গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিধ্বনি। ইহাতে কবিতা অল্প, কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। সে হিসাবে ইহা সার্থক হইয়াছে। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহের 'মনসা-মঙ্গল ও পৌরাণিক মনসা' সুলিখিত, সুচিন্তিত সন্দর্ভ। শ্রীকেদারনাথ সেনের 'ইউরোপে সেবাধর্ম্মের

ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে নিরোনামের সমৃদ্ধি আছে, রচনায় প্রতীচ্য সেবাধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই। চিকিৎসাই প্রতীচীর একমাত্র সেবাধর্ম্ম নহে।

উদ্বোধন। জ্যৈষ্ঠ। স্বামী বিবেকানন্দের 'সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ' স্বামীজীর 'The Ideal of a Universal Religion' নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতার অনুবাদ—ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। 'আমি এমন একটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মানসিক অবস্থার লোকের উপযোগী হইবে—ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম সমভাবে থাকিবে।' 'এই মত-সংঘর্ষের যুগে স্বামীজীর আর একটি উক্তি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়,—'আমরা যেমন স্বভাবতঃই একত্র স্বীকার করিয়াছি, সেইরূপ আমাদিগকে বৈষম্যও স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য নানা ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং অন্যের ভাবটিই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রকৃত সত্য। ও ধর্ম্ম প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম্ম, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঊর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেই, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যত প্রকার সত্যের উপলব্ধি করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি ভগবানেরই মর্ম্মন ছাড়া আর কিছুই নহে।' ইহারই—সহজ অনুবাদ—'যত মত, তত পথ।' কালিদাসও তাই বলিয়াছেন, 'ভবোভব বিপক্ষত্বেণাস্থিরীয়া ইবার্ণবে।' আমার অনুভূত সত্যই সত্য, আর সব মিথ্যা, এই বুদ্ধিই ভেদের সৃষ্টি করে। স্বামীজীর উপদিষ্ট ভিত্তির উপর পরমত-সহিষ্ণুতা সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতের ধর্ম্মভাবের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব। স্বামী অমৃতানন্দের 'ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীবচৈতন্য' এবং স্বামী বাসুদেবানন্দের 'ভারতের শিক্ষা' উল্লেখযোগ্য সুচিন্তিত নিবন্ধ। শ্রীবিনোদেশ্বর দানগুপ্তের 'মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অন্তরায়' আলোচনায় যোগ্য। আমাদের মনে হয়, গেটে যেমন সেক্সপীয়রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে কোনও প্রতিভাশালী, শক্তিধর, সৌভাগ্যবান সমালোচক গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালীকে—হয়ত বিশ্বমানবকে বুঝাইয়া দিবেন। উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা উচ্চ স্তরের শক্তি-শালী সমালোচকের অপেক্ষা করে। সাময়িক কুহেলিকা কোনও মহাকৃতিকে বুঝিবার চিরদিন অন্তরায় হইতে পারে না। সমালোচনার—ব্যাখ্যার রশ্মিপাতে সে কুহেলিকার তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী। তবে তাহা কালসাপেক্ষ হইতে পারে।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'সাহারা রাগ' ফুটতে ফুটতে ফুটিল না। মরুদেশের সাহারাই জাতির গান হউক, সাহারার মায়া ভুলিয়া যাও। 'বক্তব্য' জাতির জীবনের উপযোগী, কিন্তু রচনা ভাবের অনুরূপ হয় নাই। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিল্প ও শিল্পী' প্রবন্ধে অনেক তথ্যের সমাবেশ আছে। অবনীন্দ্র বাবুর মত এই যে, শিল্প ও শিল্পী, উভয়েই স্বাধীন; 'চারি দিকে জুলুম জবরদস্তী, তারই ফাঁকে ফাঁকে সে [শিল্পী] 'মনোরাজ্যের খেলাঘরে এক একবার সৃষ্টির সঙ্গে খেলে নিচ্ছে—সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া খেলা।' তথাস্তু। কিন্তু anatomy, perspective প্রভৃতি এই 'সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া খেলা'তেও প্রচুরপরিমাণে না দেখা যায়, এমন নহে। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদশাজাদীর

হইয়া মনে হইল, মানুষের ঘাড়ে যেমন খুন চড়ে, তেমনই কবিতাও 'চড়ে'। চমৎকার শব্দ-চয়ন, খুব অনুপ্রাসের ঘটা, কিন্তু কৃত্রিমতায় সবই আড়ষ্ট বলিয়া মনে হয়। 'রূপসী' ছন্দের খাতিরে 'রূপ্‌সী' হইয়াছে। ভবিষ্যতে 'রূপ্সী'ও হইতে পারে। 'নিয়তুঃ ভবয়ঃ।' গুরু-চণ্ডালীর ভোলেই আজকাল কবি-প্রতিভার ওজোন করিতে হয়। সে বিষয়ে 'বাদলাগ্রাদী' বেশ দখে ভাতী। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ের সম্মান' কবিতায় রচিত গল্প। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনে-বনে' চলনসই সুদীর্ঘ গল্প। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অকর্ণ্য' অকর্ণ্যই বটে। একই রীতি-যে সকলের অনুসরণীয় হইতে পারে না, নবীন কবিরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নূতন ছন্দে নূতন ধরণে যে পদ্য-গদ্য লিখিতেছেন, তাহাকে ভাঙ্গ-চাইবার জন্য নিশ্চয়ই অনুকারীর পল্টন কলম শানাইতেছে। 'চলতী ভাষা'ও 'বাংলা ছন্দে'র অনুকরণ ইতিমধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বপ্নসুন্দরী' চমৎকার প্রহেলিকা। ভাষা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সেই ভাষার ঠোলায় সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাব ফেরী করিতেছেন, তাহা বোধ হয় 'পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে লাগে ধন্দ!' 'চাঁদ-চারণের ভ্রম' কি বল দেখি? ইন্দ্রনাথ 'বটাইয়া' দিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাকেও 'ঝুড়ুলিয়া' দিয়াছেন। যথা, 'সখ "শীতলে" দিল চুম্ দিয়ে!'

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীবরদাচরণ গুপ্তের অঙ্কিত 'বাসক-সজ্জা'। সুন্দরীর ছবি। 'ভারতীয় চিত্রকলা'র নমুনা নহে। অথবা তাহা সদ্গতির পথে বিবর্ত্তিত হইতেছে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলি নিখুঁত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে 'প্রাচীন ভারতী চিত্রকলা'র চিরন্তনের চক্ষুঃশূল 'anatomy'র প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তাহার ফলে চিত্রখানি 'ভারতীয়' হইলেও, outlandish হয় নাই। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্যের 'ঘাস তাজা রাখিবার উপায়' গৃহস্থের উপকারে লাগিবে। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চষা' সুখপাঠ্য। শ্রীসুকুমার রায়ের 'দৈবেন দেয়ম্' সুপথ্য, বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভাটুনেরাম যুদ্ধ' ঠাকুরি চোলাবৎ চারণের অনুবাদ। শ্রীশিবশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'দিদির সুখে' বিশেষত্ব নাই। ঢাকর 'দেশের কথা' বেশ হইয়াছে। সকল দেশের লোক দেশের সন্ধান রাখে, কেবল আমরাই বড় বড় খবরের কারবার করি, দেশের খবর রাখি না। 'প্রবাসী' 'দেশের কথা'র, বিবিধ প্রসঙ্গে' দেশবাসীকে দেশের কথায় অভ্যস্ত করিতেছেন। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গদ্য 'যেমাস্ত পিতরো যাতাঃ'ই জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র শ্রেষ্ঠ রচনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার। জ্যৈষ্ঠ। 'গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যরক্ষা' সময়োচিত উপদেশ। আমাদের 'ঋতুচর্য্যা'র সহিত তুলনা করিলে আরও ভাল হইত। শ্রীযোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্যের 'বাসক বা বাকস' আরও সুসম্পূর্ণ হইতে পারিত। 'মানব-দেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য' চলিতেছে। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সীর 'স্বাস্থ্য ও স্বরোদয়' এ মাসের 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এরূপ প্রবন্ধ আরও বিস্তৃত হইলে সাধারণের অধিকতর উপকার হইতে পারে। 'হৃদ্‌রোগ ও তাহার গৃহচিকিৎসা'র 'অন্ধ-হৃদয়ে'রা উপকৃত হইবেন। জ্ঞানের অভাবেই আমরা অনেক সময়ে অসিচ্ছায় অপথে যাই, এবং কষ্ট পাই। এইরূপ

প্রবন্ধে সাধারণে পথ চিনিতে পারে। 'স্বাস্থ্য-সমাচার' আমাদিগকে নানা তথ্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতেছে।—'স্বাস্থ্য-সমাচার' কবে বাঙ্গালার প্রত্যেক পল্লীতে প্রবেশ করিবে?

সৌরভ। জ্যৈষ্ঠ।—ঢাকার 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুত ভাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের 'অভিভাষণ' সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সারগর্ভ।—মল্লিক মহাশয়ের ভাষাটী রচনা আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই।—তাঁহার বিকৃতির সার্থকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অল্প পরিসরে মল্লিক মহাশয় বাঙ্গালীকে অনেক তত্ত্বের ও তথ্যের পরিচয় দিয়াছেন, অনেক বিষয় বুঝাইয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—'যদি পর্য্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনায় সমাবেশই বিজ্ঞানত্বের প্রধান সহায় হয়, আরভবাসীর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের ভগবান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা আছে, এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। অনেক দিন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৃত্তি অনেক সময়ে বৃথা ব্যাপারে নিয়োজিত হইতেছে। * * এই বুদ্ধিচালন-নিয়মিত করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মে পাওয়ান হইতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বিজ্ঞান-জগতে আমাদের স্থান অধিকার করিতে পারিব। জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব।' তাঁহার আশা সফল হউক।

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য।

যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সে দেশ পৃথিবীর সভ্যজাতির সমক্ষে একরূপ নগণ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস আছে—কিন্তু, তাহা "লিখিত" ইতিহাস নহে। কতকটা উপাদানের অপ্রচুরতায়, কতকটা অনুসন্ধিৎসু উপাদান-সংগ্রহকারীর স্বল্পসংখ্যকতায়, আর কতকটা উপযুক্ত উপাদান-ব্যাখ্যাতার একরূপ অভাবে, তাহা এ যাবৎ সম্যগ্‌ভাবে লিখিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। প্রায় শতাধিক বৎসর হইতে চলিল—ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে—কিন্তু, অদ্যাবধি ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই—হইতে পারে নাই। কেবল সম্প্রতি ঐতিহাসিক চিত্রের রেখাপাত হইতে পারিয়াছে—কবে যে সেই চিত্র সম্পূর্ণ হইবে বা হইতে পারিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। তবে বিধাতার অনুগ্রহ ভরসা করিয়া দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। নিজকে, জাতিকে, দেশকে সম্যক্ চিনিতে আরম্ভ করিতে হইলে এ যাবদ্ লব্ধ উপাদানের সাহায্যেই সম্প্রতি ইতিহাস রচনা করিয়া তাহার বিস্তার করিতে হইবে, আবার ক্রমে ক্রমে নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইলে তদনুযায়ী পরিবর্ত্তনাদির বিধান করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার উপাদান সংগৃহীত হইলে ইতিহাস-রচনার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, এরূপ মনে না করিয়া, দেশের লুপ্ত ইতিহাসের প্রারব্ধ উদ্ধারচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চালাইতে হইবে। স্বদেশের ইতিহাস না জানিলে কাহারও উচ্চ শিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ব্যবস্থা আছে যে, প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হয়। আমরা বঙ্গবাসী—মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বের সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেই আমরা কে কতটা জানি বা জানিবার ইচ্ছা করি? ইহা আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল বিদেশীয়

মনীষী আমাদের পথ-প্রদর্শক রূপে উপাদান-সংগ্রহে প্রথমতঃ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। বিগত এক শতাব্দীর চেষ্টায় যে সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, তদবলম্বনে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যে যে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—সংখ্যায় তাহা নিতান্ত কম হইলেও—সে সকলের উপর নির্ভর করিয়াই, দেশে পুরাতত্ত্ব-পাঠের কুতূহল অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও জ্ঞান" ("Ancient Indian History and Culture") সম্বন্ধে এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আশা করি, বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ দলে দলে অগ্রসর হইয়া ভারতের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য, এই বিষয়ে এম. এ. পড়িতে যাইবেন। সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

যে দেশের "লিখিত" ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্কলন-ব্যাপারে প্রাচীন লেখের সর্ব্ববিধ চর্চ্চার প্রয়োজন যে কত অধিক, তাহা সুধীসমাজে বিশেষ ভাবে বলা বাহুল্য। তবে এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সভাসমিতিতে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার-কার্য্যে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহায়তার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা পাওয়া কঠিন হইবে—এই জন্য তাহার বিবরণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের সম্বন্ধে একটি দোষের বা কলঙ্কের কথা কেহ কেহ কহিয়া থাকেন,—তাহা এই যে, বিচার-তর্ক-বহুল ইতিহাস লিখিবার শক্তি বা প্রতিভা তাঁহাদের ছিল না, অর্থাৎ তাঁহাদের "Critical historical sense" এর অভাব ছিল। কিন্তু এই অখ্যাতি বিচারসহ কি না, তাহা বিবেচ্য। যাঁহারা বহু-বিচার-পরিপূর্ণ দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যাদি-সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগদ্বাসীকে বিস্ময়াপ্লুত করিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের ঐতিহাসিক প্রতিভা ছিল না—ইহা সকলে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। কিন্তু, কি অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা স্বদেশে সংঘটিত নানা ঘটনাবলীর ধারাবাহিক-বর্ণনারূপ তথাকথিত ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া যান নাই, তাহা বলা কঠিন।

পুরাণ-গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন যুগের রাজবংশের ও শাসনকারী রাজবৃন্দের পারম্পর্য্য লিখিত পাওয়া যায় সত্য, কবি কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীরের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন সত্য, সত্য বটে মহাকবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষচরিত

নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং 'মহাবংশ' 'দীপবংশ' ও বৌদ্ধ অবদানাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থ লিপিবদ্ধ পাওয়া গিয়াছে সত্য,—কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যাহাকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস বলা যায়, এইগুলি সেরূপ ইতিহাস-গ্রন্থ নহে। প্রাচীন ভারতে কোনও হেরোডোটস্ বা থিউসিডাইটিস্, লিভি বা ট্যাসিটস্ ছিলেন না বলা যাইতে পারে। কাযেই "লিখিত" ইতিহাস না পাইবারই কথা, কিন্তু তথাপি আমাদের দেশে ইতিহাস-উদ্ধারের নানা প্রকার উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব নাই। যত প্রকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধান ভাবে গৃহীত হইতে পারে—প্রথমতঃ, হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনগণের প্রাচীন সাহিত্য; দ্বিতীয়তঃ, পাষাণে ও ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ লিপিমালা, প্রাচীন মুদ্রা ও মোহর, এবং তৃতীয়তঃ, গ্রীশ্, রোম ও চীন প্রভৃতি দেশের পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। উত্তর কালে আবিষ্কৃত প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও যে ইতিহাসের উপাদান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ ও প্রাদেশিক সভাসমিতি ও অনুসন্ধান-সমিতি-সমূহের চেষ্টায় উত্তরোত্তর উপরি-উল্লিখিত সর্ব্ব প্রকার উপাদানের ও নিদর্শনের সংগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তাঁহাদের অদম্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ উত্তরাপথে ন্যূনকল্পে দুই সহস্র ও দক্ষিণাপথে দশ সহস্র প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও প্রাচীন যবন বা গ্রীকজাতীয়গণের শাসিত এশিয়া মাইনর আসাইরিয়া, নিশর প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত অনেক প্রাচীন লিপি ভারতীয় প্রাচীন লিপির বহু পূর্ব্বে রচিত বা সম্পাদিত হইয়া থাকে—তথাপি আমাদের নিকট ভারতীয় প্রাচীন লেখমালার মূল্য প্রতীচ্য দেশের লেখমালার মূল্য হইতে অনেক অধিক; কারণ, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্যগ্‌ভাবে লিখিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও বিশ্বাসযোগ্য উপাদানই হইতেছে এই সকল প্রস্তর ও ধাতুপট্টে ও প্রাচীন মুদ্রায় উৎকীর্ণিত লিপিমালা। তাই পাষাণপণ্ডিগণ এই সকল পাষাণ আশ্রয় করিয়া কার্য্যে ব্রতী আছেন। নিপুণভাবে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন লোকসমাজের দৈনন্দিন অবস্থা, সেই সময় প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতি, লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বিষয়ের আভাস পাওয়া গেলেও, তাহাতে রাজকীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বড় একটা উল্লেখ লক্ষিত হয় না। পৌরাণিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে রাজবংশের ও রাজনামের পর্য্যায় বা তালিকা পাওয়া গেলেও—তৎপাঠে তাঁহাদের রাজত্বকালের পরিমাণ ও রাজত্বের পারম্পর্য্য বিশুদ্ধভাবে জানা

যায় না। অনেক সময় তাহাতে সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে পূর্ব্বাপর করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রকার দোষ সন-তারিখ-যুক্ত প্রাচীন লিপির সাহায্যে দূরীভূত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের ইতিহাস, অনেক কাল পর্য্যন্ত উপাদান ও নিদর্শনের আবিষ্কারের অভাবে, ঘোর-তমসাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু গিরিগাত্রে ও পাষাণময় ও ধাতুময় স্তম্ভে, এবং তাম্রাদি ধাতু ফলকে অশোকাদি সম্রাটের অনুশাসন লিপি প্রভৃতির আবিষ্কারের পরে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময়-নির্দ্দেশ-কার্য্যে মনীষিগণ ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতেতিহাসের প্রধান অতীত ঘটনার, অর্থাৎ চাণক্যমতি-পরিগৃহীত মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়া পরবর্ত্তী অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধান-কার্য্য অধিকতর সুকর করিয়া দিয়াছে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের ত্রয়োদশ শিলা-লিপি পাঠে, ভারত সম্রাটের সমসাময়িক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, মেসিডোন ও এপিরাস এই পঞ্চ দেশের "যবন রাজগণে"র নাম জানিতে পারায়, গ্রীক দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে এই রাজগণের সমসাময়িক মৌর্য্যনরপতি অশোকেরও রাজত্ব কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন মালবদেশের দশপুরে আবিষ্কৃত শিলালিপির সাহায্যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন লিপির সাহায্যেই বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, চেদিসংবৎ, হর্ষসংবৎ প্রভৃতি অব্দ ও সংবতের কালনির্ণয় হইয়াছে। ইহা ত অল্প কথা। ভারতের, প্রাচীন শিল্পকলা, বাস্তুবিদ্যা, সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাহিত্যের প্রাচীনতা, ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশ-নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রাচীন লেখমালা সহায়তা প্রদান করে।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন লেখসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ কয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহাতে উল্লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম হইতে ভারতীয় লোক-ইতিহাস-রচনায় ও রাজকীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য-নির্দ্দেশে কতদূর সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও বিচার করা যাউক। কতকগুলি লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, অতীত ঘটনার অবিমিশ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে গৌণ ভাবে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা অন্য কোনও দানাদি-সংক্রিয়াসম্বন্ধীয় কোনও কথা উল্লিখিত নাই তাহাও নহে। কিন্তু তাহা লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। উদাহরণরূপে এই প্রকার কয়েকটি প্রধান লিপির উল্লেখ করা যাইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর রাজা খারবেলের হস্তিগুম্ফালিপি

মহারাজ শ্রীখারবেলের উদয়গিরিতে হাতিগুম্ফার প্রস্তর লিপিতে কলিঙ্গরাজ তাঁহার রাজত্বের প্রথম ত্রয়োদশ বর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কলিঙ্গের প্রজাগণের হিতার্থে এই জৈন নরপতি কি কি কল্যাণকর কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন—তিনি কত বার উত্তরাপথে বিজয়-অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—দক্ষিণাপথের আন্ধ্ররাজ সাতকর্ণির সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল—ইত্যাদি ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখই এই প্রাকৃত-ভাষায় রচিত গুহা-লিপির উদ্দেশ্য। মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের প্রয়াগ স্তম্ভে উৎকীর্ণ অগুপ্ত-গুণরাশি গুপ্ত-সম্রাট্ ভারতীয় নেপোলিয়ন চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের বিজয় প্রশস্তিকে আমরা এই শ্রেণীর লেখমালার মধ্যে গণনা করিতে পারি। গুপ্ত সম্রাটের প্রতিটি প্রধান বিজয়ের কথা ভবিষ্যদ্ বংশীয়গণের স্মরণ-পথ হইতে অপসৃত না হয়, এই জন্য সেই সমস্ত অভিযান-কথা এই পাষাণ-প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গুপ্তরাজবংশের রাজনাম-তালিকা, উত্তরাপথের কোন্ কোন্ দেশে সম্রাটের বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান হইয়াছিল, তাহাদের নাম, কোন্ কোন্ প্রত্যন্ত নৃপতির সহিত গুপ্তরাজের কিরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল তাহাদের নাম, এবং দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক অবস্থা-ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিষয়ের নানা তথ্য এই প্রস্তরলিপি পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধে আরও একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। এই সংস্কৃত-লিপির রচয়িতা মহাকবি হরিষেণের রচনা-পটুতা পর্য্যালোচনা করিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে অলঙ্কারের প্রভাব কতটা বর্ত্তমান ছিল, এবং সংস্কৃত-গদ্য রচনা তখনই কতদূর উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণও এই প্রশস্তি হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ যেন অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপনাকালে এই প্রাচীন লেখের মূল্য বিস্মৃত না হন। শিবের পাদ-পদ্মদ্বয় ব্যতীত যিনি কখনও মানুষের পাদপ্রান্তে মস্তক অবনত করেন নাই বলিয়া দর্পিত ছিলেন, হূণাধিপতি সেই মিহিরকুলের গর্ব্ব যিনি খর্ব্ব করিয়াছিলেন, সেই নরপতি যশোধর্ম্মের মন্দোসর বা দশপুরের বিজয়স্তম্ভ-যুগলও এই শ্রেণীর লিপির অন্তর্ভুক্ত। জনসাধারণের উপকারার্থ রাজার, রাজপুরুষের বা অন্য কোনও কারুণিক ব্যক্তির কার্য্যাবলী যে সব লিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিকেও এই শ্রেণীতে আনা যাইতে পারে, যথা সুরাষ্ট্রের সুদর্শন-হ্রদের সেতুসংস্কার-সম্বন্ধে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের

গির্ণার-প্রস্তর-লিপি। দেবমন্দিরের নিকট পুষ্করিণী-খনন, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বর্গগত রাজার সমাধি-নির্ম্মাণ, পথিমধ্যে পথিকের আবশ্যক দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্তির সুবিধায় জন্য বড় বড় যানপথের সঙ্গমস্থলে ভাণ্ডার-গৃহ-স্থাপন, দুই রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ, রাজপত্নীর স্বর্গগত পতির শ্মশানাগ্নিতে তনুত্যাগ, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, রাজ্যের রক্ষণ ও আক্রমণসম্বন্ধে রাজনীতিক সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি নানা বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া বহু বহু লেখ রচিত হইয়াছিল। এই ত গেল পার্থিব বা ঐহিক উপকারবিষয়ক কতকগুলি লিপির কথা। এখন আর এক শ্রেণীর লিপির উল্লেখ করা যাইতেছে—ইহা অপার্থিব বা পারমার্থিক বা পারলৌকিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত পার্থিব-বিষয়ক লিপির সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রণোদনে ধর্ম্মার্থদানাদির নিদর্শনরূপে রচিত লিপির সংখ্যাই অধিক। এই শ্রেণীর অন্তর্গত লিপির মধ্যে মৌর্য্যরাজ অশোকের ধর্ম্মলিপিই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ব-পর-রাজ্যে ধর্ম্মলিপির প্রচার করিয়া তিনি ধর্ম্মের অনুশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মমহামাত্র-নামে ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া প্রজাবর্গের চরিত্র-নীতির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উত্তরে গান্ধার—দক্ষিণে মহীশূর, পূর্ব্বে কলিঙ্গ, পশ্চিমে সুরাষ্ট্র, এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ভারতবর্ষে তিনি যে ধর্ম্মোক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রজাবর্গের ঐহিক ও পারত্রিক হিতসুখ লক্ষ্য করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, কেবল তাহা নহে; তাঁহার "ধর্ম্মবিজয়ের" প্রভাব সুদূর গ্রীক্ বা যবনগণের রাজ্যমধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। "অংতিয়োক" (Antiochus II of Syria), "তুরমর" (Ptolemy Philadelphus of Egypt), "অংতিকিনি" (Antigonus of Macedonia), "মক" (Magas of Cyrene) ও "অলিকসুন্দর" (Alexander of Epirus) এই পঞ্চ যবনরাজের রাজ্যে অশোকের ধর্ম্মদূতগণ যাইয়া ধর্ম্মানুশাসন প্রচার করিতেন। আর ভারতের অতি দক্ষিণের চোর-চের-পাণ্ড্য-প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া তাম্রপর্ণী বা সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মযাজকগণ "সদ্ধর্ম্মের" প্রচার করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের রাজনীতিক সম্বন্ধের আভাস এই সকল প্রস্তর-লিপির সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি নূতন লিপির আবিষ্কারের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। এসিয়া মাইনরে প্রাপ্ত মিটন্নিরাজবংশের একখানি অতি প্রাচীন লেখ হইতে

জানা গিয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ৩৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে, এই সুদূর পশ্চিমের হিটাইট জাতীয় রাজগণ যে আর্য্যনামধারী ছিলেন, কেবল তাহা নহে—পরন্তু তাঁহারা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র-বরুণ-মিত্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজাও করিতেন। বৈদিক আর্য্যগণের সঙ্গে সে কালের এসিয়া মাইনরের এই মিটন্নিরাজবংশের রাজগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা সম্প্রতি পরিষ্কাররূপে না-জানিতে পারা গেলেও এরূপ আশা করা যায় যে, এই পশ্চিম প্রদেশে যে সমস্ত স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, তথায় প্রাচীন-লেখাদি প্রত্নতত্ত্বের উপাদান ভবিষ্যতে অনেক আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। মনীষিগণ বিশ্বাস করেন যে, উপযুক্ত অনুসন্ধান-চেষ্টায় পুরাতত্ত্বের এই উর্ব্বর ক্ষেত্র যখন ফলপ্রসূ হইতে থাকিবে, তখন প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের পূর্ব্বসম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত অশোক অনুশাসনের কোনও স্থানেই সম্রাট নিজের নাম অশোক-রূপে প্রকাশ করেন নাই—তিনি নিজকে "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" বলিয়াই সর্ব্বত্র অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং এই "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" ও মৌর্য্য নরপতি অশোক অভিন্ন ব্যক্তি কি না তাহা লইয়া বিগত ৭৫ বৎসর মধ্যে পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে নিজামরাজ্যে আবিষ্কৃত মাস্কি-অনুশাসনের পাঠোদ্ধার হইলে দেখা গেল যে, রাজা সেই লিপিতে নিজকে "দেবানং পিয়স অসোকস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দেব-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ও অশোক এক ব্যক্তি কি না—এই তর্কের অবসান হইয়া গেল। কাজেই এরূপ লেখের মূল্য যে কত তাহা বলা যায় না।

ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিভিন্ন-সম্প্রদায়-ভুক্ত শ্রমণ বা উপাসকগণ ধর্ম্মশাস্তা বুদ্ধ ও বর্দ্ধমানের স্মরণার্থ সাঁচি, ভরহুত, ভিলসা, রাজগৃহ, নালন্দা, তক্ষশিলা, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে কত স্তূপ, কত চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর উড্ডীন রাখিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ও তত্তৎস্থানলব্ধ প্রাচীন প্রস্তর লিপির সাহায্যে জানা যায়। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া লুম্বিনী গ্রামে মহারাজ অশোক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথায় পূজা দান করিয়াছিলেন, এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ উত্থাপন করিয়া দিয়া তাহাতে লিপি উৎকীর্ণ করাইয়া এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে হেতু—"হিদ ভগবং জাতেতি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে"—এই পুণ্যস্থানে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—অতএব এই লুম্বিনী-

গ্রামকে উদ্বলিক করা হইল, অর্থাৎ এই গ্রামের অধিবাসিগণকে রাজগ্রাহ্য করাদি দিতে হইবে না। আবার বুদ্ধের শরীর-নিধান-বার্ত্তা স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রাচীন লিপি সম্পাদিত হইয়াছিল—এ সম্বন্ধে ১৫ খৃষ্টাব্দে মথুরায় মহাক্ষত্রপ রাজুলের দুহিতার প্রদত্ত স্তূপলিপির কথা উদাহৃত হইবার যোগ্য। নেপালে আবিষ্কৃত পাঁডরিয়া-লিপি হইতে যেমন বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামের প্রাচীন অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে—সেইরূপ পিপ্রাওয়াতে বুদ্ধের সগোত্র শাক্যগণের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রদত্ত বুদ্ধ-শরীর-নিধান-পেটিকা ও তৎস্থিত লিপির আবিষ্কার হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধের বাল্য-লীলা-ক্ষেত্র কপিলবস্তুর অবস্থান পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। মৌর্য্যাধিকারের অব্যবহিত পরে উত্তরাপথে যে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, ও যাঁহাদের আধিপত্য প্রায় শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—সেই শুঙ্গরাজবংশের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে একমাত্র ঐতিহাসিক চাক্ষুষ প্রমাণ ভারহুত স্তূপের এক তোরণদ্বারের নির্ম্মাণ-বিজ্ঞাপক লিপি হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্য্যব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার জলন্ত উদাহরণ বর্ত্তমান বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নানাঘাট গিরিবর্ত্মের গুহাতে উৎকীর্ণ দক্ষিণাপথপতি আন্ধ্র রাজ রাজমহিষী নায়নিকার আদেশে সম্পাদিত প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত প্রস্তর লিপি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবস্থা-বর্ণনা-সম্বন্ধে এই লিপিই প্রাচীনতম। রাজমহিষী অঙ্গাধেয়, অশ্বারম্ভনীয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, গবাময়ন, গর্গত্রিরাত্র, আঙ্গিরস ত্রিরাত্র, অপ্তোর্য্যাম প্রভৃতি কত কত যজ্ঞ ও সত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং সেই সেই যজ্ঞে ও সত্রে বহু সংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গো, ধেনু, শকট, রথ, সংপট্ট, গ্রাম প্রভৃতি কত কত বহুমূল্য সামগ্রী দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই নানাঘাট-লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ইতিহাস-লেখকগণের নিকট এই লিপির মর্য্যাদা ও মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই লিপির প্রথম শিক্ষা এই যে, প্রাচীন আন্ধ্র নরপতিগণ অপর্য্যাপ্ত দানাদি-দ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের বর্ষাবাসের সুব্যবস্থা ও তাঁহাদের আহার আচ্ছাদনের নানারূপ সুবিধা বিধান করিয়া থাকিলেও—আপনারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যগণের সভ্যতার মূল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম—তাঁহাদের এইরূপ উক্তি যে যুক্তিযুক্ত নহে—এই নানাঘাট-লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এক কথা এই যে, কৃষ্ণ পূজা যে খৃষ্টাব্দের

পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল—"নমো সংকংসন বাসুদেবানং"—নানাঘাট-লিপির নান্দীতে উল্লিখিত এই উক্তিই তাহার প্রমাণরূপে উদাহৃত হইবার যোগ্য। বুদ্ধের, বোধিসত্ত্বগণের, জৈন ঋষি-বর্দ্ধমান ও জৈন তীর্থঙ্করগণের প্রতিমাস্থাপনাদি ধর্ম্মকার্য্যে কনিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি শকনরপতিগণও যে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতেন, তাহার প্রমাণও প্রাচীন লেখমালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর এক কথা এই যে, পূর্ব্ব কালে ভূমির দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর বিধানের জন্যই প্রায় অধিকাংশ তাম্রশাসন সম্পাদিত হইত। সেগুলি যে কেবল রাজার সম্পাদিত, তাহা নহে; প্রজার মধ্যে কেহ রাজদরবারে ভূমিপ্রার্থী হইয়া তাহা যথামূল্যে ক্রয় করিয়া ভূমিদানপত্র তাম্রফলকে দলীলরূপে রাজার আদেশে সম্পাদন করিয়া লইতে পারিতেন। রাজার বা রাজবংশের পরিচয় ব্যতীত এই সমস্ত তাম্রশাসনাদি হইতে রাজশাসনপ্রণালীরও অনেক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণরূপে এই স্থানে আর একটি অচিরাবিষ্কারের কথা উল্লিখিত হইতেছে। গুপ্ত-যুগে বাঙ্গালা দেশ কোন্ রাজার শাসনাধীন ছিল—গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত সে কালের বাঙ্গালার অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির কিরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল, বাঙ্গালা দেশই বা তখন কি ভাবে শাসিত হইত, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এ যাবৎ বড়ই দুরূহ ছিল। কিন্তু দিনাজপুরের অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামের সদ্যাবিষ্কৃত তাম্রশাসন-পঞ্চকের পাঠোদ্ধার করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, সে কালের বাঙ্গালা দেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল, এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিপতিগণ গুপ্ত সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। বাঙ্গালার বিষয়পতিগণ (District officers) আবার ভুক্তিপতিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই তাম্রশাসন-পঞ্চক হইতে আর এক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা এত কাল মনে করিতেন যে, স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল, তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত মত, তাহা এই নবাবিষ্কৃত লিপিপঞ্চকের সাহায্যে জানা গিয়াছে। স্কন্দগুপ্তের পরেও ন্যূনকল্পে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত উত্তরাপথে গুপ্ত-প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল, তাহা অবগত হওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বিষয়পতিগণ সপরিবার 'বিষয়' বা জেলার ও নগরের শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহাও এই প্রাচীন লিপিপঞ্চক হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সে কালের ভূমির মূল্য, ভূমির পরিমাপ-প্রণালী, ভূমির বিক্রয়-প্রথা, ভূমির সত্ব-নির্ণয়, পুস্তপাল দলীলরক্ষকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই স

লিপির সাহায্য না লইলে চলিবে না। তাম্রাদি-শাসনের সম্পাদন-বিধি স্মৃতি-শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে—সেই-শাস্ত্রীয়-রীতি-অবলম্বনে যে সমস্ত শাসন সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দাতা ও প্রতিগ্রহীতার বংশপরিচয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবদান ও কীর্ত্তিকথার অনেক পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতীতের ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া না হউক—প্রাচীন ভারতবাসিগণ রাজাই হউক, আর প্রজাই হউক, সকলেরই ইতিহাস-রচনার অনেক উপাদান এই সমস্ত পাষাণ-লিপিতে ও ধাতুপট্ট-লিপিতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরপুরুষগণ এই সমস্ত হইতেই অতীতের চিত্র আঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিব। এই কার্য্য যে কত কঠিন, তাহা অনুসন্ধিৎসুমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে আরও একটা কথা না বলিয়া থাকা যাইতেছে না। ইতিহাসের ও তদ্রচনার লক্ষ্য কি? একাদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা-অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার অভিভাষণে যথাদরূপে প্রদান করিয়াছেন। তদীয় মতের অনুসরণ করিয়া বলা যাইতেছে যে, অতীতের যথাযথ চিত্র অঙ্কণ করিয়া তদ্দ্বারা "মনুষ্যের সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা" ইতিহাসের লক্ষ্য। অতীতের যথাযথ চিত্র অঙ্কণ করিতে হইলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। "সত্য"-তথ্য-স্কলন যদি ইতিহাস-রচনার লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে সত্যের উদ্ধার-কার্য্য বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে পরিচালিত করিতে হইবে। প্রমাণের উদাহরণ দ্বারা তথ্য-নির্দ্ধারণ-প্রথাকে আমরা বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রণালীতে কেবল কল্পনার স্থান নাই। বিচার-নিষ্ঠ অপ্রমাদী গাড়বিবাকের ন্যায় প্রমাণাবলীর সম্যক্ অবধারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের উদ্ধার করিয়া, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকৃষ্ট ও অনন্য পন্থা অবলম্বন না করিয়া, কেবল কল্পনা ও অপ্রামাণ্য দলীলের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বা হইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে নাই, পারিবেও না। সমালোচকের তীব্র আঘাত তাঁহারা কেমন করিয়া অতিক্রম করিবেন? বাস্তবিক তাঁহারা অনেক স্থলে উপকারের ছলে দেশের অপকারসাধন করিতেছেন। সুতরাং কেহ তাঁহাদের যথেচ্ছ ইতিহাস-উদ্ধার-চেষ্টার নিন্দা করিলে আমাদের কোনও দুঃখ বা ক্ষোভ নাই; কিন্তু দেশ-বিদেশে যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হইয়া যথারীতি অনুসন্ধানে

ব্যাপৃত থাকিয়া সত্যের উদ্ঘাটন কার্য্যে ব্রতী থাকেন, প্রকৃতঅনুসন্ধানকারীর কেবল নিন্দা করিতে হইবে বলিয়া, যাঁহারা সেই সকল উদ্যোগী পুরুষগণের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেশদ্রোহী; কেন না, তাঁহারা দেশের অতীতের চিত্র দর্শন করিয়া নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করিতে বিমুখ। আমার মনে হয়, সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধানকারিগণই ভারতীয় প্রাচীন-ইতিহাস-রূপ নিবিড় অরণ্যে আশার পথরেখা নির্ম্মাণ করিতেছেন। পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য উপাদান—প্রাচীন লেখমালা। এই সমস্ত লেখের মূলার্থগত পাঠ ও ব্যাখ্যাকার্য্যে যে যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণ হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তন্মধ্যে আমরা জার্ম্মেণ্টির বুলার, কিলহর্ণ, বুডারস্ ও হুলস্, ফ্রান্সের সেনার ও সিল্ভ্যান্ লিভি, ইংলণ্ডের ফ্লিট্, হুরণ্‌লি, পার্জিটার, টমাস, ব্যাপ্‌সন্ ও স্মিথ, বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারকার ও ভগবান্ লাল, এবং আমাদের বাঙ্গালার রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মহাত্মার নাম স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বিশু মল্লিকের অধঃপতন।

১

মানভূম জেলার কঞ্চুকী নামক গ্রামের উত্তরে কতকগুলি জঙ্গল এবং পর্ব্বত দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'রাজবংশী মাল' নামক জাতির বাস। রাজমহলের 'মাল পাহাড়িয়া' ইহাদেরই এক শাখা বলিয়া জনশ্রুতি। তাহারা পর্ব্বতের উপরে থাকিতেই ভালবাসে। কোন সমাজভ্রষ্ট হইলে তাহারা পর্ব্বত হইতে নিম্নে দণ্ডস্বরূপ বিতাড়িত হয়। ইহার নাম 'অধঃপতন'।

কিন্তু পর্ব্বতের উপরে থাকিয়াও তাহারা নিম্নভূমিতে কৃষিকার্য্য করে। ধান কাটিয়া তাহারা পর্ব্বতের মধ্যভাগে 'খামার' বাঁধে, এবং তখন যুবক যুবতীগণ একত্র হইয়া গান গায়। মালজাতি ধনুর্ব্বিদ্যায় খুব দক্ষ; সেই জন্য তাহাদিগের আবাসভূমির সন্নিকটে হিংস্র পশুর দৌরাত্ম্য খুব কম।

লেখাপড়ায় মালজাতির একটা আন্তরিক 'টান্' আছে। কঞ্চুকী গ্রামে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একটা 'প্রাইমারী', এবং তৎপরে একটা 'মিড্‌ল ভার্ণাকুলর' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন কি, সেখানকার জমীদার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছিলেন। ক্রমে সেই গৃহে এক জন দেশীয় খ্রীষ্টান মিশনরীর বিধবা স্ত্রী একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন। তাহাতে নানাবিধ পর্ব্বতীয় জাতির বালিকাগণ 'কথামালা', 'যীশুখ্রীষ্টের উপাখ্যান' প্রভৃতি বহি লইয়া পাঠ করিত। সেই খ্রীষ্টান্ 'গুরুমা'র নাম 'এলিজাবেথ্ জগৎতারিণী'। অর্থাৎ, পূর্ব্বে তাঁহার নাম জগৎতারিণী ছিল, পরে 'এলিজাবেথ' যুক্ত করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাহাড়িয়া বালিকাগণ তাঁহাকে হয় ত 'গুরুমা' কিংবা 'এলিজারাণী' বলিয়া ডাকিত। রাজবংশী মালজাতির মধ্যে প্রায় সকলেই গুরুমার শিষ্য ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

এলিজারাণীর খুব শান্ত মূর্ত্তি, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তাঁহার স্নেহের গুণে পাহাড়িয়া বালিকাগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। অনেকে শনিবারে পর্ব্বতের উপর প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তাঁহার গৃহেই রাত্রিযাপন করিত, এবং পর দিন প্রাতঃকালে নিম্নভূমিতে পুষ্প আহরণ করিয়া দল বাঁধিয়া গৃহে ফিরিত।

এলিজারাণীর গৃহ একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। দস্যুভয়ে তিনি পর্ব্বতের নিম্নভাগে প্রস্তর কাটিয়া, একটা গুহায় বাস করিতেন। সেটাকে 'ফ্লেক্' বলিলেও চলে। হঠাৎ তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সুকঠিন। তাহার ছাতের উপরিভাগ এত পিচ্ছিল যে, দাঁড়ান অসম্ভব। পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগ হইতে কেহ সেখানে আসিতে পারিত না। কটকপূর্ণ। যেখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিত, সেটা কূপের মত, এবং তাহার পার্শ্বেই তাঁহার সুসজ্জিত গৃহ। গৃহে যাইতে হইলে তিনটী ছোট ছোট পগার পার হইতে হয়, এবং যে সেতুর উপর দিয়া সেগুলি পার হওয়া যায়, তাহা সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামিনী টানিয়া লইতেন, সুতরাং কাহারও পক্ষে 'এলিজারাণী' পার হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িত।

গৃহের অভ্যন্তর সুসজ্জিত। গালিচার চেয়ার, দুইখানি টেবল্, এমন কি একখানা কৌচ পর্য্যন্ত মধ্যভাগে স্থাপিত। মেজে খুব শুষ্ক ও মার্জ্জিত, এবং 'ডাইনিং-রুমে'র মধ্যে অনেক রকম ছোট বড় বাসন। সেই ঘরই 'উপাসনা-গৃহ'। অর্থাৎ, খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া আসিবার পূর্ব্বে গুরুমা সেই ঘরে উপাসনা সারিয়া লইতেন।

আজ গুরুমা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া ছাত্রী 'উতি'কে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। উতি, মণ্ডলের কন্যা। তাহার 'বাদুমাথা' চক্ষু বলিয়া সকলে তাহার 'উতি' নাম দিয়াছিল। উতি কালো, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। চক্ষুর গুণে কালো দেখাইত না।

বার বৎসর পর্য্যন্ত উতি পাহাড়ে নাচিয়া ও গান করিয়া বেড়াইত। ছোট ছোট কুরঙ্গ ও বনের পাখী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সকল যুবককেই উতি ভালবাসিত। ক্রমে উতি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে সকলের চক্ষু তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। লেখাপড়ার গুণেই হউক, কিংবা কোনও দৈবযোগেই হউক, উতির গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া গিয়াছিল। সকলে মনে করিল, উতি কাহাকেও গোপনে ভালবাসে। কিন্তু সেই সৌভাগ্যবান যুবক কে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। সকলের অজস্র দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-সত্ত্বেও উতি কাহারও দিকে চাহিয়া মনের গোপন কথা কাহাকেও কখনও বলে নাই। অনেকে মনে করিত, উতির টান চরণ মল্লিকের দিকেই বেশী। চরণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী। বিস্তীর্ণ চাষ ও গাভীপূর্ণ গোয়াল। কুঞ্চিত কেশ, সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী চরণ মল্লিকের অঙ্কেই উতি শোভা পাইবে, তাহাই সকলের ধারণা। আর একটা কথা, যুবক চরণ কহিত, 'উতি ছাড়া আমার কোনও স্ত্রী অদৃষ্টে লেখা নাই।'

কিন্তু উতির 'ফুল' (সখী) মন্দুরা গোপনে কাহাকেও বলিয়াছিল যে, চরণের কনিষ্ঠ বিশুকে উতি ভালবাসে। বিশু বাঁশী বাজায়, গান করে, একটু লেখাপড়া জানে। চরণ লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই। আর একটা কথা, উতি মধ্যে মধ্যে বিশুর সঙ্গে অনেক কথা কহে, সে কথার অর্থ নাই। যে কথার অর্থ নাই, সে নিশ্চয় প্রণয়ের কথা। এই রকম কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মন্দুরা গুরুমার নিকট উতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিত।

সে কথাগুলির তথ্যনির্ণয় করিতে আজ এলিজারাণী উতি ও মন্দুরাকে ডাকিয়াছিলেন।

২

সেতু পার হইয়া উতি ও মন্দুরা গুরুমাকে প্রণাম করিয়া কৌচে বসিল। গুরুমা তাহাদের লইয়া প্রথমে উপাসনাগৃহে গেলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে, সকলে চা ও বিস্কুট খাইয়া, একটা পুরাণো হার্ম্মোনিয়মের সুর-সহকারে গান করিল। বর্ষাকাল। মুষলধারায় মেঘের জল পর্ব্বত ও কানন ভাসাইয়া নিম্নভূমির দিকে ঘোর-রবে ছুটিতেছিল।

অন্য দিন উতি উপাসনায় গান গায়, আজ একটী প্রেমের গান গায়িল। সে গানটা গুরুমা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। গুরুমা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া

গেলেন। ভয়া—যৌবনে প্রেমের গান স্বতঃই ফুটিয়া উঠে, কিন্তু এ বাঙ্গালা গান উতি শিখিল কোথায়? এ যে একটা পুরাণো সুর, অথচ এ পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রচারিত হয় নাই। তাই গুরুমা এলিজাবাণী জিজ্ঞাসা করিলেন —'উতি! এ গান শিখিলি কোথায়?'

উতি। গুরুমা, আমার বেশ বোধ হয় সুরগুলো উড়ে আসে। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। যখন আমার কানের কাছে আসে, তখন নতুন বলে' বোধ হয়।

গুরুমা। এটা যে কীর্ত্তনের সুর! শ্রীরাধার প্রেমের কথা। ও সব তোর গাওয়া উচিত নয়।

উতি। কেন গুরুমা? আমার যে বড় ভাল লাগে। আমার বেশ বোধ হয়, আমি দু চার বৎসর পরে মরে যাবো এ গানগুলোই আমাকে সে কথা বলেছে।

গুরুমা। কি সর্ব্বনাশ! তুই গানের ঐ কথাগুলো কোথায় পেলি?

উতি। পদাবলীতে পড়েছি।

গুরুমা। কি ভয়ানক! তোর যে যৌবনের সময়! পাপে আচ্ছন্ন হ'বার সময়। যিনি পাপীদের জন্য নিজের রক্ত দিয়েছিলেন, তিনিই কেবল বিপদের সময় ত্রাণ করবেন। আমি কিছুই পারবে না।

মন্দুরা। পাপ কি গুরুমা? যদি যৌবন তাঁর পায় সঁপে দিই, তবে পাপের গোড়াটাই ত নষ্ট হয়ে গেল। উতি কখনও পাপ করবে না, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

উতি তাহার মনের কথা মন্দুরার মুখে পাইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া দিল।

গুরুমা। আমিও এক সময় বষ্টমী ছিলাম লো, কিন্তু যৌবন তাঁর পায়ে সঁপতে পারিনি। অন্তরে যৌবন সঁপে দেওয়া বড় শক্ত কথা। আচ্ছা, উতি! তুই কি সেই খারাপ উপন্যাসগুলো এখনো পড়িস্? ওতে চরিত্র বিগড়ে যায়।

উতি। আমার ওগুলো পড়তে বড় ভাল লাগে। আমাকে বিশু একখানা পাঁচ শ' পাতার বই এনে দিয়েছে, তার মধ্যে সব কথা আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের কথা, জগতের কথা, ঈশ্বরের কথা, প্রেমের কথা। মানুষের মন কি ক'রে চারি দিকে ছুটে, কি ক'রে আমরা আত্মহারা হই, কি ক'রে আমাদের অধঃপতন হয়, পরে কত কাঁদি, যা হারিয়েছি, তা আর হাত বাড়িয়ে

পাইনে, দুঃখে বুক ভেঙ্গে যায়! সমুদ্রের মত বুক তোলাপাড় হয়, কখনও বোধ হয়, এগুলো সাম্‌লাবার বল আমার আছে; আর কখনও বোধ হয় যে, আমার কোনই শক্তি নাই। তখন কাতর হয়ে হতাশ হয়ে পড়ি।

নম্বুরা ব্যগ্রচিত্তে উতির কথাগুলি শুনিতেছিল।

এলিজারাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি একত্র জাগিয়া উঠিল। তিনিও এক সময় এই সব চিন্তা করিয়াছিলেন, তবে এত কথা ব্যক্ত করেন নাই। জীবের আবর্ত্তন, অসভ্য জাতির উন্নত সোপানে আরোহণ ও তাহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, সকলই স্বাভাবিক। বাস্তবের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয়। হৃদয়ে শোক না পাইলে কোনও ধর্ম্মেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না।

তবে গুরুমা উতিকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বড় আশা ছিল, উতি ভবিষ্যতে সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাঁহার পদে অভিষিক্তা হইবে। কিন্তু উতির সাবেগপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। আমার বড় সাধ, তুমি শিগ্‌গির বিয়ে ক'রে ঘরকন্না কর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। এই বন্য জাতির যাতে জ্ঞান ও ধর্ম্মে মতি হয়, সেই আশায় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। আচ্ছা, উতি! আমাকে মন খুলে বল ত, তুমি তাহাকে ভালবাস, চরণকে, না বিশুকে?

উতি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিল, 'দু জনকেই।'

গুরুমা। তাও কি কখনও হয়? সত্য বল। তুমি ত কখনও মিথ্যা বল নাই!

উতি। সত্য কথা গুরুমা! আমি এ পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারিনি।

সেই সরলা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া গুরুমা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

গুরুমা। দেখ, একটা কথা বলি। চরণের ধর্ম্মবল ও বাহুবল, দুই-ই আছে। তুমি তার উপর অবলম্বন ক'রে নির্ভয়ে থাকতে পার। বিশুর চরিত্র নাই। সে গীতা পড়ে, ডাকাতের দলে মেশে। সে জন্য তার উপর তোমার ঘৃণা হয় না?

উতি দেহ উন্নত করিয়া উঠিয়া বসিল, 'না! সেই জন্য আমার তার উপর মায়া বেশী। যার সহায় ঈশ্বর, তার জন্য ভাব্‌বার দরকার নেই। যার কেউ

সহায় নেই, তারই জন্য প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে। যীশু ত পাপীদের জন্যই রক্ত দিয়েছিলেন, গুরুমা।'

এলিজাবেথী প্রসাদের সূত্রপাত বুঝিতে পারিয়া আর কোনও দ্বিরুক্তি করিলেন না।

৩

পার্ব্বতীয় বায়ুর কঠোর স্পন্দনে বন কাঁপিতেছিল। বড় বড় পাদপ নত হইয়া প্রস্তর চুম্বন করিতেছিল। আকাশ ঘোর কাল। কাননে পথ জনশূন্য।

অর্দ্ধেক পথ পার হইতে না হইতে ঘোর বর্ষা আরম্ভ হইল। উতি মন্দুরার হাত ধরিল।

'তুই ভয় পেয়েছিস্?'

মন্দুরা। না, খানিক দূরে আমাদের একটা খামারবাড়ী আছে, চল্, সেখানে যাই।

অদূরে কুটীরখানি বিদ্যুদালোকে মধ্যে মধ্যে প্রতিভাত হইতেছিল। দুই সখী তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝড় বহিল। ক্রমে আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। রাত্রি তখন এক প্রহর। আকাশ চন্দ্রালোকে ভরিয়া গেল।

উভয়ে দেখিল, অদূরে মাথায় মোট বহিয়া এক জন লোক ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া যাইতেছে।

মন্দুরা ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বোধ হয় বিশুদাদা।'

উতি বলিল, 'ডাক।'

মন্দুরা তাহাদের পার্ব্বতীয় ভাষায় ডাকিল, 'উই—ই—ই!'

পথিক ফিরিয়া দাঁড়াইল, 'এখানে তোরা কারা?'

মন্দুরা। উতি, আর মন্দুরা।

বিশু কুটীরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রেতে তোরা এখানে?'

মন্দুরা। আমরা গুরুমার ওখানে গেছিলাম।

বিশু। তোদের কাপড় যে সব ভিজে?

উতি। তা হোক্! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বিশু। সে অনেক কথা, দাদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি আর এ দেশে থাকব না। বর্দ্ধমানে যাচ্ছি।

মন্দুরা। বর্দ্ধমানের রাস্তা ত এটা নয়?

বিশু। (হাসিয়া) আমি উতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, তাই এ পথে এসেছি।

উতি। দাদার সঙ্গে ঝগড়া কেন হল?

বিশু। আমি ডাকাতের দলে মিশি বলে'। সে দিন কঙ্কুকীর হাটে ডাকাতী হয়ে গেছে। সকলে নাকি বলে যে, আমি বাঁশী বাজিয়ে তাদের বিগড়ে দিইছি। অথচ আমি বরাবর তাদের কত মানা করেছিলেম। শুন্‌ছি নাকি দারোগা আমাকে ধরবার জন্য বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উতি! এ দেশে থাক্‌লে আমার জেল্ হবে নিশ্চয়। আমি প্রমাণ দিতে পার্‌ব না। তার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ভাল। তবে যাবার আগে তোর সঙ্গে—

উতি। বিদায় নিতে এসেছিলে? তুমি কি পাষাণ!

বিশু। উতি! আমার জীবনের মধ্যে একটা ভাবনা, সেটা কেবল তোর জন্য। তুই দাদাকে বিয়ে কর্‌লে সে ভাবনাটা যায়। উতি, প্রতিজ্ঞা কর—

উতি। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা কর্‌ব, কিন্তু আমায় একটা কথা রাখ্‌তে হবে।

বিশু। রাখ্‌ব।

উতি। মন্দু, তুমি সাক্ষী।

তাহার পর উতি বিশুর হাত হইতে মোট কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'আমি তোমাকে একলা যেতে দেব না—সঙ্গে যাব, পরে তোমার মনটা ভাল হ'লে তোমার দাদাকে বিয়ে কর্‌ব।'

বিশু। আমার মন বেশ আছে।

উতি। তুমি বিগড়ে যাচ্ছ। যখন পালানো ভিন্ন উপায় নাই, তখন আমিও তোমাকে একলা বিপদে পড়্‌তে দেব না, সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব, চোখের উপর রাখ্‌ব—

সেই যাদুমাখা চক্ষু! তাহার মধ্যে কত সাধ! কত জীবন-মরণের কথা! বিশু বলিল, 'উতি! আমার পাপের ভার বহিবার শক্তি এখনও তোর হয় নাই। আমার জীবনে অনেক বিপদ ঘট্‌বে, আমি পাগল হয়ে যাব, কিংবা সন্ন্যাসী হব।'

উতি মুখ ফিরাইয়া বিশুর কাপড়ের মোট মাথায় লইল।

মন্দুরা কাঁদিল। উতিও কাঁদিতেছিল।

উতি মন্দুরাকে বলিল, 'সই, আবার দেখা হবে নিশ্চয়। অন্ততঃ একবার হবে, কেন না তুই আমার প্রাণের সই। সকলের যাতে মঙ্গল হয়, তাই করিস্।'

ইহা বলিয়া বিশু ও উতি সেই নৈশ বায়ুর মধ্যে প্রান্তরপথ ভাঙ্গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মন্দুরা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মন্দুরা উত্তরের বিচ্ছেদে কাঁদিল। মন্দুরা বিশুকে ভালবাসিত, কিন্তু সে কথা উতিকে বলে নাই। উতি তাহার প্রাণ। উতির হাতে বিশুকে সমর্পণ করিয়া মন্দুরা আশ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়ের গভীর স্তরে যে গ্রন্থি আজ ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার ক্লেশে সে অধীর হইয়া কাঁদিল।

আর চরণ? সে পর দিন সকল কথা শুনিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'যে উতিকে নিয়ে আন্‌তে পার্‌বে, সে আমার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে।'

কিন্তু ভবিতব্য অনিবার্য্য। তন্ন তন্ন করিয়া বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা অন্বেষণ করিয়া কাহাকেও পাওয়া গেল না। ডাকাতী মোকদ্দমায় 'বিশু সর্দ্দারে'র নাম 'ফেরারী'-ভুক্ত হইল। সকলে বলিল, 'বিশুর অদৃষ্ট খুব ভাল, কেবল জেলের হাত এড়ানো নয়—কঞ্চুকীর রাণীকে নিয়ে রাজত্ব ক'রবে।'

৪

উতি ও বিশু বর্দ্ধমানে না গিয়া প্রয়াগধামে চলিয়া গিয়াছিল। বহুজন-সমাকীর্ণ কুম্ভমেলায় তাহারা একটা কুটীর বাঁধিল। বিশু বাঁশী বাজাইত, উতি গাহিত। সেই বংশীস্বরে ও গানে অনেকে মোহিত হইয়া কেহ বস্ত্র, কেহ টাকা দিয়া বাষ্পভারাক্রান্তনয়নে ফিরিত।

পারসী থিয়েটরের ম্যানেজার আবদুল খাঁ তাঁহার 'ইন্দ্রসভা'র জন্য এক জন সুগায়ক ও এক গায়িকা খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ বিশু ও উতির বাঁশী ও গান শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যে, ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব ও বিলক্ষণ মাধুর্য্য আছে। তিনি উভয়কে ডাকিয়া লইয়া থিয়েটরের দলভুক্ত করিয়া দিলেন।

খাঁ সাহেবের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইল,—'সম্প্রতি নেপাল হইতে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর জাতীয় একটী যুবক ও যুবতী কুম্ভমেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে; তাহারা স্বদেশীয় ভাষায় প্রেমের গান গায়। আসুন! কর্ণকুহর তৃপ্ত করিবার এমন সুযোগ আর ঘটিবে না।'

দলে দলে লোক আসিয়া জুটিত এবং 'কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া যাইত'। বিশু অনেক টাকা পাইত। 'প্রাইমা জেনা' মডিজানের আদর কমিয়া গেল।

মডিজান ইরাণি যুবতী, সুগায়িকা ও হাস্যময়ী। সে উতিকে ডাকিয়া বলিল, 'হে কিন্নরী! তোমার ঐ সঙ্গীতের মধ্যে একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, আধ-আধ, আবেগপূর্ণ কি রকম একটা সুর আছে, সেটা আমাকে পাগল করিয়াছে! আমাকে শিখাইয়া দাও।'

উতি উর্দ্দু কথা কহিতে শিখিয়াছিল। হাসিয়া বলিল, 'বিবিজান! এগুলো

জংলা। এর ওস্তাদ উতি। (বিশুকে দেখাইয়া)। বাঁশীর সঙ্গে না শিখ্‌লে ঠিক কসরৎ হবে না! হার্মোনিয়মে এগুলো বেরোয় না।'

বিশু মতিজানের সঙ্গে বসিতে নারাজ, কিন্তু উতি আবদার করিয়া বলিল, 'ওকে শেখাতেই হবে। একে ত আমাদের আশ্রয়-দাত্রী, তার উপর মনটা খুব সরল।'

গান শুনা খুব সহজ। কিন্তু শিখাইয়া শুনা একটু সঙ্গীন রকম। স্বহস্ত-রোপিত চারা গাছের ফুলের মত। ইরাণী যে কণ্ঠস্বরে সভ্য জগৎকে মুগ্ধ করিত, সেটুকু সাধা গলা; তার মধ্যে বৈষ্ণবী ভাব সঞ্চারিত হইয়া এমন একটা অপূর্ব্ব সুর দাঁড়াইয়া যাইত যে, বিশ্বেশ্বর তন্ময় ও স্তম্ভিত হইয়া শুনিত।

প্রত্যূষে উতি রাঁধিবার যোগাড় করিতে গিয়াছে। বিশু বাঁশী লইয়া একটা সুর সাধিতেছে। হঠাৎ ইরাণী শয্যাত্যাগ করিয়া আলুলায়িতকেশে ও স্রস্তবসনে বিশুর গৃহে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিশু অবাক হইয়া তাহার রূপ দেখিতেছিল।

নিশাকালে ইরাণী একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার ভাবে সে বিভোর।

ইরাণী বলিল, 'তুমি কোন্ সুর বাঁশীতে বাজাচ্ছ?'

বিশু। তা জানিনে।

মতিজান। ওটা ভৈরবীর কীর্ত্তন। আমাদের ভৈরবীর সঙ্গে, তোমাদের কীর্ত্তন মিশিয়া গিয়াছে।

এই 'আমাদের', 'তোমাদের', ও মিশামিশির কোমল কথায় বিশুর প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'এখন উপায়?'

মতিজান। অনিবার্য্য! দাঁড়াও, আমি গাই।

মতিজান গুণ গুণ করিয়া গাহিল। প্রভাতের ভাঙ্গা গলায় ভৈরবী কি মধুর! মতি বলিল, 'আমি রাত্রিতে স্বপ্নে পেয়েছিলেম। এখন সুরে গাচ্ছি।'

বিশু পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল, 'আমার হৃদয় যে শূন্য বোধ হ'চ্ছে।'

মতিবিবি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। 'তোমার ত প্রেমের লোক আছে, আমার কেউ নাই। তোমাদের ঐ প্রেমটুকু সুরে লইয়া আমি হৃদয় পূর্ণ করি। সেই জন্য তোমাদের ঐ অপূর্ব্ব সুরটুকু শেখবার জন্য আমি পাগলিনী।'

আরও কি যাথামুণ্ড সে বলিল, তাহা বিশু শুনিল না, সে সহসা বলিল, 'তুমি আমার প্রাণের মধ্যে এসে পড়েছ।'

মতি আত্মহারা হইয়া বলিল, 'তুমি আমার হৃদয়ে, প্রত্যেক রক্তকণায়, শিরায় শিরায়, নিঃশ্বাসে, শ্রবণে ও নয়নে—ঐ দেখ প্রভাতসূর্য্য উঠ্‌ছে, যদি বিশ্বাস না হয়, আমার তারায় তোমার প্রতিবিম্ব দেখ।'

ইহা বলিয়া ইয়াণী বিশেশ্বরের মুখ তাহার কোমল করতলে বদ্ধ করিয়া স্বীয় নয়নের সম্মুখে লইয়া আসিল।

"আমি তোমাকে এই মহামেলায় কুড়িয়ে পেয়েছি। ঈশ্বরের রাজ্যে কেহ কারও নিজস্ব নয়। আমার অধিকার, প্রেম। প্রেমে তোমাকে কিন্‌ব। আমি সকলের চেয়ে বেশী দর দিয়াছি। তুমি পরখ ক'রে দেখ, জগতে তোমাকে সকলের চেয়ে কে ভালবাসে।'

ইয়াণী বিশেশ্বরের বুকে তাহার মস্তক রাখিয়া কাঁদিল।

বিশুর হৃদয়-শোণিত উষ্ণাদের ন্যায় ছুটিতেছিল। প্রেমের মর্ম্ম সে কি করিয়া বুঝিবে? বন্য জাতি যখন হাটে যায়, তখন রাজা কাপড়গুলি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কিনিয়া আনে। জীবের আবর্ত্তনে কথারই দর বেশী। কথা—কথা—কেবল কথা! সে কথার কেবল একই উত্তর—প্রতিদান।

তিন মাসও কাটে নাই! কুটস্থের পদতলে বিশু উতিকে লইয়া বলীয়ান ছিল, কিন্তু আজ মোহে পড়িয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

বিশু বলিল, 'মতি, কেঁদ না, তুমি আমার হাত ধ'রে যেখানে খুসী নিয়ে যাও, আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।'

রুদ্ধনিশ্বাসে উতি ডাকিল, 'বিশু, শিগ্‌গির এস, আমার হাত পুড়ে গেছে।'

৫

এক বৎসর বাধার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশু মতিজানকে লইয়া নিরুদ্দেশ। খাঁ সাহেব উতিকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আবার ঘোর বর্ষাকাল। বলরামপুর ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইয়া অনাথিনী উতি পার্ব্বতীয় পথ বাহিয়া চলিতেছিল। দীর্ঘপথ, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। তাহার দৃষ্টি জগতের দিকে নাই। জগৎও উতির দিকে চাহিতেছিল না।

রাত্রি আটটার সময় এলিজারাণী তাঁহার স্কুলে বসিয়া বাইবেলের একটা অধ্যায় পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুদালোকে দেখিলেন যে, এক জন রমণী তাঁহার দ্বারদেশে পড়িয়া গেল। এলিজারাণী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ও?'

উতি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, 'গুরুমা! আমি আপনার উতি।'

গুরুমা শশব্যস্তে উতির দেহ উত্তোলন করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। উতির সেই যাদুমাখা নয়নে কালিমা পড়িয়া গিয়াছে। অনাহারে শীর্ণা। গুরুমা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, উতির সন্তানের সম্ভাবনা।

গুরুমা শোকাতুরা হইয়া বলিলেন, 'উতি! তোর এ দশা কেন? বিশু কোথায়?'

উতি। বিশুকে শয়তানে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। গুরুমা! আমি তাকে রক্ষা করতে পারি নি। জগতে শয়তানের বলই বেশী। ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করতে পারেন না। আমি তাকে চোখে চোখে রেখেছিলেম, কিন্তু আমাদের উভয়কেই অন্ধ ক'রে শয়তান তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

গুরুমা। উতি, এ কি?

উতি। ঐ কেবল আছে। বিশুর সন্তান আমার জঠরে। কিন্তু গুরুমা!

গুরুমা। কি, বল!

উতি। আমাদের বিয়ে হয় নি।

উতি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। গুরুমা শিহরিয়া উঠিলেন। এখন উপায়? এমন মহাসমস্যা গুরুমার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নাই।

গুরুমা মন্দুরাকে খবর দিলেন। মন্দুরার সঙ্গে চরণ আসিল।

সেই রাত্রিতেই উতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। উতির জ্বর হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, সঙ্কটাপন্ন। রুগ্নকীর ডাক্তার আসিয়া বলিল, 'জোর তিন দিন।'

চরণ তাহা শুনিয়া পাগলের ন্যায় উতির শয্যার নিকটে গিয়া বসিল। 'উতি! আমার প্রাণের উতি! তুই যদি ছেড়েই গেলি, তবে বিশুকে বিয়ে কল্লিনি কেন?'

উতি শীর্ণমুখে ও জ্বলন্ত চক্ষে হাসিয়া বলিল, 'চরণ! তাকে অনেক চেষ্টা ক'রেও রাখ্‌তে পারি নি। সেই শোক বুকে বিঁধেছে। জগতে ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই। তোমরা সব মিথ্যা কথা ব'লে ভুলিয়ে রাখ। আমি কি পাপ করেছিলেম যে, সেও গেল, আর এই অভাগাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে' আমিও চল্লেম। জগতের এ কেমন ধারা রীতি?'

ইহা বলিয়া উতি সদ্যোজাত সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

গুরুমা। ছি! প্রলাপ বকিও না।

চরণ উগ্রস্বরে বলিল, 'প্রলাপ নয়। কথার মধ্যে অনেক সত্য আছে! কিন্তু আজ আমি বুঝিয়ে দেব। উতি! তুই শান্ত হ! ঐ যে সন্তান, ও

আমার। আমি বেঁচে থাকতে ওকে কেউ মার্ত্তে পার্বে না। তুই বিশুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলি যে, ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবি, তা আমি তৈরী আছি। আমি বরাবর জানি, আমার অদৃষ্টে আর কোনও স্ত্রী লেখা নাই।'

চরণ ভূমিতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, 'গুরুমা, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে আমাদের বিবাহ দাও।'

উতির মুখ শান্তিপূর্ণ হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল, 'দাও'।

প্রস্তরময় গৃহে সেই মুমূর্ষুর শেষজাত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন দৈবলোক হইতে নামিয়া আসিল। গুরুমা বলিলেন, 'মন্দুরা, তুমি সাক্ষী, আমি উভয়ের বিবাহ দিলাম।'

তার পর ধর্ম্মগ্রন্থ হস্তে গুরুমা উভয়কে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

চরণ উতিকে শিবিকায় বহন করিয়া পর্ব্বতের উপর লইয়া গেল। সেখানে গৃহ সুসজ্জিত করিল। নিজের হস্তে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া শিশুসন্তানকে পান করাইল। গ্রামের যুবক ও যুবতীবৃন্দকে ডাকিয়া বলিল, 'তোরা ধীরে ধীরে বনের আড়ালে বাঁশী বাজা, খুব কোমল সুরে। আমার আজ রাসর। আমার জীবনের সাধ মিটেছে। সাধ এক দিনেও পুরে, অনেক দিনেও মিটে। আমার সকল সাধ এক দিনেই মিটেছে। আমি স্ত্রী পুত্র এক দিনেই পেয়েছি। আমি বিশুকে রেগে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তার জন্য কেঁদে সারা হয়েছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল। তোরা বাঁশী বাজা। আর, মন্দুরা, তুই গান কর।'

পাগলের মত চরণ উতির দিকে চাহিল। উতির যাদুমাখা চক্ষুর যাদু লইয়া আত্মা কোথায় গিয়া আশ্রয় করিল, তাহার ঠিক খবর জগতে কেহ দিতে পারিল না। শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মন্দুরা তাহাকে বুকে লইল।

'ওরে আমার বুকের ধন, আমার গিগিরই দুধ হবে, তোকে তার অর্দ্ধেক দেব। তুই কাঁদিস্‌নে।'

৬

সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মন্দুরার সহিত উতির অগ্রজ পিতমের সেই সাত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, এবং ছয় বৎসর হইল, মন্দুরার একটী কন্যা হইয়াছে। শৈশবে ভাই ভগ্নী মন্দুরার দুগ্ধ বাঁটিয়া খাইত। উতির পুত্রসন্তান দক্ষিণ স্তন্য ও মন্দুরার কন্যা বাম স্তন্য পান করিত। এখন তাহারা পর্ব্বতে ছুটাছুটী করে।

চরণ উতির দেহ গিরিশৃঙ্গে লইয়া গিয়া একটি সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শুক্লা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহা ফুলে সাজাইয়া দিতেন।

এ বৎসর বড় শীত পড়িয়াছিল। গিরিশৃঙ্গ মধ্যে মধ্যে তুষারাবৃত হইত।

চরণ গৃহে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। সান্ধ্য শীতে সে আজ অত্যন্ত কাতর। কিন্তু উতির সন্তান 'বিরণ' লুকাইয়া তার মাতার সমাধিস্থলে চলিয়া গিয়াছে। সে ফুলের লোভে মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইত।

আজ হঠাৎ দেখিল, সেখানে এক জন দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসীর মত লোক বসিয়া। সে ভয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল, এমন সময় সন্ন্যাসী বলিল, 'ভয় নাই। এস।'

বিরণ। তুমি ডাকাত! আমার মার মন্দিরের ফুল চুরী কচ্ছ?'

সন্ন্যাসী। এই সমাধি তোমার মার?

শিশু। হাঁ।

সন্ন্যাসী। তুমি উতির সন্তান?

বিরণ। হাঁ।

সন্ন্যাসী। তোমার পিতা কে?

বিরণ। চরণ।

সন্ন্যাসী। কখনই না। তোমার পিতার নাম বিশ্বেশ্বর।

শিশু সতেজে বলিল, 'সে ত ডাকাতের সর্দ্দার! আমার বাবা এ দেশের পাহাড়ের রাজা। সেই ডাকাত আমার মাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার নাম মুখে এন না।'

সন্ন্যাসীর চক্ষে জল আসিল। 'ওরে বুকের ধন, একবার কোলে আয়। সংসারের সব বন্ধনই গিয়াছে মনে করেছিলেম, কিন্তু তা যায় নি। সেই জন্য আবার এ পুরাণো তীর্থস্থানে ফিরে এসেছি। এখানকারই জলবায়ুর মধ্য দিয়ে আমি চলে যাব। জগতের স্বদেশ দিয়ে স্বর্গের স্বদেশে যাব। যাঁর কাছে যাব, তিনি তোর মার বুকের মধ্যে তোকে রেখে গিয়েছিলেন, একবার সে মণিমালার সূত্রটুকু ধরতে এসেছি।'

শিশু স্নেহের আকর্ষণে বিশ্বেশ্বরের কোলে গেল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে বুকে ধরিয়া চরিতার্থ হইল।

বিরণ অনেক ক্ষণ পরে বলিল, 'আমার বড় শীত করছে।'

বিশু তাহার মোট হইতে একখানা শাল বাহির করিয়া বলিল, 'যা, সন্তান! তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। এই মোট এখানে রেখে গেলাম। আট বছর

পূর্ব্বে তোর জননী এই মোট মাথায় বয়ে' আমাকে রক্ষা করবার জন্য সংসার-সমুদ্রে ভেসেছিল। সে ডুবে গেছে। তুই ভেসেছিলি বলে' তোকে এরা কুড়িয়ে পেয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ মিটেছে।'

এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর সেই পুরাণো মোট সমাধির উপর স্থাপন করিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বনতল হইয়া আসিল। বিশু হৃদয়ভেদী স্বরে ডাকিল, 'উতি—উতি—উতি!—'

বিরণ ভয় পাইয়া বলিল, 'বাবা, কেঁদ না, তুমিই আমার বাবা, বুঝতে পেরেছি। আমি স্বপ্নে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে পেতুম।'

অদূরে মন্দুরা বিরণকে অন্বেষণ করিতেছিল। হঠাৎ 'উতি'র নাম শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল।

বিশু পাগলের ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া বলিল, 'মন্দুরা, ও আমাকে বাবা বলেছে। আমার জন্মের সাধ মিটেছে। ওকে চিরদিন দেখ। আমার আজ অধঃপতন শেষ।'

তখন সন্ন্যাসী সেই উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। আঁধারে আর দেখা গেল না। প্রদূতলে সুবর্ণরেখা বর্ষার নূতন জল লইয়া গর্জ্জন করিতেছিল। সন্ন্যাসীর দেহ তাহাতে মিশিয়া গেল। মন্দুরা বিরণকে বুকে করিয়া সেই পর্ব্বতশিখরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গৌড়-প্রসঙ্গ।

"গৌড়" এই নাম কত পুরাতন, তাহা ঠিক জানা যায় না; তবে, সুপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে, বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে "গৌড়" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;—

অরিষ্ট-গৌড়-পূর্ব্বে চ।৩।২।১০০ (১)

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই সূত্রের ভাষ্য করেন নাই। ভট্টোজী

(১) এটী অন্তপ্রক্রিয়ার সূত্র। ইহার অর্থ ও উদাহরণ;—"পূরে পয়ে অরিষ্টগৌড়পূর্ব্ব-সমাসে পূর্ব্বমন্তোদাত্তম্। অরিষ্টপূরম্। গৌড়পূরম্।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

"অরিষ্ট গৌড় ইত্যেবংপূর্ব্বে সমাসে পূরশব্দ উত্তরপদে পূর্ব্বপদমন্তোদাত্তং ভবতি। অরিষ্ট-পূরম্। গৌড়পূরম্।"—কাশিকা।

দীক্ষিতের "গৌড় মনোরমা" গ্রন্থেও এই সূত্রটীর ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈয়াকরণ-কেশরী হরদত্ত মিশ্র "পদমঞ্জরী" গ্রন্থে, এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত নাগেশ ভট্ট "শব্দেন্দুশেখরে" এই সূত্রটীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু "গৌড়" শব্দের এখানে কি অর্থ, সে বিষয়ে কোনও আলোচনা করেন নাই। "গৌড়" শব্দের অর্থ সর্ব্ব-জন-বিদিত, ইহা মনে করিয়াই এই দুই জন বিখ্যাত পণ্ডিত সে বিষয়ে কিছু লেখা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। "গৌড়" শব্দের অর্থ দেশ-বিশেষ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ প্রসিদ্ধ নাই। পাণিনির সূত্রেও এই প্রসিদ্ধার্থক "গৌড়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এই গৌড় দেশ কোথায়, বোধ হয়, এ কথা কোনও বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। সেদিনও বঙ্গের কলকণ্ঠ কোকিল মাইকেল গাহিয়া গিয়াছেন,—

"বিরচিব মধুচক্র 'গৌড়'জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গভূমিই গৌড় দেশ—ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু শুনিতেছি ইহার বিরোধী একটী মত প্রচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি কাশীর "চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা"য় (Chawkhambha Sanskrit Series) কবিতার্কিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" "বিদ্যাসাগরী" টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিত হইয়াছে যে, "বঙ্গদেশকে গৌড় দেশ বলিয়া কোনও প্রামাণিক পণ্ডিতই উল্লেখ করেন নাই।" (২) যাঁহারা এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সুপণ্ডিত হইলেও, তাঁহাদের কথা আদরণীয় হইতে পারে না; গৌড় দেশের বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা না করায়, এই গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয়েরা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

১। রাঢ় দেশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত। ইহার সংস্কৃত নাম, রাঢ়া। এই রাঢ়া, বা রাঢ় দেশ গৌড় দেশের অন্তর্গত, ইহা "কৃষ্ণমিশ্র-যতি"-প্রণীত "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটকের অহঙ্কারের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়;—

'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"—দ্বিতীয় অঙ্ক।

গৌড় রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, সেখানেও রাঢ় দেশ উপমা-রহিত।

---

(২) "গৌড়দেশস্তেন বঙ্গদেশস্য প্রামাণিকৈঃ কুত্রাপি পরিগণনং ন কৃতম্।"—চৌখাম্বার "খণ্ডনখাদ্য"-ভূমিকা—৫ পৃষ্ঠা।

২। বঙ্গদেশে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বংশে কুল্লূক ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কাশী-বাস-কালে "মন্বর্থমুক্তাবলী" নামে মনুসংহিতার এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকার উপক্রমে নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে কুল্লূক লিখিয়াছেন,—

"গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।"

গৌড় দেশে বরেন্দ্রীভূমিতে সুজনগণের বন্দনীয় নন্দনবাসি ("নান্নসী") নামক কুলে শ্রীমান্ দিবাকর ভট্টের তনয় কুল্লূক ভট্ট উৎপন্ন হইয়াছেন।

৩। কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে—একটী মন্দিরের পরেই—প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর একটী শিবালয় আছে। এই শিবালয়ের মধ্যে, প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের উপরিভাগে প্রস্তরফলকে বঙ্গাক্ষরে দুইটী শ্লোক লিখিত আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকটী এই,—

ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্রগৌড়ভূমীন্দ্রভাবিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্।"

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র গৌড় ভূমীশ্বরের ভাবিনী শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অনেকে এই শ্লোকের প্রথম চরণটী "ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্ররামকান্তস্য ভামিনী", এইরূপ পাঠ করেন; কাহারও মতে, ঐ অংশের পাঠ "বঙ্গভূমীন্দ্রবারেন্দ্ররামকান্তস্য ভামিনী", এইরূপ। কিন্তু এই দুইটী পাঠই কল্পিত। আমাদের উদ্ধৃত পাঠই কাশীর উক্ত ভবানীশ্বর-মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। বঙ্গের বিশ্ববিখ্যাত সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপের "কাণাভট্ট" শিরোমণি রঘুনাথ সম্বন্ধীয় একটী কবিতায় গৌড়ের উল্লেখ আছে।

অভাগ্যং গৌড়দেশস্য কাণো যত্র-শিরোমণিঃ।

গৌড় দেশ ভাগ্যহীন, কেন না, সেখানকার শিরোমণি কাণা।

এই কবিতাংশ আমরা কাশীতে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। ইহাতে নবদ্বীপকে গৌড় দেশের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

৫। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের সপ্তম পটলে বঙ্গদেশ ও গৌড়দেশ নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত হইয়াছে।

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে। "বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥" গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥"

সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত স্থানের নাম বঙ্গদেশ; এই দেশ সমস্ত সিদ্ধির প্রদর্শক। বঙ্গদেশের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড় দেশ নামে খ্যাত। এই গৌড় দেশ সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ।

যদিও এই শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে বঙ্গদেশ ও গৌড়দেশ বিভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথাপি এই দুইটীই এখন বর্ত্তমান বঙ্গের অন্তর্গত। এই দুইটী দেশ পরস্পর সন্নিহিত হওয়ায়, এবং অনেক সময়ে একই রাজার অধীন শাসিত হওয়ায়, অনেক স্থলে কেবল "বঙ্গদেশ" অথবা কেবল "গৌড়দেশ" বলিয়া দুইটী দেশই উল্লিখিত করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

তাম্রশাসনে বহু স্থলে বঙ্গদেশকে গৌড় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা তাম্রশাসন ব্যতিরিক্ত অন্য স্থলে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহারই উল্লেখ করিলাম।

আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিতে লিখিত আছে—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা গৌড়মৈথিলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

সারস্বত (৩), কান্যকুব্জ, উৎকল, গৌড়, এবং মৈথিল, বিন্ধ্যাগিরির উত্তরদেশবাসী এই সকল ব্রাহ্মণ "পঞ্চ গৌড়" নামে বিখ্যাত।

বল্লাল চরিতে বিন্ধ্যের দক্ষিণদেশবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ "পঞ্চদ্রাবিড়" নামে অভিহিত হইয়াছেন। আনন্দভট্ট-প্রণীত "বল্লালচরিত" বঙ্গদেশের রাজা বল্লাল সেনের জীবনচরিত। এই গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণ সন্দিহান ছিলেন। এই জন্য এই গ্রন্থের উপর তত দূর নির্ভর করা যায় না। পরন্তু "পঞ্চ গৌড়" ও "পঞ্চ দ্রাবিড়" এইরূপ বিভাগ অমূলক নহে। বর্ত্তমান সময়েও কাশীতে এইরূপ বিভাগের কথা শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চ গৌড়ে"র অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হন। বোধ হয়, উত্তরাপথে বিশেষ বিশেষ সময়ে গৌড়ের অধিক প্রাধান্য ছিল, এই কারণে সমগ্র উত্তরাপথের ব্রাহ্মণগণ "গৌড়" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। এইরূপ দাক্ষিণাত্যেও দ্রাবিড়ের প্রাধান্যবশতঃ সকল ব্রাহ্মণকেই "পঞ্চদ্রাবিড়ে"র অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। উত্তর-ভারতে মারোয়াড়ী ব্রাহ্মণগণই "গৌড় ব্রাহ্মণ" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ "গৌড় ব্রাহ্মণ"

(৩) কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও পঞ্জাবের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সারস্বত ব্রাহ্মণের অন্তর্গত।

নামে প্রসিদ্ধ নহেন। কাশীতে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, যেমন বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর এক সময়ে যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে গৌড়ে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজপুতানা-অম্বরের কোনও রাজা তান্ত্রিক শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইবার অভিপ্রায়ে গৌড় হইতে ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহূত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ "গৌড় ব্রাহ্মণ" নামে বিখ্যাত। কয়েক জন সুপণ্ডিত গৌড়-ব্রাহ্মণের নিকটও আমরা এ কথা শুনিয়াছি। বঙ্গদেশে বহু কাল হইতে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রচার; বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রোক্ত শান্তিস্বস্ত্যয়নে সুনিপুণ, এখনও এ কথা অন্য দেশের লোকের নিকট সুবিশ্রুত। কাজেই এই রূপ কারণে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের [illegible] আদর, একেবারে অসম্ভব নহে। বিদেশেই দেশের নামে পরিচয় দিতে [illegible] বাটীতে অথবা অন্য দেশে বাঙ্গালী-দিগকে "আমরা বাঙ্গালী" বলিয়া [illegible] নিজের দেশে বা গ্রামে এরূপ পরিচয়ের প্রয়োজন [illegible]। পূর্ব্বোক্ত সকল গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য রাজপুতা[illegible] গমন, তাঁহারা বিদেশে স্বদেশ "গৌড়ে"র নামে [illegible] তাঁহারা ক্রমে "গৌড়-ব্রাহ্মণ" নামে [illegible] হইতে পারে।

দক্ষিণাপথবাসী [illegible] নামক অলঙ্কার গ্রন্থে গৌড়ী ও বৈদর্ভী [illegible] বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা-প্রসঙ্গে দণ্ডী এক স্থানে "গৌড়ী" রীতিকে পূর্ব্বদেশীয় রচনাপদ্ধতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৪]। [illegible] গৌড়দেশীয়গণকে পূর্ব্ব-দেশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ [illegible] বুঝিতে পারা যায়, আচার্য্য দণ্ডী পূর্ব্ব-[illegible] গৌড় বলিয়া জানিতেন। পূর্ব্বোক্ত কারণেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ গৌড় ব্রাহ্মণ রূপে প্রসিদ্ধি হইয়াছে, ইহা আচার্য্য দণ্ডীর উক্ত উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। "গৌড়-ব্রাহ্মণ" এই নামমাত্র দেখিয়া বঙ্গের বাহিরে একটী গৌড় দেশের কল্পনা করিলে, আচার্য্য দণ্ডীর উক্তি অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে।

এখানে "গৌড়" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, বোধ হয়, অনুচিত হইবে না। এই দেশে অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হয়, এই জন্য 'গুড়ের

(৪) "গৌরবাদ্যা কাব্যপদ্ধতিঃ"—১ম পরিচ্ছেদ, ৫০ শ্লোক।

(৫) "ইতি কাব্যেঽপি গৌরবাদ্যা বহুস্ত্যোজস্বিনীর্গিরঃ।"—১ম পরিচ্ছেদ, ৮৩ শ্লোক।

দেশ' এই অর্থে 'গৌড়' এই রূপ নাম হইয়াছে। (৬) পূর্ব্বে আমরা পাণিনির যে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সূত্রের উদাহরণ "গৌড়পুর" এইরূপ হইবে। কাশিকা ও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই উদাহরণই দেওয়া হইয়াছে। "গৌড়পুর" এই শব্দটীতে "গৌড়" শব্দের অন্তোদাত্ততা-বিধানের জন্য পাণিনি সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, পাণিনির সময়ে "গৌড়পুর" শব্দটী প্রসিদ্ধ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় নগরের নামের শেষে "পুর" শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "গৌড়পুর" এই নাম গৌড় দেশের নগরেরই হওয়া সম্ভব, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এখন মালদহ জেলায় গৌড়ের যে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ "গৌড়" কি প্রাচীন সময়ে, অন্ততঃ পাণিনির আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত,—"গৌড়পুর" নামে বিখ্যাত ছিল? 'পুর' শব্দ অনেক নগরেরই নামের অন্তে সংযুক্ত ছিল এই জন্য 'গৌড়' শব্দটীই নগরের বিশেষত্বজ্ঞাপক; সংক্ষেপে উচ্চারণের অনুরোধে, কেবল "গৌড়" শব্দই প্রযুক্ত করা হইত; এই রূপে পরবর্ত্তী কালে নগরের নাম কেবল "গৌড়"রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে উচ্চারণ করিবার জন্য আধুনিক নামগুলিও অনেক সময়ে অসম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায়ও এ রীতি অপ্রচলিত ছিল না। নামের এক দেশের দ্বারাও সমগ্র-নাম-বোধ্য অভিপ্রেত বস্তুর বোধ হইয়া থাকে, ইহা মল্লিনাথ কিরাতার্জ্জুনীয়ের টীকায় লিখিয়াছেন। তিনি প্রমাণরূপে "নামৈকদেশগ্রহণে নামগ্রহণম্" এই ন্যায়টীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৭) কাশিকা-কার লিখিয়াছেন,—প্রত্যয় না হইলেও, পূর্ব্ব পদ এবং উত্তর পদের বিকল্পে লোপ হইয়া থাকে। যেমন, দেবদত্ত এই স্থলে দেব ও দত্ত, এই উভয়েরই পর্য্যায়ক্রমে লোপ হইয়া, কেবল "দেব" অথবা কেবল "দত্ত" এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। (৮) ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই কাত্যায়ন-বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, পতঞ্জলি এইরূপ এক দেশের প্রয়োগের যথা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (৯) সেই স্থলে কৈয়টোপাধ্যায়-প্রণীত

(৬) গুড়স্য অয়ং দেশঃ গৌড়ঃ। গুড়+অণ্=গৌড়ঃ। "তস্যেদম্"। অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।১২০।

(৭) কিরাতার্জ্জুনীয়, ১৫ সর্গ, ২৪ শ্লোক।

(৮) বিনাপি প্রত্যয়েন পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্বিভাষা লোপো বক্তব্যঃ। দেবঃ দত্তঃ দেব ইতি বা। কাশিকা; ৫।৩।৮৩।

(৯) অথবা পূর্ব্বপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। সত্যেনসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্বদর্থা দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি। মহাভাষ্য; ১।১।১ স্থাঃ।

মহাভাষ্য-প্রদীপে এই কথাই সমালোচিত হইয়াছে। (১০) মহাভাষ্যের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় আহ্নিকে ভগবান্ পতঞ্জলি এইরূপ স্থলে—প্রত্যয় না হইলেও পূর্ব্ব এবং উত্তর পদের বিকল্পে লোপের বিধান করিয়াছেন; মহাভাষ্য-প্রদীপে এই ভাষ্যপংক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১১) অতএব "গৌড়পুর" এই নামই পরিবর্ত্তিত হইয়া, কালে কেবল "গৌড়" রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

এই গৌড় দেশের জনসাধারণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা "গৌড়ী" প্রাকৃত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বররুচির "প্রাকৃত-প্রকাশে" "গৌড়ী" প্রাকৃতের উল্লেখ নাই। আচার্য্য দণ্ডী কাব্যাদর্শে "গৌড়ী" প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। (১২)

সংস্কৃত কবিতার রচনাপদ্ধতিকে "রীতি" বলে। (১৩) বামনের মতে, এই রীতি তিন প্রকার, বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া বা গৌড়ী, এবং পাঞ্চালী। (১৪) সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ চারি প্রকার রীতি স্বীকার করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে লাটীও একটী স্বতন্ত্র রীতি। (১৫) বাগ্‌ভটালঙ্কার ও সরস্বতী-

(১০) অপরেতি। কথং পুনর্দেবদত্তশব্দে সংজ্ঞাশব্দেন বিনিযুজ্যে একদেশঃ প্রযুজ্যতে। ন হাসৌ সংজ্ঞাশব্দেন বিনিযুক্তঃ। নচৈকদেশশ্চ সমুদায়স্য বাচকত্বমুপপদ্যতে। প্রতীয়মানস্য প্রত্যয়কত্বাসম্ভবাদ্ভূচ্ছার্য্যমাণস্যৈব বাচকত্বাৎ। এবং তর্হি মনুনিপাদিন্যোঽবয়বসমুদায়সংজ্ঞাবিনিয়োগকালে বিনিযুক্তা এব। লোপস্তু বর্ণানাং সাধুত্বং মাভূদিত্যস্যাপ্রায়তে।—কৈয়ট।

(১১) অপ্রত্যয়ে তথৈষেষ্টঃ॥ দেবদত্তো দত্তঃ॥ মহাভাষ্য অপ্রত্যয় ইতি। প্রত্যয়াভাবেঽপি পূর্ব্বোত্তরপদয়োরন্যতরস্য বা লোপ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে তু পূর্ব্বপদলোপ উদাহরণমাত্রম্।—কৈয়ট।

(১২) শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্ ঃ—১ম পরিচ্ছেদ, ৩৫ শ্লোক।

(১৩) বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। ৭—৮ সূত্র, প্রথমাধিকরণ, ২য় অধ্যায়,—কাব্যালঙ্কারসূত্র।

বৈদর্ভাদিকৃতঃ পন্থাঃ কাব্যে মার্গ ইতি স্মৃতঃ।
রীঙ্ গতাবিতি ধাতোঃ সা ব্যুৎপত্ত্যা রীতিরুচ্যতে॥ ২৭। ২য় পরিচ্ছেদ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ।

(১৪) সা ত্রিধা। ৯। সা চেয়ং রীতিস্ত্রিধা ভিদ্যতে বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চেতি। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি—১ম অধিকরণ, ২য় পরিচ্ছেদ।

(১৫) পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ। উপকর্ত্রী রসাদীনাং সা পুনঃ স্যাচ্চতুর্বিধা॥ বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা॥ ১—২। সাহিত্যদর্পণ, ৯ম পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠাভরণে ছয় প্রকার রীতি স্বীকৃত হইয়াছে। (১৬) সকলেই গৌড়ী রীতি স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য দণ্ডী নিজে দাক্ষিণাত্য; তিনি স্বদেশীয় বৈদর্ভী রীতিকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্য রীতির সহিত বৈদর্ভী রীতির তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই; একমাত্র গৌড়ী রীতির সহিতই বৈদর্ভী রীতির তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। (১৭) ইহা দ্বারা অন্য রীতি অপেক্ষা গৌড়ী রীতির প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধি সূচিত হইতেছে। প্রাচীন কালে গৌড়ী রীতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা আমরা বাণভট্টের রচনা হইতেও বুঝিতে পারি। বাণভট্টের রচনাপদ্ধতির পর্য্যালোচনা করিলে, তিনি কাশ্মীরী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের গৌড় দেশে মৃত্যু হইয়াছিল। বাণভট্ট লিখিয়াছেন,—গৌড়াধিপ স্বগৃহে নিরস্ত্র অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে বধ করিয়াছিলেন। (১৮) এই কারণে গৌড় দেশের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল না। তাই তিনি হর্ষচরিতের প্রারম্ভে বিভিন্ন দেশের রচনাপদ্ধতির উল্লেখ-প্রসঙ্গে গৌড়দেশীয় রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥—প্রথম উচ্ছ্বাস—৭ শ্লোক।

গৌড়দেশীয় রচনাপদ্ধতিতে অক্ষরের অর্থাৎ শব্দের আড়ম্বর আছে। "অক্ষর-ডম্বরঃ" এই কথাটুকু ছোট হইলেও, ইহার মধ্যেই তীব্র অনাদরের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।—কেবল অক্ষরের আড়ম্বরই আছে, অর্থগৌরব বা অলঙ্কার, কিছুই নাই। দণ্ডীও গৌড়ীয় রীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। অন্য-দেশীয় অভিমানী লেখকেরা অবসরমত গৌড়ী রীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও, গৌড়দেশীয় কোনও লেখক অন্য দেশীয় রচনাপদ্ধতির প্রতি কোনরূপ অনুচিত উক্তি করিয়াছেন, এরূপ আমরা জানি না। ইহা গৌড়দেশীর লেখক-গণের প্রশংসার কথা, সন্দেহ নাই।

কাব্যপ্রকাশ-কার মম্মট-ভট্টের মতে রীতি ত্রিবিধ। কিন্তু তিনি ইহার নাম

(১৬) বৈদর্ভী সাধু পাঞ্চালী গৌড়ীয়াবন্তিকা তথা।
লাটীয়া মাগধী চেতি ষোঢ়া রীতির্নিগদ্যতে॥ ২৮
সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ২য় পরিচ্ছেদ, বাগভট্টালঙ্কারের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১৭) কাব্যাদর্শ—প্রথম পরিচ্ছেদ—৪০—১০১ শ্লোক।

(১৮) ...তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাস-মুক্তস্বস্ত্রমেকাকিনং বিস্রব্ধং স্বগৃহগত এব ভ্রাতরং রাজ্যাপিতমশ্রৌষীৎ॥ হর্ষচরিত—ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

"রীতি" স্থলে "বৃত্তি" রাখিয়াছেন। বামন যাহাকে 'বৈদর্ভী রীতি' বলিয়াছেন, রুদ্রট তাহাকে "উপনাগরিকা বৃত্তি" বলিয়াছেন; বামনের "গৌড়ী রীতি" কাব্যপ্রকাশে "পরুষা বৃত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছে। "পাঞ্চালী রীতি" কাব্যপ্রকাশে "কোমলা বৃত্তি" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, এই কোমলা বৃত্তির নাম "গ্রাম্যা বৃত্তি"। কাব্যপ্রকাশের নবম উল্লাসে ৮০—৮১ কারিকায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই কাব্যপ্রকাশেও গৌড়ী রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই; ইহার নামান্তর কল্পিত হইয়াছে, এইমাত্র।

যদিও কোনও কোনও লেখক গৌড়ীয় রচনাপদ্ধতির নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তথাপি নিরপেক্ষ আলঙ্কারিকগণ গৌড়ী রীতির উপযোগিতা সুস্পষ্ট-ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের বিখ্যাত টীকাকার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নাগেশ ভট্ট দাক্ষিণাত্যদেশীয় ছিলেন। তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রেও একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই নাগেশ ভট্ট কাব্যপ্রকাশের টীকা কাব্যপ্রদীপের কাব্যপ্রদীপোদ্যোত নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই কাব্য-প্রদীপোদ্যোত গ্রন্থে প্রসাদ ও ওজোগুণের অভিব্যঞ্জক বর্ণযুক্ত রচনাপদ্ধতিকে "গৌড়ী" বলা হইয়াছে। (১৯) এই গ্রন্থের মতে, গৌড়ী রীতি রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রসের উপযোগিনী। (২০) গৌড়ী রীতি রৌদ্র ও বীর রসের উপযোগিনী, ইহা বাগ্‌ভটালঙ্কারেও স্বীকৃত হইয়াছে। (২১) অন্য একটী আলঙ্কারিক-কারিকাতেও গৌড়ী রীতি রৌদ্ররসের উপযোগিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (২২)

গৌড়ী রীতি শৃঙ্গার রসেরও উপযোগিনী। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী গৌড়ী রীতিতেই লিখিত। এই গীতগোবিন্দের পদলালিত্যে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ চিরমুগ্ধ। সম্প্রতি প্রতীচ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের হৃদয়ও জয়দেবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ম্যাকডনেল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দকেই সংস্কৃত ভাষার রচনামাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুত

(১৯) প্রসাদৌজোব্যঞ্জকবর্ণবতী গৌড়ী—৮ম উল্লাস, ৩৭ কারিকাব্যাখ্যা।

(২০) এষা গৌড়ী রীতী রৌদ্রবীরবীভৎসেষু—" ৭৫ কারিকাব্যাখ্যা।

(২১) "গৌড়ী বীররসে চ রৌদ্ররসয়ে"—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(২২)—"গৌড়ীং রৌদ্রে কুর্য্যাদ্ যথা যথৌচিতং সুকবিঃ।"

৮ম উল্লাসের ৭৪ কারিকাব্যাখ্যায় কাব্যপ্রদীপোদ্যোতে উদ্ধৃত কারিকা।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মতে, কালিদাসও গৌড়ী রীতির অনুসরণ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন; ভবভূতির কবিতাও গৌড়ী রীতিতে রচিত। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার গৌড়ী রীতিতে রচিত হইয়াছে। যেখানেই রচনাকে সতেজ ও সুন্দর করিবার প্রয়োজন, সেই স্থলেই সর্ব্বদেশীয় কবিগণ গৌড়ী রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত তাম্রশাসন-রচনাতেই গৌড়ী রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। নেপালের রচিত প্রাচীন কবিতাতেও গৌড়ী রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। "পুরশ্চর্য্যার্ণব" নামক নেপালে রচিত প্রাচীন গ্রন্থের প্রারম্ভের হৃদয়গ্রাহিনী কবিতাগুলি গৌড়ী রীতিতেই রচিত। কাশীর বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কমলাকর ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কমলাকর ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গাগা ভট্ট নামে প্রসিদ্ধ বিশ্বেশ্বর ভট্ট বারাণসী ধামে ছত্রপতি শিবাজীর অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ভট্টবংশ কাশীতে অতিশয় সম্মানিত। এখনও কাশীতে অধ্যাপক-বিদায় হইলে প্রথমে ভট্টবংশের পূজা হইয়া থাকে। কমলাকর ভট্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে "নির্ণয়সিন্ধু" নামে এক নিবন্ধ রচনা করেন। নির্ণয়সিন্ধু-রচনায় রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের সহায়তা গৃহীত হইয়াছিল, ইহা গ্রন্থের উপক্রমে লিখিত আলোচ্য তত্ত্বমথ তীর্থকৃতাং পরেবাম্" এই শ্লোকাংশ হইতে জানিতে পারা যায়। এই নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে স্থলবিশেষে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের অভিমতের উল্লেখ-প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ "গৌড়" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (২৩) বঙ্গের বাহিরে কাশী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে প্রধানতঃ এই নির্ণয়সিন্ধুর মতানুসারেই সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

---

(২৩) যথা দুর্গোৎসবপ্রকরণে—

"কেশসংস্কারভ্রম্যাদি প্রদদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে। পক্ষতেয়োঃ দ্বিতীয়ায়াং কেশসংস্কারভেদবে॥ পট্টসোরমিতি গৌড়পাঠঃ।"

"তত্রাপি ঘটিকাতো ন্যূনত্বে পরা ন গ্রাহ্যা। ব্রতোপবাসনিয়মে ঘটিকৈকাপি যা ভবেদিতি দেবলোক্তেরিতি গৌড়াঃ। সাধিপাত্যাশ্চ পূর্ব্বগুচনমদৃষ্ট্বা দ্বিগুণব্যাপ্যাং পূর্ব্বাং কুর্য্যুরিত্যাহুঃ।

"নন্দিকা প্রতিপত্তিথিরিতি মৈথিলাঃ ষষ্ঠীতি গৌড়াঃ।

"কেচিৎ তু মুহূর্ত্তমাত্রেতি বচনাত্তদো ন্যূনত্বে পরা নেত্যাহুঃ। গৌড়া অপ্যেবমন্ত" ইত্যাদি।

হৃদয়-শ্মশান।

ঘ

[পারিজাতের কথা।]

১

ঘটনাচক্রে সত্য যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে সত্য প্রতিপন্ন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সুতরাং আমি যদি আজ বলি, পতির প্রতি প্রেমের প্রাবল্যই আমার ভগিনী পারুলের সকল দুঃখের কারণ—তবে অনেকে হয় ত সে কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। আমি কিন্তু জানি, তাহাই সত্য; এবং সে কথা আমি যেমন জানি, তেমন আর কেহ জানে কি না সন্দেহ।

কিন্তু প্রেমের যে উদারতা প্রেমাস্পদের সব ত্রুটীও অবহেলা করিতে পারে, যাহাতে পত্নীকে আপনার সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া—মান অপমান অবহেলা করিয়া পতির সুখবিধানেই জীবন উৎসৃষ্ট করিতে শিখায়—পারুলের প্রেমে সে উদারতার অভাব ছিল। তাহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, সন্দেহ; দ্বিতীয়, স্বামীকে একান্তই আপনার পাইবার অধিকার-সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস। এই দুইটি কারণ পরস্পরকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এই যে সন্দেহ ইহা আমাদের বংশানুক্রমে লব্ধ—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রকৃতিতে বিজড়িত। আমার মা ইহা তাঁহার মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে পাইয়াছিলাম। আমাদের মাতামহ বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন—অসামান্যা সুন্দরী পত্নীর সৌন্দর্য্য ও চিত্তরঞ্জন ব্যবহারও তাঁহাকে গৃহেই আকর্ষণকেন্দ্র রচনা করাইতে পারে নাই। তাঁহার সেই দৌর্ব্বল্যের জন্য নাতিনদীর যে সন্দেহসঞ্জাত শঙ্কা ছিল তাহাই আমাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ। আমার বাবা ব্যবসা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহার প্রতি মার সন্দেহের কারণ বড় ঘটিত না; ঘটিলেও বাবা সে দিকে দৃষ্টি দিতেন না—তাহা আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। তাই মার পক্ষে তাহা অসুখের কারণ হয় নাই। আমার স্বামী আমার এই দৌর্ব্বল্যটুকু একান্তই "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" হিসাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বন্যায় ভাসাইয়া দেন। কিন্তু পারুলের ভাগ্যে তাহা হয় নাই। বিন্দুমাধব অন্য কাজে ব্যস্ত না থাকায় তাহার এই দৌর্ব্বল্যটুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিত এবং তাহার প্রতি অকারণ সন্দেহে ব্যথিত হইত। ফলে পারুলের যে মান রসবেগের বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারিত তাহা অপসৃত হইতে না পারিয়া গুমট সৃষ্টি করিত; স্ত্রীর মান

স্বামী অপমান মনে করিলে যাহা হয়, তাহাই হইত, দুই জনেরই মন ভার হইয়া থাকিত।

তাহার পর স্বামীকে একান্ত তাহারই পাইবার অধিকার-সম্বন্ধে তাহার ধারণার কথা বলিব। প্রথম প্রণয়-বিকাশ-কালে, নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রেমাকুলতার সময় সকল স্ত্রীই মনে করে, স্বামী একান্ত তাহারই। যাহার জন্য সে পরিচিত পুরাতন ত্যাগ করিয়াছে—যাহার প্রতি প্রেমের প্রগাঢ়তায় সে পিতামাতাকেও পর ভাবিয়াছে—যে স্বামী তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব, বুঝি পরকালেরও সম্বল, যে স্বামী একাধারে সখা ও দেবতা, যে স্বামীর সামান্য সুখের জন্য সে সর্ব্বস্ব দিতে পারে, সেই স্বামী তাহারই। স্বামীর যে জীবনে ও সংসারে আরও আকর্ষণ থাকে; স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য যে স্বামীর আরও বহু কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম, তাহা বুঝিতে স্ত্রীর বিলম্ব হয়। প্রথমে তাহা বুঝিতে অস্বীকার করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; তাহাই প্রেমের পরিচায়ক। এই যে ভাব, পারুলের পক্ষে ইহাও প্রবল হইবার বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বাবা বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতাইয়াছিলেন। সে সংসারে বাবা আর না। কাজেই সংসারে আরও দশ জনের প্রতি পুরুষের কত কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, বৃহৎ সংসারে আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক সময় অবহেলা না করিলে যে সংসারের যন্ত্র অবাধে চলিতে পারে না, এ সব বুঝিবার সুযোগ আমরা বাল্যকালে—পিতৃগৃহে পাই নাই। সে হিসাবে আমাদের শিক্ষারই দোষ ছিল। শেষে সংসারের যে অভিজ্ঞতায় সে ত্রুটী সংশোধিত হয়, পারুল সে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই তাহাদের স্বামিস্ত্রীতে মনোমালিন্যে তাহার হৃদয় এমনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে অভিজ্ঞতার শিক্ষার প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। যে নম্রতায় শিক্ষার পথ সুগম হয়, সে নম্রতা সে পরিহার করিয়াছিল। তাহার অভিমান আপনার প্রতি অবহেলা মনে করিয়া বিরুদ্ধাচরণ ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহাকে সে শিক্ষা দেয় নাই। তাহার শাশুড়ীর ত সে শিক্ষা দিবার যোগ্যতাই ছিল না। এক জন তাহাকে সে শিক্ষা দিতে পারিতেন, দিতেও ছিলেন। তিনি তাহার দিদিশাশুড়ী। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষালাভের সুযোগ হইতেও পারুলকে রক্ষিত করিয়াছিল। সে তাহার ভাগ্য-দোষ। দ্বিতীয়তঃ—সে খানিকটা লিখাপড়া শিখিয়াছিল এবং শত শত উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল। সেই সব উপন্যাসের অসম্ভব আদর্শের তুলাটিকায় সে বাস্তবকে বিকৃত দেখিত; সে মনে করিত, যে প্রেম

তাহার অভিজাত আদর্শের অনুরূপ নহে, তাহা প্রেমই নহে। বিন্দুমাধবের সঙ্গে তাহার মনান্তরের কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি যখনই ইঙ্গিত করিয়াছি, এখানে কাজটা নন্দন নহে—এখানে সবই মনের মত হয় না। যাহা পাই তাহাতেই সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিতে হয়। তখনই সে বলিয়াছে, "দিদি, ও বিষয়ে তোমার কথা আমি কোনও কালে এক মত হইতে পারিব না। সিবতাতে গোঁজামিল চলে, স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধে চলে না।" এ বিষয়ে তাহাকে বুঝান আমার সাধ্যাতীত ছিল।

বিবাহ বিষয়ক হয়, কথাটা সত্য কি না জানি না; তবে বিষে যে বিষের বৃদ্ধি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। বিন্দুমাধবও মনে করিত যে প্রেম তাহার দোষানুসন্ধান করে, এবং যে স্থানে তাহার কোনও অপরাধই নাই, সে স্থানেও দোষ কল্পনা করে, সে প্রেম প্রেমই নহে; সুতরাং তাহার প্রতিপালকের ব্যবহার প্রেমের অভাবই প্রকাশ করে। যে স্থানে ভোগ নাই, সে স্থানে প্রেমের ভাণ কেবল যন্ত্রণা; সুতরাং সে আপনাকে পারুলের জীবন হইতে যথাসম্ভব দূরে লইতেই চেষ্টা করিত।

শাশুড়ীর ব্যবহারে যত বিরক্তি ও বেদনা, পারুল সে সকলের জন্য বিন্দুমাধবের উপরই অভিমান করিত, এবং বিন্দুমাধব সে অভিমানকে অবহেলা করিত।

২

পারুলের শাশুড়ীর ব্যবহারে যে বেদনার কারণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বাঙ্গালা কথায় যাহাকে "ঘর পোড়ানী পর ভুলানী" বলি, তিনি সেই শ্রেণীর লোক। বাহিরের লোকের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার যেমন চমৎকার, ঘরের লোকের সঙ্গে তাঁহার তেমনই আপত্তিজনক। শাশুড়ী, যা, বহু, বাহিরের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেন নাই; বধূদ্বয়ের সঙ্গেও নহে। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে স্নেহ বেশ উপচিয়া পড়িত। পারুলের বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয়; সেই পরিচয়ের সূত্রেই বিন্দুমাধবের সঙ্গে পারুলের বিবাহ হয়। আমি তাঁহার এক মেয়ের সঙ্গে স্কুলে এক সঙ্গে পড়িতাম, স্কুলের গাড়ী আমাকে লইয়া তাহাকে লইতে যাইত, এবং তাহাকে নামাইয়া তবে আমাকে নামাইতে আসিত।

এক দিন নন্দা তাহাদের বাড়ীর দরজায় নামিয়া যাইবার পরই আর এক-খানা গাড়ীর সঙ্গে আমাদের স্কুলের গাড়ীর ধাক্কা লাগিল, একখানা চাকা

ভাঙ্গিয়া গেল। স্কুলের গাড়ীর ঘোড়াটা অত্যন্ত বৃদ্ধ, নহিলে একটা বিভ্রাট ঘটিত। কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নামিয়া পড়িতে হইল। সহিস ভাঙ্গা গাড়ী আনিতে গেল, আমরা কয়টি মেয়ে নর্ম্মদাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ীর লোকরা আদর করিয়া আমাদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং জলযোগ না করাইয়া ঘাড়ী ফিরিতে দিলেন না। সে দিন বিন্দুমাধবের পিতামহীর ও জ্যেঠাইমার আদর যত্নে আমরা এক দিনেই যেন তাঁহাদের আপনার হইয়া গেলাম। ঠাকুরমা আমাকে বিশেষ আদর করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "যেন ঘর আলোকরা মেয়ে।"

নর্ম্মদা তাহার মার বড় আদরের মেয়ে; তাহার "বন্ধু" বলিয়া তাহার মাতা আমাকেও স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন—নর্ম্মদা আমাদের বাড়ী যাইতে লাগিল; ও আমি তাহাদের বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিলাম। নর্ম্মদার অন্যায় আব্দার-গুলিও তাহার মা সহ্য করিতেন, যখন তখন সে আমাকে যেরূপ মূল্যবান উপহার দিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে বাবা একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "এ সব বাড়াবাড়ি কেন?" কিন্তু চক্ষুলজ্জার তিনি আপত্তি স্পষ্ট করিয়া জানাইতে পারিলেন না। মা বলিলেন, "আর কয় দিনই বা, দুই জনেরই বিবাহের বয়স হইল। তাহার পর কে কোথায় থাকিবে!" বাল্যসঙ্গীদিগের বিস্মৃত কথা স্মরণ করিয়া মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু আমাদের বিবাহের পরও সে ঘনিষ্ঠতার অবসান হইল না। আমার শ্বশুরবাড়ী পাড়াতেই হইল—নর্ম্মদা প্রায়ই বাপের বাড়ী আসিত ও থাকিত। কাজেই আমাদের উভয়ে প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত।

এই সময় বিন্দুমাধবের বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল। রূপবান, ধনশালী, বিদ্বান যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে অনেক মেয়ের বাপই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু নর্ম্মদা করিয়া বসিল, আমার ভগিনীর সঙ্গে বিবাহ দিতেই হইবে। নর্ম্মদার মতেই তাহার মাতার মত। ঠাকুরমা প্রস্তাব শুনিবা মাত্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কেন না তিনি "গোঁয়ার" (তিনি বলিতেন গোঁরো) বড় পছন্দ করিতেন ছিলেন—বলিতেন, "মোটা কাপড়ের মেকড়াও ভাল।"

ছেলের পক্ষ হইতেই যখন প্রস্তাব আসিল, তখন তাহাতে আর কথা কি? বাবা ও মা উভয়েই সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। কেবল বাবার এক মাসীমাকে বলিলেন—"বৌ, কুটুম্বিতায় কিন্তু সুখ হইবে না।" মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" তিনি বলিলেন, "তোমার বেহাইনের মুখে হাসি নাই।

যে লোক হাসে না, তাহার মন ভাল হয় না।" মাসীমার কথা শুনিয়া মা হাসিলেন, সে কথায় আর কেহ মন দিল না।

পারুলের সঙ্গে বিন্দুমাধবের বিবাহ হইয়া গেল।

৩

বাবার মাসীমার কথা কত সত্য তাহা আমরা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। যে-ঝি পারুলকে "ঘর করাইতে" গিয়াছিল, সে-ই আসিয়া মাকে বলিল, "সবই ভাল মা। কেবল তোমার বেহাইন বড় দেমাকে, আর চালচলন কথাবার্ত্তা ঠিক পুরুষ মানুষের মত।" মা বলিলেন, "তোর যেমন কথা!" সে বলিল, "তবে তাও বলি, মা, সে জন্য ভাবনা নাই—ঐ দিদিশাশুড়ী আছেন। নাতি নাতনী সাতবৌ নিয়ে যেন ষষ্ঠীবুড়ীর মত সদাই আনন্দে আছেন। মাটীর মানুষ, কিন্তু সংসারটি যেন হাতের ভেলোয় করে রেখেছেন।" তাহাই বটে। দিদিশাশুড়ীর স্নেহে ও যত্নে শাশুড়ীর ভাবের অভাবটা পারুল প্রথম প্রথম অনুভব করিতেই পারিত না।

কিন্তু অল্প দিনেই সেটা সপ্রকাশ হইল। প্রথম প্রেমের প্রবল আকর্ষণে তাহারা স্বামিস্ত্রী যতই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, ততই তাহাতে দিদিশাশুড়ীর আনন্দ আর শাশুড়ীর বিরক্তি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ছেলে পর হইয়া যাইতেছে, এইরূপ আশঙ্কায় বধূর প্রতি শাশুড়ীর বিরক্তি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। সে ছেলে স্বভাবতঃ বড় আপনার ছিল না, বড় ছেলের ব্যবহারের সঙ্গে যাহার ব্যবহারের তুলনা করিয়া তিনি বরাবরই তাহাকে একটু "পর" ভাবিতেন, সে ছেলে যে অতি সহজেই একেবারে পর হইয়া যাইতে পারে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কিন্তু সংসারে শাশুড়ীরই একাধিপত্য, বড় যা তাহার ছায়ার মত; তাই শাশুড়ীর বিরক্তি ব্যবহারে ও মনের ভাবেই ফুটিয়া উঠিত, আর কিছু করিতে পারিত না।

তবুও সেই ব্যবহার পারুলকে ব্যথিত করিত। আর তাহার ব্যথা অভিমানে রূপান্তরিত হইয়া স্বামীর উপরই পড়িত। স্বামী কেন তাহার প্রতীকার করেন না? প্রতীকারের পথ যে কত কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ তাহা সে বুঝিত না। সে যৌবনের দোষ—প্রেমের অবিচার—অনভিজ্ঞতার অপরাধ। কিন্তু সাধারণতঃ যুবক স্ত্রীর এই "অপরাধ" অপরাধ বলিয়া মনে করে না, তাহা অভিমানের নামে পরিচিত হয়, এবং প্রেমের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করে। অভাগিনী পারুলের ভাগ্যে কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। তাহার এই অভিমান, অকারণ কোপ বিন্দু-

মাধব অন্য ভাবে গ্রহণ করিল; সে ভাবিল তাহাকে সত্য সত্যই ভালবাসিতে পারুল তাহাতে ভুল বুঝিত না—প্রেমের অভাবজনিত তাচ্ছল্যেই পারুল তেমন করিতেছে। কোনও কোনও ফলের এক বিশ্বাদ কিন্তু শস্ত মধুর—যে তাহা ফেলিয়া দিয়া শস্য গ্রহণ করিতে না জানে, সে ফলটিকেই বিস্বাদ মনে করে। বিন্দুমাধবেরও তাহাই হইল। সেও অভিমান। কিন্তু সে বেদনে পারুলের অভিমানের মর্য্যাদা না বুঝিয়া তাহাকে অবহেলা মনে করিল, পারুলও তেমনই তাহার অভিমানের স্বরূপ না বুঝিয়া তাহা অপমান মনে করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল—কেন এমন হয়?

এ দিকে পারুলের ব্যবহারে বিন্দুমাধবের মনে সর্ব্ব বিষয়ে বিরক্তিভাব বদ্ধমূল হইতে লাগিল; জীবনে যেন তাহার আর কোনও আকর্ষণ রহিল না—আকাঙ্ক্ষার আর যেন কোনও উত্তেজনা রহিল না। সে ইচ্ছা করিলে ভাল চাকরী পাইতে পারিত—চেষ্টা করিলে আইনের পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিত; সে চাকরী লইল না—পরীক্ষায় সাফল্যলাভের চেষ্টা করিল না। ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইলেন তাহার মা—কারণ, তাঁহার খরচের হাতটা কিছু অতিরিক্ত দীর্ঘ; বিশেষ নর্ম্মদাকে সদরে ও গোপনে তিনি অনেক টাকা দিতেন, সেই সব টাকা সে বাপের বাড়ীতে খরচ করিত—মা ও মেয়ে উভয়েই বলিতেন—টাকা নর্ম্মদার শ্বশুর আর স্বামী দিয়া থাকেন। মার বিরক্তি কিন্তু বিদ্ধ করিতে লাগিল পারুলকে—কথার যন্ত্রণা তাহাকেই সহ্য করিতে হইত। সেই যন্ত্রণায় যে কেবলই ভাবিত, পুরুষ মানুষের কাজে—অর্থোপার্জ্জনে—যশের জন্য আকাঙ্ক্ষায় এত অভাব কেন? হৃদয় মরু—অন্তঃসলিলা ফল্গুর ক্ষীণধারার মত কিছু নাই তা? সন্দেহের বীজ যদি একবার হৃদয়ে পতিত হইবার সুযোগ পায়, তবে সেটের উপর বটবৃক্ষের বীজের মত অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া আশ্রয়-স্থানটি শত মূলের বেষ্টনে বেষ্টিত করে। পারুলের তাহাই হইল।

এই সময় পারুলের অবস্থা দেখিয়া আমি এক দিন তাহার নিকেশ অবহেলা করিয়া বিন্দুমাধবের সঙ্গে তাহার পারিবারিক কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। মহিলাসমাজে হাস্যপরিহাস—এমন কি, অধিক রাত্রি বাহিরে বিন্দুমাধবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আলোকের এক ঝোপে বাহিরের শব্দ শুনিলে বিহগ যেমন ভীতিচকিত হইয়া ক্রত পলায়ন করে, আমার কথা আরম্ভ হইতেই সে তেমনই ভাব প্রকাশ করিল—বলিল, "দেখুন, পৃথিবীতে কতক গুলা

ব্যাপার নিতান্ত যাহার সে ছাড়া আর কেহ ঠিক বুঝে না। 'যেখানে অন্তের বেদনা ব্যথাও তথায়।' সে সব কথার আলোচনা কাহারও সঙ্গে করা যায় না।" আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

সে কথা যখন পারুলকে বলিলাম, তখন সে কাঁদিয়া ফেলিয়া, বলিল, "দিদি, তুমি কেন অপমানিত হইতে গেলে?" আমি বলিলাম, "ইহাতে অপমান কি?" উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! বিন্দুমাধবের স্বভাব বিবেচনা করিয়া সে কথায় বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না—আমি বলিলাম, "ইহা হইতেই পারে না।" তখন সে বলিল, সে বিন্দুমাধবকে স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য ও স্ত্রীলোককে উপহার দিবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছে! আবার তাহার বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে কারনিক্ষেপ করিবার জন্য বিন্দুমাধব বাছিয়া বাছিয়া তাহারই পছন্দমত জিনিস কিনিয়াছে। যে পাড়ের শাড়ী সে পছন্দ করে, যে লেসটি সে ভালবাসে, যে রকম চিঠির কাগজ সে ব্যবহার করে, যে গন্ধদ্রব্য তাহার প্রিয়, বিন্দুমাধব সেই সবই কিনিয়াছে। বিন্দুমাধব লুকাইবার চেষ্টা করিলেও সে সব পারুলের সন্দেহতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম—তবুও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পারুলকে বলিলাম, "হয় ত তুই ভুল দেখিয়াছিলি।" সে বলিল, "আপনার চোখকে অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া, দিদি?" তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া—যেন আপনার মনে বলিল, "যদি দেখিয়াও অবিশ্বাস করিতে পারিতাম!" এই কয়টি কথায় তাহার হৃদয়ের যে বেদনা আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। আমি তাহাকে আমার বক্ষে টানিয়া লইলাম। দুই ভগিনীতে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন অবস্থায় স্ত্রীলোকের আর কি সান্ত্বনা থাকিতে পারে?

৪

যখন এইরূপ অবস্থায় পারুল স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইল, মনে করিল—তাহার সুখের আশাদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে—তখন সে সংসারে জুড়াইবার একটু স্থানও পাইল না। সংসার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরমার মৃত্যুতে পারুলের পক্ষে স্নেহের আশ্রয় নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর জোঠাইমা চলিয়া গিয়াছিলেন। কাকীমা একটু জমাট তফাৎই থাকিতেন। শাশুড়ী তাহার উপর বিরক্ত। যা'র মনে যাহাই থাকুক, মুখে তিনি শাশুড়ীরই

আনুগত্য করিতেন। কারণ তাহার স্বামী সর্ব্বতোভাবে মার উপর নির্ভরশীল এবং শাশুড়ীর আনুগত্যে সুখ না থাকিলেও শান্তির উপায় ছিল। তবুও মানুষ স্নেহ ভালবাসার একটা অবলম্বন সন্ধান করে। তাই সে স্নেহে কন্যাকেই আঁকড়িয়া ধরিল। তাহার মধ্যে—হারাইবার আশঙ্কাটা প্রবল ছিল—তাই সে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে—পাছে হারায় এমনই ভাবে—কন্যাকে সর্ব্বদা আপনার কাছে রাখিত। তাহার এই "আধিক্যেতা"য় তাহার শাশুড়ী বলিতেন, তিনি কি বিন্দুমাধবের সৎ মা যে, তাহার মেয়ে তাঁহার কাছে আসিলে ছোট বৌ বিরক্ত হয়? তাহার সতর্কতার এই ব্যাখ্যায় পারুল ব্যথা পাইত; কিন্তু তেমন ব্যথার কারণ তাহার জীবনে এত ঘটিয়াছিল যে, সেটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত মনে করিত না। গুরুতর ব্যথার কারণ ঘটিল অন্য দিকে। তাহার স্নেহে বিন্দুমাধব অন্যরূপ উদ্দেশ্যের আরোপ করিত। সে মনে করিত, পাছে সে কন্যাকে লইয়া—কন্যাকে ভালবাসিয়া একটু সুখ পায়, সেই জন্য পারুল কিছুতেই মুরলাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাহার প্রতি শত্রুতা সাধিবার জন্যই পারুল তাহার কন্যাকে তাহার পর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই বিশ্বাসে বিন্দুমাধব যে বেদনা পাইত, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন পারুল তাহা বুঝিতে পারে নাই।

বিদ্যুতে বিদ্যুতের মত স্নেহে স্নেহ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পারুলের এমনই অদৃষ্ট যে, তাহার স্নেহে মুরলা যত আকৃষ্ট হইত, বিন্দুমাধবের স্নেহে তদপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইত। হয় ত বিন্দুমাধবের স্নেহ নিবিড়তর—কিন্তু সে বিচার কে করিতে পারে? পিতার স্নেহ—মাতার স্নেহ, কোন্‌টি বড়? এখন মনে হইতেছে মুরলার পিতৃভক্তি—সেও উত্তরাধিকারের ফল। যত দিন গিয়াছে, তত আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, বিন্দুমাধব যেমন তাহার পিতাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে—মুরলাও তেমনই বিন্দুমাধবকে দেবতা মনে করিয়াছে।

কন্যার প্রতি পারুলের স্নেহসতর্কতাই বোধ হয় বিন্দুমাধবকে শেষ ভুল করিতে উত্তেজিত করিল—গৃহত্যাগী করিল।

৫

সে দিন আমি বিন্দুমাধবের বাড়ীতে ছিলাম। আমি কলিকাতায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে তাহার মাতা আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি আমাকে যেমন যত্ন ও আদর দেখাইতেন, পারুলের তেমনই নিন্দা করিতেন। কিন্তু আমি

কখনও তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই—পাছে তিনি মনোমধ্যে অপমানিত মনে করেন, এবং পারুলের দিদির উপর বিরক্তি তাহাকে বহুক্ষণ ধরিয়া বিরূপ করে; আর সেই সময় আমরা দুই জন অনেক কথার আলোচনা করিতে পারিতাম। পারুলের কথা প্রায়ই দুঃখের কথা, কিন্তু সে কথা শুনিতে—তাহার সঙ্গে কাঁদিতেও যে সুখ। গৃহিণী আমাকে বলিতেন, "সোনার সংসারে ছাই হইয়া গেল। ছেলে ত সন্ন্যাসী। তুমি তোমার ভগিনীকে একটু ভাল উপদেশ দাও।"

সে দিন শুনিয়া শুনিলাম, বিন্দুমাধব চাকরী করিতে যাইতেছে। পারুলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "শুনিতেছি।" কি চাকরী, কোথায় চাকরী, সে কিছুই জানে না।

বিন্দুমাধব চলিয়া গেলে আমি ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "না হয়, আজ থাক। ছোট বৌমা ত একা থাকিবে। আমি বেহাইনকে খবর দিতেছি।" ছোট বৌমার প্রতি তাঁহার এইরূপ স্নেহপক্ষপাতে হাসি আসিল। কিন্তু আমি রহিয়া গেলাম।

রাত্রিকালে আমরা দুই ভগিনী আর মুরলা এক শয্যায় শয়ন করিলাম। বিন্দুমাধবের যাওয়া অবধি মুরলা কেবলই কাঁদিতেছিল। আমি তাহাকে ভুলাইয়া শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম; কিন্তু সে কিছুতেই শান্ত হইতেছিল না। পারুল বিরক্ত হইয়া বলিল, "মেয়ের সবতা'তেই বাড়াবাড়ি, চোখে একেবারে সাঁতার-পানি। যেন কাহারও কেহ কখন বিদেশে চাকরী করিতে যায় না!" আমি বুঝাইলাম, "আচ্ছা, আমরা কালই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিব। কেমন মুরলা?" মুরলা বলিল, "মাসীমা, বাবা আর ফিরিবেন না?" আমি বলিলাম, "ছিঃ! মা, অমন কথা বলিতে আছে?" সে বলিল, "বাবা আমাকে বলিয়াছেন। এই দেখ আলমারীর চাবি দিয়া গিয়াছেন। আমাকে সব জিনিস লইতে বলিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া সে চাবি আমাকে দিল।

বালিকার কথায় আমার আশঙ্কা হইল। তাহার সেই "আমাকে বলিয়াছেন" কথাটায় বিশ্বাসের যে প্রগাঢ়তা ছিল, তাহা সত্যসত্যই অসাধারণ। যদি তাহাই সত্য হয়? আলমারীতে বিন্দুমাধব কোনও পত্র রাখিয়া যায় নাই ত? আমি পারুলকে বলিলাম, "চল; দেখি।"

কৌতূহল নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতেছিল। সে উঠিল। মুরলাও আমাদের সঙ্গে চলিল। পার্শ্বের ঘরে যাইয়া পারুল

বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিলাম, আমি চাবি লইয়া আলমারী খুলিলাম। যে সব জিনিস—কাগজ, লেস, চিঠির কাগজ, খাম, গন্ধদ্রব্য—পারুলের সন্দেহবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল, সে সব আলমারীতে! আমি বিস্মিতভাবে ফিরিয়া তাহাকে বলিলাম, "এ কি—এ সব কি বিন্দুমাধব তোরই জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল?" সে কথা কহিল না—কহিতে পারিল না। এত অল্পক্ষণে তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল! বোধ হয় সে আপনার ভ্রমাপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই ভ্রমের বিষময় ফলের বিষয় চিন্তা করিয়া আপনার অপরাধের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। এখন উপায় কি?

মুরলা তখন তাহার পিতার শূন্য শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল। তখন পারুল তাহার ভ্রান্তিহেতু বেদনাকাতর পতির সেই শয্যায় পড়িয়া কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম; বলিলাম, "আমি ত বলিয়াছিলাম, এ সন্দেহ মনে স্থান দিবার কারণ নাই। কালই তুই একখানা পত্র লিখিয়া দিবি।" সে মুখ তুলিতে পারিল না—বলিল, "কোন্ লজ্জায় পত্র লিখিব?"

তাহার পর সে শান্ত হইল। তখন আমাদের মনে আর একটা প্রশ্নের উদয় হইল—সত্যই কি বিন্দুমাধব ফিরিবে না?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া মুরলা ঘুমাইয়া পড়িল, আমরা দুই ভগিনীতে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। যাহাকে হারাইবার আশঙ্কা সে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই, আজ তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনায় যখন তাহার অভিমান ও ভ্রান্তি সহসা অন্তর্হিত হইল, তখন পারুল বুঝিল, সে তাহার হৃদয়ের কতখানি পূর্ণ করিয়াছিল—স্বামী স্ত্রীর জীবনের কতখানি পূর্ণ করিয়া থাকেন—স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীর জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অনুভূতি। এই-টুকুই সে এত দিন বুঝিতে পারে নাই।

৬

পরদিন আমি পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, দিনের মধ্যে দুই বার সংবাদ লইলাম—বিন্দুমাধবের কোনও সংবাদ আইসে নাই। তাহার পরদিনও যখন কোনও সংবাদ আসিল না, তখন তাহার বাড়ীর লোক উদ্বিগ্ন হইলেন; শঙ্কিত হইয়া পারুল আমাকে লিখিল, "দিদি, একবার আসিও।" আমাকে যাইতে হইল।

বিন্দুমাধব তাহার যে ঠিকানা দিয়া গিয়াছিল, সেই ঠিকানায় টেলিগ্রাফ

করিয়া জানা গেল, সে তথায় যায় নাই। আর তাহার কাকা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একখানি পত্র পাইলেন—"বিন্দুমাধব কোথায়? সে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছে, সে সংসার ত্যাগ করিয়া গেল। আমাকে তাহার সন্ধানে দেখিতে বলিয়াছে। এ কি হইল?" তিনি লিখিয়াছেন, বিন্দুমাধবের এই কথায় আজ তাঁহার মনে পুরাতন বেদনা নূতন হইয়া উঠিয়াছে, বিন্দুমাধবের পিতা মৃত্যুকালে তাঁহাকেই তাঁহার পুত্র কন্যার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বিন্দুমাধবের কথায় আমার মনে হইতেছে, আমার মৃত ভ্রাতা যেন লোকান্তর হইতে আমাকে তিরস্কার করিতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে সংসারে তাহার এমনই অসহ্য বেদনার কারণ হইল যে, তরুণ যৌবনে বিন্দুমাধব সংসারত্যাগী হইল?" অপরাধ তাঁহারই। তিনি ত তেমন করিয়া তাহাদের দেখিতে পারেন নাই।

তখন আর সন্দেহ রহিল না যে, বিন্দুমাধব সত্য সত্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিন্দুমাধবও কোনও দিন মনে করে নাই, তাহার প্রতি তাহার মাতার অধিক স্নেহ ছিল। কিন্তু এখন তাহার মাতা সহসা মাতৃস্নেহের বন্যা দেখাইয়া পারুলকে তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহা মনে করিলে আজও অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়। কথায় কথায় তাহার লাঞ্ছনা চলিতে লাগিল।

বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্য সত্যই বিদেশে ব্যবসার জাল তুলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মুরলাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু পারুলকে বিন্দুমাধবের গৃহত্যাগের জন্য অপরাধী না করিয়া পারিলেন না। তিনি প্রায়ই দুঃখ করিতেন, "সেই দেশে ফিরিলাম, যদি দুই দিন পূর্ব্বে ফিরিতাম! না জানি সে কত কষ্টই পাইয়াছে, কত কষ্টই পাইতেছে!" জ্যেঠাইমা মুখে পারুলকে কোনও কথা বলিতেন না। কিন্তু জ্যেঠা মহাশয়ের ও জ্যেঠাইমার বেদনার যেন তিরস্কার পারুলের কাছে শাশুড়ীর প্রকাশ্য কুব্যবহারের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর বোধ হইত। তবে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া যেন অবহেলার অপরাধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্যই সংসারের সব ভার লওয়ায় পারুলের পক্ষে শাশুড়ীর প্রকাশ্য লাঞ্ছনার মাত্রা কমিয়াছিল।

কিন্তু এ সব বেদনাও সে সহ্য করিতে পারিত। তাহার অসহনীয় বেদনার কারণ যেদিক হইতে আসিল সেই দিক রক্ষা করিবার জন্যই সে প্রাণান্ত চেষ্টা

করিয়া আসিয়াছিল। যাহার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, যাহাকে একান্তই আপনার করিয়া রাখিবার জন্য সে স্বামীকেও হারাইয়াছে, সেই কন্যাই তাহার পর হইয়া গেল। এবার আর কেহ তাহাকে পর করিয়া লইল না, সে আপনি যার পর হইতে লাগিল। একে ত যে পিতার প্রতি তাহার ভালবাসা ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, মাতাকে সে সেই পিতার গৃহত্যাগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, তাহাতে আবার পরিবারের আবহাওয়া মার প্রতি স্নেহের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সকলেই বলিত, পারুলের দোষেই বিন্দুমাধব চলিয়া গিয়াছে।

কেবল ইহাই নহে, বালিকার অবস্থাও পারুলের পক্ষে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। বিন্দুমাধবের গৃহত্যাগের পর হইতেই যেন তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও বিষণ্ণভাব বালসুলভ চাপল্যের ও আনন্দ-প্রিয়তার স্থান অধিকৃত করিল। সে খেলা ছাড়িয়া দিল, অনেক সময় একাকী বসিয়া কাঁদিত। সময় সময় দূরে বা অদূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে চমকিয়া উঠিত, বুঝি বিন্দুমাধবের কণ্ঠস্বর! পরক্ষণেই ভুল বুঝিতে পারিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত—তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত। তাহার স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধিও যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমা তাহাকে কত যত্ন করেন, কিন্তু সে কোনও দিন তাঁহাদের কাছেও কোনও জিনিস চাহিয়া লয় নাই। এক দিন জ্যেঠাইমা সে কথা বলিলে সে অশ্রুসজল নেত্রের দৃষ্টি তাঁহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলিয়াছিল, "যাহার বাবা নাই, তাহাকে কি আব্দার করিতে আছে!" এই কথা শুনিয়া পারুল সে দিন সারাদিন কাঁদিয়াছিল।

এখন তাহার ক্রন্দনই সার—যাহার জীবন বেদনাকীর্ণ তাহার অশ্রু ব্যতীত আর কি সম্বল থাকিতে পারে? বেদনার উৎসে যে অশ্রুর উদ্ভব, তাহা যাতনায় তরল বহ্নিদাহ।

এমনই দুঃখে পারুলের দিন কাটিতেছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কেবল তাহার দুঃখ দেখিয়াই বহিয়া যাইতেছে। তাহার প্রেমের বেদনা—স্নেহেও বেদনা। কতবার আমি তাহাকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও আমার সঙ্গে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে কোথাও যায় না; বলে "আমার পাপে যে মন্দির হইতে দেবতার অন্তর্ধান হইয়াছে, সেই শূন্য মন্দিরে বেদনা যাতনা লাঞ্ছনার কণ্টক

বক্ষে লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই আমার শাস্তি। আমি সেই নিয়তিনির্দ্দিষ্ট শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইব কেমন করিয়া?" আজ সন্দেহের অন্ধকারমুক্ত হৃদয়ে সে বিন্দুমাধবের প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। যে প্রেম অবহেলার অভিমানে বিন্দুমাধবকে সংসারত্যাগী করিয়াছে, তাহার শেষ যে সে প্রেমের সান্নিহিতও হইতে পারে না! আর সেই প্রেম সে পাইয়া ইচ্ছা করিয়া হারাইয়াছে! যে প্রেম স্বর্গের সুধা, সেই প্রেম সে অবহেলায় ফেলিয়া দিয়াছে!

এই দুঃখের উপর আবার কন্যার জন্য উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। সে উৎকণ্ঠার কারণও যে তাহার কর্ম্মফল তাহাতেই তাহার দুঃখের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কবে তাহার দুঃখের অবসান হইবে, কবে তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে? সে ভুল করিয়াছিল, কিন্তু এত দিনের এই দুঃখেও কি সে ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? এত দিন আমরা বিন্দুমাধবের কোনও সন্ধানই পাই নাই। কিন্তু এবার আমাদের আশার আবার অবলম্বন হইয়াছে; হয় ত তাহার সাক্ষাৎ পাইব, পারুল তাহাকে আপনার ভুল বুঝাইবার সুযোগ পাইবে। সে আশা কি পূর্ণ হইবে না?

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

'অভিজাতশাসন' বা 'কুলীনতন্ত্র'।

আষাঢ়ের 'সাহিত্যে' আমরা 'প্রজাতন্ত্রে'র বিষয় সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এ প্রসঙ্গে প্রজাতন্ত্রমূলক 'কুলীনতন্ত্রে'র উল্লেখ করিয়াছি। মেগাস্থিনিস, সিকুলাস প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ নীসাকে এবম্বিধ কুলীনতন্ত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কুলীনতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিব। প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, স্মৃতি ও সাহিত্য, এবং অপরাপর বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর, জয়সওয়াল, প্রভৃতি আধুনিক এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অদ্য এক জন প্রতিভাবান পাশ্চাত্য পণ্ডিতের চিন্তার ফল পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

ভূতপূর্ব্ব Lord Chancellor Viscount Haldane ইংলণ্ডের সুধীসমাজের শিরোমণি। তিনি উজ্জ্বলে মধুরে মণ্ডিত পণ্ডিত। ইউরোপের তীব্র নব্যতা ও সমুদ্ভূত জ্ঞানালোকে

সমুদ্ভাসিত, আবাঢ় ভাবুকতার মাধুর্য্যে, দার্শনিকতার সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত, জাতীয়তার গৌরবে সুশোভিত। বর্ত্তমান যুগের Janus, দুই দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কর্ম্মবহুল সুদীর্ঘ গত জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতির ভবিষ্যৎ আদর্শ আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতের "The Eton Review" হইতে তাঁহার উপদেশের সার সঙ্কলন করিলাম।

প্রবন্ধটীর নাম Democracy and the training of the Coming Generation, 'প্রজাতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ পুরুষের শিক্ষা।'

আমার বোধ হয়, এ দেশের কোনও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই, কি মূলধনী, কি শ্রমজীবী, কেহই জাতীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে শক্তিসঞ্চয়ের পক্ষে শিক্ষার প্রভাব ও উপযোগিতা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য শিক্ষার প্রচার সম্বন্ধে সকলেরই একটা উদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে House of Lordsএ যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের পর, দশ জনের ভিতর মাত্র এক জন বালক রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তাহার ফলে অযথা ও অস্বাভাবিক শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়। কারণ, পরিচালনার শক্তি বা নায়কত্ব করিবার ক্ষমতা অনুসারেই লোকে সম্মান, অর্থ প্রভৃতি পাইয়া থাকে। কিন্তু পরিচালনার শক্তি মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে, মানসিক বৃত্তি আবার শিক্ষাসাপেক্ষ। ব্যবহারাজীব, চিকিৎসা, শিক্ষকতা, বাণিজ্য, রাজ্যশাসন, সেনাবিভাগ সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়, এবং ক্রমে যত দিন যাইতেছে, তত স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, মানসিক উৎকর্ষের উপরই আমাদের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে এবং মনের উন্নতি সাধনের চেষ্টাই আমাদের কর্ত্তব্য ও যোগ্যকর্ম্ম। "On earth, there is nothing great but Man; in Man there is nothing great but Mind." পৃথিবীতে মানবই শ্রেষ্ঠ, মানবের ভিতর আবার মনই শ্রেষ্ঠ।

আমরা অবশ্য আমাদের বালক বালিকাদিগকে মানসিক শক্তিতে গরীয়ান করিয়া দিতে পারি না, কারণ, প্রকৃতিদেবী তাহাদিগকে অসমান করিয়া গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তিলাভের অনুকূল শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান ভাবে সুলভ করিয়া দিতে পারি। প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ সামাজিক অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এইরূপ অন্যায় ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করা। সমস্ত বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিবে কি না, একরূপ একটা অনিশ্চয়তা জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বজাতিকে পৃথিবীর সমক্ষে পূজিত, সম্মানিত করে, কিন্তু প্রতিভা সাধারণতঃ লুক্কায়িত থাকে, শিক্ষা ও সাধনার সাহচর্য্যে ফুটিয়া উঠে। শিক্ষা সকলের পক্ষে অধিগম্য করিতে হইবে, এবং সমবেত শ্রেষ্ঠ মনীষা ও প্রতিভার সাহায্যে জাতীয় জীবন গড়িতে হইবে।

এইরূপে গুপ্ত মনীষার আবিষ্কার ও প্রয়োগে যে সম্প্রদায়গত জীবনেরই উৎকর্ষ ঘটিবে, তাহাই নহে, শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম পরস্পরের অনুকূল হইয়া উঠিবে, এবং ক্রমে শারীরিক শ্রমেরও সম্মান বাড়িবে। তড়িতবিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে,

তাঁহাদের আশা হয় যে, অনতিকালমধ্যে যন্ত্র যুগের শ্রমসাধ্য ব্যবস্থাগুলি খুব উন্নতি লাভ করিবে। ইলেকট্রিসিটির এইরূপ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বিশেষ আবশ্যক হইবে। কিন্তু কল-কারখানা পরিচালনার জন্য বিচক্ষণ পরিচালকের প্রয়োজন। মানসিক শ্রমের সাহায্যেই শারীরিক শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত ও যথার্থ সুফলপ্রসূ করিতে পারা যায়। মূলধন যেমন কায়িক-শ্রম এই দুইটীর কোনটীরই উপর আধুনিক ধনলাভ নির্ভর করে না। মূলধন বাজারে ধার করা যাইতে পারে, কায়িক শ্রমও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র প্রয়োজন, পরিচালনা শক্তির, পৃথিবীর আপাততঃ মূল্যবিহীন বস্তুনিচয়কে মহামূল্য ও প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত করিবার উপযোগী মানসিক শক্তির। সামান্য ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পর্য্যন্ত একটী স্তর গাঁথিতে হইবে। কে উচ্চে, কে নিম্নে, মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মানসিক উৎকর্ষের দ্বারাই তাহার নিরূপণ করা হইবে। প্রজাতন্ত্রের ভিতরে আবার একটী কুলীনতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে, মানসিক বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ লইয়াই এই বুদ্ধি ও মনীষা শাসিত কুলীনতন্ত্রের গঠন করিতে হইবে। "The democratic community will contain within itself an aristocracy, but this will be an elite of talent, an aristocracy of intellect."

শ্রমজীবী সম্প্রদায় (The Labour Party). কিছু দিন পূর্ব্বেও অতি সঙ্কীর্ণ আদর্শের পূজা করিয়া আসিয়াছেন। অর্থতন্ত্রের পার্থিব বস্তুতন্ত্রের প্রতিই তাঁহাদের বেশী প্রীতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতন্ত্রের মোহ তাঁহারা কাটাইয়া উঠিতেছেন। আজ তাঁহারা মানসিক শক্তিতে সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবিগণের সাহায্য ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। আজ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, মানসিক শক্তির নিকট সকলেই নত, মানসিক-বৃত্তি হইতে বিযুক্ত শারীরিক শ্রমের মূল্য অতি সামান্য। অতীতকাল ধরিয়া যে সকল তথাকথিত সার্ব্বভৌম ভাবের পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন; আজ তাহা দূরে সরাইয়া ফেলিতে হইতেছে। সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী বর্ণাশ্রমবিভেদ অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু মনীষার আদর্শে বর্ণাশ্রম বিভাগ, শুধু স্বাভাবিক নহে, জাতীয় জীবনের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই পৃথিবীর সার নহে, অতীন্দ্রিয়েরও অবহেলা যুক্তিযুক্ত নহে। "Man requires bread, but he does not live by bread alone. The spiritual is not less real than the material." বস্তুতন্ত্রের সেবায় যাহারা অতীন্দ্রিয় শক্তি বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে, তাহারা আত্মবঞ্চনায় লিপ্ত। জীবন ধারণের পক্ষে অন্নের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু কেবল অন্ন দ্বারাই কি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব? বাস্তব অপেক্ষা মানসিকের শক্তি কি কিছুমাত্র কম? সুখের বিষয়, শ্রমজীবিসম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জ্ঞান অর্থাৎ মনের ক্ষমতাই যথার্থ শক্তির নিদানস্বরূপ। যে দিন বুদ্ধিজীবিগণের অধীনে বিজ্ঞানের উপর উক্ত সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিন হইতে তাহাদের উন্নতির সকল বিঘ্ন দূর হইবে। একটী সম্প্রদায় বিশেষের উল্লেখ করিলাম মাত্র; কিন্তু যে দিন আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, জ্ঞানের প্রভাব, শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকৃত হইবে, মনীষা শাসিত কুলীনতন্ত্রের (intellectual aristocracy) সৃষ্টি হইবে,

যে দিন লোকে বুঝিবে "The spiritual alone in the real." মানসিক নাস্তিই সার ও সত্য, সে দিন আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে কেহ কণ্টক হইতে পারিবে না।

উপরে উদ্ধৃত উপদেশটী পড়িবার সময়, হিন্দু আমরা, আমাদের মনে জ্ঞানবৃদ্ধ Solomon এর উক্তিটী জাগিয়া উঠে—"There is no new thing upon the earth." পৃথিবীতে নূতন কিছুই নাই; পুরাকালে, অতীতে যাহার নিদর্শন নাই, এমন কোনও ঘটনা বর্ত্তমানে ঘটে নাই (Ecclesiastes; 9, 10)। প্লেটো যথার্থ বলিয়াছেন, জ্ঞান স্মৃতিরই নামান্তর (*c. f.* Plato's Phædo)। সোলেমানের উক্তি "All novelty is oblivion" (Eccles, 1. 11) অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি এক এক দেশ হইতে নষ্ট হইয়া দেশান্তরে প্রচলিত হয়। লুপ্তবিষয়ের পুনরুদ্ধার চেষ্টাই জ্ঞানচর্চ্চা। আদর্শের নাশ নাই। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ যে ভাবের ভাবুক, যে সাধনার সাধক, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁহাদের পবিত্র জীবনের ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম ব্যাপারের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপটী যে আদর্শের মূর্ত্তিমান সাক্ষিস্বরূপ, আজ পাশ্চাত্যের ঐক জন মনস্বী জগতের সমক্ষে সেই আদর্শ লইয়া উপস্থিত।

আর্য্যধর্ম্ম ও হিন্দুত্বের মূলভিত্তি ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠা। সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রস্ফুট। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও প্রকট, আরও শক্তিশালী। ক্ষত্রিয় জাতি রাজ্যের পালক কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় জাতির উপদেষ্টা ও কর্ণধার (মনু; Carmichael Lec. I.) এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যই প্রাচীন ভারতের 'কুলীনতন্ত্র' বা 'অভিজাতশাসন'।

এখন ব্রাহ্মণ কাহাকে বলিব? বেদ বলিতেছেন, ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ঐহিক বিষয়নিচয়ের অসারতাজ্ঞাপক, পারমার্থিক তত্ত্বের অভিব্যক্তিকে সংক্ষেপে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে। অতএব, প্রকৃত জ্ঞানই ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ বিদ্যার উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন (মনু ১ম অ। ৯৪)।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
(মনু. ১ম অ. ৯৬।)

প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানের আদর ছিল ও তদানীন্তন জ্ঞানীগণ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সে সময়ের ব্রাহ্মণ্য পরিবারগত ছিল না (accident of birth) ব্রাহ্মণের সন্তান বেদ অর্থাৎ জ্ঞান বিদ্বেষী বা বেদহীন হইলে ব্রাত্যসংজ্ঞা লাভ করিতেন (মনু ২অ। ৩৯), ব্রাহ্মণের পদবী বা সম্মান হইতে বঞ্চিত হইতেন। আবার বেদজ্ঞ বিদেশীয় বা ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের আসনে পূজিত হইতেন। আমাদের শাস্ত্রে বহু যবনাচার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় গাধিসুত বিশ্বামিত্র বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বশিষ্ঠের সমকক্ষ হইয়া উঠেন (মহাভা.)। সুতরাং ভারতের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব বা কুলীনতন্ত্র জ্ঞানের আদর ও তাহার কর্তৃত্বের পরিচায়ক। ইহাই Haldaneএর intellec-

tual aristocracy। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যায়, শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা বংশপরম্পরাক্রমে যেমন পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণের পুত্রের জ্ঞানার্জ্জনের যেরূপ প্রবৃত্তি ও উৎসাহ, অব্রাহ্মণের বংশধরের সেরূপ দেখা যায় না। এইরূপে কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব পরিবার-গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক ও অধিকাংশ স্থলে সুফলপ্রসূ। ধনমিধন্ত ভাক্তার ক্রণলস্ নবাজের নিম্নতম স্তর হইতে পরিশ্রম ও প্রতিভার বলে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন। কিন্তু তিনিও আভিজাত্যের উপকারিতা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার এক বন্ধু সংবাদ আনিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট এক ধনবান্ দরজিকে ব্যারনেট্ করিয়াছেন। শুনিয়া জনসন্ বলিলেন—"The Government can easily make him a Viscount to-morrow—and a Peer of the Realm, the day after. But they can never make him a gentleman (Boswell's Johnson, p. 155)। ব্রাহ্মণবংশধরগণ অভিজাতি ও এই অভিজাতসাসনই 'কুলীনতন্ত্র'। বাহুবলে বঙ্গীয়ান বিজয়ী ক্ষত্রিয় নরপতি হইতে কায়িক পরিশ্রমে অদ্বিতীয় শ্রমজীবী সকলেই এই কুলীনতন্ত্রের নিকট নতমস্তক, কারণ জ্ঞান ও মনীষার প্রভাব সর্ব্বত্র অল্পে। এই ভাবের উদ্দীপনায় Pericles বলিয়াছিলেন "বাহুবলে বর্ব্বর-বিজয়লব্ধ বীরকীর্ত্তি অপেক্ষা এথেন্সের সুধীসমাজের সেতৃপদবী আমার অধিক প্রার্থনীয় (Grote's History of Greece Vol. III.)। এই ভাবের প্রেরণায় নেপোলিয়ন অষ্টাদশলিট্ স্ জঁয় অপেক্ষা ফ্রেঞ্চ একাডেমীর সভ্যপদ বেশী গৌরবের বিবেচনা করিয়াছিলেন (Abbot's Life of Napoleon p. 301)। ভারতের বর্ণাশ্রমভেদ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার বলে সঞ্জীবিত, যুগ যুগান্তর ধরিয়া শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজিও সজীব, আজিও পূজিত। পুরাতত্ত্ব বিমুগ্ধ সংস্কারকের চক্ষে এই ব্রাহ্মণশীর্ষ বর্ণভেদ যতই বিসদৃশ বোধ হউক, ঐতিহাসিক ইহার মর্য্যাদা বুঝেন এবং জানেন যে, যত দিন না ঐহিকের সাধনায় পারত্রিকের আহুতি পড়িবে, তত দিন ভারতের ব্রাহ্মণপ্রসূত কুলীনতন্ত্রের ধ্বংস সুদূরপরাহত।

Lord Haldane যথার্থই বলিয়াছেন, ইউরোপ এত দিন জ্ঞান ও মনীষার প্রভাব পূর্ণভাবে স্বীকার করে নাই। বাহুবলই প্রথমতঃ পূজনীয় ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বেও আভিজাত্য বা blue blood নির্দ্ধারিত করিতে হইলে বলা হইত 'আমার অভিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বিজেতা William Iএর সহিত আসিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে Saxonদের হস্তে প্রাণ দিয়াছিল (Chronicles of Froissart p. 78)। আমেরিকার অভিজাত বলিতে Sovereign Dollarএর অনুগৃহীত Railway Kings বুঝাইত। তাহার পর পাশ্চাত্যের আভিজাত্য আর এক স্তর নিম্নে নামিয়া পড়ে। রক্তের পৌতত্ত্ব অপেক্ষা অর্থের প্রাচুর্য্যই অধিকতর পূজনীয় হইয়া উঠিল। কাঞ্চন কৌলীন্যের নিকট বংশগৌরব মস্তক নত করিল। Carlyle তীব্র শ্লেষের সহিত বলিয়াছেন—"The aristocracy of the feudal parchment has given place to the aristocracy of money bags" (French Revol. Vol. II. p. 293)। ইমার্সন বার বার এই বিষয়ে তাঁহার দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটী কার্লাইল বা ইমার্সন স্রোতের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের

আসল কৌলীন্যের উপাসনা ও আনুষঙ্গিক ইহলোক সর্ব্বস্বতার বন্যা উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইল। ধর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি ভাসিয়া গেল। প্রতীচ্য সভ্যতার কেন্দ্র বিজ্ঞানগর্ব্বিত জার্ম্মানীর বরপুত্র প্রকাশ করিলেন—"পাশ্চাত্য জগৎ ধর্ম্ম মানেনা, মানে মাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম" "There was only one Christian and He was crucified" (Bernhardi, Germany and Next War)। ইহলোকই সার ও সত্য, পশুবলই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য পশুবলের সাহায্য প্রচার ও তাহার সাহায্যে অপরের সর্ব্বনাশ করিয়াও একচ্ছত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাহার ফলে বিগত শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—দানবী-প্রচেষ্টা ও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা মন্ত্রের ধ্বন্স, ঐহিক পশুবলধর্ম্মী ও জ্ঞানমনীষার সমন্বয়সাধকের শক্তিপরীক্ষা। এই যুদ্ধই পাশ্চাত্যের চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ইউরোপ বুঝিয়াছে, কাঞ্চনকৌলীন্য তাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই নূতন ভাবের অভিব্যক্তি Viscount Haldaneএর intellectual aristocracy—প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যশাসিত অভিজাতশাসন বা কুলীনতন্ত্র।

দশাবিপর্য্যয়ের সহিত আজ পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞান ও মনীষা শাসিত কুলীনতন্ত্রের প্রার্থনা করিতেছে। আর আমরা 'নবধা কুললক্ষণে'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতেছি। ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ (শূদ্রের বিদ্যা ও চৈতন্যের ভক্তি, উভয়ই জ্ঞানের রূপভেদ মাত্র) চণ্ডালতুল্য ও ভক্তিযুক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণোত্তম বিচার করিতে চাহি না। আমরা এখন ইউরোপের পরিত্যক্ত ঐহিক আদর্শের চেষ্টায় ভাবিত। ইউরোপ যাহা চাহিতেছে, তাহা দূরে পরিহার করিয়া, ইউরোপ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সন্ধানে ছুটিয়াছি। প্রাচী ও প্রতীচীর আদর্শ কি চিরকালই বিভিন্ন থাকিবে? কবি ভবিষ্যদ্রষ্টা। যথার্থই বলিয়াছেন—'The West is the west, the East is the east and the twain shall never meet' (Rud. Kipling.)

গত মাসের Manchester Guardianএ রাসিয়ার ঋষি লিও টলষ্টয়ের পুত্র লিয়া টলষ্টয়ের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখি টলষ্টয় বলিয়াছেন—"দেড় দিনের সভ্য পাশ্চাত্য জাতিরা যখন যুগপ্রসিদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতীয়গণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্মযাজক (missionary) পাঠাইবার প্রস্তাব করে, তাহাদের প্রস্তাবের দাম্ভিকতায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।" হায় টলষ্টয়! তুমি জান না, পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ হতভাগ্য আত্মবিস্মৃত জাতি আমরা। আমাদের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সব হারাইতে বসিয়াছি। বুঝি বা কিছু দিন পরে মনীষাচালিত কুলীনতন্ত্রের, intellectual aristocracyর আদর্শও পুনরায় প্রতীচ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ।

আমরা প্রথমতঃ এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদ হইতে মূলের প্রত্যেক শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত অনুবাদ করিয়া পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিব। রমেশবাবুর অনুবাদে মূলাতিরিক্ত বহু শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ায় ইহার প্রকৃত অর্থবোধে বাধা পড়ে। তিনি কোনও কোনও স্থলে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা যে যে স্থলে অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য মূলাতিরিক্ত শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে বন্ধনীর অন্তর্গত করিয়া দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, এই সূক্ত হইতে বৈদিক যুগের যে যে জ্ঞানলাভে আমরা সমর্থ হই, তাহা মন্তব্যরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। যে ঋষি এই সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি প্রাচীন কালের কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরূরবা ও উর্ব্বশী এই সূক্তের ঋষি বলিয়া বেদে উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান করি, ইহার প্রকৃত রচয়িতার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরূরবার নাম বেদে প্রাচীন ঐতিহাসিক পুরুষরূপে গৃহীত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ।

১০।৯৫

পু। হে বোরা (অর্থাৎ নিষ্ঠুরা) জায়া! মনের দ্বারা অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার কথায় মন দাও)। এস, অদ্য বাক্য বিস্রংস করি (অর্থাৎ কথোপকথন করি)। আমাদিগের দুই জনের মনন সকল অনুচিত নহে (অর্থাৎ মনে নানা প্রশ্ন উদিত হইতেছে)। ইহারা পরে ও অদ্য সুখকর (হইবে)। ১

উ। এই বাক্য দ্বারা আমরা কি (লাভ) করিব? উষাদিগের অগ্রবর্ত্তিনীর মত (অর্থাৎ যে সকল উষা দেবী চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ আর ফিরিয়া আসেন না) আমি তোমার অতীত হইয়াছি। হে পুরূরবা! পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি দুঃখে ধারণীয় বায়ু সদৃশ হইয়াছি। ২

পু। (বিজয়) শ্রীলাভের নিমিত্ত ইষুর আধার হইতে ইষু নিক্ষেপ করি না; শতধন গো (শত্রুর নিকট হইতে) জয় করি না। অবীর কর্ম্মেও আমাকে উদ্দীপিত করে না; ধুনিগণ উরু (দেশে) শব্দকে চেতনা দেয় না (১)। ৩

(১) সায়ন ধুনি অর্থে বলেন—সেনা; উরু অর্থে বিস্তীর্ণ সংগ্রামক্ষেত্র। সায়ন-সম্মত অর্থ:—"বিস্তীর্ণ সংগ্রামক্ষেত্রে সেনা সকল সিংহনাদ ছাড়ে না।" আমাদের মতে ধুনি অর্থে

হে উষা! যুদ্ধরকে ধন, অন্ন প্রদানকারিণী সেই (উর্ব্বশী) যখন সকামা হইতেন, তাস্তি-গৃহ হইতে অন্তে প্রবেশ করিতেন।.....৪

উ। .....হে পুরূরবা! সপত্নীহীনা আমাকে প্রীতা করিতে। তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম; হে বীর! তখন (তুমিই) আমার দেহের রাজা ছিলে। ৫

পু। যে সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুমআপি, হৃদেরম তচক্ষুবৎ গ্রন্থিনী, (ও) চরণ্যু (নামধেয়া গাভী ছিল), সেই সকল আভরণযুক্তা, অরুণবর্ণা (গাভীসকল তোমার নিকট হইতে) নড়িত না। (এই) ধেনু সকল (নবপ্রসূতা) গাভীর মত দোহনার্থ (আর) শব্দ করে না (?)। ৬

উ। হে পুরূরবা! এই লোকে (তোমার) জন্মকালে দেবী সকল আগমন

তত্ত্বযুক্ত বাদ্য যন্ত্র, এবং উহা অর্থে উপদেশ। ওখেদে বিষ্ণুকে উরুগায়ন্ বলা হইয়াছে। ইন্দ্র ও বিষ্ণু উরুলোক বজ্রের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান গেল।—

মু। মর্ত্তঃ। যজতে। সনিষ্যন্
যঃ। বিষ্ণবে। উরুগায়ায়। দাশৎ। ৭।১০০।১

অর্থ:—যে মর্ত্ত্য ধন ইচ্ছা করে, (সে) দাতা, উরুগীত, বিষ্ণুকে শীঘ্র হবি প্রদান করুক।

[সায়ন-মতে উরুগায়ায় অর্থ—বহুভিঃ কীর্ত্তনীয়ায় বিষ্ণবে। আমাদের মতে, উরুদেশের লোকের দ্বারা গীত।]

যি। চক্রমে। পৃথিবীং। এষঃ। এতাম্
ক্ষেত্রায়। বিষ্ণুঃ। মনুষে। দশস্যন্।
ধ্রুবাসঃ। অস্য। কীরয়ঃ। জনাসঃ
উরুক্ষিতিং। সুজনিমা। চকার। ৭।১০০।৪

অর্থ:—ইনি (অর্থাৎ বিষ্ণু) এই পৃথিবীকে ক্ষেত্র নিমিত্ত মনুকে প্রদান করিতে বিক্রম (প্রকাশ) করিয়াছিলেন। হে জনগণ! ধ্রুবগণ তাঁহার স্তবকারী। (তিনি) উরুক্ষিতি (ও) সুজন্মাদিগকে করিয়াছেন।

উরুং। যজ্ঞায়। চক্রথুঃ। উ। লোকম্। ১।৯৯।৪ অর্থ:—(হে ইন্দ্র বিষ্ণু)! যজ্ঞের নিমিত্ত (তোমরা) উরু লোক করিয়াছ।

(১) সায়ন-সম্মত অর্থ:—যে সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুমআপি, ও হৃদেচক্ষু (চারি জন অপ্সরা সখী ছিল) গ্রন্থিনী চরণ্যু অর্থাৎ সন্মর্ত্তবর্তী বিচরণশীলা উর্ব্বশী, (তাহাদের সহিত চলিয়া গিয়াছেন); অথবা, সুজূর্ণি চরণ্যু (অর্থাৎ সুমন্দগামিনী, বিচরণশীলা, উর্ব্বশী) শ্রেণি, সুমআপি, হৃদেচক্ষু ও গ্রন্থিনী (এই চারি জন অপ্সরা সখীদিগের সহিত) গমন করিয়াছেন। সেই আভরণযুক্তা, অরুণবর্ণা (অঙ্গরোগশূন্য) (পূর্ব্ববৎ) গমন করে না। (নবপ্রসূতা) সো সদৃশ ধেনু সকল দোহনার্থ শব্দ করে না।

করিয়াছিলেন, এবং স্বর্গীয়া (বা, গমনশীলা) নদী সকল ইহাকে (অর্থাৎ তোমাকে) বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মহৎ রণে দস্যু-হত্যার নিমিত্ত দেবগণ তখন তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৭

পু। (দেবতাদিগের) সহায়ভূত মানুষ (আমি) রূপ-ত্যাগকারিণী, অমানুষী অপ্সরাদিগের মধ্যে যখন ক্রীড়া করিতাম, তখন (তাঁহারা) আমার নিকট হইতে মৃগীর মত পলায়ন করিতেন; তাঁহারা রথে যুক্ত অশ্বের মত দৌড়াইতেন। ৮

যখন মর্ত্ত্যে (আমি) অমৃতা অপ্সরাদিগের মধ্যে স্পর্শ লাভ করিতাম, বাক্য ও কর্ম্ম সকলের দ্বারা স্পর্শ হয় নাই। তাঁহারা পক্ষিগণের মত স্বীয় তনু অলঙ্কৃত করেন; জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠলেহনশীল অশ্বের মত ক্রীড়া করেন। ৯

হে উর্ব্বশি! যিনি বিদ্যুতের মত ঝক্-মক্ করিয়া গমন করেন, (যিনি) আমার মনোমত কামনা সকল পূর্ণ করেন, (সেই তোমাতে) দেবভক্ত, সৎকর্ম্মী, সুজাত (পুত্র) জন্মিয়াছিল। (তাহাকে) দীর্ঘ আয়ু প্রদান কর। ১০

উ। হে পুরূরবা! সেই ওজ আমাতে ধারণ করিয়াছিলে, যাহাতে গোপালনের জন্য (পুত্র) জন্মিয়াছে। বিদুষী (আমি) তোমাকে সকল দিন (কর্ত্তব্য) শিক্ষা দিতাম। (নিশ্চিন্ত) হে অভুক! (১) আমার (কথা) শুন নাই। হে অভোক্তা! (এক্ষণে) কি বলিতেছ? ১১

পু। জাতপুত্র কবে পিতাকে (দেখিতে) ইচ্ছা করিবে? (পুত্র জন্মিয়াছে) জানিয়াই (আমার) অশ্রু চক্রের মত গড়াইতেছে। কে এক-মনো-বিশিষ্ট দম্পতীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে? যে হেতু এক্ষণে (তোমার) শ্বশুরকুলে অগ্নি (তোমার জন্যই) প্রজ্বলিত হইল (অর্থাৎ পুত্র ছিল না বলিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল)। ১২

উ। (তোমার) অশ্রু চক্রবৎ গড়াইতেছে। তোমায় বলি, স্ত্রীর নিমিত্ত মনঃপীড়ায় ক্রন্দন করিতে নাই। যাহা তোমার আমার নিকট (আছে), তাহা তোমায় প্রেরণ করিব। গৃহে প্রত্যাগমন কর। হে মূঢ়! আমাকে পাইবে না। ১৩

পু। প্রিয়া দূরে চলিয়া গেলে মন্দ সুদেব (পুরূরবা) অনাবৃত হইয়া পতিত হউক। নিম্নে নিঋতির ক্রোড়ে শয়ন করুক। তৎপরে ইহাকে বেগবান্ ব্যাঘ্র ভক্ষণ করুক। ১৪

(১) অভোক্তা বা সন্ন্যাসী।

উ। হে পুরূরবা! মরিও না, পতন ইচ্ছা করিও না। অশুভ ব্যাঘ্র সকল তোমাকে ভক্ষণ না করুক। স্ত্রীসম্বন্ধীয় সখ্য সকল থাকে না; ইহাদিগের হৃদয় সকল অরণ্য-ব্যাঘ্রদিগের মত। ১৫

যখন মর্ত্ত্যদিগের মধ্যে বিচিত্র রূপ (ধারণ করিয়া) শরৎকালের চারি রাত্রি বিচরণ করিয়াছিলাম ও বাস করিয়াছিলাম, দিবসে একবারমাত্র অন্নের বা ঘৃতের বিন্দু পান করিতাম। তাহার দ্বারাই তৃপ্ত হইয়া ইহাতে (মর্ত্ত্যলোকে) বিচরণ করিতাম। ১৬

পু। অন্তরিক্ষবিচরণকারিণী, উদকের নির্ম্মাত্রী উর্ব্বশীকে বাস করিতে ইচ্ছুক (অর্থাৎ ভোগেচ্ছু আমি) বশে আনয়ন করি। সুকৃতের দাতা তোমাকে নিকটে আসুন। ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। ১৭

উ। হে ঐড়! এই দেবগণ তোমাকে এই (কথা) বলিয়াছেন—ইঁহারা সকলে যেমন (তুমিও) সেইরূপ মৃত্যুবন্ধ হইবে। তোমার পুত্র দেবতাদিগকে হবি দ্বারা যজন করিতেছেন। তুমিও স্বর্গে (সোমপানে) আনন্দিত হইবে। ১৮

মন্তব্য:—সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক-লিখন-প্রণালীর বীজ এই সূক্তে উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে প্রাচীন কালের যে সকল জ্ঞান ইহা হইতে লাভ করিতে পারি, আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে মানুষ বলিলে মনুবংশীয় বুঝাইত। উর্ব্বশীকে দেবলোকবাসিনী, অমানুষী, অমৃতা ও অপ্সরী বলায়, তিনি মনুবংশীয়া ছিলেন না, ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু পুরূরবা মানুষ ও মর্ত্ত্য। তবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং দস্যুহত্যার জন্য দেবলোকেই লালিত ও পালিত হন। সেই জন্য তিনি বাল্য ও যৌবন কালে অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। অপ্সরোগণ নিজ নিজ দেহ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিতেন; তাঁহারা এত ক্ষিপ্র দৌড়াইতে পারিতেন যে, পুরূরবাও ধাবনে তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন; তাঁহাদিগকে বিচরণকালে চঞ্চলা সৌদামিনীর মত দেখাইত। কবির এইরূপ বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন।

উর্ব্বশীর সহিত দেবলোকেই পুরূরবার বিবাহ হয়। দেবলোকের বিবাহ আজন্মস্থায়ী ছিল না অনুমান করি। দেবলোকে বিবাহের কি নিয়ম ছিল,

যদিও তাহার কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু ঘটনাবলী দৃষ্টে উহার কিছু সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

যখন উর্ব্বশী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, তখন শরৎকাল। তিনি মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া চারি দিন মাত্র অবস্থান করেন। এই চারি দিন শুধু জলের বা ঘৃতের বিন্দু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। মর্ত্ত্যলোকের উষ্ণ জলবায়ুর জন্য উর্ব্বশী অপর কিছু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিংবা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। উর্ব্বশী পুরূরবাকে এক স্থলে বলিয়াছেন, "বিদূষী আমি তোমাকে সকল সময় কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতাম। কিন্তু হে সন্ন্যাসী মহাশয়! আমার কথা শুন নাই।" ইহা হইতে অনুমান করি, উর্ব্বশী দেবলোকের বিবাহ-নিয়ম জানিতেন, এবং পুরূরবাকে তাহা বলিতেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। ইহা হইতে মনে হয়, দেবলোকের নিয়ম অনুসারে উর্ব্বশীর গর্ভসঞ্চার প্রকাশ পাইলেই তাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এই কথাই তিনি সর্ব্বদা পুরূরবাকে বলিতেন।

মর্ত্ত্যলোকে চারি দিন মাত্র বাস করিয়াই উর্ব্বশী দেবলোকে চলিয়া যান। ইহার পর পুরূরবা বোধ হয় আর দেবলোকে গমন করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার দেবলোকে আগমনের কারণ কি? এই সূক্ত হইতেই জানা যায়, উর্ব্বশীর নিকট স্বীয় পুত্র ভিক্ষা করাই তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। উর্ব্বশীকে পুনরায় স্বীয় গৃহে আনয়ন করিবার চেষ্টাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদিগের কথোপকথন হইতে জানা যায়, তাঁহাদের বিবাহকালে পুরূরবার পিতা জীবিত ছিলেন, এবং উর্ব্বশী অন্ন ও ধন দ্বারা শ্বশুরের সেবা করিতেন। তাঁহাদের বাটীতে নানা প্রকার গৃহ ছিল—তাহাদের মধ্যে দুইটী নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়:—অন্তি ও অন্ত। গৃহে অনেক গাভী ছিল; অরুণবর্ণা গাভীই লোকে ভালবাসিত। ঐ সকল গাভীকে নানা আভরণে সজ্জিত করা হইত। পুরূরবা নিজ ভবন উর্ব্বশী বিহনে কিরূপ আনন্দহীন হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে, উর্ব্বশীকে গৃহপালিত গাভীগণ এতই ভালবাসিত যে, তাঁহার নিকট হইতে নড়িত না, এবং আনন্দধ্বনি দ্বারা গৃহ মুখরিত করিত। কিন্তু তাঁহার অদর্শনে উহারা এত ম্রিয়মাণ হইয়াছে যে, দোহনকালেও শব্দ করে না। তিনি নিজে উর্ব্বশী বিহনে এতই উৎসাহহীন হইয়াছেন যে, যজ্ঞজন্যে আর বহির্গত হন না; গান বাদ্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদেও তিনি আনন্দ প্রাপ্ত হন না।

উর্ব্বশী প্রথম তাঁহাদের পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে কথোপকথনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, তাহাতে কোনও লাভ নাই; তাঁহাকে পুরূরবা আর প্রাপ্ত হইবেন না। পুরূরবার নির্ব্বন্ধাতিশয় নিমিত্ত যখন পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ কথা হইতেছে, উর্ব্বশী ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য পুরূরবার দেবলোকে জন্মের কথা তুলিলেন। দেবগণ যে তাঁহাকে দস্যু-হত্যার জন্য যত্নপূর্ব্বক লালন পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন পুরূরবা দেবলোকে অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার ক্রীড়ার কথা বর্ণনা করিলেন। পাছে এই বর্ণনায় উর্ব্বশীর মনে কিঞ্চিৎমাত্র ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়, এই ভয়ে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, উর্ব্বশী ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার প্রণয়পাত্রী ছিল না। উর্ব্বশীকে তিনি একান্তমনে ভালবাসিয়াছিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তায় সময় পুরূরবা পুত্রের কথা তুলিলেন। উর্ব্বশীর যে গর্ভ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দেবভক্ত, সৎকর্ম্মী পুত্রের আশা করিয়াছিলেন। যাহাতে ঐ পুত্র রক্ষিত হইয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়, এই প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে উর্ব্বশী স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার গর্ভে পুরূরবার পুত্র জন্মিয়াছে। এই কথা শ্রবণমাত্র পুরূরবার নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। "কবে ঐ পুত্র পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে"—ইহাই তাঁহার প্রথম প্রশ্ন। তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে যে উর্ব্বশী রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশীর প্রীতি-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সেই জন্য তিনি বলিলেন, "কে একমনো-বিশিষ্ট দম্পতীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে?" পুরূরবা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার পুত্র না থাকায়, তাঁহার অবর্ত্তমানে কে পিতৃকুলে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবে, এই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। উর্ব্বশীর নিকট নিজ পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া, উর্ব্বশীকে শ্বশুর-কুলের মঙ্গলার্থিনী জানিয়া বলিলেন, "এক্ষণে (তোমার) শ্বশুর-কুলের অগ্নি (তোমার জন্যই) প্রজ্বলিত হইল।" পুরূরবাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া উর্ব্বশীর মনও একটু ব্যাকুল হইল। তিনি পুরূরবাকে বুঝাইতে লাগিলেন। "স্ত্রীর জন্য কাঁদিতে নাই; কারণ, তাহাদের হৃদয় বন্য ব্যাঘ্রের মত। তাহাদিগের সহিত সখ্য চিরদিন থাকে না। তোমার পুত্রকে আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তুমি আমাকে পাইবে না। তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।" পুরূরবা উর্ব্বশীর নিকট এইরূপ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলে, শান্ত না হইয়া, বরং আরও কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয়া চলিয়া গেলেই তিনি নিদ্রে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্যাঘ্রসঙ্কুল কোনও পর্ব্বতে দেখা হইয়াছিল। সে কালে

বিশ্বাস ছিল, যাজ্ঞিক, দেববিশ্বাসিগণ মৃত হইলে আকাশে পিতৃ (অর্থাৎ যম) লোকে গমন করেন, এবং পাপিগণ নিম্নে অন্ধকারময় নির্ঋতি লোকে গমন করে। পর্ব্বতের পদই প্রকৃতপক্ষে নির্ঋতি লোক। পুরূরবা তথায় পতিত হইলে, ব্যাঘ্রগণ তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিবে। এই কথায় উর্ব্বশী বড়ই ভীতা হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্য মরিও না; পর্ব্বত হইতে পড়িও না। ব্যাঘ্রগণ তোমায় ভক্ষণ না করুক।" মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মর্ত্ত্যলোকে যে চারি দিন বাস করিয়াছিলাম, সে কয় দিন দিবসে একবারমাত্র জলবিন্দু পান করিতাম।" পুরূরবা তথাপি তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আসিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন উর্ব্বশী বলিলেন যে, "দেবগণ তোমাকে মৃত্যুবন্ধু করিবেন, বলিয়াছেন; তোমার পুত্র সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে যজ্ঞ করে। অতএব যখন তুমি পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গে আসিবে, তখন আনন্দে কালযাপন করিবে।"

দেবতাদিগের দেশকে অমরলোক বলে। ঋগ্বেদের সায়ন-সম্মত ব্যাখ্যা মতে, ৩৩ জন দেবতার মধ্যে ১১ জন দিব্যলোকে, ১১ জন অন্তরিক্ষে, এবং ১১ জন পৃথিবীতে আছেন। অতএব, পৃথিবীতেও দেবলোক আছে। এই দেবগণ বসু নামে বিখ্যাত। বসুগণ যেখানে বাস করেন, তাহাই অমরলোক। ইহাকে অমরলোক বলিত কেন? মনে হয়, যেখানে বার মাস অত্যন্ত শীত, সেখানে জীব জন্তু মরিয়া পচিয়া যায় না, সেই দেশকেই বৈদিক যুগে বোধ হয় অমরলোক বলা হইত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবজন্তু মরিলে অল্প কালের মধ্যেই পচিয়া যায়; সেই জন্য উহাকে মর্ত্ত্যলোক বলা হইত। হিমালয়ের পর পারে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক অবস্থিত; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেখানে মৃতদিগের দেহ অগ্নিসংস্কার না করিয়া রক্ষা করা হইত। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি উপায় দ্বারা মৃত দেহ নষ্ট করা হইত। উর্ব্বশী-পুরূরবা সূক্তে দেখি, দেবগণ পুরূরবাকে আশ্বাস দিয়াছেন—তাঁহারা যেমন, তিনিও সেইরূপ মৃত্যুবন্ধু হইবেন। ইহার দুই অর্থ হইতে পারে; মৃত্যু, অর্থাৎ যমের তিনি মিত্র হইবেন, কিংবা মৃত্যুর সহিত তাঁহার দেহ যুক্ত হইয়া থাকিবে। ইহা হইতে মিশরদেশীয় মমীর কথা মনে হয়।

ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই, পিতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া পিতৃ-

লোকে নীত হইয়াছেন; অপর কেহ কেহ অগ্নিদগ্ধ না হইয়াই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। (১) যেসোক্ত পিতৃগণ বোধ হয় পৃথিবীর দেবলোকবাসী ছিলেন। অনুমান করি তাঁহাদের মধ্যে অগ্নিসৎকারের প্রথা প্রচলিত ছিল না। মৃত হইলে দেহকে রক্ষা করা হইত। এইরূপ অবস্থায় দেহ রক্ষিত হইলে, মনে হয়, মৃত্যুবস্তু নাম দেওয়া হইত। শীতপ্রধান দেবলোকেই ইহা সম্ভব ছিল।

পুরূরবাকে ঐড় নামে অভিহিত করায়, তিনি ইড়ার পুত্র, এইরূপ ধারণাই প্রথম হইয়া থাকে। কিন্তু ঋগ্বেদে ইড়াকে কোথাও মনুর কন্যা বা পুত্র বলা হয় নাই। যত দূর দেখা যায়, বৈদিক যুগে তিনটী বাক্‌দেবীর মধ্যে ইড়া অন্যতমা। ইড়ার পদে মনু প্রথম অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বর্ণিত আছে। এই সকল হইতে অনুমান করি, পুরূরবা ইড়দেশের লোক বলিয়া ঐড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইড় ও উরু দেশ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতরূপে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

মল্লারিসেবক

প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে মধ্য-যুগে ভারতবর্ষে অনেক প্রকার রহস্যপূর্ণ উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে কল্পনার অপ্রতিহত প্রভাবে কতকগুলি উপাসনা এতই অদ্ভুত-কর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বিস্ময় ও হাস্যরস উভয়ই যুগপৎ আবির্ভূত না হইয়া যায় না। ঐ যুগে উদ্ভাবিত উপাসনাসমূহের মধ্যে অনেকগুলির মূলে বেদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্বকীয় উপাস্য দেবতার মোক্ষদাতৃত্ব এবং সৃষ্টিসংহার-কর্তৃত্ব-স্থাপনের অভিপ্রায়ে উপাসকগণ বেদমন্ত্র উপস্থাপিত করিয়া অনুকূল ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা "মল্লারি-দেবের" উপাসক সম্প্রদায়ের মত বিবৃত করিব।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে "জন্মুমর" নামক নগরে একবিংশতি দিবস বাস করিবার পর নিজ সমীপে সমাগত

---

(১) যে অগ্নিদগ্ধাঃ। যে। অনগ্নিদগ্ধাঃ
মধ্যে। দিবঃ। স্বধয়া। মাদয়ন্তে। ১০।১৫।১৪

যে সকল (পিতৃগণ) অগ্নিতে দগ্ধীভূত, (ও) যাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ হন নাই, (তাঁহারা) দিব্যলোকে স্বধা দ্বারা তৃপ্তি প্রাপ্ত হন।

তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ, তোমরা প্রভাত-সময়ে যে প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান কর, উহা কি বেদসম্মত? অনন্তর ব্রাহ্মণগণ স্বকীয় উপাসনার সমস্ত বিবরণ শঙ্কর-সমীপে প্রকাশিত করিলেন।

হে স্বামিন্! আমাদের বংশানুক্রমে এই উপাসনা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ভগবান্ পরমেশ্বর মল্ল-নামক অসুরকে নিহত করিয়া নর্ম্মদে মল্লারি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জগদুৎপত্তি-স্থিতি-কারণ তাঁহার সেই মূর্ত্তি এই স্থলেই আবির্ভূত হইয়া অদ্যাপি রহিয়াছে। আমরা প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার বাহনস্বরূপ কুক্কুরের বেশভাষা-যুক্ত হইয়া অর্থাৎ কুক্কুরের মত কণ্ঠে বরাটিকা-ধারণ এবং ভুক্ ভুক্ শব্দ করিয়া ত্রিকালেশ্বর ভগবান্ মল্লারির প্রীত্যর্থ স্তবাদি পাঠপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতেছি। তাঁহার অনুগ্রহে প্রতিদিন আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমস্ত জগৎ তাঁহারই উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, আমরা এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত আমরা কিছুই চাই না; কারণ, তিনিই সর্ব্বাত্মক। বেদেও মল্লারির সর্ব্বব্যাপকত্ব ও তদ্বাহনের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—"শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ"। অতএব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ আচারের কিছুতেই অন্যথা করিবার যো নাই। তুমিও শিষ্যগণের সহিত পরম মুক্তির উপায়স্বরূপ আমাদের এই আচার গ্রহণ কর, তোমার ধারণের উপযুক্ত বরাটিকা এখনই দিতেছি। এই কথা শুনিয়া আচার্য্য স্বামী বলিলেন,—হে মূঢ়াত্মা! তোমার মত সঙ্গত নহে, মল্লারি জগতের কারণ, এ কথা বেদবিরুদ্ধ; সুতরাং স্বীকার্য্য নহে। বেদে কুক্কুর-বাহন মল্লারি নামক রুদ্রাংশবিশেষ প্রসিদ্ধ আছেন, সত্য; কিন্তু "শ্বভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার স্তব বিহিত হয় নাই, একাদশ রুদ্রের স্তব করা হইয়াছে। কারণ, উহার পূর্ব্ব-বাক্যে রুদ্রের স্তব বিহিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী "শ্বভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যেও তাহাদেরই সর্ব্বব্যাপকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্বপতি শব্দের অর্থ, শ্বান, শবর প্রভৃতি বৈবস্বত-বংশ-সম্ভব কতিপয় ব্যক্তি। অথবা, শ্বপতি অর্থাৎ কুক্কুরের বিক্রমার্জ্জিত মাংসভোজী, অর্থাৎ ব্যাঘ্র। অথবা শ্বপতি শব্দের অর্থ—শ্বমাংসভক্ষণশীল চাণ্ডাল। অতএব, মন্ত্রের অর্থ—যে সকল রুদ্র কুক্কুরের এবং চণ্ডালেরও হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপক রুদ্রদিগকে নমস্কার করি। ইহাতে কুক্কুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই। কুক্কুর নিকৃষ্ট পশু, তাহাদের স্পর্শে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে মৃত্তিকা-স্নানের বিধান আছে; তোমরা তাহাদের বেশভাষা-রূপ চিহ্ন ধারণ করিয়াছ কেন? তোমরা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মরহিত

হইয়া পুরুষপরম্পরায় এই বেদবিবদ্ধ আচরণ করিতেছ; অতএব, তোমাদের ব্রাহ্মণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমাদের জন্য যে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইবে, তাহাও স্থির করিতে পারি না। তোমাদিগকে দর্শন করিলেও সূর্য্যদর্শনজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব, তোমাদের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনই কর্ত্তব্য। শঙ্করের মুখে এই কথা শুনিয়া মল্লারি-ভক্তগণ পাপ-পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই, একমাত্র শঙ্কর-করুণাই ভরসা, এই মনে করিয়া আচার্য্যের চরণতলে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় নিপতিত হইয়া অনুনয় করিতে লাগিল। তখন শঙ্করাচার্য্য তুষ্ট হইয়া পাপীদিগকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ করিবার জন্য পদ্মপাদাচার্য্য ও হস্তামলক প্রভৃতি শিষ্যবর্গকে আদেশ করিলেন। অনন্তর আদিষ্ট শিষ্যগণ কুক্কুরবেশধারীদিগের শিরোমুণ্ডন, মহানদীতে স্নান, অযুত মৃত্তিকা-স্নান প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন, এবং কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণ্য-মার্গের পথিক করিলেন। তখন সেই অমুমল্লপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য স্বামীর মুখ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য হইল, এবং স্নানাদি-সৎকর্ম্মশীল হইয়া পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইল।

যেখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঘেউ-ঘেউ, ভুগ্-ভুগ্ প্রভৃতি অপূর্ব্ব প্রাতঃ-কৃত্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই অমুমল্লপুর বর্ত্তমান সময়ে কোথায় কি নামে পরিচিত? মল্লারিদেবের আকৃতিই বা কেমন? তথাকথিত বর্ণনায় তিনি কুক্কুরবাহন, এইমাত্র পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাঁহার হস্তপদাদি-বিন্যাসের বিবরণ কিছুই জানা যায় না। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ বটুক-ভৈরব সারস্বেয়-সমন্বিত বলিয়া আপদুদ্ধার-স্তবোক্ত ধ্যানে কথিত হইয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রসারে বটুক-ভৈরবের প্রয়োগে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার ধ্যান উক্ত হইয়াছে; ইহাদের কোনটিতেই কুক্কুরের কথা নাই। সুতরাং বেদোক্ত মল্লারিই তন্ত্রে আসিয়া বটুক-ভৈরব-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা স্থির করা সমস্যার বিষয় হইয়াছে। কুক্কুরবাহন মূর্ত্তি পাইলে, ঐতিহাসিকগণ উহাকে তন্ত্রোক্ত দেবতা অথবা বেদোক্ত দেবতা বলিয়া স্থির করিবেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

মল্লারিদেবের অদ্ভুত উপাসনা-প্রণালী কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এই মত বিলুপ্ত হইয়াছে, এইমাত্রই বুঝা যায়। এই উপাসনা প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল; সুতরাং পৃথিবীর অন্যত্র উহার প্রচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ভাস্করায়-কৃত সৌভাগ্য-ভাস্করে (১) মল্লারির কিছু কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ভাস্কর-বর্ণিত মল্লারি কুলুর-রাজ নহেন, তিনি অশ্ব-সমারূঢ়। ভাস্করের মতে, "মণিমল্ল" নামক দৈত্যকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ শিব পৃথিবীতে অশ্বারূঢ়-রূপে সমাগত হইয়া "মল্লারি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই আবার "মার্ত্তণ্ড-ভৈরব" নামেও কথিত হইয়াছেন। এই বিষয়টি মহারাষ্ট্র দেশে "তন্ত্রচিন্তামণি" নামক তন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। মল্লারি ত্রিপুরাদেবীর উপাসক ছিলেন, এ কথাও মল্লারি-মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

ভালবাসার আর এক ধারা।

(Another way of Love—by *R. Browning*,)

১

বসন্ত হয়নি অবসান;
তবু বসন্তের শোভা যদিও অতীত;
শেষের গোলাপগুলি সেরা সেরা যত
তখনো হয়নি বিকশিত
যুবা এক মোর পরিচিত
(কহিব না কি নাম তাহার,
উৎসুক শ্রবণ তাহে আছে কার
নামে তা হইবে প্রকাশ)
বসন্তের লয়ে আনন্দ,
অধরে হাসির আধ ভাণ
যেন ক্লান্তি-দুঃখ-অপনীত,
কহিলা গভীর স্বরে পুরুষ-উচিত—
"ভাল যদি নাহি লাগে বসন্ত তোমায়,
সৃষ্টি আর নাহি রয় তাহাতে আমায়,
অধিক কি আছে তার ভাঙ্গিবার?"

---

(১) সৌভাগ্য-ভাস্কর ১৫৮ পৃঃ; ভাগে বিদ্যাসাগর প্রেস মুদ্রিত।

২

এক কথা, বাছি, বিনোদায়,
সত্য বটে, শুধু প্রেম, মৈচিত্র্য-বিহীন,
বিষম বিরাগ আনে পুরুষের মনে
নবরসে, এ বসন্ত; দীন ;—
বটে তায় কোরক-নবীন
রহে যাহা আলো অবলোক,
সেগুলির ফুটিলে উন্মেষ,
অভিনব মাধুরীর লেখ
মাঝে তার আসিবে কেমনে—
বিসে তারা তুষিবে তোমায় ?
সৌরভে, না আবীর-আভায় ?
যথাপূর্বং—যথাপূর্ব্ব—সে ত সেই হায় !
তবে যাও—যাই ভাবি অল্প কি অধিক—
মধুকুঞ্জ, তব চয়ে, শ্রীহীন যে দিক্,
এখন তা করি যদি ঠিক—তাই ঠিক

৩

তার পর, কৌতুক-বিলাসে,
কুসুম-সৌরবে যদি বসন্ত আমায়
মুগ্ধ লোলে সুষমায় পূর্ণ সমুচ্ছ্বাস,—
ফুলে ফুলে ফুল্ল চারিধার,
নাহি শুধা কণ্টক-পীড়ার—
শুধু দল নিবিড় কোমল,
শুধু পুষ্প মধু চল-চল,
যত্রে যথা সুধা সুমধুর
সুমধুর, চমকে চকল—
তখন কৌতুক-অভিলাষে,
বসন্ত যদি সে ভালবাসে
বিরাগ নাহিক তার সে রূপে সে বাসে ;—
ধরিবা, বুঝিয়া রীতি পুরুষ-নৃভার,
নিবারিতে নব ভাস, করে ব্যবহার
কণ্টক অমনি—তা সে করিবে বিলায়।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা—প্রথম বর্ষ ; প্রথম সংখ্যা ; বৈশাখ। এই নবপ্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রখানি 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লা এম্. এ. বি. এল্., মৌলভী মোজাম্মেল হক বি. এ. প্রভৃতি কয়েক জন মুসলমান সাহিত্যিকের উদ্যোগে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টিসাধনকল্পে কলিকাতায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সমিতির অবস্থা,—উন্নতি ও অবনতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় মৌলভী আবদুল করিম বি. এ. সমিতির সভাপতি, খাঁ বাহাদুর মৌলভী আহসান্ উল্লা এম্. এ. ও 'মোহাম্মদী' ও 'আল্-এসলামে'র সুযোগ্য সম্পাদক মৌলভী মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্থায়ী সভাপতি, এবং মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বি. এ. সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় দুই বার 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে'র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 'মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্. এ, বি. এল্. সভাপতির আসনে বরিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহুসংখ্যক সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেক প্রখ্যাতনামা হিন্দু-সাহিত্যিকও সভায় আগমন করিয়াছিলেন।' সমিতির উদ্দেশ্য,—'(১) বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টিসাধন। (২) আরবী, পারসী ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ-প্রকাশ। (৩) প্রাচীন মুসলমান-বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। (৪) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের গ্রাম্য ও সাধু পুরুষদিগের (ওলীদিগের) জীবনী-সংগ্রহ ও প্রকাশ। (৫) বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রাচীন বংশাবলীর ও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ-সংগ্রহ। (৬) বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে মাসিক, সাময়িক ও সপ্তাহিক পত্রের বহুল প্রচার। (৭) সদ্গ্রন্থের প্রচারকল্পে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহপ্রদান। (৮) সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন।'

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদও এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মুসলমান সাহিত্য-সমিতি দেশ-কাল-পাত্রের প্রয়োজন অনুসারে মাসিকপত্রাদির বহুল প্রচার, সদ্গ্রন্থের প্রচারে উৎসাহদান ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টাকে আপনাদের উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত করিয়া সমীচীনতার পরিচয় দিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ সমিতির শেষোক্ত উদ্দেশ্যসাধনে সাহচর্য্য করিলে, উভয় পক্ষের চেষ্টায় পবিত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মৈত্রীবন্ধন আরও সুদৃঢ় হইতে পারে।

মুসলমান সাহিত্য-সমিতি বাঙ্গালার জাতীয়তার প্রতিপালন সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা এই বঙ্গ সাহিত্যের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। ইহাই বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব-স্থাপন ও সংহতি-প্রতিষ্ঠার সুপ্রশস্ত পথ। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান এক মার দুই

সন্তান। হরি-হরের মত হিন্দু ও মুসলমানের সমবায়ে বাঙ্গালার 'গণ'-বিগ্রহ গঠিত হইয়াছিল। আমাদের ধর্ম্মগত ভেদের মধ্যে রাজনীতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক অভেদ ছিল। আমরা এক দেশে বাস করি, এক দেশমাতার অন্নে ও জলে পুষ্ট হই, আমাদের রাজনীতিক স্বার্থ অভিন্ন, আমরা একই আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় মুক্তির পথে যাত্রা করিয়াছি। বাঙ্গালার মুসলমান ও হিন্দু একই ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত চেষ্টায়, প্রতিভার দানে ও রসিকের আনুকূল্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। আমরা বহু বার বলিয়াছি,—'নানান দেশে নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?' বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হইতে পারে না। সার্ব্বভৌমিক হিন্দী যেমন বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষণীয় হইলেও মাতৃভাষা হইতে পারে না, উর্দ্দুও তেমনই বাঙ্গালী মুসলমানের উপজীব্য হইলেও মাতৃভাষা হইতে পারে না। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত আবদুল করিম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালার মুসলমানকে ইহা বুঝাইয়া আসিতেছেন। সে-দিনও প্রসিদ্ধ সুলেখক মৌলভী আবদুল গফুর সিদ্দিকী 'সাহিত্যে' বাঙ্গালার মুসলমানকে বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া বরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গালায় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের পুরুষপরম্পরার বাসভূমির—জন্মভূমির ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই ভাষাকে বিবিধ উপায়ে পুষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা আমরা মুসলমানের অভিব্যক্তি ও উভয় পক্ষেরই সৌভাগ্যসূচক বলিয়া মনে করি।—তাঁহাদের পুণ্যব্রত সফল হউক, মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধ হউন, হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা বিশ্বে নন্দিত ও বন্দিত হউক। ইহা অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ত খুঁজিয়া পাই না।

'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র 'নিবেদনে' লেখক লিখিয়াছেন,—'জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক। আমাদের জাতীয় সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি এমন সাহিত্য, যাহাকে দণ্ডযন্ত্র (lever) রূপে অবলম্বন করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারিব।' ইহাই জাতীয় জীবনের বড় কথা। এই বড় কথাটীকে ছোট মনে করিয়াই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছি। সাহিত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আমরা যদি আবার জাতিস্মর হইতে পারি, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদিগকে ভিক্ষাভাণ্ড-করে বিশ্বের দরবারে ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ বাঙ্গালার শুভ দিন—বাঙ্গালার মুসলমান এই মূল-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

লেখক বলেন,—'প্রথমতঃ, আমরা চাই—আমাদের * * গৌরবে অমর কীর্ত্তিগাথা বাংলা বীণার সুরে গাহিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ভাবের উদ্দীপনা, কর্ম্মের প্রেরণা আনিতে। তাই চাই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। দ্বিতীয়তঃ, আমরা চাই—বঙ্গীয় মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে অমর-সেতুস্বরূপ। বাঙ্গালী মুসলমান এই সেতুর অভাবে তাহার অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে মিলাইতে পারিতেছে না। আমাদিগকে এই সেতু গড়িতে হইবে। বাঙ্গালায় কত পীরের আস্তানা, কত জিয়ন্তগ, কত

প্রাচীন-বংশ-প্রবাদ, কত লৌকিক কিংবদন্তী, কত প্রাচীন পুঁথি তাহাদের অতীত কাহিনী বলিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে! শ্রোতা কোথায়? আমরা চাই—সেই সকল কাহিনী শুনিতে ও শুনাইতে। তাই চাই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। তৃতীয়তঃ, আমাদিগকে আমাদের ঘরের ভাল জিনিসগুলির বিষয় আমাদের প্রতিবেশীদিগকে জানাইয়া তাহাদের মন হইতে আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা দূর করিতে হইবে।'

লেখকের তৃতীয় নিবেদন সম্বন্ধে আমাদের অকপটে বক্তব্য এই যে, মুসলমানদিগের সম্বন্ধে 'হীন ধারণা' বাঙ্গালী হিন্দুর নাই। হয় ত আমরা 'সুস্পষ্ট ধারণা'য় বঞ্চিত, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও, রাজনীতিক স্বার্থ-সংঘাতের পূর্ব্ব যুগেও, বাঙ্গালা দেশে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধে হীন ধারণা ছিল না।

তাহার পর লেখক বলিয়াছেন,—'চতুর্থতঃ, যেমন চাষের প্রথম অবস্থায় ধান্য-শস্যের চারার সহিত আগাছা জন্মিয়া শস্যের চারাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, সেইরূপ প্রত্যেক সাহিত্য-যুগের প্রারম্ভে অনেক অসার গ্রন্থের প্রচার হইয়া থাকে। আমরা চাই—এই সমস্ত অসার গ্রন্থকে সমালোচনা দ্বারা দূর করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রকে পরিষ্কার করত সৎ-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে।'

ইহাও আবশ্যক। সমালোচনার অভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্য অপথের পথিক হইতেছে। মুসলমানের সাহিত্য-প্রচেষ্টা সূচনা হইতে এই বিষয়ে অবহিত হইলে সাহিত্যের যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে।

এই পত্র-প্রচারের ৫ম উদ্দেশ্য,—'লোকলোচনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন মুসলমান কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে সাহিত্য-ব্রতে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা। এরূপ পত্রের প্রয়োজন আছে, নিবেদনে তাহা সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীমতাক্ষর মোজাম্মেল হকের 'আবাহন' নামক কবিতাটী সুলিখিত। অতএব ইহা বুঝিবার জন্য গবেষণা হইতে হয় না। আশা করি ইহার উদ্দীপনা ব্যর্থ হইবে না। এই সংখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবন্ধ—'দ্বিতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ'। মোহাম্মদ মহীউদ্দীন সাহেব লিখিয়াছেন,—'আমাদের শিক্ষার পথে প্রথমেই ভাষা-সমস্যা আসিয়া পড়ে। আরবী আমাদের ধর্ম্মভাষা, পারসী আমাদের সভ্যতাভাষা, উর্দ্দু আমাদের ভারতীয় সাময়িক ভাষা, ইংরাজি আমাদের রাজভাষা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই পাঁচ ভাষারই সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর সম্বন্ধ আছে। তাই আমরা আমাদের ছেলেপুলেদিগকে ছোটবেলা হইতেই একবারে পাঁচ কলমে মুন্সী করিতে চাই।' কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। ইহার ফলে মুসলমান শিক্ষার্থী কোনও ভাষাই ভাল করিয়া শিখিতে পারে না। লেখক এই বিষম সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'যে স্কুল কলেজের ছাত্র, কি মাদ্রাসার ছাত্র, সকলেরই পক্ষে বিদ্যারম্ভ হইবে বাংলা ভাষায়। আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্ত্তায়, ভাব-ভালবাসায়, চিন্তা-কল্পনায় ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা বোঝ করিয়া বুঝিতে চাহেন না।' তাহার পর লেখক ইতিহাসের

উদাহরণ দিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই; শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্ম্মভাব, আর কতকগুলি শব্দ। তাই ফার্দৌসী, ফারুকী, সাদী, হাফেজ, নিজামী, জামী, সানাঈ, রুমী-প্রমুখ কবি ও সাধক-বুলবুলগুলের কলতানে আজ ইরানের কুঞ্জ-কানন মুখরিত! যে দিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরাজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যত দিন পর্য্যন্ত জর্ম্মাণিতে ফরাসীভাষা অনন্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, তত দিন পর্য্যন্ত জর্ম্মাণির জাতীয়জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান ভাইদের সংখ্যা এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত, আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্থানী আলেমগণ উর্দ্দুভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ, তফ্‌সীর, হেকা, হদীস, তসউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া, কিংবা এতদ্বিষয়ক আরবী, পার্সী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইস্‌লামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চারি জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত, আমাদের মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্ম্মগ্রন্থের অমর্য্যাদা করা হয়, ইত্যাদি রূপ প্রলাপ-উক্তি করিতে ছাড়েন না।' তাই লেখক ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন,—'স্কুলের ন্যায় যে পর্য্যন্ত বাংলার মাদ্রাসায়ও বাঙ্গালাভাষা অবশ্যপাঠ্য দেশীয় ভাষা রূপে স্থান না পাইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা যাইবে না। যে পর্য্যন্ত আরবী-পার্সী-জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না।'

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন,—'হিন্দুর রামায়ণ আছে; মুসলমানের "আমীর-হামজা" আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে; মুসলমানের "ফাসানেয়-আজিয়া" আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে; মুসলমানের "মারফতী-গান" আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে; মুসলমানের "পদ্মাবতী" আছে। আবদুল গফুর সিদ্দিকী হাজারের বেশী মুসলমানের লেখা পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন। ** এই পুঁথি-সাহিত্যই বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের আনন্দ অধিকাংশ সম্পাদন করিতেছে। এখনও মাঝের মাঝি হইতে গৃহস্থের বৌ ঝি পর্য্যন্ত তাহাদের দিনের হাড়ভাঙ্গা কাজ সারিয়া পুঁথি শুনিতে বসে।' লেখক এও করিয়াছেন,—'দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ন্যায় কে আমাদের এই পুথি-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে?' মুসলমান সম্প্রদায়ের এই নব উদ্যোগ অচিরে তাঁহাদের অভীষ্ট ঐতিহাসিকের সৃষ্টি করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

লেখক 'পুথির ভাষাকে অতীত যুগের জীবকঙ্কালের ন্যায় কেবল মাখিয়া দিবার' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সাধু ভাষায় 'আধুনিক বাঙ্গালায় মুসলমান সাহিত্য রচনা' করিবার পক্ষপাতী। লেখক মুসলমানকে অনুরোধ করিয়াছেন,—'আমাদের মিতনের শত বছর মধ্যে আর এই

ভাষার বাধা আসিত না।' লেখক হিন্দুকেও অনুরোধ করিতে বিস্মৃত হন নাই ;—'ভাই হিন্দু, তোমার নাটক নভেলের মধ্যে মুসলমানের, শুধু মুসলমানের কেন, হিন্দু মুসলমানের, বাদশাহ বেগমদিগের কালীঘাটা মূর্ত্তি কালীমাখা কল্পনার দ্বারা আঁকিয়া, আর তাহার স্বপ্নহৃদয়ে বেদনা দিও না।' এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে। মিলনের মঙ্গল-মুহূর্ত্তে পুরাতন কাহিনী ঘাঁটিয়া কোনও লাভ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলি, 'তথাস্তু'। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের স্বার্থের অনুশাসন ইতিহাসের সত্যকে মিথ্যই লুপ্ত করিতে পারিবে না। ঐতিহাসিক সত্যেও আমাদের উভয় জাতির স্বার্থ রহিছে। সে স্বার্থের মূল্যও জাতীয় জীবনে অল্প নহে। জাতীয় জীবনে হিন্দুরও দাবী আছে; মুসলমানেরও দাবী আছে। সে সকল দাবী ছাড়াইয়া কোনও পক্ষেরই কোনও লাভ নাই। বিশেষতঃ, এই ভেদ-ভিন্ন দেশে যাহা হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রতিবন্ধক ও সদ্ভাবের পরিপন্থী, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহা দেশের কল্যাণকামী মাত্রকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইতিহাস ইতিহাসই থাকিবে। আশা করি, উভয় পক্ষ এই সার-সত্য স্মরণ করিয়া, সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া মিলনের পথে মুক্তির তীর্থে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

লেখক বলিয়াছেন,—'এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান বর্দ্ধ অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অধিক পক্ষপাতী।' লেখকের এ 'ফতোয়া' আমরা—হিন্দু কখনই স্বীকার করিব না। রামমোহনের যুগে হিন্দু যে সাহিত্যের পত্তন করিয়াছিল, খ্রীষ্টানীর বিরোধই তাহার ভিত্তি ছিল। বাঙ্গালী হিন্দু খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের অধিক পক্ষপাতী নহে, তবে তাহারা খ্রীষ্টানধর্ম্মের সহিত অধিক পরিচিত বটে। খ্রীষ্টপন্থীর রচিত ইংরেজী সাহিত্য ও খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রচারের প্রভাবে ইংরেজীনবীশ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই খ্রীষ্টধর্ম্মের যে পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই কোনও পক্ষেরই আন্তরিক অনুরাগের স্থল নহে।

মুসলমানী বাঙ্গালা সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন,—'তাহা নানা প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। * * * এখন মৌলানা, মৌলভী ও পণ্ডিত, যিনি যত্নসহকারে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিছু লিখিতেছেন, তিনি সাধু ভাষা ব্যবহার করিতেছেন।' ইহা আমার কথা বটে। বাস্তবিক, 'যশোহর-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র ভাষা দেখিয়া আমরা বিস্মিত—আশান্বিত হইয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার দলের প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন,—'বর্ত্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (Style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে—এক দল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘসিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাঁই "সবুজপত্রে"র সম্পাদক প্রমথ বাবু। ইঁহাদিগকে চলমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল নায়েক দল। ইঁহারা ভাষার কোন পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না। "সাহিত্য" পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইঁহারা প্রাচীনপন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয়কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইঁহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব?' লেখক রবিবাবুকেও এই দলের অন্তর্গত মনে

করেন। কিন্তু রবিবাবু বিষয়বিশেষে বিভিন্ন রচনা-নীতির প্রয়োগ করেন। তিনি বাউলের গানের ভাষায় 'তাজে'র ছবি আঁকেন নাই। তিনি চলিত সহজ ভাষার পক্ষপাতী হইলেও, স্বয়ং বক্তব্য ও ভাবের ওজনে আপনার ভাষা বাঁধিয়া লন। লেখক 'সাহিত্য'কে 'নাবেক দলে' ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহা আমরা শিরোপার মত শিরোধার্য্য করিলাম। 'সাহিত্য' নিশ্চয়ই 'ভাষা'র 'পরিবর্ত্তন' সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বিকৃতি ও প্রাদেশিকতা, অপপ্রয়োগ, বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরেজী রচনা, অবোধ্যতা, ইংরেজী রচনা-রীতির অনুসরণে সৃষ্ট নিরর্থক জটিলতা, ভাবের ব্যভিচার, ভাষার অপচার—এক কথায় মাতৃভাষায় অসিদ্ধ ও বিদেশী ভাবায় ভোরপুর, বোসধোয়াগী, যথেচ্ছাচারীর অত্যাচার সাহিত্যেও অসহ্য; 'সাহিত্যে'র অসহ্য। 'সাহিত্য' যত দিন বাঁচিবে, তত দিন এ বিষয়ে সে যেন এইরূপ অসহিষ্ণু হইয়াই থাকিতে পারে। লেখকের বিশ্বাস, কালে কলিকাতার ভাষাই প্রাধান্য লাভ করিবে। আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। অবশ্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে আলোচনার স্থান নাই। লেখক মুসলমান লেখকগণকে মধ্য-পথ অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ অবশ্য মন্দ নহে। তিনি যে ভাষায় পরামর্শ দিয়াছেন, সে ভাষা কিন্তু সাধু ভাষা।

'বড় গাছের তলায় ছোট গাছের মত যদি আমরা শুকাইয়া মরিতে না চাই, তবে আমাদিগকে বড় হইতেই হইবে। এই বড় হইবার জন্য সাহিত্য চাই।' হিন্দু মুসলমান উভয়কেই আমরা এ কথাটী মনে রাখিতে বলি।

লেখক উপসংহারে প্রশ্ন করিয়াছেন,—'আসিবে কি সে দিন, যে দিন বাঙ্গালার মুসলমান তাহার স্পেনীয় মুর বা আরবীয় সারাসেন ভ্রাতৃগণের ন্যায় ধর্ম্মে মহীয়ান্—জ্ঞানে গরীয়ান্ হইয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাহারও নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারিবে?' আমরা আমাদের মহাকবির ভাষায় বলি,—'আসিবে, সে দিন আসিবে!'

ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'আঁধার যুগের আরব' সুলিখিত সন্দর্ভ। মরুচারী আরব কবির সুখদুঃখাঙ্কিত কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তালেবউদ্দীন আহাম্মদের 'বক্ষের ধন' নামক গল্পটী মন্দ নহে। 'T'র ঠকামী' এরূপ পত্রের যোগ্য নহে। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের হাফেজ হইতে অনূদিত 'প্রেমবন্ধন' উল্লেখযোগ্য। সেখ ফজলল করিম 'অন্তিম পিপাসা' নামক পদ্য-গল্পে সহজ ভাষায় যে করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। ইনি কবিতায় প্রসাধনে আরও অবহিত হইলে ভাল হয়। 'ভাল জল—টল-টল' পাদপূরণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'টল-টল' বিশেষণ যেমন নিরর্থক, তেমনই অস্বাভাবিক। আমাদের মনে হয়, অষ্টম শ্লোকটী বর্জ্জন করিলে কবিতাটীর কোনও ক্ষতি হইত না। কাজী আবদুল মজুদের 'ভুল' নামক গল্পে ৫১ পৃষ্ঠায় শত্রুর চাচা ও তাহার দাদী শত্রুর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে উপসর্গের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ছাপাইবার যোগ্য নহে। বিবি সারা তয়ফুরের 'ফোস্তীত' নামক অনুদিত ক্ষুদ্র সন্দর্ভটী আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকে পড়িতে বলি। সম্পাদক 'মুর্শিদী গান' ও 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া লুপ্তরত্ন-উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সুফল ফলিবে। 'কোরক' দেখিয়া 'সাহিত্যে'র 'কবিতা-কুঞ্জ' মনে পড়িল। হায়! সে 'কবিতা-কুঞ্জ' শুকাইয়া গিয়াছে। এখন শুধু মনে হয়,—'তে হি নো দিবসা গতাঃ!'

ভারতী।—আষাঢ়। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্রোতের মুখে' নামক ছবিখানির ব্যাখ্যা সঙ্গে নাই। থাকিলে ভাল হইত। ইহার বিশিষ্টতা এই যে, অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতী' চিত্রকলা-পদ্ধতি'র ছাপ ইহাতে অত্যন্ত অল্প। কেবল বৃদ্ধের অঙ্গুলির বঙ্কিম ভাবে সে 'পদ্ধতি'র সংস্কার—সে উদ্ভটতার ছায়া খুঁজিয়া পাওয়া যায়। চিত্রের নারী প্রাচ্য, নয়ের যুথে একটু 'সেমিটিক' আমেজ। অবনীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ও প্যাটেন্ট চিত্রকলা-পদ্ধতিও ক্রমে স্বভাবের ও বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভোলা' গল্প-গল্প। Modern বালগোপালের ছবি। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষের 'আর্ট ও কবিত্বে'র প্রতিপাদ্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। রসের অখণ্ডতা, নির্লিপ্ততা, 'বিশ্ব-বস্তুর সীমাশুন্যিকে আকুল মনের উপর তুলে নিয়ে তার মধ্যে অসীমের সুর বাজিয়ে তোলার নাম কবিত্ব' প্রভৃতি ছোট ও বড় শব্দ ও বাক্যগুলি 'সম্পূর্ণ মৌলিক' হইলেও অত্যন্ত গুরুপাক। এই রকম রচনা 'কবিত্ব', অথবা 'আর্ট', কিংবা উভয়ের খিচুড়ী, তাহা বলিতে পারি না। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। আজ কাল নব্য বাঙ্গালী মনের ভাবের জিলিপী ঢাকিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ জটিল জালের নক্সায় ভাষার, কবিত্বের, আর্টের, দর্শনের ও এই সকলের সমাহারের 'ঝঞ্ঝীপোষ' বুনিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'একটা কিছু করো' এত শীঘ্র এমন সার্থকতা লাভ করিবে, তাহা কে জানিত! শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'খেয়ালের খেসারৎ' নামক আখ্যানটি আরও ছোট—বাহুল্য-বর্জ্জিত হইলে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিত। পিসীমা 'তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে ছিটকে ছুটে চলে গেলে'ই যথেষ্ট হইত। 'আৎকে না উঠলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষণিক মিলন' দীর্ঘক কবিতায় বিশেষত্ব নাই। পিক 'দ্বিধা-ভরে ফুকারিয়া উঠে'? সে 'দ্বিধা' কি? দ্বিতীয় শ্লোকেই যতিভঙ্গ। পরে আর চারি পাঁচটা আছে। 'ভগ্ন ললাটে দিনু এঁকে চুম্বন?' একেবারে চুম্বনের 'মিলন'!—গরম ললাটের উপর গরম অধরের বর্ণে চুম্বনের পাকা ছবি আঁকা হইয়া গেল। ইহাও বাঙ্গালার নরনারীকে ডাকিয়া শোনান হইতেছে, এবং শুনিবারও লোক জোটে! শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ইতিপূর্ব্বে জলে অনেক আলিপনা দিয়াছেন; এবার হাতে-কলমে 'জলের-আল্পনা' ধরিয়াছেন। অসমাপ্ত। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'হাত-ফেরে' আখ্যানবস্তু Realistic বটে; নূতনও বটে। তবে মনে হয়, যেন বাঙ্গালীর জীবনে বিদেশী গল্প-কল্পতরুর একটা ডালের কলম বাঁধা হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'স্বাধীন ত্রিপুরার ঠাকুরগণ' দেশবাসীকে যুগ-ধর্ম্মে দীক্ষা দিক। শ্রীযজ্ঞেশ্বরকুমার চক্রবর্ত্তীর 'মাসকাবারি'র 'সমাজচ্যুতাদের কথা' ও 'পল্লী-সভ্যতা' আলোচনার যোগ্য। মিথুন-রাগের উপাসনা সকলে করিয়া উঠিতে পারিবে না, কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অজিতকুমার অল্প পরিসরে অনেক চিত্র ও বস্তু সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচীর 'কলঙ্কিনী' সমবেদনায় স্নিগ্ধ, মানবতায় পবিত্র। পাপের পঙ্কে শতদল পদ্মের মত তাঁহার 'কলঙ্কিনী' ফুটিয়াছে। 'পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে?'—সত্য। কবি উপসংহারে বলিতেছেন,—

'একদিও পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি
পঙ্কিল পরশ ভাবি' মনে মনে পাড়িয়াছি গালি

সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর ফুটিয়ে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে।
'পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে!'

'এক দণ্ড পূর্ব্বে' তিনি 'পল্লী-কলঙ্কিনী তারা'কে কেন 'কলঙ্কের ডালি' ভাবিয়াছিলেন, এবং 'মনে মনে গালি পাড়িয়াছিলেন', তাহার কারণও আমরা এই কবিতায় পাইয়াছি।—কবির চিত্ত তখন পিশিতপিণ্ডের লালসায় কলুষিত ছিল,—তিনি নির্লজ্জ হইয়া দেখিতেছিলেন, এবং দেখাইতেছিলেন,—

'রসে-ভরা অধখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে;'
'আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্যভঙ্গী ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের!'
'দাঁড়াইল স্নানশেষে তীরপ্রান্তে বিচিত্র বসনে
উচ্ছলিত যৌবনের বন্যুরতা কসিয়া শাসনে।'

মানস-ব্যভিচারে কবির মন 'যাদুনী ভাবনা' যন্ত্র সিদ্ধিভূবতি তাদৃশী'র উদ্ভবে হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পীবরযৌবনশালিনীর প্রতীকে লালসার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। শুভ-মুহূর্ত্তে সৌভাগ্যক্রমে 'অধীরা চঞ্চলকন্যা' তাঁহার মানস-নেত্রে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া-রূপেণ সংস্থিতা', তাঁহারই দিব্য-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া দিয়াছিল। 'বাহুমৃণালের ললিত লাবণ্যভঙ্গী' যে 'আনন্দের ইঙ্গিত' করে, সে আনন্দে ও 'রমণীর বিপুল গৌরব'-অনুভূতির আনন্দে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাহুমূলের ইঙ্গিতে যে 'আনন্দ' সূচিত হয়, তাহা কবিতার বিষয় নহে। শিক্ষিত সুকবিরাও আজকাল উচ্চদরের উপাদানে গেউড়ের সৃষ্টি করিতেছেন।—কবি 'কলঙ্কিনী'র কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার পূর্ব্বোক্ত কলঙ্করেখাগুলি কি তিনি মুছিয়া ফেলিবেন না?

প্রবাসী।—আষাঢ়। শ্রীগগনেন্দ্র ঠাকুরের 'বর্ষায়' চিত্র নয়, চিত্রের আভাস। ছাপার ছবিখানি যেন বর্ষার জলে ধুইয়া গিয়াছে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য মন্দ নয়। বাঙ্গালীর একঘেয়ে জীবনের একটা সখ আঁকিবার বস্তু বটে। মেছুড়ের কাঁধের হুকের দাগটা যে একখানা লাঙ্গ গামছাও হইতে পারে, এই অনুমানের জন্য আমরা কাহাকে ধন্যবাদ দিব? গগনবাবুকে, অনুমান যন্ত্রকে, না কল্পনাসুন্দরীকে? 'মালা' রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প। রবিবাবুর কলম হইতে 'পাগলা ঝোরা'র মত গল্প ঝরিতেছে। আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অল্প, ভাবের ধারায় গল্পটি পুষ্ট হইয়াছে। একটু রোমান্টিক, একটু আধ্যাত্মিকও বটে। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'কবিত্বের ত্রিধারা' পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি ইহা নিশ্চয়ই আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল ও অধ্যাপক হীফেন্সের জন্য লেখা হইয়াছে। স্বীকার করিতে হইতেছে, এ গভীর, গুরুতর গবেষণা আমাদের মত 'ভোলা' পাঠকের জন্য নহে। 'কালো হয়ং নিরবধিঃ' বটে, কিন্তু ব্যক্তির সম্বন্ধে 'নিরবধি কালে'রও একটা 'অবধি' আছে। এ বয়সে আর মাষ্টার রাখিয়া মাসিকপত্রের প্রবন্ধ পড়িবার উপায় নাই।—প্রত্যক্ষ ভাবে,

সোজা কথায়, রূপক বাদ দিয়া, উপমার বদলে উপমেয়টাকেই খাড়া কথায় ফুটাইয়া তুলিয়া কর্ত্তব্য বুঝাইবার পদ্ধতিটা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইল। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী 'সৌখীন বাংলা লেখে' কয়েকটি সত্য কথা বলিয়াছেন। শ্রীশিবশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'হতচ্ছাড়া' চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু 'কোটা অমৃত পেপলাইয়ের কারখানা'র সংবাদ দিয়াছেন। 'আমাদের দেশে এই দেশী দেশলাইয়ের বিস্তার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।' লেখক কারখানাও ঠিকানা ছাপিলে ভাল হইত। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'কবি এ, ইর স্বাভাত্যের আদর্শ' আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। সেদিন যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গদ্যের নকলে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচী 'পৌরী' লিখিয়াছেন। ছন্দটি দুরূহ। খোদ রবীন্দ্রনাথকেও পাদপূরণ করিতে হইতেছে। দুই একটি চরণ বেশ,—'কৌতুক ঘন কেশের রাশি ঝিঙে পাখীর বাসা।' কিন্তু 'চোখের অরুচির অব্যর্থ আরাম' অত্যন্ত উৎকট, অনহ। 'হায়দ্রাবাদে উর্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে প্রকাশ,—'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সকল পুস্তক ভাষান্তরিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে উর্দ্দু ভাষা স্কুলকলেজপাঠ্য গ্রন্থাবলীতে বাঙ্গালাকে ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে। *** ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য সব পুস্তক প্রায় অনুবাদিত হইয়াছে; বোধ হয় জুলাই মাসে পুস্তক ছাপা হইয়া যাইবে। তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ইংলণ্ড, গ্রীস্ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রস্তুত হইয়াছে। বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিবিজ্ঞান জুলাই মাসে শেষ হইবে। সরকারী অনুবাদ-কর্ম্মালয় ছাড়াও অপর অনেকে পুস্তক ভাষান্তরিত করিতেছে। একটি লোক এরিষ্টটল্ ও তাঁহার তর্কবিজ্ঞান বিষয়ক দুই ভাগের পুস্তক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা কি করিবে?' লেখক 'সাহিত্য-পরিষদে'কে আহ্বান করিয়াছেন। 'পরিষদে ত-গৃহবিবাদ আরও হইয়াছে'ও বলিয়াছেন। 'গৃহবিবাদ' না থাকিলেও একটা পরিষদে সব কাজ হইতে পারে না। এ জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা আবশ্যক। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। দেশের কৃতবিদ্যমণ্ডলী সংঘ-বদ্ধ হইয়া এ ব্রত পালন করুন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ' হিতকারী ও মনোহারী সন্দর্ভ। 'দেশের কথা' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা আছে।

পুরুষ-যজ্ঞ।

খ্রীষ্ট-যজ্ঞের কথা বলিয়াছি। খ্রীষ্ট-যজ্ঞে হবিঃশেষের নাম ইউকেরিষ্ট। বিধিবিধি মন্ত্রোচ্চারণের পর রুটিতে ও মদে দেবতার আবির্ভাব হয়; উহা খাইলে দেবতাকেই খাওয়া হয়; দেবতাকে আত্মস্থ করিলে দেবতার সহিত ঐক্য ঘটে। ঐ দেবতাটি কে? ইনি স্বয়ং ঈশ্বর—ঈশ্বরের অগ্রে জাত পুত্র হইলেও অনাদি নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতারূপে অনাদি নিত্য ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি আবার পরিপূর্ণ জীব—যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব। তিনিই যজমানরূপে যজ্ঞ করিয়াছেন; এবং সেই যজ্ঞে আপনাকেই পশুরূপে—মেষরূপে—কল্পনা করিয়া জীবহিতার্থ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইউকেরিষ্ট সেই পশুর রক্ত ও মাংস—উহা খাইলে ইতর যজমান দেবতার সহিত একত্ব পায়, মৃত্যু জয় করিয়া অমরতা পায়। কেন না, খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস অমৃত স্বরূপ।

এখন বেদপন্থীর যজ্ঞে আসিব। বেদপন্থীর যজ্ঞে পশুমাংস দেওয়া হইত—ইষ্টি যাগে মাংসের বদলে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত। সোমযজ্ঞে সোমরস দেওয়া হইত। যজ্ঞবিশেষে সোমরসের বদলে সুরা বা আর কিছু দেওয়া হইত। এখন প্রশ্ন যে, এই সকল দ্রব্যে কোন দেবতার অধিষ্ঠান হয় কি না? সে কোন্ দেবতা? সে দেবতার সহিত যজমানের সম্পর্ক কি?

প্রথমে সোমরসের আলোচনা করিব। ইহুদির দেবতা জেহোবা রক্তপ্রিয় ছিলেন। খ্রীষ্ট মেষস্বরূপ হইয়াছিলেন; মেষরূপেই আপনার রক্ত দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা যে সুরাপান করেন, ঐ সুরা খ্রীষ্টের রক্ত। সোমরস কিন্তু দেবতার রক্ত হইতে পারে না, কেন না, বেদপন্থীর দেবতা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুযজ্ঞে পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য; রাক্ষসদের জন্য উহা বেদির পার্শ্বে উৎকরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সোমরস রক্ত নহে, তবে উহা অমৃতস্বরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সোম-যজ্ঞ প্রসঙ্গে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সোমপানে অমরতা পাওয়া যায়। আগেই বলিয়াছি, সোম রসের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়েরা বট অশ্বত্থ প্রভৃতির রস পান করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষ ভাবে সোম পানই হইত। কেন না, এই যে বটবৃক্ষ, ইহা পরোক্ষভাবে সোমেরই স্বরূপ। ক্ষত্রিয় "সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই সেই বটের রস পান করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেকের পর ক্ষত্রিয় রাজা সুরা পান করিতেন। রাজায়

হাতে সুরাপূর্ণ কাংস্যপাত্র দেওয়া হইত। "স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ" এই মন্ত্রে রাজার হাতে দেওয়া হইত। এই মন্ত্রে সুরাকেই সোম বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। বলা হইতেছে, অহে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য তোমার অভিষব হয়; তোমার স্বাদু ও মাদক ধারার দ্বারা এই রাজাকে পূত কর। পানান্তে রাজা সেই সুরাশেষ তাঁহার কোন বন্ধুর হাতে দিতেন। এক পাত্রে সুরাপানে উভয়ের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইত। সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরা দেওয়া হইত; বিধিমতে সন্ধান বা fermentation দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিয়া সেই সুরা দেওয়া হইত। এই যজ্ঞের দেবতা ছিলেন, অশ্বিদ্বয় সরস্বতী আর ইন্দ্র সুত্রামা। অধ্বর্যু আগুনে দুধ ঢালিয়া দিতেন; তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা সেই সঙ্গে সুরা ঢালিয়া দিতেন। সুরাহুতির মন্ত্র— "যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধীষু, সোমস্য শুষ্মঃ সুরয়া সুতস্য, তেন জিষ্ব যজমানং মদেন, সরস্বত্যশ্বিনাবিন্দ্রমগ্নিং স্বাহা" এই মন্ত্রে সুরাকে স্পষ্টতই সোমস্থানীয় বলা হইয়াছে। কালক্রমে এই যজ্ঞেও সুরাপান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুরার পরিবর্তে দুধ চলিবে। দ্বিজাতিসমাজে —বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে—সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচের হত্যাপরাধে শুক্রের অভিশাপে সুরা অপেয় হইয়াছে, এই পৌরাণিক কাহিনী প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্র শাস্ত্র কিন্তু সুরাকে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্র দ্বারা সুরাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সুরাপানের ব্যবস্থা করিলেন। সুরা-শোধনের জন্য একেবারে ব্রহ্মের দোহাই দেওয়া হইল। "বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি, তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু"—এইরূপে দোহাই দিলে আর কি ব্রহ্মহত্যার পাপ থাকিতে পারে? তান্ত্রিকদিগের সুরাশোধনের আসল মন্ত্রটি বৈদিক মন্ত্র—"হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ, হোতা বেদিষৎ অতিথির্দুরোণসৎ, নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ, অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।" এই মন্ত্রটি ঋক্‌বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে আছে। ইহার ঋষি স্বয়ং বামদেব, যিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এই ঋকের নাম হংসবতী ঋক্। যাবতীয় ঋক্‌মন্ত্র মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের পরেই বোধ হয় এই মন্ত্রটির প্রসিদ্ধি। তান্ত্রিক হংসমন্ত্রের বা অজপামন্ত্রের মূল এই হংসবতী ঋক্। ঐ মন্ত্রে যে হংসের কথা উল্লেখ হইতেছে, সেই হংস এককালে হয়ত আদিত্য ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে প্রায় একবাক্যে তিনি

ব্রহ্ম অর্থে গৃহীত হইয়াছেন। পুরাণে এই হংস ব্রহ্মার বাহন হইয়াছেন। মন্ত্রটির অর্থ, এই যে হংস বা ব্রহ্ম, তিনি দ্যুলোকে আছেন, অন্তরিক্ষে বাস করিতেছেন, হোতারূপে বেদিতে উপবিষ্ট আছেন, অতিথিরূপে গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আছেন, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সেখানে রহিয়াছেন, ব্যোমে অবস্থিত আছেন, সত্যে অবস্থিত আছেন, অপ্‌সমূহ হইতে ইহার জন্ম, গো অর্থাৎ বাক্য হইতে ইহার জন্ম, অদ্রি হইতে ইহার জন্ম, ঋত হইতে ইহার জন্ম, ইনি সত্যস্বরূপ। তান্ত্রিকেরা এই মন্ত্রে সুরাশোধন করিলে সুরা একেবারে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। খ্রীষ্টান যাজক মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিবামাত্র সুরা যেমন খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়, সেইরূপ। সোম যেমন অমরতা দেন, সুরাও তেমনি অমরতা দিয়া থাকেন।

এখন আপনারা খ্রীষ্টপন্থীর সুরাপানের সহিত বেদপন্থীর সোমপানের আর তন্ত্রপন্থীর সুরাপানের সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন। খ্রীষ্টানেরা যেমন দেবতাকে আত্মসাৎ করেন, বেদপন্থীও সেইরূপ করেন। এই যে সোম, ইনি স্বয়ং এক জন দেবতা, দেবগণের মধ্যে ইনি এক জন রাজা। সোম যজ্ঞে সোম ক্রয় করিয়া যখন যজ্ঞশালায় আনা হয়, তখন তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানই দেওয়া হয়। যজ্ঞশালায় তাঁহাকে রাজার মত উচ্চ আসনে বসান হয়। রাজা অতিথিরূপে যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আতিথ্য ইষ্টি যজ্ঞ করা হয়। সোম যাগের পূর্ব্ব দিনে যখন তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া মহাবেদির উপরে হবির্ধান মণ্ডপে রাখা হয়, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য অন্য যাগ করিতে হয়। সোম যজ্ঞে এই দেবগণের রাজা সোমকেই ভক্ষণ করা হইতেছে। স্পষ্টই বলা হইতেছে—"সোমং রাজানম্ ইহ ভক্ষয়ামি।" এখন আপনারা খ্রীষ্টানের দেবতা ভক্ষণের সহিত বেদপন্থীর দেবতা ভক্ষণের তুলনা করুন।

খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট ত অনাদি নিত্য বাগ্‌দেবতা। সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক কি? আমার সঙ্গে আসুন; চমকাইবেন না। আমাদের বেদসাহিত্যে সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি। বাগ্‌দেবতাই সোম আনিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে নানা স্থানে সোম আহরণের আখ্যায়িকা আছে। কোন পাখী দেবতাদের জন্য সোম আনিয়াছিল; সেই পাখীকে শ্যেন বা সুপর্ণ বলা হইতেছে। কোথাও বলা হইতেছে শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ দূরদেশ হইতে সোম আনিয়াছেন। কোথাও

বলা হইতেছে তার্ক্ষ্য পক্ষী সোম আনিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, গায়ত্রী সুপর্ণী হইয়া সোম আনিয়াছেন; তার্ক্ষ্য অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। বেদের এই তার্ক্ষ্য পুরাণের গরুড়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যত্র বলা হইতেছে, দেবতারা সোম আনিবার জন্য বেদের ছন্দগুলিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ছন্দেরাই পাখী বা সুপর্ণ সাজিয়া সোম আনিতে উপরে উঠিলেন। প্রথমে জগতী উঠিলেন, পরে ত্রিষ্টুপ্ উঠিলেন; তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শেষে গায়ত্রী উঠিলেন। সোম গন্ধর্ব্বদের মধ্যে ছিলেন। কৃশানু নামক গন্ধর্ব্বের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও গায়ত্রীরূপা সুপর্ণী দুই পা এবং মুখ দিয়া সোমকে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। অতএব যে পাখী সোম আনিলেন, তিনি গায়ত্রী, আর কেহ নহেন। এই গায়ত্রী কিন্তু ছন্দের মধ্যে প্রধান; তিনি ছন্দসাং মাতা। এই অর্থে তিনি বেদবাক্যের প্রধান, স্বয়ং বাগ্‌দেবতা। সোম ক্রয় উপলক্ষে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। বাগ্‌দেবী দেবগণকে বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীপ্রিয়, আমাকেই তোমরা পাঠাও, আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিব। এই বলিয়া বাগ্‌দেবী নগ্না কুমারীরূপে সোম আনিতে গেলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে বঞ্চনা করিয়া সোম লইয়া আসিলেন। এই ঘটনার অভিনয়ে সোম যজ্ঞে একটি ছোট গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হইত। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবীর স্থানীয়। মনে রাখিবেন 'গো' শব্দের একটা অর্থ 'বাক্য' বা 'বাক্'। সোমাহরণ সম্বন্ধে কতকগুলি উপাখ্যান পাইলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা এই কয়েকটী উপাখ্যানকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিতেছেন, কদ্রু এবং সুপর্ণী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। বেদের এই সুপর্ণী পুরাণে বিনতা হইয়াছেন। এই বিনতারই পুত্র গরুড়। কদ্রুর জয় হইয়াছিল; সুপর্ণী তাঁহার দাসী হইয়াছিলেন। কদ্রু বলিলেন, তৃতীয় দ্যুলোকে যে সোম আছেন, তাঁহাকে যদি আনিতে পার, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন করিব। বেদের ছন্দগুলি এই সুপর্ণীর সন্তান। মায়ের আদেশে ছন্দেরা সোম আনিতে উঠিল; জগতী পারিল না, ত্রিষ্টুপ্ও পারিল না কনিষ্ঠা গায়ত্রী সমর্থ হইলেন। দুই পা এবং মুখ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সোমকে নামাইয়া আনিলেন। পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু সোমকে আটকাইলেন। তখন দেবতারা বাগ্‌দেবীকে পাঠাইলেন। বাগ্‌দেবী গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিলেন। গায়ত্রী এই সময় রোহিণী বা রক্তবর্ণ মৃগীর রূপ ধরিয়াছিলেন;

তদনুসারে রক্তবর্ণের গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হয়। এখানে বাগ্‌দেবী ও গায়ত্রীকে ভিন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু উভয়েই সোম আনয়ন কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাগ্‌দেবীই সোম আনেন। এখন বাগ্‌দেবীর সহিত সোমের সম্পর্ক আপনারা বুঝিতে পারিলেন। অমৃতস্বরূপ সোমকে পূর্ব্বে কেহ জানিত না; স্বয়ং বাগ্‌দেবতা তাঁহাকে দেবগণের জন্য আনয়ন করেন। তাহার পর মনুষ্যেরাও তাঁহাকে পাইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের খ্রীষ্ট স্বয়ং বাগ্‌দেবতা—Word become flesh. তিনিও স্বর্গ হইতে মর্ত্তলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপন্থী যজমান যেমন সুরাপান করিয়া অমরতা লাভ করেন, বেদপন্থী যজমানও সেইরূপ সোম পান করিয়া অমরতা পান। সোমপান কালে তিনি বলেন, "বাগ্‌দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু"—বাগ্‌দেবী প্রীত হইয়া সোমরসে তৃপ্ত হউন; আবার বলেন, "দেবকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, মনুষ্যকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, পিতৃকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি"—দেবকৃত পাপের তুমি বিনাশ কর, মনুষ্যকৃত পাপের বিনাশ কর, পিতৃকৃত পাপের বিনাশ কর—পুনরায় বলেন—"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্, কিং নূনমস্মান্ কৃণবৎ অরাতিঃ, কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য"—আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি, জ্যোতি পাইয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি; আমরা অমর; মর্ত্ত্য পাপে আর আমাদের কি করিবে? যিনি সোম পান করেন, স্বয়ং বাগ্‌দেবী আসিয়া তাঁহাকে অমরতা দেন। তিনিই ত সোমকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সোমের কথা বলিলাম। এবার পুরোডাশের কথা বলিব। পুরোডাশ আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা খাইতে হয়। কয়েক খণ্ডে ভাগ করিয়া খাইতে হয়। এক এক ভাগ এক এক ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সকল ভাগের নাম ইষ্টি যাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পুরোডাশের একটা খণ্ড থাকে, যাহা যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে খাইয়া থাকেন। এই ভাগের নাম ইড়া। আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছি, ইড়া ভক্ষণই যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। এই ইড়া-ভক্ষণেই যজ্ঞ সমাপ্তি লাভ করে, যজ্ঞ সার্থক হয়। খ্রীষ্টানের ইউকেরিষ্ট ভক্ষণে নানাবিধ খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম breaking of the bread; খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের সহিত ভোজন কালে রুটি ভাঙ্গিয়াছিলেন, ও সেই ভাঙ্গা রুটির টুকরা শিষ্যদিগকে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, This is My body which is broken for many for the

remission of sins. তদনুসারে খ্রীষ্টান যাজক বেদির উপরে রুটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও পরে যজমানদিগকে বাঁটিয়া দেন। খ্রীষ্টানেরা এই রুটি ভাঙ্গার গভীর তাৎপর্য্য দিয়াছেন। জীবহিতের জন্য খ্রীষ্ট আপনাকে ভাঙ্গিয়া খণ্ডিত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন—the breaking of the bread is a symbol of the suffering and death of the Lord on the cross. পুনশ্চ —Broken and divided is the Lamb of God, who is broken and not severed. দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, Consecration and Invocation —ভক্ষণের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করিয়া রুটি উৎসর্গ করিতে হয়। সম্প্রদায় ভেদে মন্ত্রের ভিন্নতা আছে; কেহ বা বাগ্‌দেবতারূপী খ্রীষ্টকে আহ্বান করেন, কেহ বা Holy Ghostকে আহ্বান করেন; কেহ বা Trinityকে আহ্বান করেন। অনেকের মতে এই আহ্বান মন্ত্র পাঠের পরই দেবতার আবির্ভাব হয় ও রুটি মাংসে পরিণত হয়। খ্রীষ্টপন্থীর যজ্ঞে যেরূপ, বেদপন্থীর যজ্ঞেও ঠিক তদনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র, উহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ড অগ্নীৎ ভক্ষণ করেন; ইহার নাম বড়বত্ত। আর এক খণ্ড চারি অংশে ব্রহ্মা হোতা অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ এই চারিজনে ভক্ষণ; ইহার নাম চতুর্দ্ধাকৃত ভাগ। আর দুই খণ্ড ব্রহ্মা ও যজমান যজ্ঞ সমাপ্তির পর ভক্ষণ করেন, উহা ব্রহ্মার ভাগ ও যজমানের ভাগ। এইরূপে পুরোডাশকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার নাম পুরোডাশের অবদান; ইংরেজিতে fraction বা breaking. এই সকল ভাগ ব্যতীত যজমান ও ঋত্বিক্ সকলের একযোগে ভক্ষণের জন্য একটা ভাগ থাকে, উহার নাম ইড়া। ইড়া রাখিবার জন্য একখানি কাঠের পাত্র থাকে; উহার নাম ইড়াপাত্র। পূর্ণমাস যাগে অধ্বর্য্যু পুরোডাশের খণ্ড কাটিয়া লইয়া সেই ইড়াপাত্রে রাখেন। প্রথমে ইড়াপাত্রে একটু ঘি ঢালা হয়; সেই ঘিয়ের উপরে দুইখানা পুরোডাশ হইতে দুই খণ্ড কাটিয়া রাখা হয়; আবার একটু ঘি ঢালা হয়। এইরূপে নীচে উপরে ঘি মাখান পুরোডাশ খণ্ডের নাম ইড়া। অধ্বর্য্যু হোতার আঙুলে ঘি মাখাইয়া দেন। হোতা সেই আঙুল দিয়া আপনার ঠোঁট মাজেন। অধ্বর্য্যু হোতাকে ইড়াপাত্র ধরিতে দেন। যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে ইড়াপাত্র স্পর্শ করিয়া থাকেন। হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রে ইড়া দেবতাকে সমীপে আহ্বান করা হয়। মন্ত্র

পাঠের নাম ইড়ার উপহ্বান; ইংরেজিতে Invocation. এই আহ্বানের পর ইড়াদেবী পুরোডাশ খণ্ডে আবির্ভাব করেন। তৎপরে আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলিয়া ইড়া ভক্ষণ করেন। ইড়াদেবতাকেই ভক্ষণ করা হয়। খ্রীষ্টপন্থীর ও বেদপন্থীর অনুষ্ঠানে কতটা মিল তাহা দেখিলেন।

এই ইড়াদেবতাটি কে? ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্ট স্বয়ং যজমান, স্বয়ং পশু, স্বয়ং দেবতা—বাগ্‌দেবতা—Word of God. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "যজমানো বৈ পুরোডাশঃ"—এই যে পুরোডাশ, ইহা যজমানই; পুরোডাশ আহুতির দ্বারা যজমান আপনাকেই আহুতি দিতেছেন। আপনার নিম্নস্তরূপে তিনি পশু দিতে পারিতেন; কেন না, "পশবঃ পুরুষঃ", পশুগণই পুরুষস্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যস্থানীয়। এখানে যজমান সেই পশুর পরিবর্ত্তে পুরোডাশখণ্ড দিতেছেন। অতএব সেই পুরোডাশখণ্ড বা ইড়া পশুস্থানীয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণই আবার বলিতেছেন, "পশবো বৈ ইড়া"—এই যে ইড়া, ইহাও পশু। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন খ্রীষ্টরূপী পশুর মাংস, এই ইড়াও সেইরূপ যজমানরূপ পশুর মাংস। ভাল কথা, হোতা তবে মন্ত্রের দ্বারা কোন্ দেবতাকে আহ্বান করিলেন? এই দেবতারও নাম ইড়াদেবী। আপনারা এই ইড়াদেবীকে চেনেন কি? আশ্চর্য্য হইবেন, ইড়াদেবী স্বয়ং বাগ্‌দেবতা; সমস্ত বৈদিক সাহিত্য এককালে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ ছিল। যে মন্ত্রে ইড়াকে আহ্বান হয়, সেই মন্ত্রটি শুনুন—হোতা ইড়াদেবীকে ডাকিতেছেন:—

"সুরূপবর্ষমূর্ত্তে এহি"—অয়ি দেবি, তোমার রূপ সুন্দর, বর্ণ সুন্দর, বর্ষণ-শক্তি (বা উৎপাদন-শক্তি) সুন্দর; তুমি এখানে এস। "ইমান্ ভদ্রান্ দুর্য্যান্ অভ্যেহি"—আমাদের এই সজ্জিত যজ্ঞগৃহের অভিমুখে এস। "মানুষব্রতা নি উ শীর্ষাণি মৃড়ঢ়ম্"—আমরা যে ব্রত লইয়াছি, তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া আমাদের শীর্ষে কল্যাণ অর্পণ কর। "ইড়ে এহি, অদিতে এহি, সরস্বতি এহি"—ইড়া তুমি এস, অদিতি তুমি এস, সরস্বতি তুমি এস। রন্তিরসি, রমতিরসি, সুনরীরসি,"—তুমি আনন্দময়ী, তুমি আনন্দদায়িনী, তুমি সুন্দরী। "জুষ্টে জুষ্টিং তে অশীয়"—তোমার পূজা করি, তুমি আমাদিগকে প্রীতি দাও। "উপহূতে উপহ্বং তে অশীয়"—তোমাকে আমরা ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া লও। "সত্যা আশীরস্তু যজ্ঞস্য ভূয়াৎ"—এই যজ্ঞে যে আশিষ চাহিতেছি, তাহা সত্য হউক। "অরেড়তা মনসা তচ্ছকেয়ম্"—স্থির মনে তাহার শক্তি লাভ করিব। "যজ্ঞো দিবং রোহতু, যজ্ঞো দিবং গচ্ছতু, যো

দেবযানঃ পন্থা তেন যজ্ঞো দেবান্ অপ্যেতু"—এই যজ্ঞ দিব্যলোকে আরোহণ করুক, দিব্যলোকে গমন করুক, দেবগণের যে পথ আছে, সেই পথে দেবগণের সমীপে চলুক। "অস্মান্ ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু"—যিনি বলবিধাতা ইন্দ্র, তিনি আমাদের বলবিধান করুন। "অস্মান্ রায় উত যজ্ঞাঃ সচন্ত"—আমরা শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করি, আমরা যজ্ঞ লাভ করি। "অস্মাসু সন্তু আশিষঃ, সা নঃ প্রিয়া সুপ্রতূর্ত্তিঃ মঘোনী"—অয়ি ইড়া, তুমি আমাদের প্রিয়া, তুমি বিঘ্নঘাতিনী, তুমি কল্যাণদায়িনী; আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হউক।

এই মন্ত্র হইতে ইড়াদেবীর মাহাত্ম্যের কিছু পরিচয় পাইলেন। ইহাঁর আর দুইটী নাম পাইলেন—অদিতি এবং সরস্বতী। দেখা যাক, ইড়াদেবীর আর কোন নাম আছে কি না? ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যে ইড়ার নাম ছড়াইয়া আছে। পশুযাগ প্রসঙ্গে আপ্রী মন্ত্রের কথা বলিয়াছি। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ করিতে হয়। পশু যাগে এগার জন দেবতার উদ্দেশে এগারটি প্রযাজ যাগ হয়। প্রত্যেক প্রযাজের পূর্ব্বে হোতা যে মন্ত্র পড়েন, তাহার নাম আপ্রী মন্ত্র। দেবতা এগার জন, কাজেই মন্ত্রও এগারটি। ঋগ্বেদের যে সূক্ত মধ্যে এইরূপ এগারটি আপ্রী মন্ত্র থাকে, তাহার নাম আপ্রী সূক্ত। ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দশটি আপ্রী সূক্ত আছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি প্রভৃতি বড় বড় ঋষি আপ্রী সূক্ত প্রচার করিতেছেন; আপ্রী সূক্তের প্রচারে যেন বিশেষ বাহাদুরী আছে। যে যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, তিনি তাঁহারই আপ্রী সূক্ত ব্যবহার করিতেন, অন্যের করিতেন না। ইহাতেও আপ্রী সূক্তের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আপ্রী সূক্তের এগার মন্ত্রের এগার দেবতা। অষ্টম দেবতার বেলায় কিন্তু তিনটি নাম একযোগে দেখা যায়—ইড়া, ভারতী সরস্বতী। গোটাকয়েক আপ্রী মন্ত্র শুনুন। "ইড়া সরস্বতী মহী, তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ, বর্হিঃ সীদন্ত অস্রিধঃ"—এই মন্ত্রটি মেধাতিথির। "ভারতীড়ে সরস্বতি, যা বঃ সর্ব্বা উপব্রুতে, তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে"—এইটি অগস্ত্যের। "আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা, ইড়া-দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ, সরস্বতি সারস্বতেভির্বাক্, তিস্রো দেবীর্বহিরেদং সদন্ত" —এটি বশিষ্ঠের। এইরূপ দশটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রেই ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই তিনটি নাম পাইতেছেন। ইহাদিগকে "তিস্রো দেব্যঃ" বলা হইতেছে, অথচ ইহারা তিনে এক। কেন না, এক একটি মন্ত্র এক এক দেবতারই উদ্দিষ্ট। ইহাঁর মধ্যে ভারতীর এবং সরস্বতীর নাম আজি পর্য্যন্ত আপনাদের সুপরিচিত। এই দুই নামই যাগদেবীর নাম। ইড়াদেবীকে

আপনারা ভুলিয়াছেন, কিন্তু ভারতী ও সরস্বতী যদি বাগ্‌দেবী হন, তাহা হইলে ইড়াও বাগ্‌দেবী। অতি প্রাচীন কালে হয়ত ইহাঁরা পৃথক্ দেবতা ছিলেন; কালে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ঋগ্‌বেদে সরস্বতী বহু স্থলে নদীর নাম। এখন সরস্বতী নদী লুপ্ত, কিন্তু এককালে ইনি বেগবতী ছিলেন। একালে যেমন গঙ্গার মাহাত্ম্য, সেকালে সেইরূপ সরস্বতীর মাহাত্ম্য ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে সরস্বতীতীরে ব্রহ্মবাদীরা বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠার সহিত বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে, একদা ঋষিগণ সরস্বতীতীরে সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবষ নামে একটি লোক সেখানে উপস্থিত ছিল; সে দাসীপুত্র এবং অব্রাহ্মণ। ঋষিরা তাহাকে মরুভূমিতে খেদাইয়া দিলেন। পিপাসার্ত্ত কবষের মুখ হইতে ঋক্‌মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। মন্ত্র শুনিয়া স্বয়ং সরস্বতী মরুভূমিতে স্রোত ফিরাইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন এবং কবষের পিপাসাশান্তি করিলেন। তদবধি কবষ ঋষি হইলেন। কবষের মন্ত্রগুলিও সোমযজ্ঞে স্থান পাইল। এই মন্ত্রগুলির নাম অপোনপ্ত্রীয় মন্ত্র। সোমযজ্ঞের দিন প্রত্যূষে যখন 'একধন' নামক জল আনা হয়, তৎপূর্ব্বে হোতা এই মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। যে সরস্বতীর এই মাহাত্ম্য, সেই সরস্বতী উত্তরকালে বেদবাক্যের দেবতা বা বাগ্‌দেবতা বলিয়া গৃহীত হইবেন, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাহার পর ভারতী। ইনি হয় ত ভরতবংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই ভরতবংশের কীর্ত্তি বর্ণনায় আমাদের সাহিত্য পূর্ণ। কালিদাসের প্রসাদে দুষ্মন্তপুত্র সর্ব্বদমন ভরতের নাম কে না জানে! ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, ঋষি দীর্ঘতমা দুষ্মন্তপুত্র ভরতকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেক করিয়াছিলেন; আরও দেখিবেন, তিনি পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া একশ ত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কালিদাসের দিলীপ মহাবল পুত্র রঘুর সাহায্যেও শতক্রতু হইতে পারেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, মনুষ্য যেমন হস্ত দ্বারা দ্যুলোক স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ ভরতের কৃত মহাকর্ম্ম পূর্ব্বে বা পরে কেহ করিতে পারেন নাই। এই ভরতবংশের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়াই মহাভারত। অধিক কি বলিব, এই ভরতের নাম হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভরতবংশের কুলদেবতা ভারতী ক্রমে বেদপন্থীর প্রধান দেবতা হইয়াছেন। সরস্বতীর ও ভারতীর পরে ইড়াদেবী। ঋগ্বেদে ইহাঁর একটা বিশেষণ মনুষ্বতী বা মানবী। এই বিশেষণটি কিরূপে আসিল, তাহার সন্ধানের জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে যাইতে হইবে। শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পটি বলিব।

আপনারা বৈবস্বত মনুর নাম জানেন। কালিদাসের ভাষায় ছন্দের মধ্যে যেমন প্রণব, গায়ত্রীদের মধ্যে তিনি সেইরূপ আদ্য রাজা ছিলেন। সেই মনু একদিন প্রাতঃকালে হাত মুখ ধুইতেছিলেন। হাতের কাছে একটি মাছ আসিল। মাছ বলিল, মাছে মাছ খায়, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অসময়ে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। মনু মাছটিকে তুলিয়া জলের জালায় রাখিলেন। মাছ ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন কুলায় না, তখন একটা খালে ফেলিলেন। খালে যখন কুলায় না, তখন সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে জলপ্লাবন ঘটিল। মাছের উপদেশে মনু নৌকার আশ্রয় লইলেন। মাছ নৌকার নিকট ভাসিতেছিল, তাহার শিঙে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মাছ নৌকা টানিয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, এই মাছই পুরাণের মৎস্যাবতার। জলপ্রবাহে সমস্ত প্রজা নষ্ট হইল; মনু একা বাঁচিলেন। কালে জল নামিয়া গেলে মনু জলের উপরেই যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞে যাহা আহুতি দিলেন, তাহা হইতেই বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মিল। এই কন্যার নামই ইড়া। মনুকন্যা বলিয়া ইঁহার নাম মনুধতী বা মানবী। ইড়া মনুকে বলিলেন, আমি তোমারই কন্যা, তোমার যজ্ঞেই আমি জন্মিয়াছি। অতঃপর তুমি আমাকেই যজ্ঞে আহুতি দিবে। সেই যজ্ঞ হইতে নূতন প্রজা জন্মিবে। মনু তাঁহাকে যজ্ঞে প্রয়োগ করিলেন। তাঁহা হইতে নূতন প্রজা জন্মিল; মনুর বংশ রক্ষা হইল। এই বংশই মানব বংশ। তদবধি যজ্ঞে ইড়ার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যজ্ঞে যে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়, সেই পুরোডাশের অংশই ইড়া। তাহাতে ইড়াদেবী বর্ত্তমান থাকেন; মানবেরা তাহা ভক্ষণ করে। মনুকন্যা ইড়ার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বেদে তাঁহার নাম ঐড় পুরূরবা। পুরাণের মতে পুরূরবার পিতা বুধ; বুধের পিতা সোম। এই সোম সেই রাজা সোম, যিনি দেবগণের অমৃত। অতএব, এই ইড়াদেবী হইতেই সোম বংশের বা চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, যে বংশে দুষ্মন্তপুত্র ভরত জন্মিয়াছিলেন। ভরত বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ইড়াদেবী যে সেই বংশের কুলদেবতা ভারতীর সহিত মিলিয়া যাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইড়াদেবীর কয়েকটি নাম পাইলেন। ইড়া আহ্বানের মন্ত্রে পাইয়াছেন অদিতি এবং সরস্বতী। আপ্রী মন্ত্রে পাইলেন ভারতী ও সরস্বতী। বেদপন্থী তাঁহার দেবতাকে শত নামে, সহস্র নামে, ডাকিয়াও তৃপ্ত হন না। ইড়াদেবীর আর নাম আছে কি? যাস্কের 'নিরুক্ত' খুঁজিয়া দেখুন। এই নিরুক্ত খানি বৈদিক ভাষার

dictionary। ইহার আরম্ভে নিঘণ্টু মধ্যে অনেকগুলি বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ বা synonym দেওয়া আছে। 'বাক্' শব্দে আসিয়া দেখুন। সাতাশটি প্রতিশব্দ দেখিবেন। সাতাশটি লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। গোটাকতক বাছিয়া লইব। 'বাক্' বা বাক্যের প্রতিশব্দ—শব্দ, স্বর, ঘোষ, বাণী ইত্যাদি। তাহার পরে দেখুন—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। আপ্রী মন্ত্রে এই তিন নাম একযোগে পাইয়াছেন। তাহার পরে দেখুন, সুপর্ণী—এই সুপর্ণী গায়ত্রী বা বাগ্‌দেবীরূপে সোম আনিয়াছিলেন। অতঃপর ইড়া যে বাগ্‌দেবী, তাহাতে আপনাদের সন্দেহ থাকিল না। তাহার পর কয়েকটি নাম দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। একটি নাম অদিতি। ইড়ার এই নাম আগেই ইড়ার আহ্বান মন্ত্রে পাইয়াছেন, অথচ এই অদিতি এখন দেবগণের মাতা। তাহার পর শচী—ইনি এখন ইন্দ্রপত্নী, বেদে ইনি যজ্ঞক্রতুরূপিণী। তাহার পর স্বাহা—ইনি অগ্নির পত্নী। তাহার পর দেখুন গৌরী—ইনি এখন মহেশ্বরপত্নী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখা যায়। এই উমা হৈমবতী হিমালয়কন্যা পার্ব্বতীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং ইঁহারই নামান্তর গৌরী। নিরুক্তকার গৌরীতে আসিয়া থামেন নাই; আর একটি নাম দিয়াছেন মেনা বা মেনকা; ইনি গৌরীর জননী। সর্ব্বশেষে নাম মহী বা পৃথিবী, গো এবং ধেনু। পৃথিবী যে গাভী, তাহা প্রসিদ্ধ; কালিদাসের 'দুদোহ গাং স যজ্ঞায়', এবং 'দুদোহ গো-রূপ-ধরামিবোর্ব্বীম্' মনে করুন। বাগ্‌দেবীও যে গাভীরূপিণী, তাহা বহু দিন হইতে স্বীকৃত হইতেছে। চলিত ভাষাতেই গো-শব্দে বাক্য বুঝায়। সোম যজ্ঞে একটী গাভী দিয়া সোম কিনিতে হয়, আগেই বলিয়াছি। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবী। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"বাচং ধেনুম্ উপাসীত। তস্যাঃ চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারঃ।"—বাগ্‌দেবতাকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে, তাঁহার চারিটি স্তন, স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার এবং স্বধাকার। স্বাহাকার এবং বষট্‌কার দেবগণের উপজীব্য; হন্তকার মনুষ্যের এবং স্বধাকার পিতৃগণের। প্রাণ তাহার পক্ষে বৃষস্থানীয় এবং মন বৎসস্থানীয়। বাগ্‌দেবতার মূর্ত্তি বলিয়াই গাভী আমাদের ভগবতী হইয়াছেন। স্বয়ং বাক্‌পতি গো-পতি বা গো-পালরূপে গো-গোপ-সংবৃত হইয়া গো-লোক বা বাঙ্‌ময় বিশ্বভুবন জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। স্থানান্তরে ইহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আপনারা দেখিলেন, এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বময়ী। বেদ-

পন্থী ইহাকে ভুলিতে বা ছাড়িতে পারেন না। আমরাও উচ্চৈঃ ইহাই আমাদের শাস্ত্র প্রায় একবাক্যে বলিতেছেন, 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম'—বাক্ই ব্রহ্ম —"The Word is God". খৃষ্টিয়ের পণ্ডিতেরা এইখানে একটু খট্‌কায় পড়িয়াছেন। উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে ব্রহ্মশব্দ ঈশ্বরবাচক; বাক্যকে একবারে অনাদি নিত্য ঈশ্বরে পরিণত করা খৃষ্টীয়ানের পক্ষেও সম্ভব, ইহা মনে করিতেই বোধ করি খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের খট্‌কা লাগে। ঐ পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের মন্ত্র মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্মণ মধ্যে, ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্যই বুঝায়, স্পষ্টরূপে ঈশ্বর বুঝায় না। সুসমাচার প্রচারক জোহনের এত পূর্ব্বে ব্রহ্মনামক বাক্যকে ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে পরিণত করা হইয়াছে, ইহা মনে করিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। ফলে কিন্তু বাক্ই যে ঈশ্বর, শব্দই যে ব্রহ্ম, ইহা বেদপন্থীর পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত এবং অত্যন্ত পুরাতন কথা। হীব্রাক্লিটসের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেদপন্থীর নিকট ইহা অত্যন্ত পরিচিত কথা। বেদপন্থী সমাজের সমস্ত ইতিহাসটা ব্যাপিয়া, অন্ততঃ ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডল সঙ্কলনের পূর্ব্ব হইতে আজি পর্য্যন্ত, এই তত্ত্ব বেদপন্থীর অধ্যাত্ম জীবনকে নিয়মিত করিয়া আছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রধান দেবতা প্রজাপতি; কিন্তু মন্ত্র সংহিতার মধ্যে প্রজাপতির তেমন প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডলে চারিবার মাত্র প্রজাপতির নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ সংহিতায় কিন্তু আর একটি দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়, তাঁহার নাম বৃহস্পতি—নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি—ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদবাক্যের পতি। উত্তরকালে ইহাঁর নাম হইয়াছে বাচস্পতি। তাহাতে বুঝাইল যে, বাক্ বা বেদবাক্যই ব্রহ্ম। ঋক্ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে, তাহাতে বৃহস্পতি স্বয়ং বলিতেছেন, যেন আত্মীয় বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন, এই যে বাক্, যাহা সৃষ্ট পদার্থের নামকরণে প্রথমে আবির্ভূত হয়, তাহা কোন্ গুহার মধ্যে নিহিত ছিল! কোন্ প্রেমের বলে সেই গুহা হইতে সে বহির্গত হইল! "উত ত্বঃ পশ্যন্ অদদর্শ বাচম্, উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্"—লোকে ইহাকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। "উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে, জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ"—পত্নী যেমন শোভন বাস পরিয়া পতির নিকট যায়, ইনিও তেমনি প্রেমভরে নিজের দেহ প্রকাশ করেন। বৃহস্পতি স্বয়ং বাকের পতি, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভাবাই সমুচিত। এই যে বাক্, ইহা বিশেষতঃ বেদবিদ্যা। বৃহস্পতিই বলিতেছেন—"ব্রহ্মাণং ত্বা শোমমাহে ধ্যুনান,

গায়ত্রং বো গায়তি শকরীষু, ব্রহ্মা বো বদতি জাতবিদ্যাং, যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ"—এই বাক্ হোতার মুখে ঋক্‌রূপে বাহির হইয়া যজ্ঞকে পুষ্ট করেন; উদ্গাতার মুখে শকরী সামরূপে গীত হন; অধ্বর্য্যুর মুখে যজুর্ম্মন্ত্ররূপে যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করেন; ব্রহ্মা এই বিদ্যাকে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগ করেন। অতএব এই 'বাক্' অর্থে বিশেষতঃ বেদবাক্যকেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকের ভাষায় এই বেদবাক্য "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" অর্থাৎ সেই মহাভূত ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় প্রজাপতি প্রজারূপে বহু হইবার কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তপস্যার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মরূপ ত্রয়ী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বেদবাণী পুরাণ কবি বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে প্রথমে সমীরিত হইয়াছিল, বেদপন্থী ইহা মানিয়া লইয়াছেন। বলা হইয়াছে, "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগ্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা"—স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইলেও এই বাক্ নিত্য; ইহার আদিও নাই, নিধনও নাই। খ্রীষ্টানদিগের জনকেশ্বর হইতে উৎপন্ন তনয়েশ্বরের—খ্রীষ্টের বা শব্দরূপী ঈশ্বরের—নিত্যত্বের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রত্যেক ব্যাখ্যানের আরম্ভেই "যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ" বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়াছেন, পরন্তু বলিয়াছেন, "যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে"—যিনি বেদবাক্য দ্বারা অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানেরাও বলেন, পিতা ঈশ্বর শব্দরূপী পুত্র খ্রীষ্টের দ্বারাই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদপন্থীও বলেন, শব্দ হইতেই সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ কোনরূপ শরীরধারী দেবতা মানেন না, চলিত অর্থে ঈশ্বরও মানেন না। অথচ তাঁহারা এই বেদবাক্যকে নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেদবাক্য মূর্ত্তিহীন শব্দরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছেন; এই শব্দ ঋষিদিগকে দেখা দেন এবং মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঋষিমুখে আত্মপ্রকাশ করেন। বেদবাকাই বাগ্‌দেবতা বা ব্রহ্ম। বেদমন্ত্রের স্বয়ম্ভূত যে গায়ত্রী মন্ত্র, উহাকেই বিশেষতঃ বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম; এই ছন্দ সুপর্ণীরূপ ধরিয়া সোম বা অমরতা আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ছন্দের মধ্যে প্রধান, তিনি "ছন্দসাং মাতা"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত আমরা প্রাতাহিক সন্ধ্যোপাসনার সময়ে "আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং, গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম সুরক্ষ নঃ" এই মন্ত্রে

গায়ত্রীকে 'ছন্দসাং মাতা' এবং ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া আবাহন করিয়া থাকি। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ জোরের সহিত বলিতেছেন, 'গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ; বাগ্ বৈ গায়ত্রী, বাগ্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ"—সমস্ত ভূত যাহা কিছু বিদ্যমান, এ সমস্তই গায়ত্রী; গায়ত্রীই বাক্, বাক্ই সমস্ত ভূত; গায়ত্রীই বাক্‌রূপে সকল ভূতের নাম দেন এবং সকলকেই রক্ষা করেন। গায়ত্রী ছন্দের যে মন্ত্রটিকে আমরা বেদবাক্যের সার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, এইজন্য উহাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলা হয়। এই জন্য গায়ত্রীর নামান্তর সাবিত্রী। বিশ্বামিত্র ঋষি উহা প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তদবধি আজি পর্য্যন্ত উহাই বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক বালক উপনয়ন কালে আচার্য্যের নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তদবধি যাবজ্জীবন এই মন্ত্রের জপে বাধ্য থাকে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"স যানেব অমুং সাবিত্রীম্ অন্বাহ এব এষ সা"—সেই আচার্য্য বালককে যে সাবিত্রী মন্ত্র দান করেন, সেই সাবিত্রী মন্ত্রই বিশেষতঃ গায়ত্রী। "এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা"—এই গায়ত্রী আত্মার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই গায়ত্রীতে সমস্ত জগৎই প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুর ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণের উপাখ্যান ঋক্‌সংহিতা মধ্যে পুনঃ পুনঃ আছে। উহার গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, বিষ্ণুর তিন পদ এই লোকত্রয়কে বা সমস্ত প্রত্যক্ষ জগৎকে ব্যাপিয়া আছে, এই তাৎপর্য্য এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই তিন পদ ব্যতীত বিষ্ণুর আর একটি চতুর্থ পদের বা পরম পদের কথা ভূয়োভূয়ঃ শুনা যায়, যে পদ পরম ব্যোমে অবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত, লোকে বিদ্যমান। এইরূপে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু চতুষ্পদ। গায়ত্রী ছন্দের কিন্তু তিনটি মাত্র চরণ; গায়ত্রীর ব্রহ্মরূপ দৃঢ় করিবার জন্য বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, ভূমি অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক ইহাই গায়ত্রীর প্রথম পদ, ঋক্ যজুঃ সাম ইহাই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদ, প্রাণ অপান ব্যান ইহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ; কিন্তু ইহার উপরেও আর একটি তুরীয় বা চতুর্থ পদ আছে, যাহা "পরোরজা" অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত।

এই বাগ্‌দেবতার ব্রহ্মস্বরূপত্ব সম্বন্ধে যদি এখনও আপনাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডল হইতে একটি সূক্ত আপনাদিগকে আমি শুনাইতে চাহি। এই সূক্তটির নাম দেবীসূক্ত। আজি পর্য্যন্ত শরৎ কালের দেবীপূজায় উহা আমাদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়। ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা ঐ সূক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সূক্তের ঋষির নাম বাক্। তিনি

অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি যিনিই হউন, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারক জোহনের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি হীরাক্লিটাসের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, তিনি আপনাকে বাক্ অথবা শব্দ-ব্রহ্মরূপে পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের এই পুরাতনী ঋষিকন্যা বাক্ জোরের সহিত বলিতেছেন—

অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামি,
অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ,
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি,
অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা,—

আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; মিত্র এবং বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি; ইন্দ্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও, আমি ধরিয়া রাখিয়াছি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি,
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ,
অহং জনায় সমদং কৃণোমি,
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ,—

আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি, আমিই দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্,
মম যোনিরপ্সু অন্তঃ সমুদ্রে,
তভো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা,
উতামুং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি,—

আমি ঊর্দ্ধভাগে পিতা দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি; দ্যুলোককেও আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি।

অহম্ এব বাত ইব প্রবামি,
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা,
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা,
এতাবতী মহিমা সংবভুব,—

বিশ্বভুবন নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হই; পৃথিবীর

পরে, দ্যুলোকের পরে, যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আমি আমার মহিমাদ্বারা সম্ভূত হই।

ইহার চেয়ে জোরের ভাষা হইতে পারে না; ইহার চেয়ে স্পষ্ট কথা হইতে পারে না। মেরীগর্ভে জীবরূপে অবতীর্ণ শব্দরূপী খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। তাহার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে অম্ভৃণ-কন্যারূপে অবতীর্ণা বাগ্‌দেবীও স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, আমিই বিশ্ব ভুবনের নির্ম্মাণকর্ত্রী—অহং ব্রহ্মাস্মি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যে দার্শনিক অদ্বৈতবাদ খুঁজিয়া পান নাই; এই সূক্তটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে।

ইড়াদেবীকে আপনারা চিনিলেন। ইনি বেদপন্থীর সনাতনী বাগ্‌দেবী। শ্রৌতকর্ম্মের সহিত ইড়াভক্ষণ অনুষ্ঠান এখন অপ্রচলিত; ইড়াভক্ষণে ইড়াদেবীকে—বাগ্‌দেবীকে—ভক্ষণ করিয়া আত্মস্থ করা হইত। ইড়া সর্ব্বদেবময়ী; সকল যজ্ঞেই ইড়াভক্ষণ বিহিত ছিল। যজ্ঞান্তে যজমান বিষ্ণু-পদ পাইতেন। ইড়াদেবীর নাম পর্য্যন্ত আপনারা ভুলিয়াছেন। কিন্তু বাগ্‌দেবীকে বেদপন্থী ভুলিতে পারেন না। তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া বেদপন্থীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদপন্থীকে আমি মোটের উপর nominalist বলিয়া জানি। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, দেবতার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীর নাই; কোন রূপ নাই। যে কোন পদার্থের, যে কোন conceptএর বা ideaর একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে, সেই পদার্থই দেবতা। যাহা কিছু object of thought, তাহাই দেবতা। যে বাক্যে সেই conceptএর তাৎপর্য্য বা connotation পাওয়া যায়, সেই বাক্যই—সেই predicationই,—দেবতার মন্ত্র; অতএব দেবতা নামাত্মক। ইহা চূড়ান্ত nominalism. জগতে যাহা কিছু মননযোগ্য বা object of thought আছে বা থাকিতে পারে, তাহাই দেবতা এবং যে দেবতাকে যে নাম দেওয়া যায়, সেই নামই সেই দেবতার শরীর। এই অর্থে দেবতামাত্রই শব্দময়ী, বর্ণময়ী। যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা দেবতার নামকেই দেবতার তুল্যমূল্য ধরিয়া লইয়াছেন। এমন কি, সত্যভামা ঠাকুরাণী তুলাদণ্ডে তাঁহার হরির মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া ফাঁপরে পড়িলে, রুক্মিণী তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, হরির চেয়ে হরির নামের গুরুত্ব অধিক। বেদপন্থীর এই nominalism শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক নাম-মাহাত্ম্য-প্রচারে চরম সার্থকতা পাইয়াছে। ও এই

একাক্ষর শব্দটির প্রাচীন অর্থ—হাঁ; আছে কি নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইত, ওঁ অর্থাৎ হাঁ,—আছে। ব্রহ্ম আছেন এ বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ ছিল না, তাঁহারা এই ওঁ অক্ষরটিকেই ব্রহ্মের সব চেয়ে ব্যাপক ও প্রসিদ্ধ নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি। তন্ত্রপন্থী দার্শনিকও বেদপন্থীর এই nominalism গ্রহণ করিয়াছেন। ওঙ্কারের অনুকরণে তিনিও x, y, z, বা ক খ গ বা হিং টিং ছট্ ইত্যাদি অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নাম বা বীজমন্ত্র দ্বারা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন। অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নামের সুবিধা এই যে, সাধক নিজের স্বভাব ও মেজাজ অনুসারে যে কোন সঙ্কেতে যে কোন সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য্য আরোপ করিতে পারেন —আপনার মনের মত করিয়া আপনার দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্ত হন না। তন্ত্রপন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক; তিনি প্রত্যেক নামকে একটা রূপ দিয়া realise করিতে চাহেন, রূপের জগতে টানিয়া আনিয়া দেবতার সহিত মেলা মেশা কারবার করিয়া রসসম্ভোগ করিতে চাহেন। তিনি এখানে আর্টিষ্ট। প্রত্যেক নামের, প্রত্যেক দেবতার, তিনি একটা রূপ কল্পনা করিয়াছেন; সেই নামের যে তাৎপর্য্য বা connotation তিনি দিতে চাহেন, তদনুযায়ী রূপ কল্পনা করিয়াছেন। সেই রূপ ধ্যান করিয়া তিনি তৃপ্তি পান। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ঝগড়ার কোন লাভ নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বেদপন্থীর বাগ্‌দেবীকে শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তন্ত্রে তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী। ইনি শব্দাত্মিকা—অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে ইঁহার দেহ নির্ম্মিত; প্রতি অঙ্গে কতকগুলি বর্ণ বা অক্ষর বসাইয়া ইঁহার শব্দময়—বর্ণময় —দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে—অতএব ইনি পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃ-পদ্মধ্যবক্ষঃ-স্থলা। ইনি ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা—ইঁহার মস্তকে সোমকলা নিবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। এ সেই সোমকলা, বাগ্‌দেবী স্বয়ং যাহা আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এক হাতে মুদ্রা, এক হাতে অক্ষমালা, এক হাতে বিদ্যা, চতুর্থ হাতে সুধাঢ্য কলস,—অমৃতপূর্ণ কলস—ইহাও সেই সোমকলস, যাহা অমৃতরসে পূর্ণ। ইনি ত্রিনয়না—বিশদপ্রভা—আপীনতুঙ্গস্তনী। এমন রূপ আর হয় না। এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বময়ী;—যে কোন দেবতার পূজায় বসিয়া যিনি পূজক, তিনি আপনাকে এই মাতৃকা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন মনে করেন—আপনার প্রতি অঙ্গে অ আ ক খ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ বিন্যাস করিয়া আপনার স্থূল দেহকে বাগ্‌দেবতার বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন;

আপনার অন্তঃশরীরের ও চক্রে চক্রে ঐস্তর্ণ বর্ণ বিন্যাস করিয়া অন্তর্দেহেও বাগ্‌দেবীর বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন। তন্ত্রমতে পূজাকালে ভূতশুদ্ধির পরে এইরূপে মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়। বাহিরের দেহে ও অন্তর্দেহে বর্ণ বিন্যাস দ্বারা বাগ্‌দেবীর পঞ্চময় বাঙ্‌ময় দেহ রচনার নামই মাতৃকা ন্যাস। এইরূপে পূজায় বসিলে পূজকের সহিত বাগ্‌দেবতার অভিন্নতা কল্পিত হয়; জীবের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য কল্পিত হয়। বৈদিক যজ্ঞে ইড়াভক্ষণের অভিপ্রায় যজমানের সহিত বাগ্‌দেবতার—পরব্রহ্মের—ঐক্য সম্পাদন। তান্ত্রিক পূজারও সেই একই অভিপ্রায়। খ্রীষ্টান তাঁহার বাগ্‌দেবতাকে গ্রীকদের নিকট ধার করিয়া লইয়াছেন; তাঁহাকে মূর্ত্তি দিয়া খ্রীষ্ট বিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই ব্রহ্মব্রহ্ম-তত্ত্বকে অধিকদূর ফলাইতে পারেন নাই। বেদপন্থী যাহা ধরেন, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন।

এতক্ষণে আপনারা ইড়াভক্ষণের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। হাসিবেন না, ইড়া ভক্ষণ খ্রীষ্টানের দেবতা ভক্ষণের অনুরূপ অনুষ্ঠান। ইড়াভক্ষণে বাগ্‌দেবতাকে আত্মস্থ করা হয়, বাগ্‌দেবতার সহিত সাযুজ্য স্থাপন হয়, অমৃত ভোজন ঘটে। সোমপানেও যে ফল, ইড়া ভক্ষণেও সেই ফল। ইড়া ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না—ইড়াভক্ষণেই যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা। পুরাকালে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কতটা স্থান জুড়িয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিবেন। যজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকে আমি এ পর্য্যন্ত খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু এখন খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে কথায় কথায় যজ্ঞ সম্বন্ধে উপাখ্যান দেখিবেন। সকলেই যজ্ঞ করিতেছে। রাজারা করিতেছেন, ঋষিরা করিতেছেন, অগ্নিসোগণ করিতেছেন, আদিত্যগণ করিতেছেন, পিতৃগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ, সকলেই যজ্ঞ করিতেছেন। এমন কি গাভীগণ ও বৃক্ষগণও যজ্ঞ করিতেছে। যজ্ঞ লইয়া দেবগণের সহিত অসুরগণের কেবলই বিবাদ হইতেছে। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ অসুরগণকে পরাভব করিতেছেন। দেবতারা যজ্ঞকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, বরং আপনি আসিয়া ধরা দিতেছেন; দেবগণের সকল কামনা পূর্ণ করিতেছেন। মনু যজ্ঞ করিয়া তৃপ্ত মানববংশ রক্ষা করিতেছেন। সংবৎসররূপী অর্থাৎ কালরূপী প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ করিতেছেন; ঋতুগণ ও মাসগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছেন। প্রজাপতির ইচ্ছা হইল, আমি একা আছি, বহু হইব। তিনি

তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া আপনার প্রাণের মধ্যে বাদশাহ যজ্ঞ দেখিতে পাইলেন। সেই বাদশাহ যজ্ঞকে আবিষ্কার করিয়া তিনি সেই যজ্ঞ করিলেন; তাহাতেই তিনি যজ্ঞ হইলেন ও প্রজাপতি হইলেন। দেখাদেখি ইন্দ্র বাদশাহ যজ্ঞ করিলেন; তাহাতে তিনি দেবগণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইলেন। প্রজাপতি একলাকে গৃহপতি হইয়াছিলেন; দেবগণও যজমান হইয়া প্রজাপতির সহিত একযোগে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহাদের চিত্তি স্রুক্ হইয়াছিল, চিত্ত আজ্য হইয়াছিল, বাক্য বেদি হইয়াছিল, ধ্যান বর্হিঃ বা কুশ হইয়াছিল, জ্ঞান অগ্নি হইয়াছিল, বিজ্ঞান অগ্নীৎ হইয়াছিল, প্রাণ হব্য হইয়াছিল, সাম অধ্বর্যু হইয়াছিল, বাচস্পতি হোতা হইয়াছিলেন, মন মৈত্রাবরুণ হইয়াছিল। অধিক কি বলিব, এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ। স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছেন। মনে রাখিবেন, যাজ্ঞিকের পরিভাষা মতে কোন দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে বিরাট্ পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন। কোন্ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছিলেন? যজ্ঞদেবতার উদ্দেশেই আহুতি দিয়াছিলেন। প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞপুরুষ—যজ্ঞদেবতা, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার কোন ইষ্টলাভ বাকিতে পারে না; তিনি সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা লীলা-কৈবল্য। আপনারা বিখ্যাত পুরুষ সূক্তের কথা শুনিয়াছেন—সেই পুরুষ সূক্তে সৃষ্টিকর্ত্তার অনুষ্ঠিত এই আদিম যজ্ঞের—এই পুরুষ যজ্ঞের—সবিশেষ বিবরণ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন পুরুষ; এক জন Person, যাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে, কামনা মাত্রে, তপস্যা মাত্রে, এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে পুরুষ, তাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি, সহস্র পদ। বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন এবং তাহার উপরেও আরও দশ অঙ্গুলি ব্যাপিয়া আছেন। সমস্ত বিশ্বভূত তাঁহার একপদ মাত্র, তাঁহার অন্য তিন পদ বিশ্বভূত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। যাহা কিছু আছে, যাহা ছিল বা হইবে, তাহা লইয়াই এই পুরুষ। অথচ এই সমস্তই তাঁহার এক পদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পদ এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তিনি বিরাট্‌রূপে জন্মিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন; এবং জাত হইয়াই সম্মুখে এবং পশ্চাতে সমস্তকে আক্রমণ করিলেন এবং অতিক্রম করিয়া রহিলেন। তিনিই অগ্রজন্মা পুরুষ; তখন কোথাও কোন দেবতা ছিল না, ঋষি ছিল না, মনুষ্য ছিল না, অথচ সেই অগ্রজা পুরুষেরা কোথা

হইতে আসিয়া সেই অগ্রজন্মা বিরাট্ পুরুষকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে চমকাইবেন না; অঘটনা কালাতিগ ঘটনা; এখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সহিত মিশিয়া থাকে। যজ্ঞে পশু আবশ্যক; সেই পুরুষকেই তাঁহারা পশু করিলেন। "তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ, তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে"—ঋষিগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ সেই অগ্রে জাত পুরুষকেই পশুরূপে প্রোক্ষিত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। "দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্"—দেবগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই পুরুষকেই পশুরূপে বন্ধন করিলেন। সেই যজ্ঞ সর্ব্বহুত যজ্ঞ। যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই সেই পুরুষ; সেই সর্ব্বরূপ পুরুষকেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল; সেই পশুকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া আহুতি দেওয়া হইল। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্রাগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে জন্মিল। আরণ্য এবং গ্রাম্য পশুগণও উৎপন্ন হইল। ভাবী জীবগণের হিতার্থী বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—আপনাকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন;—ভাবী জীবেরা, ভাবী দেবগণ ও ভাবী ঋষিগণ, যজমান ও ঋত্বিক্ হইয়া তাঁহার সহিত একযোগে তাঁহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞের সম্পাদন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যজ্ঞের কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিবেন। ইহাই বিশ্বমধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম যজ্ঞ; কেবল যজ্ঞের জন্যই, অন্য কামনা বর্জ্জন করিয়া কেবল যজ্ঞের জন্যই, এই প্রথম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ, তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্"—এখন যে যজ্ঞ করা হয়, সে সেই আদিম যজ্ঞেরই অনুকরণে।

বিরাট্ পুরুষের এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল। বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করা হইতেছে, "কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানম্"—এই যে যজ্ঞ হইয়াছিল, ইহার পরিমাণ কি ছিল, প্রতিমা কি ছিল, উহার সঙ্কল্প কি ছিল? "আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ, ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থম্; যদ্ দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে"—বিশ্বমধ্যে দেবতারা যজ্ঞ পুরুষের যে যাগ করিয়াছিলেন, তাহার আজ্য কি ছিল, পরিধি কি ছিল, ছন্দ কি ছিল, পঙ্‌ক্তই বা কি ছিল? বলা হইতেছে, "যো যজ্ঞো বিষতস্তন্তসর্জি-

শুক্ল একশতং দেবকর্ম্মেভির্যায়ভঃ"—বিশ্ব ব্যাপিয়া এই যে যজ্ঞরূপ বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে, দেবগণের যাবতীয় কর্ম্ম তাহাতে তন্তুস্বরূপ হইয়াছে। "ইমে বয়ন্তি পিতরো য আয়য়ুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে"—সম্মুখের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, বলিতে বলিতে পিতৃগণও আসিয়া সেই বয়ন কার্য্যে যোগ দিতেছেন। "চা কৃপ্রে উপ সরো মনুষ্যাঃ, যজ্ঞে যাতে পিতরো নঃ পুরাণে"—সেই পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাহারই অনুকরণে আমাদের পিতৃগণ মনুষ্যগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। "পশ্যন্ মধে মনসা চক্ষসা তান্, য ইমং যজ্ঞম্ অযজন্ত পূর্ব্বে"—পূর্ব্বে যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এখনও যেন জ্ঞানচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতঃ এই সৃষ্টি-যজ্ঞ কখনও সমাপ্ত হইবার নহে। কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই যজ্ঞ ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন; এই সৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতাই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট্‌পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন। সেই যুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে বদ্ধ করিয়া আপনাকে যজ্ঞিয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্বজগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্বজগৎটাই সেই যজ্ঞিয় পশুর দেহ; যাবতীয় জীবের হিতার্থে ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা ভোগ্যরূপে—অন্নরূপে—নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ এবং আত্মসাৎ করিয়া সেই বিরাট্‌পুরুষের শরীরে আপনার শরীর মিশাইতেছে। বিরাট্ পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন; অথচ তিনি নষ্ট—নিহত—হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা এক দিনের অনুষ্ঠান নহে—মহাকাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রারম্ভও নাই, উদয়নও নাই, আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই; কেন না, এই যজ্ঞই ত বিশ্বব্যাপার। বেদপন্থী সমাজে অগ্নিচয়ন বলিয়া একটা সংবৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত। তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার তাৎপর্য্য বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে একটি বেদি গাঁথা হইত, তাহার নাম চিতি। ইটের পাশে ইট বসাইয়া, ইটের উপর ইট থাকে থাকে সাজাইয়া, এই চিতি

নির্ম্মিত হইত। তজ্জন্য বহু ইষ্টকের প্রয়োজন হইত। এই চিতির যজ্ঞস্থলে উত্তর বেদি গড়িয়া সেখানে অগ্নির স্থাপনা হইত; এবং সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। কোথাও বা সংবৎসর ধরিয়া সত্ররূপে অগ্নিচয়নের অনুষ্ঠান হইত। অনুষ্ঠান ভেদে এই অগ্নি নানাবিধ নাম পাইত। কোথাও নাম সাবিত্র অগ্নি; কোথাও বৈশ্বসৃজ অগ্নি; কোথাও বা চাতুর্হোত্র অগ্নি; কোথাও নাম নাচিকেত অগ্নি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে অন্য অগ্নির সহিত নাচিকেত অগ্নির চয়নের বিস্তৃত বিবরণ আছে। নাচিকেত অগ্নির প্রসঙ্গ আপনারা কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদ মধ্যে পাইয়াছেন। মৃত্যু নচিকেতাকে এই অগ্নিচয়নে ইষ্টকের সংখ্যা ও ইষ্টক স্থাপনের প্রণালী এবং অগ্নির তাৎপর্য্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার নামেই এই অগ্নির নাম হইবে; যে তিন বার এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিবে, সে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিবে ও পরম শান্তিলাভ করিবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সেই উপাখ্যানটির উল্লেখ আছে। আর এক অগ্নির নাম আরুণ-কেতুক অগ্নি—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের আরম্ভেই ইহার সবিস্তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। উত্তর বেদির স্থানে গর্ত্ত করিয়া জল ঢালা হইত; তাহার উপর পদ্মের পাতা, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মফুল বিছাইয়া একখানা পদ্ম পত্রে সোণার পাতের উপরে সোণার পুরুষ মূর্ত্তি রাখা হইত; তাহার পার্শ্বে একটা কূর্ম্ম—কাচ্ছিম—রাখা হইত। অতঃপর সেখানে অগ্নি রাখিয়া অগ্নির চারিদিকে ইট সাজাইয়া চিতি প্রস্তুত হইত। এই অগ্নির নাম আরুণকেতুক অগ্নি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জলময় ছিল। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে বিখ্যাত নাসদাসীয় সূক্তে এই জলের কথা আছে—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে, অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।" সেই জলমধ্যে পদ্মপত্রে একা প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার কামনা হইল, আমি সৃষ্টি করিব। এখানেও তৈত্তিরীয় আরণ্যক নাসদাসীয় সূক্তের দোহাই দিয়া বলিতেছেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—অগ্রে কাম উৎপন্ন হইল, উহা মন হইতে বীজরূপে প্রথমে অগ্নিল। সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টি-কামনাকেই পৌরাণিকেরা প্রজাপতির মানসপুত্র মন্মথজ কামে পরিণত করিয়াছেন। জলমধ্যে পদ্মপত্রস্থ প্রজাপতিতেও আপনারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইবেন। সে কথা যাক্। সৃষ্টি কামনা করিয়া প্রজাপতি তপস্যা করিলেন ও আপনার শরীর কল্পন করি-

লেন। শরীর হইতে কতকগুলি ঋষি জন্মিল—একদল ঋষির নাম অরুণকেতু। প্রজাপতি দেখিলেন, জল মধ্যে একটি কূর্ম্ম—কচ্ছপ—চরিতেছে। প্রজাপতি সেই কূর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এখনই জন্মিলে? কূর্ম্ম বলিল, না, আমি আগে হইতেই আছি; এই বলিয়া কূর্ম্ম সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষের মূর্ত্তি ধরিল। এই তিনটি বিশেষণেই আপনারা ইহাকে চিনিতে পারিবেন; ইনিই পুরুষসূক্তের বিরাট্ পুরুষ। এইখানে নারায়ণের কূর্ম্মাবতারের মূলও পাইবেন। প্রজাপতি বলিলেন, তাহা হইলে তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর। তখন সেই পুরুষ অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া এদিকে ওদিকে ছিটাইতে লাগিলেন। এক এক দিকে এক এক দেবতা জন্মিল—আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা জন্মিল। সেই জলের বিন্দু হইতে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মিল। ফলে ঐ যে কূর্ম্মরূপী পুরুষ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রজাপতির মধ্যেই ছিলেন, প্রজাপতির সৃষ্টিকামনার পর তিনি বাহিরে আসিলেন মাত্র। প্রজাপতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন; তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপসংহারে বলিতেছেন—বিধায় ভূতানি বিধায় লোকান্, বিধায় মর্ত্যান্ প্রদিশো দিশশ্চ, প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য, আত্মনা আত্মানম্ অভি সংবিবেশ—সত্যস্বরূপ অগ্রজন্মা প্রজাপতি ভূতসকল ও লোকসকল বিধান করিয়া দিক্ বিদিকের সৃষ্টি করিয়া নিজেই নিজের সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইংরেজিতে বলিলে তিনি বিশ্বজগৎকে transcend করিয়াও তাহাতে immanent রহিলেন।

আরুণকেতুক নামক অগ্নির চয়ন অনুষ্ঠান প্রজাপতি কর্ত্তৃক সেই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারের অনুকরণ। উত্তর বেদির নীচে যে জল ঢালা হয়, উহাই সেই সৃষ্টির পূর্ব্বতন কারণ সলিল; পদ্মপত্রস্থ বা সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট হিরণ্ময়বপুঃ পুরুষ কারণসলিলশায়ী নারায়ণ; পার্শ্বে কাছিমটি কূর্ম্মরূপী বিরাট্ পুরুষ। এই বিরাট্ পুরুষ স্বদেহ দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠিত পুরুষ-যজ্ঞ। চিতির মধ্যে উত্তর বেদিতে যে অগ্নির প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ অগ্নিই প্রজাপতির তৈজস রূপ; বৈশ্বানর অগ্নিরূপে তিনি জগতের যাবতীয় কর্ম্মের প্রেরণা করিতেছেন। অগ্নির চারিদিকে ইট বসাইয়া যে চিতি নির্ম্মিত হয়, তাহা প্রজাপতির স্থূল দেহ—বিশ্বজগৎরূপ স্থূল দেহ; ইষ্টকগুলি সেই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—কূর্ম্মপুরুষনিক্ষিপ্ত কারণসলিলের বিন্দু হইতে উৎপন্ন জাগতিক লোকসকল বা ভূতসকল। অরুণকেতু ঋষিগণের নামানুসারে ঐ অগ্নির

নাম আরুণকেতুক অগ্নি। ঐ অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে পুরুষ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান ঘটে। শতপথ ব্রাহ্মণ এই অগ্নিচয়নের থিয়োরি আরও ফলাইয়াছেন। ঐ অগ্নি বৈশ্বানর অগ্নি—জগতের যাবতীয় কর্ম্মের বা যাবতীয় ঘটনার প্রেরক। ঐ চিতি প্রজাপতির স্থূল দেহ—উহা প্রজাপতির দেহ বটে; শতপথ বলেন, উহা যজমানের দেহও বটে—কেন না যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। উহা আবার সংবৎসরের দেহ, অতএব কালস্বরূপ; প্রজাপতিই সংবৎসর, সংবৎসরই কাল। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান সংবৎসর ধরিয়া চলে। প্রজাপতির সৃষ্টিকর্ম্ম কাল ব্যাপিয়া চলিতেছে; উহার আদি নাই, অন্ত নাই। চিতিটিকে শ্যেনপাখীর আকার দেওয়া হইত। এই শ্যেনপাখী ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে সমর্থ; আপনাদের মনে থাকিবে, এই শ্যেনপাখী একদা কোন্ ঊর্দ্ধলোক হইতে সোমরূপী অমৃত আনয়ন করিয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বুঝাইতেছেন, চিতি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই যে অগ্নি, ইনি জগৎ-কর্ম্মের প্রেরক বৈশ্বানর অগ্নি; ইনিই প্রজাপতির স্বরূপ। শতপথ বলেন, ইনি আবার যজমানেরও স্বরূপ; কেন না যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। ইহাতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতির আত্মাহুতি; তাহা জীবনযজ্ঞে যজমানেরও আত্মাহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই আত্মাহুতিকে আমরা মৃত্যু বলি; এই আহুতির বিরাম বা অন্ত নাই; মৃত্যুরও বিরাম বা অন্ত নাই। প্রজাপতি আপনাকে ত্যাগদ্বারা নিহত করিতেছেন; যজমানও আপনাকে ত্যাগদ্বারা নিহত করিতেছেন। প্রজাপতি মৃত্যুস্বরূপ; যজমানও মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুর অন্ত নাই, কেন না এই মৃত্যু দ্বারাই অমরতা পাওয়া যায়। প্রজাপতি মৃত্যুঞ্জয়—যজমানও মৃত্যুঞ্জয়ী। খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রসঙ্গ আবার মনে করিবেন।

বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞের স্থান আমি আপনাদিগকে দেখাইতে চাহি। ইষ্টি যাগাদি যজ্ঞ বটে; ঐ সকল অনুষ্ঠান প্রাচীনতর কালের অনুষ্ঠান; আর ও প্রাচীন কালের survival. ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল অনুষ্ঠান সমাজে চলিত হইয়াছিল—যাজ্ঞিকেরা উহাতে নূতন তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগকে সেই নূতন তাৎপর্য্যই মানিতে হইবে; এবং এই তাৎপর্য্য অনুসারে যজ্ঞকে খুব ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে। ইহা টাইলার সাহেবও মানিয়াছেন। বেদপন্থী যজ্ঞকে কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম—ঋক্‌মন্ত্র প্রচারের সময়েও কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম। খ্রীষ্ট যজ্ঞের সহিত

পুরুষ-যজ্ঞের সাদৃশ্য তুলনা করিবেন। ওয়েবারের মত বিদেশী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশী খ্রীষ্টান এই সাদৃশ্য কতকটা দেখিয়া চমকাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার ব্যাপকতা দেখিতে পান নাই। খ্রীষ্টানের মতে ঈশ্বর স্বয়ং জীবহিতের জন্য যজ্ঞের পশুরূপে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন—সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ তৎক্ষণে ইতর জীব ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করে। খ্রীষ্টান এই একত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টানের কাছে এই একত্ব সালোক্য বা সামীপ্য মাত্র; তাহার অধিক কিছু নহে। বেদপন্থীর মতে পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য্য আরও ব্যাপক। ঈশ্বর আত্মাহুতি দিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হইয়াছিলেন। যিনি মুক্ত তিনি বদ্ধ হইয়াছেন, যিনি বড় তিনি ছোট হইয়াছেন, যিনি অমৃত তিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন। ইতর জীব জানে না, যে সে নিজে সেই ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; সে নিজেই ঈশ্বর—তাহার বাহিরে আর কোন ঈশ্বর নাই; অতএব সে চিরমুক্ত; অথচ তাহাকে বদ্ধ সাজিয়া সংসার-যাত্রা চালাইতে হইতেছে, অমৃত হইয়াও মৃত্যু স্বীকার করিতে হইতেছে; সেও জীবন ব্যাপিয়া পশুর মত যূপবদ্ধ থাকিয়া পুরুষযাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্, যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনম্, অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্ বর্ষাণি তৎ তৃতীয়ং সবনম্,—মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; তাহার চব্বিশ পরমায়ু একদম ষোল বৎসর ধরিলে প্রথম চব্বিশ বৎসর সেই যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মধ্যের চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, এবং শেষের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন মনে করা যাইতে পারে। আবার বলা হইতেছে, মানুষ শৈশবে যে পান ভোজন করে, তাহাই এ যজ্ঞে দীক্ষা; বাল্যে যে খেলাধূলা করে, তাহাই উপসদ্; যৌবনে যে সংসারধর্ম্ম করে, তাহাই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ; আর বার্দ্ধক্যে যে তপস্যাদি করে, তাহাই দক্ষিণা; পরিশেষে মৃত্যুই তাহার অবভৃথ স্নান। ছান্দোগ্য বলেন, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি তাঁহার শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে মানবজীবন সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—"অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংহিতমসি"—অহে হে প্রাণধারী মানুষ, তুমি অচ্যুত, তুমি অক্ষয়। উত্তর কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এই দেবকী-

নন্দন কৃষ্ণটিকে অচ্যুত এবং অক্ষয় পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশকেই পল্লবিত করিয়া গীতাশাস্ত্ররূপে তাঁহারই মুখ দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একালের অনেক পণ্ডিতে বলেন, যজ্ঞকে নিন্দা করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল; বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যই আধুনিক কালে উপনিষদের এবং গীতাশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। এ সব বাজে কথায় আপনারা কাণ দিবেন না। ঋক্‌মন্ত্রের প্রচার কালেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য কতটা ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমি উপস্থিত করিয়াছি—সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা সমর্থন করিলাম। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোন মর্ম্মগত বিরোধ নাই; আপনারা আশ্বস্ত হইবেন।

এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতাগ্রন্থেই বলিয়াছেন—"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"—স্বয়ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিতই প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে; ইহাতেই তোমাদের কামনার পূরণ হইবে। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"—যাহারা যজ্ঞের হবিঃশেষ রূপে সকল ভোগ্য ভোগ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্"—যজ্ঞের যাহা হবিঃশেষ, তাহাই অমৃত; সেই অমৃত ভোজনে সনাতন ব্রহ্ম লাভ হয়। অধিক কি বলিব, "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ যজ্ঞ কোন্ যজ্ঞ? এক পক্ষে ইহা বিশ্বকর্ম্মার পুরুষ যজ্ঞ, অন্য পক্ষে ইহা ইতর মানবের জীবন যজ্ঞ; একটা অন্যটারই প্রকারভেদ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গরূপে দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ঘোর আঙ্গিরসের ও এই উপদেশ—তাঁহার ক্ষত্রিয় শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও এই উপদেশ। উপনিষদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিরোধ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরম তৃপ্তি পান, তাঁহারা এখানে অবধান করিবেন। দেবকীনন্দন বলিতেছেন, যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্—যে কর্ম্ম তুমি করিবে, তোমার দান, তোমার তপস্যা, তোমার পূজা, তোমার পানভোজন পর্য্যন্ত তুমি যজ্ঞরূপে আমার উদ্দেশে অর্পণ করিবে; আমি অচ্যুতই সেই যজ্ঞের দেবতা। তন্ত্রপন্থীও এই বাক্যকে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"; মনে রাখিবেন যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান।

যজ্ঞ নানাবিধ—"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে, স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ"—কাহারও নিকট দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ, কাহারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কাহারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনই কাহারও নিকট যজ্ঞ। কেহ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেহ বা রূপরসাদি ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন; আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ; যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ। কে কাহার উদ্দেশে কোন্ দ্রব্য আহুতি দেয়? ইহার উত্তরে আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্বের চরম কথা বলিতেছেন—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্; ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"—এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম; ব্রহ্মই এখানে যজমান বা ঋত্বিক্ সাজিয়া আহুতি দিতেছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা; এই ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে।

জীবনের কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ; ত্যাগের পর যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহারই ভোগ কর্ত্তব্য—ইহাই হবিঃশেষ ভোজন, অতএব অমৃতভোজন; "যজ্ঞবিষ্টাশিনঃ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে এই যজ্ঞরূপে দেখিলে জীবনটাই উঁচু হইয়া পড়ে—নীচের পরদা হইতে উঠিয়া অত্যন্ত উঁচু পরদায় উপনীত হয়; জীবনের অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই—বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় হইতেই—এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরিয়া আছি, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

আপনারা গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা জানেন। মনুষ্য জন্মমাত্রেই কয়েকটা ঋণে বদ্ধ হইয়া জন্মে, ইহা মানবজন্ম সম্বন্ধে অতি প্রাচীন থিয়োরি। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে।" উত্তর-কালে এই তিন ঋণ পাঁচ ঋণে দাঁড়াইয়াছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্য-বিধাতা; পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে; পশু পাখী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপে তাহার জীবন রক্ষায় সাহায্য করিতেছে। অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই ঋণী আছে। এই

পাঁচটি ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া জীবনযাত্রাটা দুষ্কর। জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণশোধের চেষ্টা করিতে হইবে। এক একটা ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডুষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ভূতগণের অর্থাৎ পশুপাখীর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্য যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ স্বাধ্যায়ং অধীয়ীত একামপি ঋচং যজুঃ সাম বা, তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্ততঃ একটি ঋক্ একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই; কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপি এই পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞপঞ্চক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই, এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এস্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন, "পঞ্চ বা এতে

মহাযজ্ঞা সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে'—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দিনে সমাপ্ত করিতে হইবে। কৌতুক এই যে ঋষিযজ্ঞকে সকল যজ্ঞের উপরে, এমন কি দেব-যজ্ঞের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যার্জ্জন; ইহার নামান্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বিদ্যার যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট cultureএর প্রতিষ্ঠাতা; ঐ সমাজের যাহা প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "সমাধের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতারা তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ দিলেন। তদবধি তাঁহারা ঋষি হইলেন। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে সেই বেদবিদ্যাকে পাইয়াছেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্যক, নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋক্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ঘৃতাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সাম মন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। গ্রহ চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।" এই শেষের বাক্যটি আমাদের সেনেট হাউসের দরজায় খোদাই করিয়া রাখা উচিত।

মানুষের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন—মানুষ অন্য পশুর মত খায়, লাফায় ও ঘুমায়, এবং অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজের স্বার্থসাধন করে। আপাততঃ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন রক্ষা—পরের জীবন নষ্ট করিয়া আপন জীবনের রক্ষা। প্রাণিবিদ্যা বা biology বিদ্যামতে মানবজীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ জীবনে কোন রস নাই, কোন গৌরব নাই। মানব-জীবনকে পশু জীবনের উপরে রাখিতে হইলে জীবনে সম্পূর্ণ উল্টা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ম্মকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের জীবনের সহিত মিলাইয়া সমঞ্জস করিয়া দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের ভাষায় যে বৈশ্বানর অগ্নি বিশ্বজগতে সর্ব্বকর্ম্মের

প্রেরণা করিতেছেন, সেই অগ্নি মানবের প্রাণকেও জীবনের কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন, মনে করিতে হইবে। এই বৈশ্বানর অগ্নিকেই অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে উত্তর বেদিতে আহরণ করিতে হয়—ইনিই বিরাট্ পুরুষরূপ প্রজাপতির প্রাণ, অতএব জীবেরও প্রাণ। প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন, "স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ অগ্নিরুদয়তে"—সেই বিশ্বরূপ বৈশ্বানরই জীবদেহে প্রাণাগ্নিরূপে উদিত হন। ইহারই প্রসাদে তুমি "অৎসি অন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্"—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় দর্শন করিতেছ। এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই যাবতীয় জীব অন্নের অন্বেষণে, ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণে, ছুটিতেছে; এবং সেই প্রাণাগ্নিতেই সেই অন্নের, সেই ভোগ্য বস্তুর, সমর্পণ করিতেছে। ইহা এক রকম নিত্য অগ্নিহোত্রের ব্যাপার; প্রাণিমাত্রকেই আপন দেহে এই অগ্নিহোত্র অহরহঃ সম্পাদন করিতে হইতেছে। "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রমুপাসতে"—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন স্তন্যের জন্য মাতার নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত এই অগ্নিহোত্রের সমীপে উপস্থিত হয়। বিশ্বরূপ প্রজাপতির দেহ ব্যাপিয়া এই অগ্নি সঞ্চরণ করিতেছেন; প্রাণিদেহের অগ্নিতে অন্নাহুতি হইলেও সেই বিশ্বরূপী প্রজাপতির উদ্দেশেই আহুতি হয়। "প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে অন্তঃ, ত্বমেব প্রতিজায়সে, তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি, যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি"—অহে প্রাণ, তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর, এবং তুমিই জীবরূপে জন্মগ্রহণ কর; সকল প্রাণ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে; সকল প্রজা তোমার উদ্দেশে বলি আনিয়া উৎসর্গ করিতেছে। প্রাণের ভিতরে নিত্য আকাঙ্ক্ষার ও বাসনার আগুন জ্বলিতেছে, তাহার তৃপ্তি আবশ্যক—ইহা তাহার নিত্য অগ্নিহোত্র। পশুধর্ম্মী মানুষ ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কেবল একটা biological need মনে করিবেন না। তাহা সেই অগ্নিহোত্রের আহুতি—ইহার নাম প্রাণাগ্নিহোত্র। জীবনরক্ষার জন্য শেয়াল কুকুরের মত অন্নের গ্রাস গিলিয়া গলাধঃকরণ করায় কোন বিশিষ্টতা নাই; কিন্তু ঐ পাশবিক কর্ম্মকে নিত্য সন্ধ্যা অগ্নিহোত্ররূপে দেখিলে, উহাতে আর পাশবিকতার ক্লেদ থাকে না, উহা মানবিকতার গৌরবে মণ্ডিত হয়। ছান্দোগ্য বলিতেছেন, "তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ হোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি, প্রাণস্তৃপ্যতি"—ভোজ্যের যে প্রথম গ্রাস উপস্থিত হয়, তাহা

হোমদ্রব্য ; প্রাণের স্বাহা বলিয়া সেই ভাতের গ্রাস আহুতি দিবে, প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে। কেবল নিজের প্রাণ কেন, বিশ্বের প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হইবে ; "সর্ব্বেষু লোকেষু, সর্ব্বেষু ভূতেষু, সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি" ; এইরূপে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব ভূতে সর্ব্ব আত্মার আহুতিরূপে অর্পিত হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী উপনিষৎ মন্ত্রটিকে আরও স্পষ্ট করিতে চাহেন। অন্নগ্রাস গ্রহণের মন্ত্র হইবে—"প্রাণে নিবিষ্টঃ অমৃতং জুহোমি, প্রাণায় স্বাহা"—আমি প্রাণে নিবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিতে যে আহুতি দিতেছি, ইহা অমৃতাহুতি ; এই যে অন্ন, ইহা অমৃত। প্রাণ অপানাদি পাঁচ প্রাণের উদ্দেশে ঐরূপ পাঁচটি আহুতির পর সমাপ্তিতে, বলা হইবে, "ব্রহ্মণি মে আত্মা অমৃতত্বায়"—আমার আত্মা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করুক। অনুষ্ঠানরত গৃহস্থেরা এখনও ভোজনকালে এইরূপে পঞ্চগ্রাস লওয়ার প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। কেহ কেহ এখনও ইষ্টিযাগ করিয়া ইড়া ভক্ষণে দরকার কি ? প্রত্যহ উদরপূরণের জন্য আমি ভোজনেই আমরা ইড়া ভক্ষণের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারি। অন্নের প্রত্যেক গ্রাসই ইড়া ; অন্ন ভোজনের ব্যাপারটা নিতান্ত উদরপূরণের ব্যাপার মনে না করিয়া ইহাতে আমরা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট যজ্ঞে বৈশ্বানর অগ্নিতে অর্পিত হবিঃশেষ ভক্ষণ মনে করিলে, বিশ্বহিতার্থ নিযুক্ত আপনার দেহটাকে পুরুষ যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ রাখিবার উপায় রূপে মনে করিলে, কর্ম্মটা পাশবিকতার স্তর হইতে একবারে মানবিকতার স্তরে উঠিয়া পড়ে।

এ দৃষ্টান্ত একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। আসল কথা এই :—আমার এই যে জীবন, ইহা বৈশ্বানর অগ্নির চয়নব্যাপার মাত্র। মারা জীবন ধরিয়া ইটের পাশে ইট গাঁথিয়া, ইটের উপর ইট বসাইয়া, আমি পুরুষ যজ্ঞের চিতি নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিতেছি। এ কেবল ত্যাগের ব্যাপার ; ভোগের এখানে কোন অবসর নাই। এই ত পুরুষ যজ্ঞ, এ ত বিশ্বযজ্ঞের অনুকরণ ; কেননা বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে ত্যাগই করিয়াছেন। এখানে আমিই যজমান, আমিই ঋত্বিক্ এবং আমিই দেবতা এবং আমার সমস্ত জীবনটাই হব্য বা আত্মাহুতি। বেদপন্থী এই জীবনযজ্ঞের তত্ত্বটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন ; এত বড় করিয়াছেন যে, পশ্চিমের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদের ইহা দৃষ্টি এড়ায় নাই। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা

কৌতুহলী, তাঁহারা Eggeling সাহেবের শতপথ ব্রাহ্মণের এবং Keith সাহেবের তৈত্তিরীয় সংহিতার অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গের ভূমিকা দেখিবেন। জীবনযজ্ঞ পুরুষযজ্ঞেরই প্রকারভেদ, এবং ইহা ভোগের ব্যাপার নহে, ত্যাগের ব্যাপার। প্রত্যেক কর্ম্মকে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু প্রতি অর্পণ করিতে হইবে; বেদপন্থীর প্রতি তাঁহার শাস্ত্রের এই চূড়ান্ত আদেশ। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, তৎ কুরুষ মদর্পণম্"—দান ধ্যান হইতে আহার নিদ্রা নাচা কোঁদা সকল কর্ম্মই কেবল স্বভাব-প্রেরিত জৈব কর্ম্মরূপে না দেখিয়া সেই এক দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে। তন্ত্রের ভাষায়, যাহা কিছু করিবে, তাহা জগন্মাতার পূজারূপেই করিবে। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম পূজারূপে অর্পণ করিলে পূজক খাট হন না, ইহাতে তিনি আপনাকে বড়ই করেন; কেন না পূজামাত্রই আত্মপূজা, পূজক নিজেই নিজের দেবতা। তন্ত্রমতে মানসপূজার স্তবটি স্মরণ করুন,—

আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃ প্রাণাঃ, শরীরং গৃহং,
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ,
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ, স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরঃ,
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।

অহে শম্ভু, আমিই তুমি, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই; আমার মতিই তোমার পত্নী পার্ব্বতী। আমার প্রাণসকলই তোমার সহচর ভূতগণ; আমার শরীরই তোমার গৃহ। আমি যে বিষয়োপভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, ইহাই তোমার পূজা। আমি যখন নিদ্রা যাই, তখন তোমাতেই সমাধি লাভ করি। পৃথিবীতে পা ফেলিয়া এদিক্ ওদিক্ যে ভ্রমণ করি, ইহাতে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। আমি যে কিছু কথা কহি, তাহা তোমারই স্তব। আমি যে যে কর্ম্ম করি, সে সকল ত তোমারই আরাধনা। দেখিবেন, আঙ্গিরস ঘোর ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তন্ত্রও তাহারই অন্য ভাষায় পুনরুক্তি করিতেছেন।

আমিই ভূমি, এর চেয়ে বড় কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। ফলে আমিই বিশ্বকর্ম্মা; বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণের কাদামাটি আমার হাতেই রহিয়াছে; সেই মালা দিয়া আমার জগৎ আমার ইচ্ছামত আমি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারি। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—পৃথিবীর ধূলিকে আমি ইচ্ছামত মধুতে পরিণত করিতে পারি। এই জন্য বেদপন্থী আপনাকে খুব বড় করিয়া

দেখিতে অভ্যস্ত। জগতের যাবতীয় দ্রব্যকে তিনি বড় করিয়া দেখেন; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাকেই খুব বৃহৎ করিয়া দেখিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁহার হাতে যে পরশ পাথর আছে, তাহার স্পর্শে মাটি সোণা হইয়া যায়। নামে সুখস্মৃতি—অন্নে তাঁহার সুখ নাই। এই জন্য লৌকিক ব্যবহারেও যে কোন অঙ্কের গায়ে দশ বারটা শূন্য বসাইতে তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। তাঁহার দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে, সর্ব্বত্র তাঁহার এই অভ্যাসের—লোকে বলিবে এই কদভ্যাসের—পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে লোকে এইজন্য হাসে; কিন্তু তিনি আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানেন, এবং জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই সেই পরিমাণে বড় করিয়া দেখেন। আপনারা Individualism বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন—পশ্চিম সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে এই বস্তুটা সম্প্রতি আমাদের দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আপনাকে স্বাধীন ও বড় করা—নৈসর্গিক প্রবৃত্তির মুখে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে বড় করা—যাবতীয় নিয়মের ও সংযমের আচারের ও নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র রোমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; রোমান রাষ্ট্রনীতি মতে রাষ্ট্রের নিকটে মনুষ্য জীবনের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। এই রাষ্ট্রনীতি পশ্চিম দেশে মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে পেষণযন্ত্রে নিষ্পীড়িত করিয়া আসিতেছে; ফলে বিদ্রোহী মানবপ্রকৃতি চীৎকার করিয়া সকল সামাজিক, এমন কি সকল গার্হস্থ্য বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। এ এক রকমের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বটে, কিন্তু বেদশাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য বা Individualism সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বস্তুতঃ আমার কাছে, আমি যত বড়, অন্য কেহ তত বড় নহে—হইতে পারে না। বটেই ত, আমিই ত বিশ্বকর্ম্মা। তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় আমাকে রাখিলে ও অন্য পাল্লায় ব্রহ্মাণ্ডকে রাখিলে আমারই গুরুত্ব অধিক হয়। বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই—পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ম্ আত্মা—আমার অন্তরের ভিতরে এই যে আমি, সেই আমি পুত্র বিত্ত আর সমস্ত হইতেই প্রিয়। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেম্নাস্পদং যতঃ"—এই যে আমি, ইহার চেয়ে প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই, অতএব ইনিই পরম আনন্দস্বরূপ। আপনাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র না করিলে ইহার সোয়াস্তি হইতে পারে

না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে আত্মসাৎ, আত্মগত, আত্মস্থ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তাহার দুইটা পথ আছে। একটা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক পথ—উহা বিরোধের পথ এবং বিরোধ দ্বারা ভোগের পথ। প্রাকৃতিক নিয়মে বাহিরে যে কেহ আছে, সকলেই আমার পর, আমার শত্রু। তাহাকে দমন করিয়া চিবাইয়া খাইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। প্রত্যেক পশু তাহাই করিতেছে—বাহিরে যে জড়জগৎ ভোগের জন্য বিস্তীর্ণ আছে, তাহাকে টানিয়া ছেঁচিয়া নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত রস নিঃশেষে পান করিবার চেষ্টায় আছে। আচার্য্য হক্সলী ইহাকে cosmic processএর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। জগৎকে নিংড়াইতে গেলে যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহার আবর্জ্জনার ক্লেদে জগৎটা পূর্ণ হয় এমন জগতে তিষ্ঠিয়া কোন লাভ নাই। হক্সলী যাহাকে ethical process বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই cosmic processএর সনাতন বিরোধ। এই নৈসর্গিক cosmic processকে পরাভূত করিয়া ethical processকে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের বিশিষ্ট কর্ম্ম। ১৮৯৩ সালে শেলডোনিয়ান থিয়েটারে দাঁড়াইয়া হক্সলী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "The practice of that which is ethically best involves a course of conduct which, in all respects, is *opposed* to that which leads to success in the cosmic struggle for existence." পুনশ্চ, "moral precepts are directed to the end of *curbing* the cosmic process." পুনশ্চ, the ethical progress of society depends, not on imitating the cosmic process, but in *combating* it." চারি বৎসর পরে ঠিক্ সেইখানে দাঁড়াইয়া ঐ cosmic process সম্বন্ধে স্যর্ হক্সলী বলিয়াছিলেন—"Nature does *not* work by moral rules. Nature, red in tooth and claw, does by system all that good men by system avoid." প্রত্যেক মনুষ্য-পশু এইরূপে জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে; নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিতেছে; ইহাই তাহার নৈসর্গিক প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ্য পশুর ভিতরে আর একটা মানুষ গোপনে বসিয়া আছে, সে কেবলই না—না—না—না বলিতেছে। মানুষ বিরোধের দ্বারা ভোগের পথে চলিতে গেলেই সেই মানুষটা প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, না—না—না—না, ও পথে না—ও পথে না। ইনিই সেই আদিম মানুষ প্রজাপতি, যিনি চরতি গর্ভে অন্তঃ। ইনি বলিতেছেন, আমি বিশ্বযজ্ঞে

আমাকে দান করিয়া আপনাকে বড় করিয়াছি—জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ না করিয়া আপনাকে ছড়াইয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছি, আপনাকে এইরূপে জগতে সম্প্রসারণ করিয়া বড় হইয়াছি। ইহা ত্যাগের পথ এবং ত্যাগের দ্বারা মিলনের পথ। এইরূপ উল্টা পথে আপনাকে পরে মিশাইয়া পরকে আমি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়াছি—আমার নিকটে পর নাই—এইরূপেই আমি পরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি। ইহাই খাঁটি individualism. কেন না, সমস্ত পর আত্মস্থ হইয়া গেলে পরাধীন পরবশ হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু এই মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বন্ধন আবশ্যক—বিশ্বজগতের যাবতীয় দ্রব্যের সহিত মিলনের সম্বন্ধ পাতাইয়া সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইতে হইবে—যমনিয়মের সহস্র বন্ধনে ভিতরের নৈসর্গিক পশুটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে—সংসারের যূপস্তম্ভে সেই পশুটাকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে।

মানবজীবনের থিয়োরি সম্পর্কে বেদপন্থীর সহিত খ্রীষ্টপন্থীর গোড়ায় আশ্চর্য্য মিল আছে, আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। ইউরোপের খ্রীষ্টানেরা কিন্তু মনুষ্য জীবনকে দুইটা কুঠরিতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; একটা secular, temporal, আর একটা religious, spiritual—এবং এই দুই কুঠরির মধ্যে একটা দেওয়াল গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। সাবেক রোমানের জীবন ছিল একটা কুঠরিতে নিবদ্ধ; খ্রীষ্টানের জীবন ছিল অন্য কুঠরিতে। খ্রীষ্টীয়সমাজ আত্মরক্ষার জন্য রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আশ্রয় লইতে গিয়া এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আজি তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। ভুবন বিজয়োদ্যত ইসলামের জয়ধ্বজাকে পিরিনীসের ওপারে ঠেলিয়া দিয়া চার্লস মার্টেল খ্রীষ্টীয় সমাজকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে রোমের বাবাজী পোপ যেদিন চার্লস মার্টেলের বংশধর বড় চার্লসের—শার্লমেনের—মাথায় রোমের কাইসারের মুকুট পরাইয়া রাষ্ট্রপালের সহিত ধর্ম্মপালের একটা অস্বাভাবিক সন্ধি স্থাপন করিলেন, সেই দিন এই বিরোধের বীজ বপন হয়; উভয়ের মধ্যে সন্ধি টেঁকে নাই; ফলে কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে হাজার বৎসর জুড়িয়া একটা মর্ম্মগত বিরোধ খ্রীষ্টপন্থীর জীবনের এক অংশকে অন্য অংশের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপ কাল বালক বালিকার ও বৃদ্ধ বনিতার রুধিরের হ্রদে স্নান করিয়া সেই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভোগমত্ত রতিকামের উপর দাঁড়াইয়া ইউরোপের সভ্যতা ছিন্নমস্তাবেশে আপনার

রক্ত আপনি পান করিতেছে। ভারতবর্ষে বেদপন্থীর জীবনে এইরূপ দুইটা বিরোধী কুঠরি থাকিতে পারে না। বেদপন্থীর থিয়োরিতে সমস্ত জীবন একটা ব্যাপার, একটা যজ্ঞ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ,—কুরুক্ষেত্রের লড়াই হইতে দাঁতনকাঠির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মকে একই পর্য্যায়ে ফেলাইতে বেদপন্থী বাধ্য আছেন—ইহাতে ক্ষোভ করিলে বা উপহাস করিলে চলিবে না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির ভিতরে ধর্ম্ম আটকান আছে, বলিয়া হাসিলে চলিবে না। ফলে ইউরোপের আশ্রিত অবাধ competitionএর পরিণামই ঐরূপ ভয়ঙ্কর। আজকাল competitionএর স্থানে co-operation বসাইবার যে ধুয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কুলাইবে না; ভিতরের পশুটা দাঁত বাহির করিবেই। চাই একবারে ষোল আনা sacrifice—যাহার অর্থ বস্তু বা ত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণেই আত্মা চরিতার্থ হইবে; এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভেই প্রকৃত individualism. ভারতবর্ষে বেদপন্থীর individualismএর স্বাতন্ত্র্য এই আত্ম সমর্পণে।

আপনারা পুরাণে ঋষিগণের বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবন-যাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধ পৃথিবী প্রভাষিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্য্যন্ত, অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভাষিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্য আত্মোৎসর্গে মায়ের ব্যথা হয় নাই। তিনি কখন ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত পরকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই; বরং, যখনই ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে —ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়,—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহের সহিত স্তন্যদান করিয়াছেন। চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন;—কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন

নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়া-রূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানাস্ত্র লইয়া দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণায় ধারায় দেশবিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন; পৃথিবীতে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্য, তিনি আপনার পায়ে সংযমের শিকল পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; পরপীড়নের আনন্দার আপনার সন্তানদের পায়েও নিগড় পরাইয়া বিদ্যালাভের বা লক্ষ্মীলাভের ব্যপদেশে পরদেশ আক্রমণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। যা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবী রূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সরস্বতী রূপে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের ভূদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মরূপিণী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধীশক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন। অগ্নিপত্নী স্বাহারূপে তিনি আমাদের জীবনযজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মকে আহুতি রূপে গ্রহণ করিতেছেন, ইন্দ্রপত্নী শচীরূপে তিনি সেই যজ্ঞক্রতুর পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই দেবমাতা অদিতি—স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে জন্ম দিয়াছেন। "অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ",—অদিতিই দক্ষ প্রজা-পতির দুহিতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন; সেই অদিতি হইতেই ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর দক্ষকন্যা সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণ-চক্রে শতখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কামরূপ হইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে। অশ্বক্রান্তা, রথ-ক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা সেই ভূমি মহাবিষ্ণুর ত্রিপাদচ্ছায়ায় আক্রান্ত রহিয়াছে। ভারতভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা হিমনৎকন্যা পার্ব্বতীর দেহের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেই ধূলি উৎপন্ন প্রত্যেক ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে ইড়ারূপ পরমান্নের অমৃতরস সহিত আছে। বিষ্ণুরূপী যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর, পক্ক মহাযজ্ঞে যাবতীয় ভূতে অর্পণের পর, হবিঃশেষরূপে সেই ইড়াভোজন মাত্রে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। এই সর্ব্বদেবময়ী মহাশক্তি দেবতাকে সম্বোধন করিয়া আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি;—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্—
বন্দে মাতরম্।

হৃদয়-প্রদান।

৬

[ধরানাথের কথা।]

১

বিল্বমাধবের দগ্ধ হৃদয়ের দাহবিবরণের বিবৃতি আমার দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছিল। আমাকেই তাহা শেষ করিতে হইবে।

মুরলা চলিয়া গেল—কিন্তু যে কয় দিন সে দিল্লীতে ছিল, সেই কয় দিনেই আমাদিগকে স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া গিয়াছিল। তাই তাহার সহিত তাহার কাকীমার পত্র-ব্যবহার চলিত। কোনও কারণে তাহার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইতেন।

কয় মাস পরে যখন বিল্বমাধবের জ্যেষ্ঠতাতের পত্র পাইলাম, আমার পরামর্শমত তিনি মুরলার বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন, কয়টি সম্বন্ধ উপস্থিত, তিনি সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চাহেন, তখন আর সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি কলিকাতায় যাইব। এত দিন কলিকাতায় যাই নাই, যাইতে আর ইচ্ছা ছিল না—কেন না, তথা হইতে দুঃখের স্মৃতি লইয়াই আসিয়াছিলাম; কিন্তু এবার যাইব। গৃহিণী বলিলেন, তিনিও যাইবেন। কলিকাতার সঙ্গে আমার দুঃখের স্মৃতিই জড়িত বলিয়া তিনিও এত দিন বঙ্গদেশে আত্মীয় স্বজনদিগের দর্শন-সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। উভয়েই যাইব বলিয়া ছুটী লইলাম।

আমি কলিকাতায় আসিলে মুরলার বিবাহের জন্য বিল্বমাধবের জ্যেঠামহাশয় আমার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। আমি বাছিয়া একটী পাত্র পছন্দ করিলাম। ছেলেটির যেমন রূপ, তেমনই গুণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকরী পাইবার চেষ্টা করিতেছে। সংসারে এক মা ছাড়া আর কেহ নাই। রেলে একটা বড় চাকরী খালি ছিল। আফিসের যিনি 'বড় সাহেব', তিনি যখন বড় হইতে পারেন নাই, তখন আমি অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—আমার লোককে চাকরীটি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাজেই সেই পাত্রের সঙ্গে মুরলার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতেও বেগ পাইতে হইল না।

বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের অনুরোধে আমাদের দুই জনকে মুরলার বিবাহ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতে হইল।

সেই সময়ের মধ্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিন্দুমাধবের গৃহে মহিলাদিগের পরিচয় হইল। তিনি বিন্দুমাধবের মাতার সম্বন্ধে বলিলেন, "কি ঝাঁঝ! অমন ছেলে নিরুদ্দেশ হইয়াছে—তবু ঝাঁঝ কমে নাই! আর বৌর নিন্দা, সে যেন বর্ষার নদীতে বান আসিয়াছে!"

আর বিন্দুমাধবের স্ত্রী? গৃহিণী বলিলেন, "দেখিয়া দুঃখ হয়; কি ভুলই করিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "বুঝিতে না পারিলেই ভুল হয়।"

"বুঝে নাই বা কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার মত বুদ্ধির অভাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "এ বুদ্ধি পুরুষ মানুষের না থাকিলেও চলে; কেন না, তোমরা যাহা কর, তাহাই সাজে; কিন্তু আমাদের যে না থাকিলে চলে না! যাহারা লতার মত অবলম্বন না পাইলেই মাটীতে লুটায়, পদদলিত হয়, তাহাদের লতার মত নরম হইতে হয়। মান বল, অভিমান বল, যতটা সহে, ততটাই ভাল; তাহার অধিক হইলেই সর্ব্বনাশ। যেখানে মান থাকে না, সেখানে মান যে কেবল অপমান।"

"কিন্তু সে বুঝটাই যে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।"

"স্বামী থাকিতে শাশুড়ীর যে ব্যবহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল—এখন যে তাহার দশ গুণ কুব্যবহার সহ্য করিতে হইতেছে! যাহার বলে বল, তাহাকেই যদি হারাইলাম, তবে আর থাকিল কি?"

"মেয়েটিও তাহার পর হইয়াছে।"

"পর হইলেও এত দিন ত তাহাকে বুকে ধরিয়াই ছিল—এখন সে ত পরের ঘরে চলিল। এখন কেমন করিয়া, কি লইয়া বাঁচিবে!" বলিতে বলিতে বিন্দুমাধবের অভাগিনী পত্নীর দুঃখ মনে করিয়া গৃহিণীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় আসিয়াই দাদার জামাইবাড়ীতে গিয়াছিলাম। এখন আমার দ্বারা স্বার্থসাধনের আর কোনও সম্ভাবনাই নাই, কাজেই বৌদিদি মুখে অত্যন্ত আত্মীয়তা করিলেন। এমন কথাও বলিলেন, "তুমি আসিয়া বাসা করিয়া আছ, সে কি ভাল দেখায়? কি করিব বল, বাড়ী ছোট—মানুষ কচিকাচা

লইয়াই আরম্ভ হয় না, নহিলে আমি ছোট বৌকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতাম। না হয় গরীবের বাড়ী গরীবের ভাতই খাইতে।"

দাদার মেয়ে মানু—মার মত কথার ঝুড়ী বাহির করিল না বটে; কিন্তু তাহার আন্তরিক যত্নে আমি আকৃষ্ট হইলাম। তাহার ছেলে মেয়েদের দেখিয়া দাদার কথা মনে পড়িল, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ইহাদিগকে লইয়া কত আনন্দে থাকিতেন। আর তাহা হইলে আমার পক্ষেই কি কলিকাতা প্রবাস হইত? আমি কি বাঙ্গালার সঙ্গে এমন ভাবে সকল-সম্পর্ক-শূন্য হইতে পারিতাম?

আর মা—তিনি আধার শূন্য উদ্বেগ, আশঙ্কা ও কষ্ট ভোগ করিয়াই গিয়াছেন। আমার সাফল্যের আনন্দ লাভ করিতে না করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তাই আমার সঙ্গে বাঙ্গালার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়াছে। কাহার আকর্ষণে আর আকৃষ্ট হইব?

২

আবার চাকরীতে যাইয়া বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের পত্রে মুরলার যে সংবাদ পাইতাম, তাহাতে বুঝিতাম, আমার কথাই ফলিয়াছে। নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়া, প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে, মুরলার হৃদয় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার সে বিষণ্ণ ভাব দূর হইয়াছে—শরীরে যেমন, মনেও তেমনই নূতন সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বিকশিত হইয়াছে; জানিয়া সুখী হইলাম।

আমরা স্বামী স্ত্রী প্রায়ই মুরলার কথার আলোচনা করিতাম। এক দিন আমি বলিলাম, "বিন্দুমাধব যদি আর একবার ফিরিয়া আসিত, তবে হয় ত তাহাকে আবার সংসারের বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিতাম। কি দুঃখেই বেচারা জীবন কাটাইল!"

গৃহিণী বলিলেন, "আর তাহার স্ত্রী—তাহার দুঃখ যে আরও অধিক!"

"অধিক?"

"হাঁ। বিন্দুমাধবের ভুল এখনও ভাঙ্গে নাই, কিন্তু তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। তাহার দুঃখ অভিমানের বেদনা নহে, আত্মগ্লানির দহন।"

"তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে?"

"ভাঙ্গে নাই?—স্বামীকে হারাইয়াই যখন সে বুঝিয়াছিল, জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়াছিল, স্বামীর প্রতি তাহার সন্দেহ অকারণ, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বামীর ভালবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিল। তাহার পর যদি মনের কোণে কোথাও ভুলের একটু অবশেষ

থাকিয়া থাকে, তোমার কাছে বিন্দুমাধবের বিবৃত বিবরণ শুনিয়া তাহাও গিয়াছে। এখন আছে বুকপোরা বেদনার জ্বালা—আত্মগ্লানির মুমূর্ষদাহ।"

এমন আলোচনা আমরা প্রায়ই করিতাম। আমার স্ত্রী মুরলার পত্র পাইলে, আমি বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের জামাতার পত্র পাইলে, এমন আলোচনার কারণ ঘটিত। এইরূপে দুই বৎসর কাটিল। ইহার মধ্যে বিন্দুমাধবের জামাতা কার্য্যব্যপদেশে তিন চারিবার দিল্লীতে আসিয়াছিল, এবং আমার কাছেই থাকিয়া গিয়াছে। সেও আমাদের কত আপনার। স্নেহ কি সম্বন্ধ দেখিয়া আত্মপ্রকাশ করে? সে যে সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে পারে। বিশেষ 'পর' বত আপনার হয়, আপনার জন অনেক সময় তত আপনার হয় না। কারণ, পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহা অনাবিল স্নেহের, তাহাতে স্বার্থহানির লজ্জা নাই, ঈর্ষ্যার বিকৃতি নাই।

৩

তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার শয়নকক্ষে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিয়া হাঁসপাতালে যাইলাম। রোগী আসিয়াছে; যাহারা আনিয়াছে, তাহারা জিদ করিয়া বলিয়াছে, ডাক্তার সাহেবকে তখনই সংবাদ দিতে হইবে, রোগী তাঁহার বন্ধু। আমার বন্ধু! ব্যস্ত হইয়া যাইয়া দেখিলাম, বিন্দুমাধব। এত দিন যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম, আজ তাহাকে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলাম—তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া।

ক্ষীণকণ্ঠে বিন্দুমাধব আমাকে বলিল, "তুমি আমাকে নূতন জীবনের সন্ধান দিয়াছিলে, তাই মরিবার পূর্ব্বে একবার তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিলাম।"

বিন্দুমাধবকে শয্যায় তুলিয়া পরীক্ষা করিলাম—ডবল নিউমোনিয়া, ফুসফুসের প্রদাহ যেরূপ, তাহাতে বাঁচিবার আর আশা নাই। চিকিৎসার ফলাফলের আশা অল্প, কিন্তু শুশ্রূষা হইতে সে যাহাতে বঞ্চিত না হয়, সেই জন্য ঘাট ধরিয়া তাহাকে আমার গৃহে আনিলাম। সংবাদ পাইবামাত্র গৃহিণী আসিয়া সেই শয্যার পার্শ্বে বসিলেন—আমাকে বলিলেন, "মুরলাকে আর তাহার মাকে খবর দাও, টেলিগ্রাফ কর।" তাহাই করিলাম।

যাহারা বিন্দুমাধবকে আনিয়াছিল, তাহারা তাহার শিষ্য। বিন্দুমাধব সন্ন্যাসীও নহে, গুরুও নহে, তবু তাহার শিষ্য জুটিয়াছিল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে, সে তেমনই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আমি

সব সংবাদ জানিতে পারিলাম, এই দুই বৎসর সে নানা তীর্থে অনাথ আতুর প্রভৃতির সেবার ও চিকিৎসার জন্য অনুষ্ঠান করিয়াছে; সেই কাজেই সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। বোধ হয়, তাহাতে সে শান্তিও পাইয়াছিল, নহিলে আমার কাছে তাহার কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন?

এবার সে অমরনাথে গিয়াছিল; ফিরিবার পথে পীড়িত হইয়া পড়ে। মরিবার পূর্ব্বে সে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাই তাহার গুণমুগ্ধ ভক্তগণ তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিয়াছে।

পর দিন প্রভাতে রোগীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, জীবনের মোদ দিনে গণিতে হইবে, আর সময় নাই। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তিনি বলিলেন, "যদি জীবনের আশা না-ই থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না, সব কথা বল। মরিবার পূর্ব্বে বিন্দুমাধব আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে ক্ষমা করিবার সুযোগ লাভ করুন; আর সে—" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আপনাকে সামলাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "আর সে, সে যদি জানিতে পায়, স্বামী মরিবার পূর্ব্বে তাহার অপরাধের স্বরূপ বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, তবে সে দগ্ধ হৃদয়ে তবুও একটু শান্তিলাভ করিতে পারিবে। আর বিলম্ব করিও না।"

আমি যাইয়া বিন্দুমাধবের কাছে বসিলাম। তখন তাহার কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে সব কথা বলিলাম। তাহার স্ত্রীর ভুল, সেই ভুলের জন্য তাহার মনস্তাপ, সব কথা যখন আমি বলিতে লাগিলাম, তখন তাহার মুখে বা দৃষ্টিতে কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। বোধ হয়, সে আপনার আশা ও নিরাশা সব জয় করিয়া উচ্চ লক্ষ্য অবলম্বন করিয়াছিল।

শেষে আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার পর তুমি বোধ হয় তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা করিবে?" তখন সে ক্ষীণকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিল, "আমি ত অনেক দিনই ক্ষমার গঙ্গোদকে অভিমানের ও অপরাধের মলিনতা ধৌত করিয়া দিয়াছি। আমিও যে অপরাধী।"

তাহার পর যখন আমি মুরলার কথা বলিতে লাগিলাম, তখন কিন্তু বিন্দুমাধবের সে নির্ব্বিকার ভাব আর রহিল না—শান্ত সরোবরে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। মুরলার বেদনা, তাহার বিমর্ষ ভাব সব বিবৃত করিয়া আমি যখন বলিলাম, দাম্পত্য জীবনের সুখে সে সুখী হইয়াছে, তখন বিন্দুমাধব যেন নিশ্চিন্ত হইল; একটি দীর্ঘশ্বাসে তাহার হৃদয়ের চাঞ্চল্যের অবসান হইয়া গেল।

তখন আমি বলিলাম, "তাহাদের আসিতে টেলিগ্রাফ করিব?"

বিন্দুমাধব অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "আর কেন?"

কিন্তু আমি যখন বলিলাম, "আমার স্ত্রীর পরামর্শে আমি টেলিগ্রাফ করিয়াছি", তখন সে আর কোনও কথা বলিল না—একবার শুশ্রূষানিরতা আমার পত্নীর দিকে চাহিল, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৪

পর দিন জীবনের মেয়াদ দিন হইতে ঘণ্টায় নামিল; বিন্দুমাধবের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। আমি উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলাম, বিন্দুমাধবকে বাঁচাইতে পারিলাম না; যাহাদিগকে আসিতে বলিয়াছি, বিন্দুমাধবের সঙ্গে কি জীবনের শেষ সময় তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না? এই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিবিবার পূর্ব্বে কি তাহারা আসিতে পারিবে না? আমার উদ্বেগ বোধ হয়, আমার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল; তাহা দেখিয়া বিন্দুমাধব ম্লান হাসি হাসিল, সে হাসি যেন জগতের সব বন্ধনকে, মানুষের সব দৌর্ব্বল্যকে উপহাস।

দিন কাটিল—সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইল। মধ্যরাত্রিতে ট্রেণ পঁহুছিবার কথা। আমি কেবল ঘড়ী দেখিতে লাগিলাম, আর বিন্দুমাধবের অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

বিন্দুমাধবের স্ত্রীকে লইয়া তাহার জ্যেঠামহাশয় আসিলেন। কিন্তু মুরলা? আমি ব্যস্ত হইয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ডাকগাড়ী পরে কলিকাতা ছাড়িয়া আগে দিল্লীতে পঁহুছে; বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয় সেই ট্রেণে আসিয়াছেন। কিন্তু মুরলার সে বিলম্ব সহে নাই—যে ট্রেণ আগে ছাড়ে, সে সেই ট্রেণে রওনা হইয়াছে; টেলিগ্রাম পাইয়া মার জন্যও অপেক্ষা না করিয়া রওনা হইয়াছে। বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাকে দেখিতে তাহার বাড়ী গিয়াছিল—তখন টেলিগ্রাম পাইয়া সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিয়াছে—সে ট্রেণ যে পর দিন সকাল না হইলে দিল্লীতে পঁহুছিবে না, কাকাকে তাহা দেখিতেও দেয় নাই। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম, আরও সাত ঘণ্টা!

তখন বিন্দুমাধবের দেহ হইতে জীবনীশক্তি দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে—ঔষধ দিয়া কি তাহার গতি শ্লথ করা যায়? তবুও আমি চেষ্টা করিলাম। আর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম,—জ্ঞান লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ করাইব।

যখন রাত্রি শেষ হইল, তখন আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বিন্দুমাধবকে বলিলাম, "তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন।" বিন্দুমাধব ইঙ্গিতে জানাইল—"আর কেন?" আমার স্ত্রী তাহার মুখে উত্তেজক ঔষধ দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমার ভিক্ষা—বারণ করিবেন না।" বিন্দুমাধব আর আপত্তি করিল না—কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া জানাইল—তিনি যদি বলেন—তবে তাহাই হউক।

আমার স্ত্রী উঠিয়া যাইয়া তাহার স্ত্রীকে আনিলেন; আমি রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিলাম—কি জানি, মানসিক চাঞ্চল্যের বেগে কি হয়।

বিন্দুমাধবের স্ত্রী আসিয়া তাহার পাশতলে বসিলেন—আজ কত দিনের কত ব্যথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—আজ স্বামীকে লাভ করা, সে ত কেবল হারাইবার জন্য। বুকভাঙ্গা ব্যথার অশ্রু বিন্দুমাধবের চরণে পতিত হইতে লাগিল।

বিন্দুমাধব চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে এক দিন আমাকে বলিয়াছিল, সে কখনও ভগবানে বিশ্বাস করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাহার সেই মতই অবিচলিত ছিল কি না, জানি না; কিন্তু মনে হইল সে যেন জপ করিতেছে।

সেই সময় কম্পিত—কাতর কণ্ঠে "বাবা!" বলিয়া ডাকিয়া ঝড়ের মত বেগে মুরলা কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম—বিন্দুমাধবও চাহিয়া দেখিল। আমি বলিলাম—"মুরলা।"

মুরলা মরণাহত পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই বার রোগীর ক্ষীণগতি নাড়ীতে চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিলাম। বিন্দুমাধব একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিল—মা!! কথা ফুটিল না। সে নিস্তেজ দেহের সমগ্র শক্তি সঞ্চিত করিয়া একখানি হাত তুলিয়া মুরলার মস্তকে দিল। তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বেদনার উৎস হইতে সেই দুই বিন্দু স্নেহাশ্রুতে তাহার হৃদয়-শ্মশানের দাহজ্বালা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে?

* * * *

তাহার পর সব শেষ হইল। যে নিগমবুধি শ্মশানে দাঁড়াইয়া এক দিন সে মৃত্যুকেই মুক্তি মনে করিয়াছিল, সেই শ্মশানে তাহার শবদাহ করিয়া যখন চিতায় জল দিলাম, তখন মনে হইল—

"কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল;
ধরাদগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব জনমের হায়।

লহ, লহ, বক্ষে, নবীন সম্বল
জীবনে খুঁজিনে যাহা।"

শ্মশান হইতে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন মুরলা তাহার কালীমার কোলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে—বিনুমাধবের পত্নী পাষাণপ্রতিমার মত বসিয়া আছে, সে যেন বাহ্যজ্ঞানহতা—তাহার নয়নে অশ্রু নাই—মুখে কোনও ভাবের বিকাশ নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সমাপ্ত।

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির আচার ব্যবহার।

নবান্ন প্রথা।

প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে নবান্ন উৎসব প্রচলন ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে (২য় খণ্ড, ৩য় প্রঃ পাঃ ৫ম ব্রাহ্মণ) ইহা আগ্রয়ণ নামে পরিচিত। নবান্ন উৎসব বৎসরে তিন বার সম্পন্ন হইত। প্রাচীন ইব্রীয়গণ নবান্ন উৎসব না করা পর্য্যন্ত নূতন শস্যের অন্ন ভোজন (Exodus 22—29, 23—19, Levi 23—10; 12) করিত না। এই নবান্ন উৎসব তাহাদিগকেও বৎসরে তিন বার (Exodus 23—16, 17) করিতে হইত।

নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা।

আর্য্যদের ন্যায় ইব্রীয় জাতিও শাস্ত্রানুসারে সাড়ম্বর নানা আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা ও নূতন গৃহে প্রবেশ (Deut 20—5) করিত।

অক্ষক্রীড়া বা পাশা খেলা।

প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে অক্ষক্রীড়ার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। Proverbs 16—33 পদে ইহার উল্লেখ আছে। হিব্রু ভাষায় পাশা "পুর" নামে পরিচিত। প্রাচীন আর্য্যগণ যে অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, ইহা ঋগ্বেদের ১০।৩১৯ এক ও ১০।৩৪ সূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়। ১০।৩৪ সূক্তে অক্ষক্রীড়ার অপকারিতা বর্ণিত আছে।

পাদুকা ব্যবহার।

আর্য্য জাতির ন্যায় ইব্রীয় জাতির মধ্যেও ধর্ম্মমন্দিরে কি পবিত্র স্থানে এবং পিতা মাতার মৃত্যুতে পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ (Exodus [illegible] Joshua [illegible] Malachi [illegible]) ছিল।

সংস্কৃতের উপানৎ বা উপানহ, যথা উপ—উপরি + নহ—বন্ধন করা সহ হিব্রু ভাষার পাদুকাবাচক "নাল" শব্দের সাদৃশ্য আছে।

অধিকার সমর্পণ।

প্রাচীন কালে কোনও ইব্রীয় পুরুষ আপন সত্বাধিকার বিক্রয় ব্যতীত অপর ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিলে সেই সমর্পণের সাক্ষ্য বা প্রমাণ স্বরূপ তাহাকে আপন পাদুকা সত্বাধিকার গ্রহীতাকে অর্পণ করিতে হইত। ইহা মহাত্মা মুসার বিধি। Deut 25—9, 10 পদ পাঠে ইহা জানা যায়, রাজর্ষি দায়ুদের প্রপিতামহ বোয়সের অধিকার ক্রয় বৃত্তান্ত (Ruth 4th chapter) হইতে, ইহা ভালরূপে অবগত হওয়া যায়। রামচন্দ্র আপন রাজ্যাধিকার ভরতকে সমর্পণ বা ত্যাগ কালে তৎসম্পর্কে যে আপন পাদুকা ভরতকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কি উদ্দেশ্যে তাহা বিচারসাপেক্ষ। ক্ষত্রিয়ের তরবারই সম্বল। তাহাই অনুপস্থিতিকালে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। বিশেষতঃ স্বর্ণ পাদুকা বনবাস কালে ব্যবহার অসম্ভব। অবশ্যই ইহা ভরত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ভরতকে পাদুকা সমর্পণ সম্পর্কে (অযোধ্যাকাণ্ড ১১৫।১৪—২০) "সন্ন্যাস" শব্দের প্রয়োগ থাকায় প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যেও যে অধিকার ত্যাগের সাক্ষ্য স্বরূপ আপন পাদুকা গ্রহীতাকে অর্পণ করিতে হইত, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে রথ ও বিষাক্ত তীর ব্যবহার।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণ যুদ্ধে বিষাক্ত তীর ব্যবহার (৬।৭৫।১৫ ঋক) করিত। ইব্রীয় জাতিও বিষাক্ত তীরের ব্যবহার (Genesis 27—3, 48—12, Job 6—4) জানিত। বৈদিক কালে যুদ্ধে রথের ব্যবহার (৬।৪৭।২৬—৩১ ঋক) ছিল। ইব্রীয় ও সিরিয়াবাসিগণের যুদ্ধ-রথের বৃত্তান্ত Joshua 8—2,8, Judges 4—3, 2 Samuel 13—5, 1 Chronicles 18—4 পদ-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

দাসত্ব-প্রথা।

প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে দাসত্ব প্রথার প্রচলন ছিল। দাস দাসীগণ ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় হইতে সংগ্রহ হইত। দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা পর্য্যন্ত প্রচলন ছিল। বাইবেলে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগে আর্য্যগণও দাস দাসী রাখিতেন। আর্য্য সমাজে দাস দাসী বিক্রয় (১।৯২।৭—৮ ঋক ও ৮।৫৬।৩ ঋক) পর্য্যন্ত হইত। ইহারা যে অনার্য্য ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বৈদিক যুগেই এই দাসগণ ধর্ম্ম কর্ম্ম পদ্ধতিতে আর্য্য সমাজে গৃহীত (৮।৫১।৯, ১০।৮৬।১২ ও ১০।৯০।১২ —১৪ ঋক)। পরবর্ত্তী কালে ইব্রীয় দাসগণও ইব্রীয়-সমাজে স্থান পেয়ে

(Joshua 9—27) হইয়াছে। ধর্ম্মমন্দিরের জল ও কাঠ বহনরূপ পরিচর্য্যা কার্য্যে ইহারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেরূপ আর্য্য মাত্রই শ্বেতবর্ণ নহেন, তদ্রূপ অনার্য্য মাত্রই কৃষ্ণবর্ণ নহে। যে প্রকার আর্য্য সমাজের পরিচর্য্যাকারী কোনও কোনও শূদ্রের উপাধি 'দত্ত', তদ্রূপ ইব্রীয় সমাজের পরিচর্য্যাকারী ভিন্ন জাতীয় দাসদের উপাধি 'নদীনীয়' (Ezra 8—20)। 'দত্ত' ও 'নদীনীয়' উভয় শব্দ একার্থজ্ঞাপক। হিব্রু ও আরবীতে 'নাদীনীয়' শব্দের পূর্ব্বের 'ন' অক্ষর ব্যাকরণের কায়দা হেতু প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচীন তামিল জাতির মধ্যে বা দক্ষিণ ভারতে দাসত্ব-প্রথা অজ্ঞাত (Early Histories of India by V. Smith 441) ছিল। অথচ উত্তর ভারতের প্রাচীন তক্ষশিলায় প্রকাশ্য, বাজারে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় (Early History of India by V. Smith 154) হইত।

দেবর দ্বারা বংশ রক্ষা।

প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভাবে কনিষ্ঠ দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশ রক্ষা (Genesis 38—7, 8 Deut 25/5—10) হইত। বৈদিক যুগেও আর্য্য সমাজে এই প্রথাটী বিদ্যমান (১০।৪২।২ ঋক) ছিল।

দত্তক পুত্র।

প্রাচীন আসিরীয়াস ও ইব্রীয় সমাজে অপুত্রক লোকে 'দত্তক' পুত্র গ্রহণ (Genesis 15/2—3) করিত। বৈদিক কাল হইতে আর্য্য সমাজে দত্তক পুত্র গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তরাধিকার।

বৈদিক কালে আর্য্য সমাজে পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাগণ পৈত্রিক সম্পত্তির কিছুই (২।১৭।৭ ঋক) পাইত না। প্রাচীন ইব্রীয় সমাজেও পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাগণ কিছুরই অধিকারিণী (Genesis 21—10, 31—14, Numbers 27/1—11) হইত না।

পশু পালন ও গো দোহন।

বৈদিক যুগে বিশেষ কোনও বাঁধা বাঁধি নিয়ম না থাকিলেও প্রায়ই আর্য্য কন্যাগণ পশু-পালন ও গো-দোহন কার্য্য (৯।৯৭।৪৭ ঋক) সম্পন্ন করিত। ইব্রীয় সমাজেও কন্যাগণের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। ইহার উল্লেখ Genesis 29/9—10, Exodus 2/16—17 ও কোরাণ সুরা কসস, ২৩ আয়েতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বস্ত্র বয়ন।

প্রাচীন আর্য্য ও ইব্রীয় কন্যাগণ যে প্রকার গো-দোহনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিত, সেই প্রকার তৎকালে বস্ত্র-বয়ন কার্য্যও তাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রাচীন আর্য্য নারীর বস্ত্র বয়ন কার্য্যের

উল্লেখ ঋগ্বেদের ২।৩৬, ২।৩৮।৪, ৫।৪৭।৩ ঋক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইব্রীয় ও অরামীয় কন্যাগণের বস্ত্র-বয়নের বর্ণনা Judges 16—14, Exodus 35—25, 2 Kings 23—7, Proverbs 31—13, 21, 25 পদে দৃষ্ট হয়।

যব-ভর্জ্জন।

আর্য্য কন্যাগণ প্রস্তরখণ্ডের উপর যব-ভর্জ্জন (১।১১২।৩ ঋক) করিত। ইব্রীয় কন্যাগণও ঐ প্রকার প্রস্তরখণ্ডের উপর যব-ভর্জ্জন কার্য্য সম্পন্ন (1 Samuel 8—13, Leui 2—5 ও 1 Chron 23—29) করিত।

জল বহন।

বৈদিক কালে আর্য্য নারীগণ জল আনয়ন জন্য কলস লইয়া কূপ সন্নিকটে যাইতেন। ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ ১।৫৩।৮, ১।১২১।১০ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ইব্রীয় নারীগণ সাংসারিক প্রয়োজনের জল বহন জন্য কূপ সন্নিধানে দলে দলে সমাগত হইতেন, সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা, আলাপ প্রসঙ্গ, হাস্য পরিহাস হইতে থাকিত। এই প্রকার চিত্রের বর্ণনা রেবেকা (Genesis 24/11—30) ও মিদিয়ন কন্যার (Exodus 2/16—19) জল বহনের প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি। জল বহন জন্য কূপ সন্নিধানে সমাগত সমরীয়া নারীর নিকট হইতে খ্রীষ্টের জল পান (John 4/7—15) বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন।

জলদান।

আর্য্য জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে জলদান মহা পুণ্যজনক কার্য্য। ইব্রীয় জাতিও জলদান মহা পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস রাখিতেন। Psalms 143—6, Proverbs 25—25, Matthew 10—42 পদ পাঠে ইহা অবগত হইতে পারি।

কূপোদক পান।

আরবীয় ও ইব্রীয় জাতি নদ নদী অভাবে কূপোদকই পান করিত। বৈদিক আর্য্যগণও যে কূপোদক পান করিত, তাহার আভাষ ১।৩০।১, ১।৫৫।৮, ।১২১।১৪ ঋক পাঠে পাওয়া যায়।

চর্ম্মাধার।

প্রাচীন ইব্রীয়গণ চর্ম্মাধারে দধি, সুরা, মধু, তৈল ইত্যাদি রাখিত। Leui 11—32, Job 41—20, Isaiah 22—24 পদ পাঠে ইহা অবগত হইতে পারি। বৈদিক কালে আর্য্যগণও নানা প্রয়োজনে চর্ম্মাধার ব্যবহার করিত। ঋগ্বেদের ১।২৮।৯, ৪।৪৫।৩ ঋকে 'সোম', ১।১৯১।২০ ঋকে 'সুরা', ৮।৪৮।১৮ ঋকে 'দধি', ৮।৫।১ ঋকে 'মধু', ৯।৬৪।২৯ ঋকে 'সোম রস' রাখার জন্য চর্ম্মাধার ব্যবহারের প্রসঙ্গ আছে। এই চর্ম্মাধার ঋগ্বেদে 'দৃতি' ও হিব্রু বাইবেলে 'চুদ' নামে পরিচিত।

প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে পরীক্ষাস্থলে কোনও লোক দোষী কি নির্দ্দোষ,

অগ্নি পরীক্ষা।

অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা তাহার নির্দ্ধারণ হইত। সীতার অগ্নি পরীক্ষাই তাহার সাক্ষ্য। প্রাচীন ইব্রীয় সমাজেও এই প্রথাটীর প্রচলন (Leui 18—21, 2 Kings 23—10) ছিল।

আর্য্যগণ প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি দেবতা কি পীঠস্থানের উদ্দেশ্যে

ধর্ম্মার্থে কেশ রাখা।

শ্মশ্রু ও মস্তকে কেশ রাখিয়া আসিতেছেন। ইব্রীয় সমাজেও যে প্রথাটী প্রচলিত ছিল, তাহা সম্যেনের কেশ রাখার বৃত্তান্ত (1 Samuel 1—11) হইতে অবগত হইতে পারি।

বশিষ্টদের 'কপর্দ্দ' (৭।৩৩।১ ঋক) ও তৃৎসুগণের (৭।৩৩।৮ ঋক) 'জটা'র

কপর্দ্দ বা জটা।

কথা হইতে বৈদিক যুগে যে ঐ প্রকারেও কেশবিন্যাস প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যেও এই প্রকারের কেশবিন্যাস প্রচলন (Jacua 9—10) ছিল। মূসার সময় হইতে ইব্রীয় সমাজে এই প্রকারে মস্তিকের চূড়ার ন্যায় কেশবিন্যাস নিষিদ্ধ (Leui 19—27) হয়।

আবরীয়, আসিরীয়, ইব্রীয় জাতি শ্মশ্রু রাখিত। বাবেল ও নিনেভী

শ্মশ্রু রাখা।

প্রভৃতি প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত নগর খনন করিয়া যে সমস্ত দেব-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শ্মশ্রুযুক্ত (Babylon & Ninevah 23—26) দৃষ্ট হয়। বৈদিক ঋষিগণও যে শ্মশ্রু রাখিতেন, তাহা ইন্দ্রের (২।১১।১৭ ঋক ও ১০।২৩।১ ঋক) ও বুধের (১০।২৬।৭ ঋক) শ্মশ্রু কল্পনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

চার্ব্বাক-মত-আগমনের বহু পূর্ব্বে সেই প্রাচীন বৈদিক কালে ঋণ পরিশোধ

ঋণদান ও ঋণশোধ।

না করা মহা পাপ ছিল। ঋণ শোধ জন্য বৈদিক ঋষিগণ দেবগণের নিকট প্রার্থনা (২।২৩।১৭, ২।২৭।৪, ২।২৮।৯ ঋক) করিতেন। প্রাচীন পারসীক সমাজেও এই ভাবটী বিদ্যমান (Vendidad 3—147) ছিল। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি ঋণদায় মহাদায় (Leui 25/39—41, 2 Kings 4—7) বলিয়া জানিতেন।

আর্য্যগণ যে প্রকার অমাবস্যা ইত্যাদি তিথি বিশেষে যাত্রা কি কর্ম্মাদি বন্ধ

তিথিবিশেষে কর্ম্মাদি বন্ধ।

রাখেন, তদ্রূপ প্রাচীন ইব্রীয়গণও অমাবস্যা ইত্যাদি তিথিতে কর্ম্মাদি বন্ধ (Amos 8—5) রাখিতেন।

ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষাদান কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল।

শিক্ষাদান। তাঁহারা বিনা বেতনে জ্ঞান বিতরণ করিতেন। ইব্রীয় যাজকগণও প্রাচীন কালে বিনা বেতনে শিক্ষাদান (Micha 3—11) কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সমাধি ও দাহ। বৈদিক যুগে আর্য্য জাতির মধ্যে দাহ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে সমাধি প্রথারও প্রচলন (১০।১৫।১৪, ১০।১৮।১০—১২ ঋক) ছিল। পক্ষী দ্বারা শব ভক্ষণ প্রথার আভাষও ঋগ্বেদের ১০।১৬।৫ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে সমাধি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে দাহ প্রথারও (Amos 6—10) প্রচলন ছিল। শৌলের দেহ দাহ (1 Samuel 31—32) হইয়াছিল। প্রাচীন এলম দেশীয় লোকের মধ্যে সমাধি প্রথার প্রচলন (Ezekiel 32—24) ছিল। প্রাচীন পারস্য সম্রাট Cyrus ও Dariusএর শরীর কবর দেওয়া (Nineveh and its Remains 2—220) হইয়াছিল।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

বৈরাগী।

১

স্বরূপ বৈরাগীর মেয়ে পরাণী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া যখন স্বামীর পরিত্যক্ত মণিহারীর বাক্সটা মাথায় তুলিয়া লইল, তখন প্রতিবাসী অভিরাম দাস কণ্ঠীবদলের আশায় নিরাশ হইয়া নরোত্তম দাসের কথায় মনঃসংযোগ করিল।

পরাণীর বাপ ছিল না, মাও ছিল না, ঘরে শুধু বুড়ী আরী ছিল। বাপের মা নয়, মায়ের মা। অল্প বয়সে মা মারা গেলে আরীই জামাই-বাড়ীতে আসিয়া পরাণীকে মানুষ করিয়াছিল। আরীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, বিধবা পরাণী কণ্ঠী-বদল করিয়া পুনরায় সংসারধর্ম্ম করে। এই বয়সে মাথায় মোট করিয়া তাহার হাটে বাজারে যাতায়াত কি ভাল দেখায়? পরাণী কিন্তু কণ্ঠীবদলের চেয়ে এই কাজটাকেই ভাল বলিয়া পছন্দ করিল।

পরাণীর স্বামী চিন্তামণি বৈরাগী বরজামাই হইয়াছিল। সে জাতি-ব্যবসায় ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য মণিহারী জিনিসের ফেরী করিয়া বেড়াইত। চিন্তামণির মৃত্যুর পর পরাণী স্বামীর বৃত্তি গ্রহণ করিল।

আরী কিন্তু ইহাতে বড় গোল বাধাইল। এমন সোমত্ত বয়সে হাটে বাজারে

যাওয়ায় যে কত বিপদ্, আয়ী তাহা জানিত। বুড়ী ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। পরাণী কিন্তু সে প্রতিবাদে কাণ দিল না। সে হাটের দিন খুব সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া আসিত। তার পর একখানি ধোপদস্ত থান কাপড় পরিয়া, নাসাগ্রে একটী ক্ষুদ্র রসকলি কাটিয়া, গোল্লা-ভরা পান গালে দিয়া মোট মাথায় কৃষ্ণনগরের হাটের দিকে যাত্রা করিত। পথিকেরা এই ষোড়শী পসারিণীর মত্তগজেন্দ্রগতিদর্শনে মুগ্ধ হইত; যুবকেরা তাহার দিকে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে থাকিত; বৃদ্ধেরা হুচোট খাইত; আর গ্রামের অনেক লোক, শুধু পরাণীকে নয়, বুড়ীকেও ছি ছি করিত।

গ্রামের লোকের নানা অনুযোগ শুনিয়া বুড়ী এক দিন রাগিয়া পরাণীকে বলিল, "দেখ্ পরাণী, তুই যদি এমন মোট মাথায় ক'রে হাটে বাজারে যাবি, তা হ'লে আমি তোর হাতের জল পর্য্যন্ত খাব না।"

পরাণী বলিল, "তা হ'লে তো আমি বেঁচে যাই আয়ী, এই দু'কোশ পথ ভেঙ্গে এসে আমাকে আর জল টল তুলতে হয় না।"

আয়ী রাগিয়া বলিল, "আমি এবার যাথামুড় খুঁড়ে মরবো পরাণী।"

পরাণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি তোমায় তুলসীতলার গোর দিয়ে নিশ্চিন্দি হব।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া আয়ী বলিল, "তুই আবার হাঁসচিস্ লা ছুঁড়ী?"

পরাণী বলিল, "কি করি আয়ী, আমার যে কান্না আসচে না।"

আয়ী মাথা নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীর ভাবে বলিল, "এখন কান্না আসবে কেন, কিন্তু এর পর দেখবি। তখন এই বুড়ীর কথা ফলবে।"

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "পরে কাঁদতে হবে ব'লে এখন থেকে তার আখড়া দেব নাকি?"

আয়ী রাগে ফুলিতে লাগিল। কোনও উত্তর করিতে পারিল না, শুধু কঠোরদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আয়ীর রাগের বৃদ্ধি দেখিয়া পরাণী হাস্য সংবরণ করিল; বলিল, "তা হ'লে তুমি কি করতে বল আয়ী?"

রাগে ভ্রূকুটি করিয়া আয়ী বলিল, "লোকে কত কথা কইচে, এর পর আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে।"

পরাণী এবার রাগিয়া ক্ষুব্ধ করিয়া বলিল, "কেন দেবে? আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি? নিজের গতর খাটিয়ে খাই, তাতে লোকের কি?"

পরাণীর রাগ দেখিয়া আয়ী একটু নরম হইল; ধীর কোমল স্বরে বলিল, "পোড়া লোকের স্বভাবই ঐ, শুধু ছুতো খুঁজে বেড়ায়।"

পরা। আমি এমন ছুতোর কাজ কি ক'রেছি?

আয়ী। করবি আবার কি, তবে এই বয়স নিয়ে কি হাটে বাজারে যাওয়া ভাল দেখায়?

পরা। আমি তো হাটে বয়স বিক্রী করতে যাই না, জিনিস বিক্রী করতে যাই।

আয়ী। যে জন্যেই হোক, যাস্ তো। তুইই বুঝে দেখ্ না, এতে পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলতে পারে কি না।

পরাণী একটু চুপ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "বেশ, কাল থেকে যদি হাটে যাই, তবে আমার নাম পরাণীই নয়। ঘরে প'ড়ে উপোস দিয়ে ম'লেই যদি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তাই করবো।"

আয়ী ব্যগ্রস্বরে বলিল, "ও আবার কি কথা পরাণী, বালাই, ষাট।"

পরাণী রাগে গুম হইয়া রহিল। আয়ী বলিল, "নিজের গোঁ ছেড়ে দে, আমার কথা শোন্।"

পরাণী বলিল, "তোমার আর কি কথা? সাদা তো?"

আয়ী বলিল, "সাদা কেন, কষ্টীবদন্। আমাদের জাতে তো আছে।"

পরাণী বলিল, "সে যারা ভেকধারী বোষ্টম, তাদের ঘরে আছে। আমি জাত বোষ্টমের মেয়ে।"

আয়ী শ্লেষের স্বরে বলিল, "আবে আমার জাত রে! জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাবি?"

পরাণী বলিল, "জাত নিয়ে ধুয়ে খাব না তো কি বাপ ঠাকুরীর মুখে কালী দেব?"

আয়ী বলিল, "না, হাটে গিয়ে নিজের মুখে বেশ ক'রে চুণ-কালী মাখবি। আমার তো মরণ নাই, তাই ব'সে ব'সে এই সব দেখতে হচ্চে।"

পরাণী কোনও উত্তর করিল না। আয়ী উঠিয়া পেরেকে ঝুলান জগের ঝুলী পাড়িতে পাড়িতে বলিল, "পরাণী, আমার কথা শোন্। আজও অভিরাম এসেছিল। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।"

পরাণী বুঝিল, এই যুক্তিগুলা অভিরামেরই। সুতরাং আগে তাহার মুখ বন্ধ করিতে না পারিলে আয়ীর তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না।

২

বালির কাগজের ছেঁড়া খাতাখানা সম্মুখে ধরিয়া অভিরাম সুরের সহিত নরোত্তম দাসের কড়চা আবৃত্তি করিতেছিল,—

"রাম নাম বিনে যে গোবিন্দ নাম বিনে,
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে।
যায় রে মনুষ্য জন্ম গেল রে বহিয়ে,
কি কর পামর মন কৃষ্ণ না ভজিয়ে।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ কর সার,
কৃষ্ণ বিনে সংসারের গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু,
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ নাম হৈনু।"

অভিরাম একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাগজখানা চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইল। হায়, মায়ারূপী স্ত্রী পুত্র কন্যা আসিয়া তাহার সংসার-বৃক্ষকে এক দিন এমনই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, অভিরাম ভাবিয়াছিল, "হা গোবিন্দ! এ মায়া মোহ হ'তে আমায় উদ্ধার কর, মহা পাতকী আমি, আমায় পথ দেখাও।" কিন্তু গোবিন্দ যে দিন তাহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, সহসা একটা কালের ঝড় আসিয়া অভিরামের সংসার-বৃক্ষের ডালপালাগুলা নির্ম্মূল করিয়া দিল, সে দিন বিশাল প্রান্তরে শাখা-প্রশাখা-বিহীন শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় দাঁড়াইয়া অভিরাম শোকবিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "হা গোবিন্দ, এ কি করিলে?" আগে যে অভিরাম শ্রীপুরুকেই সাধনপথের প্রধান কণ্টক স্থির করিয়াছিল, এখন সেই কণ্টক উন্মূলিত হইল, মায়ার বন্ধন খসিয়া গেল; কিন্তু সে পথ দেখিতে পাইল না। সমগ্র বিশ্বটাই যেন তাহার শ্মশান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এ মহাশ্মশানে বসিয়া রুদ্র কাপালিক কপালমালিনীর সাধনা করিতে পারে, কিন্তু অভিরামের মত সাধক ভক্তির কোমল সুরে তাহার প্রেমের দেবতাকে কিরূপে ডাকিবে?

চিত্তকে দৃঢ় করিয়া অভিরাম জপে বসিত, কিন্তু মন জপে বসিতে চাহিত না; দুইটা মালা না ঘুরিতেই যেন কাহার কলহাস্যপূর্ণ মুখখানি দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিত। অভিরাম জোর করিয়া চোখ দুইটা মুদিত করিত। কিন্তু স্মৃতি শত চক্ষু প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইত, ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়াছে; প্রদীপের সম্মুখে এক তন্বঙ্গী যুবতী দেড় বছরের ছেলেটীকে কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। ছেলে ঘুমাইতে চাহিতেছে না; মা তাহাকে জোরে কোলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথায় মৃদু চাপড়াইতে চাপড়াইতে, হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে, ঘুমপাড়ানোর সুরে বলিতেছে,—"আয় রে আয়, আমার

সোনার যাদু ঘুম যায়।" ছেলে মাথা নাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে; মা মুখে তাহাকে তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু চোখ দুইটা দিয়া স্নেহের অমৃতধারা উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে। ছেলে অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে বলিতেছে, "আ-বা-বা-বা।" মা তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "হাঁ, হাঁ, সে এখন জপে বসেছে, তোর তরে কি ভগবানকেও একটু ডাকবে না?" ছেলে কিন্তু ভগবানকে ডাকিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে বা-বা-বা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "এমন ছেলেও তো দেখিনি" বলিয়া মা তাহাকে ধমক দিল। অভিরাম চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ব্যস্তভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। অভিরাম মালাটা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিল। হায় দেবতা! তোমার মায়ার এ কি কঠোর বিদ্রূপ!

অভিরাম দিনরাত ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিত, "হে দীনদয়াল, মায়ার বন্ধন যখন ছেদন করিয়া দিয়াছ, তখন মনের এই মোহটুকু কাটাইয়া দাও ঠাকুর! দাবদাহে বৃক্ষ দগ্ধ হইয়াছে, তাহার শুষ্ক মূলটুকু আর থাকে কেন?"

কেন যে থাকে, তাহা অভিরাম জানিত না, কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিতেন। তিনি জানিতেন, বর্ষার স্নিগ্ধধারাসম্পাতে এক দিন এই দগ্ধ বৃক্ষের শীরস মূল সরস হইয়া উঠিবে; বসন্তের মৃদুমলয়স্পর্শে নবীন শিহরণ অনুভব করিবে। তখন আবার এই বৃক্ষ নবোদ্গত শাখাপ্রশাখায়, নবীন পত্রপুষ্পে সুভূষিত হইয়া শ্যামসৌন্দর্য্য বিস্তার করিবে।

গ্রামের ঘরে ঘরে নামগানই অভিরামের জীবিকা ছিল। নামগান করিয়া গৃহস্থদিগের নিকট যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সকালে উঠিয়া করতাল লইয়া নামগানে বাহির হইত, এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘরে ফিরিত। তার পর স্নান ও ইষ্টপূজা-সমাপনান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিত। গ্রামের কোনও বাটীতে যে দিন ক্রিয়াকর্ম্ম থাকিত, সে দিন আর তাহাকে পাক করিতে হইত না; ব্রাহ্মণ কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণের সহিত অভিরামের নিমন্ত্রণও বাদ যাইত না। শুধু বাসগ্রামে নয়, পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানা গ্রামেও অভিরামের যাতায়াত ছিল।

সে দিন কেশবগঞ্জে নামগান করিয়া ফিরিতে একটু বেলা হইয়াছিল। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইতেছিল; রাস্তার ধূলাগুলা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পায়ে লেগিতেছিল। পথ প্রায় জনশূন্য; ক্বচিৎ দুই এক

জন হাটুরিয়া ভিজা কাপড় গায়ে দিয়া শূন্য বাজরা মাথায় বহে ফিরিতেছিল। সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন পথে অভিরাম একা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বৈরাগী ঠাকুর!"

অভিরাম চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। আবার ডাক আসিল, "এ দিকে বৈরাগী ঠাকুর, এ দিকে।"

রাস্তা হইতে অল্প দূরে একটা শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণীর তীরে দুইটা গাছ—অশ্বত্থ ও বট জড়াজড়ি করিয়া স্থানটাকে ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছিল। অভিরাম দেখিল, সেই ছায়াময় স্থানে বৃক্ষতলে এক স্ত্রীলোক। সে স্ত্রীলোক তাহাদেরই গ্রামের স্বরূপ দাসের মেয়ে পরাণী। অভিরাম বিস্ময়পূর্ণচিত্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল, এবং নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, পরাণী?"

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "হাঁ, আমি। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

অভিরাম গাছতলায় ঘাসের উপর বসিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কেশরগঞ্জে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুই পরাণী, তুই এখানে?"

পরাণী বলিল, "আমি কেষ্টনগরের হাটে গিয়াছিলাম।"

অভিরাম একটু বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "হাটে?"

সম্মুখবর্ত্তী বাজরার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পরাণী সহাস্যে বলিল, "আমি যে মণিহারীর দোকান ক'রেছি।"

অভিরাম একবার পরাণীর দিকে, আর বার বাজরার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। পরাণী বলিল, "আজ যে ভাদ্দরো রোদ, তার উপর এই ভারী মোট, একটু না জিরিয়ে আর পারলাম না। কিন্তু মোট নামিয়ে এক বিপদে পড়েছি, তুলে দেবার লোক পাই নি। একা মেয়েমানুষ কি এত বড় মোট তুলতে পারি?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিরাম বলিল, "এ সব কি তোর কাজ পরাণী?"

ঈষৎ হাসিয়া পরাণী বলিল, "সে তো তুমিও বল, আমিও বলি, কিন্তু পেট তো সে কথা শোনে না।"

অভিরাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটা দমকা বাতাস আসিয়া পরাণীর কাণের পাশে চুলগুলায় দোল দিয়া গেল। গাছের খুব উঁচু ডালে বসিয়া একটা পাখী উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, ফটি-ই-কু জ-ল্। অভিরাম ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া ভূর্ভাকিরণে সমুজ্জ্বল বাঁধের দিকে চাহিল।

পরাণী উঠিয়া কাপড়টা বেশ গুছাইয়া পরিল, এবং আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া অভিরামের দিকে চাহিয়া বলিল, "মোটটা তুলে দাও দেখি।"

অভিরাম উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাঁধের গামছাখানা কোমরে বাঁধিয়া বলিল, "ওটা আমি নিচ্ছি।"

পরাণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু।"

সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাহারা মুখের দিকে চাহিয়া অভিরাম ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "দোষ কি পরাণী?"

পরাণী দুই হাত দিয়া মোটের একটা পাশ ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "নাও, তুলে দাও।"

অভিরাম আর কিছু না বলিয়া মোট তুলিয়া দিল। মোট লইয়া পরাণী আগে আগে চলিল, অভিরাম তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। যাইতে যাইতে পরাণী বলিল, "আমার সঙ্গে তোমাকে আস্তে আস্তে যেতে হচ্চে। কিন্তু রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, আমার একা যেতে কেমন ভয় করে।"

অভিরাম কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে চলিল। আরও কিছু দূর গিয়া পরাণী বলিল, "একা হ'লে তুমি এতক্ষণ বাড়ী পঁহুছাতে পারতে। তোমার দেরী হ'য়ে গেল।"

অভিরাম বলিল, "তা হোক্।"

সেই দিন বাড়ী পঁহুছিয়া অভিরাম দেখিল, তাহার প্রাণের উপর দিয়া একটা ঝড় চলিয়া গিয়াছে। সে ঝড়ে তাহার মনের বৃত্তিগুলা এমন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা দুষ্কর।

অপরাহ্নে অভিরাম বৈষ্ণবগ্রন্থগুলা পড়িয়া তাহাদের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া বৈরাগ্যসূচক পদগুলা বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিল। সন্ধ্যার জপ ও বন্দনার শেষে অভিরাম দেখিল, তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে, মনের দেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু পরাণীর জন্য একটু করুণা-মাত্র জাগিতেছে।

পর দিন অভিরাম পরাণীর আত্মীয় নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিল যে, পরাণীর এরূপ হাটে বাজারে যাওয়া ভাল নয়। কণ্ঠীবদল করিয়া পুনরায় সংসারী হওয়া উচিত।

আত্মীয় অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিল, "তা বাছা, ও হতভাগা মেয়ে কি আমার কথা শোনে? তুমি একটু বুঝিয়ে দেখ না।"

অভিরামের বুকটা ধড়-মড় করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আয়ীর কাছ হইতে পলাইয়া আসিয়া নরোত্তম দাসের কড়চা খুলিয়া বসিল, এবং জোরে জোরে পড়িতে লাগিল,—

"রাম নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে,
বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে।
যায় রে মনুষ্যজন্ম গেল রে বহিয়ে,
কি কর পামর মন কৃষ্ণ না ভজিয়ে।"

৬

"রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ,
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।"

কাগজখানা কপালে ছোঁয়াইয়া অভিরাম অন্য পদ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় পরাণী হেলিতে দুলিতে আসিয়া ডাকিল, "বৈরাগী ঠাকুর!"

অভিরাম মহাজনপদাবলী হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সবিস্ময়ে পরাণীর দিকে চাহিল। পরাণী আবদারের সুরে বলিল, "আমাকে নাম শোনাবে বৈরাগী ঠাকুর?"

পরাণী অভিরামের সম্মুখে একটু দূরে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অভিরাম হতবুদ্ধি হইয়া শুধু বিস্ময়স্তব্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পরাণী সহাস্যে অথচ তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখচো?"

দৃষ্টি নত করিয়া অভিরাম ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার সঙ্গে এ বিদ্রূপ কেন পরাণী?"

পরাণী বলিল, "নাম শুনতে চাওয়া কি বিদ্রূপ?"

অভিরাম বলিল, "সত্যই কি তুমি সেই জন্য এসেছ?"

"তবে কি তোমার সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে এসেছি?"

অভিরাম শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "ছিঃ পরাণী!"

পরাণী কিন্তু এ তিরস্কারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না; সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি কেন বৈরাগী ঠাকুর? তোমারও তো কণ্ঠীবদল দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

অভিরাম বিরক্তিপূর্ণদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরাণী বলিল, "কি দেখচো? আমার রূপ?"

অভিরাম একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ রূপ ক'দিনের জন্য পরাণী?"

সহাস্যে পরাণী বলিল, "যে ক'দিন থাকে।"

অভিরাম বলিল, "বড় বেশী দিন থাকে না, দু'দিন মাত্র। তার পর—"

পরাণী বলিল, "তার পর কি ? মাটীর দেহ মাটী হবে, না ?"

পরাণী হাসিয়া উঠিল ; অভিরাম ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে পরাণী পুঁথিগুলার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলা তোমার বৈরাগ্যের দপ্তর নাকি ?"

অভিরাম বলিল, "এ সব মহাজনপদাবলী।"

"ওতে কি লিখচে ? মেয়ে মানুষগুলাই মত আপদ্, পায়ের বেড়ী, পথের কাঁটা, আর পুরুষগুলি সব সাধু সন্ন্যাসী, না ?"

অভিরাম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পরাণী বলিল, "একটু শোনাও না।"

অভি। ও সব তোমার ভাল লাগবে না।

পরা। তোমার ভাল লাগে ?

অভি। ভাল লাগে ব'লেই পড়ি।

পরা। শুধু পড় ? টিয়ে পাখীর মত ?

অভিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলে কি ? এ তো পরিহাসের কথা নয়, এ যে অন্তরের কথা, অনেক উচ্চশিক্ষার কথা ! সত্যই তো, শুধু টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি করিয়া কি হইবে ? সে যে আজীবন এই সকল উপদেশ আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, আবৃত্তি করিয়া লোককে শুনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু ফলে কি হইয়াছে ? কিছুই হয় নাই। প্রথমে এই সকল মহাজনবাক্যকে যেরূপ জীবিকার সহায়স্বরূপে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিল, এখনও ঠিক তাহাই আছে। এই সকল উপদেশের একটী অক্ষরও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই, ইহার একটী আদেশও সে পালন করে নাই। একটা অরুন্তুদ যাতনায় অভিরামের বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো বৈরিগী ঠাকুর ?"

অভিরাম অশ্রুকাতর দৃষ্টি তুলিয়া পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। সবিস্ময়ে দেখিল, পরাণীর মুখে আর হাসি নাই ; তাহার হাস্যচঞ্চল মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে, চঞ্চল দৃষ্টির মধ্যে তিরস্কারের ভীষণ তীব্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাতরস্বরে অভিরাম বলিল, "আমায় মাপ কর পরাণী, আমি ঘোর পাতকী।"

অভিরাম কাঁদিয়া ফেলিল। পরাণী আবার হাসিয়া উঠিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি বৈরিগী ঠাকুর, কেঁদে ফেল্‌লে যে?"

অভিরাম খোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি অতি হতভাগ্য পরাণী, আমার উদ্ধার নাই।"

পরাণী বলিল, "তোমার উদ্ধার আছে কি না, সে কথা তোমার উদ্ধার-কর্ত্তাই জানেন। তবে কণ্ঠিবদলের যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার কাছে যেও; আরীকে নিছে ভালিও না।"

পরাণী উচ্চৈঃস্বরে গম্ভীরপদক্ষেপে চলিয়া গেল। অভিরাম স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। দিবার আলোক নিবিয়া আসিল; সন্ধ্যার অন্ধকারে গৃহপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন হইল। উঠানের আমগাছে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিল। অভিরাম চমকিত হইয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার কি হবে গোবিন্দ!"

অভিরামের মুখ বন্ধ করিয়া পরাণী যে শুধু নিশ্চিন্ত হইল, তাহা নহে, মনের ভিতর বেশ একটু গর্ব্বও অনুভব করিল। তাহার এখন একটা ঐশ্বর্য্য আছে, যাহাতে অনেকেই ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারস্থ হইয়া তাহার কৃপা ভিক্ষা করে, তাহার রূপ-যৌবনের পদে আপনার সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিবার জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু হৃদয়ের অসামান্য দৃঢ়তার প্রভাবে যে লোকের সেই সকাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে, দাতার অযাচিত সর্ব্বস্ব দানকেও অকাতরে ফিরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনই তাহার হৃদয়বল, এতই তাহার চিত্তের দৃঢ়তা।

চিত্তের এই কঠোর দৃঢ়তায় অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া, লোকের নিন্দা গ্লানিতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পরাণী পুনর্ব্বার মোট মাথায় হাটে বাজারে যাতায়াত করিতে লাগিল। আরী হতাশচিত্তে পরাণীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে হরিনামে মনঃসংযোগ করিল।

আরী কিন্তু বিধাতার নিকট যৌবনী থাপ্পা লইয়া সংসারে আসে নাই। আর সকলের ন্যায় সেও মেয়াদী দলীল লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং পরাণী এক দিন হাট হইতে ফিরিয়া দেখিল, আরীর দলীলের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহারই নোটিস দিবার জন্য জ্বর ও অতিসার নামক দুই যোদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে। পরাণী বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

পরাণী ঔষধ খাইবার জন্য আয়ীকে অনুরোধ করিল। আয়ী কিন্তু তুলসী-তলার মাটী আর গঙ্গাজল ছাড়া অন্য ঔষধ খাইতে চাহিল না। পরাণী হাট বাজার বন্ধ করিয়া আয়ীর সেবা করিতে লাগিল। তার পর আয়ী যখন অন্তরে তাহার চিন্তা ও মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোকের চিন্তার অতীত স্থানে চলিয়া গেল, তখন পরাণী যেন সংসার শূন্য দেখিল। সে উঠানের ধূলায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অভিরাম ও অন্যান্য স্বজাতীয়গণ আসিয়া বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। আয়ীর পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য পরাণী [illegible] করিয়া বৈষ্ণবভোজন করাইল। দধি-চিপীটক-সংযোগে ক্ষীতোদর বৈষ্ণব-বৃন্দ পরাণীর ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। পরাণী সূন্যগৃহে বসিয়া আপনার অসহায়-অবস্থা-স্মরণে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার কাঁদার ইচ্ছা হইল, অভিরামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ছিঃ, এক দিন যে তাহারই দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সে গর্ব্বের সহিত যাহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহারই নিকট আজ ভিক্ষা চাহিবে? পরাণী ভাবিল, অনহায়ের সহায় ভগবান্; ভগবানকে ছাড়িয়া সে কেন মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে। পরাণী ভগবানের উপরেই নির্ভর করিয়া চিত্তে দৃঢ়তা আনিল, এবং পুনরায় মোট মাথায় হাটে যাতায়াত করিতে লাগিল।

ভগবানের উপর নির্ভর করিলেও পরাণী কিন্তু পূর্ব্বের মত কেনা বেচা করিতে পারিল না। খরিদ্দার জিনিসের দর করিতে করিতে মুখের দিকে চাহিলেই পরাণী যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত; কেহ হাসিয়া কথা কহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; জিনিসের মূল্যাধিক্যের জন্য কেহ তাহার বয়সের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিলে পরাণীর ইচ্ছা হইত, সে বাজরা শুদ্ধ জিনিস সেই-খানে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়। কিন্তু ঘরে পলাইলে চলিবে কেন? বাজরা আছড়াইলে খাইবে কি? সুতরাং এই সামরিক উত্তেজনা দমন করিয়া সে অসীম ধৈর্য্যসহকারে দোকানদারীতে মন দিত। বিরক্ত হইলেও সে আগেকার মতই নিয়মিতরূপে হাটে যাইত; সস্তা দরে জিনিস কিনিয়া চড়া দরে বেচিবার চেষ্টা করিত; খরিদ্দারের সমক্ষে পাঁচ পয়সার জিনিসকে তিন আনার কেনা বলিয়া শপথ করিতেও ছাড়িত না। তবে আগে পরাণী যে কাজটা প্রবল আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিত, এখন যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কোনরূপে

তাহা চালাইয়া যাইত। এক এক সময় ভাবিত, "দূর হোক, না খেয়ে মরতে হয় সেও ভাল, তবু এমন ঝকমারীর কাজ আর করবো না।"

ইহার উপর পাড়ার ছোঁড়ারা বড়শী, সূঁচ, সূতা, সাবান, চিরুণী কিনিতে আসিয়া যখন বাজে গল্প পাড়িয়া বসিত, এবং তিন পয়সার জিনিস কিনিতে আসিয়া তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করিত না, তখন অগত্যা পরাণীকে কখনও মিষ্ট স্বরে, কখন বা একটু চড়া গলায় তাহাদের এই সময়ের অপব্যবহার-টুকু স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। সেই সঙ্গে নিজের ঝকমারীর কাজের বোঝাটা ক্রমশঃ কত ভারী হইয়া উঠিতেছে, তাহাও নিজে ভাবিয়া লইত।

সকলেই আসিত, আসিত না শুধু অভিরাম। পরাণী ভাবিত, "তার কি আসবার আর মুখ আছে? বেড়ালতপস্বী সেজে পরাণী বোষ্টমীর সঙ্গে এসেছে ঢলাকী করতে!"

দৈবাৎ কোনও দিন হাট হইতে ফিরিবার সময় পরাণী একটু ঘুরিয়া অভিরামের বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইত। বাহির হইতে উঁকি দিয়া দেখিত, অভিরাম সর্ব্বাঙ্গে গোপীচন্দনের ছাপ পরিয়া, তুলসীমঞ্চের সম্মুখে বসিয়া ভক্তি-চিত্তে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছে,—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে,
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।"

পরাণীর মনে হইত, এটা যেন নেহাৎ ফাঁকা প্রার্থনা নয়; ইহার সঙ্গে যেন তাহার অন্তরের বাস্তব যোগ আছে, এবং সে যোগে অনেকখানি কান্না অভিরামের কণ্ঠা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পরাণীর মনে হইত, এই সময় যদি সে একবার কঠোর বিদ্রূপের স্বরে ডাকে—বৈরিগী ঠাকুর! মনে উঠিলেও পরাণী কিন্তু ডাকিত না, ডাকিতে সাহস হইত না। সে ডাকে পাছে অভিরামের এই তন্ময়তাটুকু নষ্ট হইয়া যায়; পাছে সে তেমনই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলে—"আমি ঘোর পাতকী পরাণী, আমি ঘোর পাতকী!"

পরাণী মোট মাথায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অভিরামের আকুল-কণ্ঠোচ্চারিত প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনিত; তার পর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সে স্থান ত্যাগ করিত। সে জোরে পা ফেলিত না, পদশব্দে যদি অভিরামের ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়; যদি তাহার এই আকুল প্রার্থনার সূক্ষ্ম সুরটুকু শ্রীবৃন্দাবনের কাণে গিয়া পঁহুছিতে বিলম্ব হয়।

একটু দূরে গেলেই কিন্তু পরাণীর মনের এই সঙ্কোচটুকু তিরোহিত হইয়া যাইত, সে আপনার মনে আপনি হাসিয়া বলিত, "মর গোড়ারমুখী, এই বেড়ালতপস্বীর আবার তপ জপ, আর সেই তপ জপকে এত ভয়!" পরাণী খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া পদশব্দে নির্জ্জন পল্লীপথ শব্দিত করিয়া চলিয়া যাইত।

৫

ঝড়ের বেগে গাছটা খুব খানিক ওলট-পালট খাইয়া আবার যেমন স্থির হইয়া দাঁড়ায়, অভিরামও তদ্রূপ মোহের ধাক্কায় খানিকটা লুটোপুটি খাইয়া শেষে বৈরাগ্যের জোরে মনটাকে খাড়া করিয়া লইল। আবার সে নামকীর্ত্তন, ভিক্ষা ও জপ আহ্নিক লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু রোগ সারিলেও মোহিক দুর্ব্বলতাটুকু সারিতে যেমন অনেক দিন লাগে, সেইরূপ অভিরামের মোহ-মুক্ত চিত্তের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা রহিয়া গেল, সেটুকুর শান্তির জন্য অভিরাম জপ আহ্নিকের মধ্যে চিত্তটাকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টিত হইল।

অভিরাম সাধ্যপক্ষে পরাণীর বাড়ীর দিকে যাইত না। দৈবাৎ পথে দেখা হইলে, লোকে সাপ দেখিয়া যেমন বিশ হাত দূরে ছুটিয়া পলায়, অভিরামও সেইরূপ ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। পরাণী কৌতুকের হাসি হাসিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে ডাকিত, "বৈরিগী ঠাকুর, ও বৈরিগী ঠাকুর!" সে বিদ্রূপপূর্ণ আহ্বানে অভিরাম লজ্জিত হইত, কিন্তু ফিরিয়া চাহিত না।

তার পর পরাণী যখন অনেকটা অগ্রসর হইত, তখন অভিরাম সহসা দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া নির্নিমেষনেত্রে পরাণীর নবযৌবনগতির দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত, "হায় রক্তমাংসগঠিতা নারী, সত্যই তুই মহামায়ার অংশ। নতুবা শ্যামসুন্দরকে ছাড়িয়া তোর এই নশ্বর সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্ত এত আকৃষ্ট হয় কেন?" অভিরাম নশ্বর-সৌন্দর্য্যমুগ্ধ দৃষ্টিটাকে ফিরাইতে না পারিয়া আপনার উপর আপনি রাগিয়া উঠিত। তাহার ইচ্ছা হইত, সাধু বিল্বমঙ্গলের মত সর্ব্বনাশের মূল চোখ দুইটাকে উপড়াইয়া ফেলে। হায় প্রভু, রমণীর রূপলাবণ্য ছাড়িয়া কবে এই দৃষ্টি দুইটাকে তোমার চরণে নিবদ্ধ করিতে পারিব?

হৃদয়ে গভীর বিষাদ ও আত্মগ্লানি লইয়া অভিরাম ঘরে ফিরিত, এবং সংসারটাকে দূরে সরাইয়া, সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়া শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিত। কিন্তু ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিত না; কোথা

উঠিত পরাণী আসিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাকে যেন বিশ ক্রোশ ব্যবধানে টানিয়া আনিত।

অভিরাম কাঁপিত; মাথা কুটিত; পরাণীকে জোর করিয়া ভুলিয়া, মনে জোর আনিয়া, আবার শ্যামসুন্দরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিত। সংসারে সংস্রব, দেশের মায়া ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর কি না, এ কথাটাও মাঝে মাঝে ভাবিত।

এইরূপে অভিরাম যখন এক দিকে পরাণী এবং অন্য দিকে শ্যামসুন্দরকে রাখিয়া উভয়ের মধ্যে কাহারও উপরই মনঃস্থির করিতে পারিতেছিল না, তখন গ্রামের লোকে তাহার নামের সহিত পরাণীর নামটা জড়াইয়া উভয়ের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল, যাহা শুনিয়া শুধু পরাণী নয়, অভিরাম পর্য্যন্ত ভীত স্তম্ভিত হইল।

গ্রামের মধ্যে নবীন প্রবীণ অনেকেই পরাণীর কৃপাপ্রার্থী ছিল, কিন্তু তাহার মুখের মিষ্টি হাসিটুকু ছাড়া যখন আর কোনরূপ কৃপার প্রত্যাশা দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা এই যুবতী বৈষ্ণবকন্যার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন বয়সে এত রূপ যৌবন লইয়া যে হাটে বাজারে যাতায়াত করে, মিষ্ট কথায় চটুল হাস্যে খরিদ্দারের মন মুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে কি এতটা ধৈর্য্যধারণ—চরিত্রের এত দূর দৃঢ়তা সম্ভব? সুতরাং এই ধৈর্য্যের অন্তরালে, এই অস্বাভাবিক দৃঢ়তার আবরণের ভিতর এমন একটা কিছু রহস্য আছে, যাহা দ্বারা সে সকলেরই অকাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারে। যাহারা বুদ্ধিমান, তাহাদের সেই গুপ্ত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য এই গুহ্য রহস্যের গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সকলকে দেখাইয়া দিল যে, অভিরামের সহিত অবৈধ প্রণয়ই পরাণীর এই দৃঢ়তার মূল!

বুদ্ধিমান্‌দিগের গবেষণার এই অত্যাশ্চর্য্য ফল শুনিয়া লোকে শুধু বিস্মিত হইল না, তাহারা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ছি ছি, যে অভিরামকে তাহারা নিতান্ত নির্বীহ বলিয়াই জানিত, তাহার এই কাজ! তাহার লম্বা টিকী ও ছিটে-কোঁটার ভিতর এত দুরভিসন্ধি লুকান ছিল! গ্রামের অনেকেই অভিরামের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। মেয়েরা তাহার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল; যুবকেরা তাহার টিকী ছিঁড়িয়া, হুঁকার ঝুলি মালা কাড়িয়া লইয়া উত্তম মধ্যম দিবার সঙ্কল্প আঁটিতে লাগিল; বৃদ্ধেরা কলির পূর্ণ আবির্ভাব-দর্শনে অস্থির হইল।

পরাণী শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। জন্নরবটা কেন উঠিল, কে তুলিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। রাগে দুঃখে তাহার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। গ্রামে বাহির হওয়া তাহার যেন দায় হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিলেই যুবকেরা হাসে; বৃদ্ধেরা ভ্রূ কুঞ্চিত করে; মেয়েরা দড়ী কলসী সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দেয়; আর ছেলের দল হাত তালি দিয়া গাহিতে থাকে,—বোষ্টমী লো সই, তোর বোষ্টম ঠাকুর কৈ?

পরাণী রাগে জ্ঞান হারাইয়া সদ্যঃ সদ্যঃ গ্রামের লোকগুলার মুখাগ্নি করা যায় কি না, তাহাই ভাবিতে থাকে।

সে দিন হাটবার। পরাণী মোট লইয়া হাটে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন সে বেচা কেনায় আদৌ মন দিতে পারিল না। ভরা হাটে খরিদ্দারের দল যখন দোকানে ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন সহসা সে ব্যস্তভাবে দোকান তুলিয়া মোট বাঁধিয়া ফেলিল। পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, এরই মধ্যে উঠলে যে?"

"মাথা ধরেছে" বলিয়া পরাণী মোট মাথায় তুলিল। জনৈক রসিক ক্রেতা বলিয়া উঠিল, "বোষ্টম ঠাকরুণের রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?"

তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরাণী দ্রুতপদে হাট ত্যাগ করিল।

গ্রামে ঢুকিতেই পরাণী দেখিল, এক পাল ছেলে তাহার আগে পিছে দাঁড়াইয়া হাত তালি দিয়া গাইতে লাগিল,—বোষ্টমী লো সই, তোর বোষ্টম ঠাকুর কৈ?

রাগে পরাণী দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিল; তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

বাড়ী ঢুকিয়া পরাণী এমনই ব্যস্ততার সহিত মোটটাকে ধপ্ করিয়া দাওয়ার উপর ফেলিল যে, সে আঘাতে মোটের ভিতরকার ভঙ্গুর কাচের জিনিসগুলা যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এ জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার রহিল না। মোট ফেলিয়াই সে দ্রুতপদে অভিরামের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল। অভিরাম উনান ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিয়াছিল। কাল একাদশী গিয়াছে, সুতরাং ক্ষুধার তাড়নায় অভিরাম একটু সত্বর আহ্নিক জপ সারিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিল। উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া, কতকগুলা বাঁশ কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিয়া সে তামাক সাজিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল,—

"দীনের দিন গেল হে হরি,
আমি ভজন সাধন কখন করি ; দিন গেল ধরি।"

এমন সময়ে পরাণী উগ্রমূর্ত্তিতে আলুথালু বেশে আসিয়া ডাকিল, "বৈরিগী, বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরাম চমকিত হইয়া শঙ্কিতদৃষ্টিতে পরাণীর দিকে চাহিল। পরাণী ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তোমার মতলবখানা কি বল দেখি?"

শঙ্কাজড়িতস্বরে অভিরাম উত্তর করিল, "আমি কি করবো পরাণী?"

পরাণী গলা সপ্তমে চড়াইয়া বলিল, "কি করবে? আর কিছু না পার, হাটপুকুরে ঢের জল আছে, গিয়ে ডুবে মর।"

পরাণী অবসন্নভাবে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। অভিরাম এক হাতে হুঁকা, অপর হাতে কলিকাটা ধরিয়া, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। একটু দম ফেলিয়া পরাণী একটা আঙ্গুল উঁচু করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আর কিছু কত্তে না পার, তোমার ঐ ঝুলি মালা সব জলে ফেলে দাও। নিজে নষ্ট কর, ধর্ম্মের মুখে আর চুণ কালি দিও না।"

অভিরাম নিরুত্তর। পরাণী বলিল, "যদি কণ্ঠীবদলেরই সাধ হ'য়ে থাকে, তবে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বল। দেশে আমি ছাড়া কি মেয়েমানুষ নাই? রূপ যৌবন কি শুধু আমারই আছে? তবে সকলে মিলে শুধু আমার পিছনেই কেন এত লেগেছ বল দেখি?"

পরাণীর চোখ দুইটায় জল টলটল করিতে লাগিল। অভিরাম হুঁকা কলিকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ডান হাত দিয়া গলায় বালাছড়া মুঠা করিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এই তুলসীর মালা ছুঁয়ে বলছি পরাণী, আমি এর বিন্দুবাষ্পও জানি না।"

পরাণী তীব্র ভ্রূকুটী করিল। অভিরাম জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বাস হ'লো না?"

জোর গলায় পরাণী উত্তর দিল, "না।"

অভিরাম হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। পরাণী তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে বলিল, "আমি বিশ্বাস করলে কি হবে, পাঁচ জনের মুখে তো সরা চাপা দিতে পারব না?"

অভিরাম বলিল, "আমি তার কি কত্তে পারি?"

দৃঢ়স্বরে পরাণী বলিল, "কিছু কত্তেই হবে।"

অভিরাম জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলিল, "হয় তুমি গাঁ ছেড়ে যাও ; নয় বল, আমি যাই।"

একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অভিরাম বলিল, "পা ছাড়তে হয়, আমিই ছাড়ব। কিন্তু তাইতেই কি লোকের জিব থেকে নিস্তার পাবি? তার চেয়ে—"

কথাটা বলিতে গিয়া আটকাইয়া গেল। পরাণী কিন্তু সে অসমাপ্ত কথাটুকু উক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "তার চেয়ে আমি কণ্ঠীবদল করি, কেমন, না?"

"সেইটাই কি ভাল নয়?"

"আরও ভাল হয়, যদি কণ্ঠীবদলটা তোমার সঙ্গেই হয়।"

মুখ নীচু করিয়া অভিরাম বলিল, "আমি ছাড়া কি আর লোক নাই?"

গর্জ্জন করিয়া পরাণী বলিল, "কিন্তু এমন সাধু লোক আর দু'টী নাই। তা নৈলে গাঁয়ে এত লোক থাকতে তোমার সঙ্গেই বা আমাকে এমন ভাবে জড়াবে কেন?"

পরাণী দেখিল, অভিরামের মুখখানা মরা মানুষের মুখের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। পরাণী ইহাতেও দমিল না; সে আরও উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ বৈরিগি ঠাকুর, হরিনাম কত্তে হয় কর, কিন্তু এমন চিতে বাঘ সেজে পরের মেয়ের উপর নজর দিয়ে বেড়িও না। মুখে হরি হরি বলবে, আর মনে মনে পরের বৌ ঝির মুখখানা ভাববে, তার চেয়ে—"

অশ্রুকাতরকণ্ঠে অভিরাম বলিল, "পরাণী!"

পরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্র কঠোর স্বরে বলিল, "দরকার হয়, কণ্ঠী-বদল করবো, কিন্তু তোমার মত চিতে বাঘের সঙ্গে নয়।"

সদম্ভপদক্ষেপে উঠান কাঁপাইয়া পরাণী চলিয়া গেল। অভিরাম স্তব্ধ নিঃসংজ্ঞভাবে বসিয়া রহিল।

যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন উনান নিবিয়া গিয়াছে, ভাতের হাঁড়ীর ভাতগুলা গাঁজিয়া উঠিয়া পাঁকের মত হইয়াছে। অভিরাম হাঁড়ীটা নামাইয়া রাখিয়া হাত ধুইল, এবং ঘরে গিয়া চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিখানা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। ঘরের পিছনে তেঁতুল গাছে বসিয়া একটা পাখী চীৎকার করিতে লাগিল—ফটি-ই-ক্ জ-ল্।

৭

আঘাতের পরিবর্ত্তে যদি প্রতিঘাত পাওয়া যায়, অহেতুক ভর্ত্সিত ব্যক্তি ভর্ত্সনের উত্তরে যদি প্রতিভর্ত্সনা করে, তাহা হইলে আর ক্ষোভের কোনও কারণ থাকে না; সঙ্গে সঙ্গে দেনা পাওনা মিটিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তি

যদি নিঃশব্দে প্রহার-যাতনা সহ্য করে, কঠোর তর্জনের উত্তরে যদি শুধু সকাতরদৃষ্টিতে আপনার আহত অন্তরের ব্যথাটুকু জানাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ক্ষোভের আর অবধি থাকে না। সকল ক্রোধ, সকল দুঃখকে অতিক্রম করিয়া আহতের সেই নীরবতারূপ যাতনাটুকুই মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতে থাকে।

গ্রামে যে জনরব উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে অভিরাম যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, ইহাতে পরাণীর কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আপনার ক্রোধাগ্নিতে আহুতি দিবার মত আর কাহাকেও যখন খুঁজিয়া পাইল না, তখন সে এই নিরীহ লোকটীর উপরেই আপনার ঝাল ঝাড়িয়া আসিল। ভাবিল, ইহাতেই বুঝি মনের জ্বালাটা অনেক কমিবে। কিন্তু কম হওয়া দূরে থাক, অভিরামকে তিরস্কার করিয়া আসিবার পর পরাণীর অন্তর্দাহ যেন আরও বাড়িয়া উঠিল; এই নিরীহ লোকটীর অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাহার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আর সেই ক্ষোভটুকু মনের ভিতর যেন কাঁটার মত খচ্-খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। পরাণীর অশান্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইহার উপর অভিরামের সেই ভিরস্কার-নির্বর্ণ মুখ, সেই কাতরতাপূর্ণ জলভরা দৃষ্টি আরও গোল বাধাইয়া দিল। বিড়াল-তপস্বীর সেই গোপীচন্দনের ছাপভরা মুখ, যাহাকে পরাণী কখনও প্রসন্নতার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই, সেই বিশ্রী মুখখানা, সেই গোল গোল চোখ দুইটা যে মনের উপর এমন আঁকিয়া বসিতে পারে, ইহা পরাণী কখনও ভাবে নাই। কিন্তু যাহা কখনও ভাবে নাই, আজ তাহাই ঘটিতে দেখিয়া সে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পরাণী ঘরে আসিয়া রাঁধিল, কিন্তু খাইতে পারিল না। দুই চারি গ্রাস খাইয়াই ভাতগুলা ফেলিয়া দিল। রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সে একাই থাকিত, কিন্তু আজ যেমন একা বোধ হইতে লাগিল, এমন এক দিনও হয় নাই। গ্রামের লোকদের কুটিল দৃষ্টিগুলা যেন বিভীষিকার মত বোধ হইতে লাগিল। পরাণী সারা রাত্রি ছটফট করিয়া কাটাইল। ভোরের সময় যখন একটু তন্দ্রা আসিল, তখন শুনিতে পাইল, অভিরাম অন্য দিনের মতই রাস্তা দিয়া ভজনের সুরে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, হরি, জগতজনপালন!
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি, দীননাথ দীনতারণ॥"

আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগন্ত অবস্থায় সে সুরটা পরাণীর কাণে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

পর দিন পরাণী অভিরামের বাড়ীতে গিয়া দেখিল, অভিরাম একটা বড় গাঁঠরী বাঁধিতেছে। পরাণী ডাকিল, "বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরাম ফিরিয়া চাহিল। পরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "গাঁঠরী বাঁধছ যে? কোথায় যাবে?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া অভিরাম উত্তর করিল, "মনে করেছি, শ্রীধামে যাব।"

"আমাকে সঙ্গে নেবে?"

"তোকে?"

"হাঁ, আমাকে। পারবে না?"

"না।"

"কেন?"

মুখ নীচু করিয়া অভিরাম বলিল, "আমি মহা পাতকী পরাণী, আমার পাপ মন এখনও আমার বশ নয়।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া পরাণী বলিল, "কিন্তু এই পাপ মন নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছ?"

অভিরাম বিস্ফারিতদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী মুখ ফিরাইয়া দ্রুত জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর বৈরিগী ঠাকুর, আমি না বুঝে তোমাকে অনেক মন্দ কথা বলেছি।"

প্রফুল্লকণ্ঠে অভিরাম বলিল, "তুই আমার শিক্ষাদাতা গুরু!"

পরাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অভিরাম পুনরায় গাঁঠরী বাঁধিতে লাগিল। পরাণী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কি হবে বৈরিগী ঠাকুর?"

মুখ না তুলিয়াই অভিরাম বলিল, "গোবিন্দ আছেন।"

পরাণী ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "আমি মেয়েমানুষ, আমার ত নির্ভরের ক্ষমতা নাই বৈরিগী ঠাকুর। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

অভিরাম বলিল, "আমি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট; আমার কাউকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নাই।"

তীব্রস্বরে পরাণী বলিল, "একটা অনাথাকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নাই, অথচ এক জন অনাথাকে কলঙ্কসাগরের মাঝে ফেলে গোবিন্দের কৃপা পাবার আশায় বৃন্দাবনে ছুটবার ক্ষমতা আছে?"

নক্ষত্রকে অভিভবনে অভিলাষ করিয়া, "হরের ঘরে পরাণপতি দেব, এ যে আবার অনেক দিনের বাদ পরাণী ?"

পরাণি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আর আমোরে যায়, আমি জেনায় বলে কষ্টীবদল করবো।"

অভিলাষ শিহরিয়া উঠিল।

ক্ষণ ভাবিয়া পরাণী বলিল, "এখন বল, বৃন্দাবনে যাবে, না আমারে নিয়ে যেবে ?"

অভিলাষ পাঠশী ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং পরাণির মুখের উপর নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবেগপূর্ব্বকণ্ঠে বলিল, "তোমেই ঠাই যেব পরাণী, নিজে আর কষ্টীবদল নয়; তুই গুরু, আমি শিষ্য; আমি বাপ, তুই মেয়ে; তুই মা, আমি ছেলে; মান অপমান, ঘরটি ছিলা সব মাপা খেতে দিয়ে, এইখানে এসে, শ্রীগোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করি। আয়-আমি বৃন্দাবনে যাব না পরাণি।"

পরাণি উপুড় হইয়া পড়িয়া অভিলাষের পায়ের ধুলা লইল; এবং অভিলাষ বলিল, "তোমার মনের ভিতরেই যে বৃন্দাবন বৈষ্ণবি ঠাকুর!"

শ্রীরাধাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

মহাযোগী সাহিত্য।

আর্য্য উপনিবেশ।

খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থা অনেক বদল হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মূলগত আধ্যাত্মিক, ও বৈষয়িক, ও আধিভৌতিক উন্নতি বা অবনতির অনুরূপের ইতিহাসটি, সাধারণ সকলের নিকট অপেক্ষা ভোগ অংশ ভুল রহিয়াছে। এই সময়ের এই অঞ্চলের ইতিহাসের কতকটা উদ্ধার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দেড় সাতশত সহস্রাব্দ পূর্ব্বেকার পুরাবস্তু—মোহেনজো, দৈরো, আরাপ্পা প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপ, এবং পাশ্চিমের পরাধ্যায়ী, ও আত্মাদেশের মাটির। দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক-পুরাণ ও নিম্ন প্রাণীর মৌখ সাহিত্য।

পশ্চিম আসিয়া ও ইউরোপে আর্য্যগণের উপনিবেশের পরেই এই ভূখণ্ড ভোগ করিয়াছে। আসিয়ার পশ্চিমাংশে 'অক্সিয়ানস' নামে অভিহিত। একটি বৈষয়িক গতে (৩. বে. ৩০০০) পশ্চিমে বিস্তৃতিতে এক হইতে "অক্সিয়ানা" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অক্সিয়ানস পশ্চিমে যে সময়ের আসি সম্যুচিত এসময়ের পশ্চিমে কুরাইয়া। আসিয়ার আধ্যগণ সর্ব্বপ্রথম উত্তর ও পশ্চিম আসিয়ার যে অংশটিকে বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম "কেল্ড" অর্থাৎ বিস্তারিত নামে আছে (খ্রী. পূ. ৩০০০)। এই বিস্তৃত ও উর্ব্বরা ভূমি অধিকার

ঠিক করিতে পারিতেছি। [ইহাদের তারিখের (খ্রী. পূ. ১৭০০; মাসপাগল-ভৌক-দুষ্ট, ১৪।২৩।] তবে বিশ্বামিত্রের মন্ত্র দেখিতে পাই যে, ওজনাদলের দলকর্তৃক এইরূপ ও তাহার পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জনগণ তাহার বিশ্বামিত্র উপাধি পরাধর পুত্রদের আর্যাবর্ত্তাধিষ্ঠিত গ্রামের "গ্রামে" নির্দ্দেশিত করেন। পূর্ব্বোক্ত তারিখ হইতে আরও জানিতে পারি যে যদু, পুরু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু, সুমিত্র ও কুশিক প্রভৃতি "জন"গণ বিশ্বামিত্রের এই পরাধর পুত্রেরই বংশধর। ইহাদের মধ্যে যদু, সুমিত্র ও কুশিক মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে তাহাদের উত্তর বাসস্থান না জানিতে পারিলেও, আর্য্যগণ যে এই সময়ে বিন্ধ্যের দক্ষিণে অবস্থিত এই সকল অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পাণিনি (৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ঔদীচ্য ও প্রাচ্য মনুষ্য জাতিদের প্রাচীন ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐতিহ্যিত স্থান ও নদী সাধারণতঃ পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের তিনি, অশ্ব (৪।২।১০০), অবন্তি (৪।১।১৭৬), কোসল (৪।১।১৭১) ও কলিঙ্গের (৪।১।১৭৮) উল্লেখ করিয়াছেন। অশ্বক (৪।১।১৭৩) ভিন্ন অন্যান্য দক্ষিণের দেশ বা জাতির উল্লেখ পাণিনিতে নাই। দুরতিক্রম এতই অতি আধুনিক ভৌত পাথি নহে। ইহাতে খ্রী. পূ. ৯৭০-৭] লেখিতে পাওয়া যায়, কোসল-দেশ পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাপথে (দক্ষিণাপথে) অশ্বক (অন্ধ্রক) রাজ্যে গোদাবরীর তটস্থ প্রদেশে ইক্ষ্বাকুগণ নিবেশিত করেন। রাজধানী তাঁহারা গোদাবরী জিলাতে মূলকের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শিলালেখের উপরাজিমুখে কালের সীমা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে [খ্রী. পূ. ২০০১—৩]। তাঁহারা প্রথমে বুনক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণ হইতে, বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে আসিয়া ছিলেন।

পাণিনি, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, দাক্ষিণাত্যে যেসকল জনপদের নাম করিয়াছেন। কিন্তু কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে) পাণিনির "অবন্তি-কুলাভ্যাং" (৪।১।১৭৬) সূত্রের বার্ত্তিক করিবার সময় ("অবন্তিভ্যঃ") "আদি" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। "অবন্তিভ্যো-ভ্যাদি"—এই সূত্রের বার্ত্তিকে তিনি অশ্বক, ভোজ, ঋষিক ও কেরলের নাম করিয়াছেন। ইহাদের অনেকের দেশ পাতঞ্জল ব্যাখ্যাতে ও মহাভাষ্যে। কিন্তু পাণিনি ইহাদের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং পাণিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আর্য্যগণের নিকট অশ্বক ভিন্ন, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহাদের সকল তাহারা ইহাদের পরিচয় পান করেন। যেসব পরিচয় অনুসারে বন পুরেই আর্য্যগণ নিকট বা প্রতীচ ভারতবর্ষীয় বিদেশ ছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। অশ্বকদের দুইটি অনুবাদের নাম "অশ্বকায়ন" এবং মেগাস্থিনিস অনু "অন্ধ্রোনেস" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের এই সময় প্রাচ্যজাতির মধ্যে ভোজ, অন্ধ্রিক ভোজ, ও কেরলক প্রভৃতিরা প্রতিষ্ঠিত। ঐ দেশের পরিচয়ও ঐ সময়ে ছিল। এই ভোজদের হইতে ভোজবংশ অনু ভোজপুর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ও রাজপুতানায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের

ও প্রাথমিক অর্থ কাম্পিয়ান অধিত্যকার অধিবাসী ডাহি (Dahae)* জাতি, কিন্তু বৈদিক যুগে "পরস্বাপহারী" অর্থে প্রযুক্ত হয়। অনার্য্যজাতির নামসূচক 'দস্যু' শব্দের ন্যায় 'চোর' শব্দও ঘৃণিত তস্করের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। বেদে পরদ্রব্যাপহারক বুঝাইতে তস্কর, তস্যু, স্তেন, পরিপন্থিন্ শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, কিন্তু কোথায়ও 'চোর' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থেই ইহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [তৈ. ব্রা. ১০।৬৫]। কিন্তু কাত্যায়নের ব্যুৎপত্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পাণ্ড্যগণ আর্য্যজাতীয়, চোল বা চোরের ন্যায় অনার্য্য নহে।

গ্রীক ঐতিহাসিক মিনি, মেগাস্থিনিসের বর্ণিত কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পাণ্ড্যগণ কৃষ্ণের দুহিতা পাণ্ডিয়ার (Pandaea) বংশধররূপে উক্ত। "পাণ্ডিয়া সৌরসেনগণের রাজ্য হইতে চলিয়া যান। মেথোরা বা মথুরা, এবং ক্লিসোবোরা বা কৃষ্ণপুর সৌরসেনগণের প্রধান নগরী ছিল। প্রধান কালে পাণ্ডিয়া পিতা কৃষ্ণের নিকট হইতে ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত ও সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগ প্রাপ্ত হন।" মেগাস্থিনিসের উক্তি হইতে অবশ্য জনবাদের অংশ পরিত্যাগ করিলেও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণ সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। বেশ বোধ হয় যে, উত্তর ভারতে মথুরার সন্নিহিত জাতিবিশেষ পাণ্ডুনামে অভিহিত হইত এবং ইহাদেরই এক অংশ দক্ষিণ ভারতে অভিযান করে ও তথায় বসতি করিয়া পাণ্ড্য নামে পরিচিত হয়। কাত্যায়নের বার্ত্তিক 'পাণ্ডোদ্যণ' হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পণ্ডশব্দ ক্ষত্রিয়জাতিবাচক ও দেশবাচক। উত্তর ভারতের এই পণ্ডুজাতির বংশধরগণই দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া "পাণ্ড্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। টলেমি (Ptolemy) তাঁহার ভারতের ভূগোলে (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পাণ্ডিয়ন বা পাণ্ড্যরাজ্য এবং পল্লবের পাণ্ডবদিগের নাম করিয়াছেন। পাণ্ডবদিগণ পাণ্ড্যজাতিরই নামান্তর। ঋষিপ্রতিম জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহির (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে) মধ্যদেশে অবস্থিত পাণ্ড্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বরাহমিহির বর্ণিত মধ্যদেশস্থ পাণ্ড্যগণই মেগাস্থিনিসের সময় মথুরার সন্নিকটে বাস করিত। মেগাস্থিনিসের উক্তি যে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যগণ উত্তর ভারতের যমুনা ও মথুরার নিকটবর্ত্তী পাণ্ড্যগণের সহিত সম্পর্কিত—প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ গ্রীক ঐতিহাসিক মিনি ও টলেমির মতে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যগণের প্রধান নগর মোদোরা অর্থাৎ বর্ত্তমান মাদুরার মথুরা। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারতের পাণ্ড্যগণ যখন দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা স্বীয় আদিম বাসস্থলের রাজধানী মথুরার অনুকরণে নূতন বসতিতে নূতন পুরী মথুরা স্থাপন করেন। পুরাতন নগর ও প্রদেশের নামে নূতন পুর ও দেশের নামকরণ উপনিবেশিকগণের সর্ব্বজনবিদিত রীতি।

উত্তর ভারতের আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে গমন, উপনিবেশ স্থাপন ও পুরাতন আবাসের নামানুসারে মথুরা বা মদুরা প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম ও তথায় উপনিবেশ করিয়া, সিংহলে উপস্থিত হন ও আর একটী মথুরা স্থাপন করেন।

* Hillebrandt, Vedische Mythologie, 1.95 ; E. Kuhn's Zeitschrift, 28-214.

তথা হইতে পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে Eastern Archæpelago অভিযান করেন এবং উপনিবেশের চিহ্নস্বরূপ আরও একটী চতুর্থ মন্ত্রণার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্য্যগণ দক্ষিণ ভারতের টিনেভেলি (Tinnevelly) জেলা হইতে সিংহলে উপস্থিত হন। এই টিনেভেলি জেলায় তাম্রপর্ণি নদী প্রবাহিত। সিংহলের আর একটী নাম তাম্রপর্ণি। বলা বাহুল্য, সিন্ধু বা ইন্দাস্ নদীর নাম হইতে সিন্ধু বা সিন্ধ্ দেশের ন্যায় তাম্রপর্ণি নদীর নাম হইতে সিংহলের তাম্রপর্ণি নামের উদ্ভব হইয়াছে। টিনেভেলি হইতে সিংহলের উত্তর পশ্চিমাংশে অবতরণই স্বাভাবিক। এইজন্য ঐ অংশই সমগ্র দ্বীপের ভিতর সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, প্রাচীন ও জনবহুল। এইখানেই কলম্ব Kalawa অবস্থিত।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের রীতি অভিন্ন। পুরাকালে আর্য্যগণ ক্ষত্রিয় জাতির কর্ত্তৃত্বাধীনে আফগানিস্থান ও পঞ্জাব হইতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং ঐ সকল ক্ষত্রিয়জাতির নামে নূতন বাসস্থানের নামকরণ করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি আর্য্যগণ বিদেঘ মাঠবের অধীনে সরস্বতীর পূর্ব্ব করতোয়া অতিক্রম করিয়া বিদেহে উপস্থিত হন। বিদেঘ মাঠবের নাম হইতেই বিদেহ নাম উৎপন্ন। পাণিনির 'পকালানাং নিবাসো—" ইত্যাদি সূত্র ইহারই প্রমাণস্বরূপ। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও ক্ষত্রিয়জাতীয় নেতৃস্থানীয় পঞ্চ জাতি হইতে পাণ্ড্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দাণ্ডক্য অর্থাৎ দণ্ডকাধিপতি ভোজ ব্রাহ্মণকন্যায় উপর অত্যাচার করেন ও সেই পাপে বন্ধু ও ভৃত্যবর্গের সহিত বিনষ্ট হন। মহাভারত ও হরিবংশে ক্ষত্রিয় ভোজের উল্লেখ আছে; কৌটিল্য তিনি দণ্ডক বা মহারাষ্ট্রের অধিপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। চাণক্য মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর শেষভাগ)। তাহার মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উত্তরের ভোজগণ অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র অধিকার করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ সুত্তনিপাতে পটিট্ঠান বা নিজামরাজ্যের পৈথানের নাম আছে। কিন্তু ঐল পুরূরবার রাজধানী পটিট্ঠান বা প্রতিষ্ঠান নামে উত্তর ভারতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আর একটী স্থান আছে। [Wilson, Vishnu-Purana, III. 237 বিষ্ণুপুরাণম্ (BSPS. Ed.) ৩১৭ পৃঃ।] বেশ বুঝা যায়, উত্তর ভারতের ঐলজাতি দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন কালে, পুরাতন প্রতিষ্ঠানের নামে গোদাবরীর তীরে আর একটী স্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। উপনিবেশিকগণ সর্ব্বত্রই এইরূপ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের একাধিক জাতি ও পরিবারগণের দাক্ষিণাত্যে অভিযানের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলায় অমরাবতী বৌদ্ধ স্তূপে প্রাপ্ত তিনটী অনুশাসনলিপি ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মাঢ়রীপুত্র শ্রী-বীরপুরুষদত্তের সময়ে উৎকীর্ণ। রামায়ণের রাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশ হইতে উদ্ভূত। পুরাণেও উত্তর ভারতের ইক্ষ্বাকু রাজবংশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ উত্তরের ইক্ষ্বাকুগণই যে দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত কিষ্ণা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করেন, তাহা অস্বীকার করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। [Luders List of Brahmin Inscrr.] Nos. 1202-4.

আর্য্যগণ প্রধানতঃ দুইটী মুখ্য কারণে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হন। প্রথমতঃ রাজ্যলোভ, দ্বিতীয়তঃ আর্য্যসভ্যতার প্রচার। বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুগণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও স্বকীয় আর্য্য সভ্যতার প্রচারকল্পে যথেষ্ট যত্ন করিতেন। মহাভারত ও রামায়ণে দেখি, ব্রাহ্মণ ঋষি অগস্ত্য সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যমালা অতিক্রম করিয়া আর্য্য অভিযানের পথপ্রদর্শন করেন। [মহাভা. ৩।১০৪ ; রামা. ৩।২।৮৫]। দক্ষিণপথে রামের পঞ্চবটীতে উপস্থিতির বহু পূর্ব্বেই দুই যোজন দূরে বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে অগস্ত্যের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যের মজ্ঞাত প্রদেশ সমূহে অনার্য্য দ্রাবিড়গণের ভিতর সভ্যতা প্রচার করেন। তামিলগণ সেই প্রাচীন স্মৃতির সম্মানে অগস্ত্যকে তমিরমুনি নামে অভিহিত ও তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অগস্ত্যের মহাপ্রস্থানের চিহ্নস্বরূপ টিনেভিল্লি জেলার একটী পর্ব্বত এখনও অগস্তির (Agastier) নাম বহন করিতেছে। [Caldwell, Intro., ১০১ ১১৯] সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণগুরু বাভরিন বহু শিষ্যপরিবৃত হইয়া গোদাবরী তটে অশ্মক রাজ্যে যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন। পূর্ব্বে তিনি কোসলদেশে শ্রাবস্তিতে ছিলেন, পরে আর্য্যসভ্যতা প্রচারসূত্রে শিষ্যগণসহ ৬ শত মাইল অতিক্রম করিয়া গোদাবরী তীরে উপনীত হন। রামায়ণে দেখি যে, রাম দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ তপস্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রমে বাস ও যজ্ঞাদি করিতেন। অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ও যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, কিন্তু বানরগণ ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞভাগ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। অনার্য্য রাক্ষসগণেরও কেহ কেহ ব্রাহ্মণভক্ত ও আর্য্য-সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, যেমন রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ—"নতু রাক্ষস-চেষ্টিতঃ" [রামা. ৩।১৭।২২]। অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন ও আর্য্যসভ্যতার প্রচারকল্পে ঋষিগণ সর্ব্বত্র পুরোগামী ছিলেন। রামায়ণ মহাভারতাপরাপর প্রাচীন গ্রন্থও ঋষিগণের এই মহৎ কার্য্যের সাক্ষ্যদান করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের প্রতি অভিশাপের উপাখ্যান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বিশ্বামিত্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ ঋষিচরিতা ঋষির বংশধরগণও নির্ভীকভাবে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিতেন ও অনার্য্য নারীবিবাহ ও অনার্য্যজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের দ্বারা আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করিতেন।

আর্য্যগণ কোন্ পথে দাক্ষিণাত্যে অভিগমন করেন? তাঁহারা প্রধানতঃ স্থলপথে যাত্রা করেন, কিন্তু কতকাংশে জলপথ ব্যবহার করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাভরিনের গল্পে স্থলপথ বর্ণিত হইয়াছে। বাভরিনের শিষ্যগণ গোদাবরী তীর হইতে মূলকরাজ্যে পটিট্ঠানে উপস্থিত হন, তথা হইতে ক্রমান্বয়ে মাহিস্সতি (মহেশ্বর), উজ্জয়িনী, গোনদ্ধ, ভেদিসা, বনসহব্বয় ; কোশাম্বী, সাকেত, সাবট্ঠি (কোশলের রাজধানী) ; সেতব্য, কপিলবৎথু ও কুসিনারা ; পাবা, বেসালী (মগধের রাজধানী ; সর্ব্বশেষে তাঁহারা পাসাণক চেতিয়ে উপস্থিত হন। আর্য্যগণ উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিবার সময় ঠিক ইহার বিপরীতমার্গ অবলম্বন করেন। উপরি উক্ত মার্গ হইতে বেশ জানা যায় যে, আর্য্যগণ বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে উপস্থিত হন ; পূর্ব্ব দিক ঘুরিয়া যাইবার কোনও প্রমাণ নাই। অশ্মক হইতে আর্য্যগণ

আর কতদূর অগ্রসর হন, তাহার আভাস নিজামরাজ্যের রাইচুর জেলায় লিঙ্গসুগুর তালুকে প্রাপ্ত অশোকের লঘু শিলা অনুশাসন ও মধীশূরে চিতলদ্রুগ জেলায় প্রাপ্ত তিনটী অনুশাসন লিপি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধুরা জেলায় প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর কয়েকটী জৈন অনুশাসনও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত অনুশাসনই আর্য্য পালিভাষায় লিখিত, সুতরাং আর্য্যগণ যে এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অবন্তি হইতে রাইচুর ও চিতলদ্রুগের ভিতর দিয়া আর্য্যগণ মদুরায় উপস্থিত হন। তমিল ব্রাহ্মণগণের বৃহচ্চরণ শাখার মতন্তু ও যোলশু বিভাগদ্বয়ের স্থান পরিবর্ত্তন প্রণালী এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল।

জলপথে আর্য্যগণ সিন্ধু হইতে কচ্ছ, তথা হইতে সুরাষ্ট্র বা কাথিয়াওয়াড়, ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান ভরুচ), এবং পরিশেষে বোম্বাইএর থানা জেলায় সুপারক বা সোপারায় উপনীত হন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বোধায়ন বাসিষ্ঠসম্প্রদায়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সিন্ধু, সৌবীর এবং সুরাষ্ট্রের অধিবাসীবর্গ দাক্ষিণাত্যবাসীদের ন্যায় মিশ্র জাতি; আর্য্যগণের উপনিবেশ চেষ্টাই ইহার কারণ। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে তাঁহারা সোপারা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্রকূল ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী কোনও দ্বীপ প্রভৃতির উল্লেখ নাই। সুতরাং জলপথ ভিন্ন তাঁহাদের উপায়ান্তর ছিল না।*

ভারত ও সিংহলের যে স্থানেই আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন, আর্য্যধর্ম্ম, সভ্যতা ও রীতিনীতির সহিত তাঁহারা আর্য্যভাষাও অনার্য্যগণকে শিক্ষা দেন। এক সময়ে উত্তর ভারতে অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল (*cf.* Kittel, Kannada-English Dictionary) পরে আর্য্যভাষা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করে; আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্য অধিকারের সময় আর্য্য পালি ও অনার্য্য দ্রাবিড়ি কিছুকাল একত্র সমান ভাবে বিরাজ করে, কিন্তু পরিশেষে অনার্য্য দ্রাবিড়িই লুপ্ত হয়, পালিভাষা লোপ পায়। সিংহলে আর্য্য পালিভাষা অনার্য্য সিংহলি ভাষাকে নিষ্পিষ্ট করে। আর্য্যভাষার সংঘাতে অনার্য্যভাষার ধ্বংসই স্বাভাবিক ও সঙ্গত; উত্তর ভারত ও সিংহল দৃষ্টান্তস্বরূপ। দাক্ষিণাত্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে —পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।†

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

---

* Sir George Grierson, Linguistic Survey of India.

† Prof. D. R. Bhandarkar, Carmichael Lecture I.

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রাবণ।—শ্রীসারদাচরণ উকীলের অঙ্কিত 'আকাশ-বাসরে' চিত্র-প্রদর্শিকা। ইহা কি? মেঘ ও সৌদামিনী? পুরুষ ও প্রকৃতি? সজল-জলদ-নীল পুরুষ আগ্রহে, গৌরী নারীর নয়ন মুদিত। নারীর স্থিতি-ভঙ্গী সুন্দর। পুরুষের চোখে বিষাদের ছায়া; মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল নয়, বরং তাহার বিপরীত। চিত্রকরের উদ্দেশ্য কি? মিলনেও বিরহের শঙ্কা? না, সংসারটাই দুঃখময়—বিষণ্ণ হইয়া থাকাই স্বাভাবিক? নারীর বিহ্বলতা—কতকটা সুখের সুপ্তির মত। মিলনের আনন্দে আত্মবিস্মরণ? মনে মনে এমন অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যাহা ধরিবার ছুঁইবার বস্তু নয়, তাহার ভাল মন্দ বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায় কি? চিত্রকর পুরুষকে এমন সুদীর্ঘ হস্তের অধিকারী করিয়াছেন যে, ঘুরবর্ত্তিনী নারীকে বেষ্টন ও আলিঙ্গন করিয়াও তাহা একটু বাঁচিয়াছে। বড়াস কবি লিখিয়াছিলেন,—

'শত নাগিনীর পাকে জড়াও আমায়,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ দুর্ব্বল হিয়া।'

আমরা এখনও কবিকে জিজ্ঞাসা করি, ক' গজ ঘুণায়মান বাহু ও রক্ত-পদ্ম হইলে এ সাধ মিটিতে পারে? প্রত্যেক পাকে রক্ত-ফুট হাত দরকার? এত দিন পরে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল। চিত্রকর তাহা আঁকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আসল' পদ্যগল্প—একটা স্তুতির চর্চ্চা। বর্ণনা Realistic। আট বছর বয়সের ভূমিকা, আট বছর বয়সের উপসংহার। সমস্তটা ক্ষীণ—অস্পষ্ট। ছন্দটা বড় দুরূহ। একটু একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—

'যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।'

ইহার উপর আর কথা চলে না। বাঙ্গালা দেশে কবির ভাগ্যে নোংরা সমালোচন একবারেই ফলে নাই, এমন কথা আমি বলিতে না পারি, কিন্তু ইহাও স্থির যে, এত অ-নোংরা, শুচি, সমালোচন এ দেশের কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। এত স্তুতি, এত স্তব, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা, এত অন্ধ সমালোচনা, এত স্তাবকের হনুকরণ ও সমালোচকের বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন্ কবি লাভ করিয়াছেন? 'তবু ভরিল না চিত্ত?' বাঙ্গালী যে 'রাজা ও রাণীর' রাণীর মত ক্রমাগত বলিতেছে,—'একান্ত তোমারই আমি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশের ভালবাসায় অত্যন্ত অবিশ্বাসী। অতএব, অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে ভাল দিকটা বলিয়াই উপসংহার করি—'আসলে'র একটি উপমা বড় সুন্দর। পাগল মেয়েটিকে কাঁধে তুলিয়া লইল। কবি উপমা দিয়াছেন—

'ভোলানাথের জটার যেন ধুতুরো ফুলের কুঁড়ি।'

রবীন্দ্রনাথ উপমার রাজা। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'বিশ্বনিদ্যালয়ের কথা' আমরা সাবধানে পড়িয়াছি। লেখক ভাষায় বীরবলের নকল করিয়াছেন। কিন্তু এক জনের রচনা-রীতিকে

ভাঙচাইয়া লাভ কি? ভাষার ওস্তাদী তথ্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। ইহা শুধু আক্ষেপ, তথ্যে প্রতিষ্ঠিত পরামর্শ নয়। লেখক অনেক গুলি শোনা কথা ওস্তাদীর তবকে মুড়িয়া আমদানী করিয়াছেন। আজকাল নবীন লেখকদের আত্মপ্রত্যয় ও দেশের লোকের বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নিদারুণ অপ্রত্যয় ও অবজ্ঞা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এটা শতাব্দীর সৃষ্টি, না বিশ্ববিদ্যালয়ের দান, না আমাদের পোড়া কপালের ফল, তাহা বলিতে পারি না। লেখক এক স্থলে অম্লানবদনে লিখিয়াছেন,—'উত্তেজনা আর উৎসাহ যে এক বস্তু নয় এটা মানবার মতো মন আর বুঝবার মতো বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই নেই।'—ভাগ্যে এক জনের ছিল। ভাগ্যে চক্রবর্তী মহাশয় এই 'অনেকে'র দলে না পড়িয়া মননক্ষম মন ও ক্ষুরধার বুদ্ধি পাইয়াছেন। নতুবা এই বাঙ্গালা দেশের 'অনেকে'র এইরূপ মানসিক দুরবস্থা ও বৌদ্ধিক দুর্গতির কথা আমরা জানিতেই পারিতাম না। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা' যাঁহার আলোচ্য, দেশের শিক্ষার ইতিহাসের সেদিনকার কথাও তাঁহার অজ্ঞাত। লেখক বলেন,—আমরা যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ গড়ে তুলেছিলেম সেটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে। উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি। জাতীয় শিক্ষাকে আমরা সেদিন শিক্ষার দিক থেকে মোটেই দেখিনি—দেখেছিলেম সেটাকে পলিটিক্সের দিক থেকে। গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ থেকে যে আমরা মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না সে অভাবটা আমরা সেদিন মোটেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করিনি; সেখান থেকে যে পলিটিক্স করা চলবে না—এইটে ছিল আমাদের জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সত্যময় ভিত্তিটা। * * * বেষের ওপরে ভিত্তি করে আমরা যেটা খাড়া করেছিলেম সেটা স্থায়ী হয়ে আমাদের সফলতা দান করতে পারল না। কৃতকার্য্য হবার যে রাস্তা—সেটা পরের ওপরে বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে নেই, সেটা আছে আপনজনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে। পরের উপরে যেষে হয় মানুষের শক্তির বাজে খরচ; এক ভালবাসাই মানুষকে সক্ষম [সমর্থ?] করে গুরুভার বহন করতে।' উত্তেজনা যে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ব্যর্থ, নিষ্ফল এবং সকল অনর্থের হেতুরূপক, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। উত্তেজনায় জগতে অনেক বড় কাজ হইয়াছে, এবং বিশ্ব এখনও অনেক বড় কাজের সাফল্যের জন্যে 'উত্তেজনা'র প্রতীক্ষা করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিশ্ববিধান—ফরাসী বিদ্রোহ কি একটা 'উত্তেজনা'র ফল নয়? 'উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি'—এটাও সত্য নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপমারা গ্রাজুয়েটে মনুষ্যত্বের বৈন্য আমরা তখন যেমন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি, আর কখনও তেমন করিয়াছি কি? 'পলিটিক্সের দিক থেকে'ও শিক্ষাকে দেখিবার সময় আসিয়াছে। 'পলিটিক্স' হাতী-ঘোড়া নয়, শিক্ষার সঙ্গেও তার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। বিশেষতঃ, পরাধীন, বিজিত প্রজার শিক্ষা 'পলিটিক্সে'র নাগপাশে আদ্যোপান্ত বাঁধা। যে 'পলিটিক্স' আমাদের শিক্ষাকে বন্ধ্যা করিয়া রাখিয়াছে, সে পলিটিক্সের অধিকৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ পলিটিক্স যদি মাথা তুলিতে না পারে, তাহা হইলে, 'আপন জনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে' প্রবন্ধ 'লেখা যেতে পারে', কিন্তু সে শিক্ষা কখনও 'মানুষ'-প্রসূ হইবে না। যাঁহারা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ গড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই 'পরের উপর দ্বেষে মানুষের শক্তির বাজে খরচ' করিয়াছিলেন লেখক-চক্রবর্ত্তীর এ উক্তি অন্যায়ের উদ্ধত প্রকাশ। এ সব-

পরিচয়ে নিয়েট অনভিজ্ঞতার ফল। লেখক অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিলে বুঝিবেন,—পলিটিক্সের মাঝেই—আমাদের নয়, অন্য পক্ষের—জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অঙ্কুর জন্মাইয়া গিয়াছে। লেখক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবের জন্য কলম ধরিয়াছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়, এবং যে 'নীতি' সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই নীতি এ দেশে যেরূপ মানবের আবাদ করিয়াছে, সেরূপ মানবের দেশে পলিটিক্স কৃপা না করিলে কোনও শিক্ষাই বাঁচিতে পারে না, বাঁচে না, বাঁচিবে না। আমি চাই কেরাণী; আমি চাই 'ঐ জাতীয় উদার বংশ'। আমার শিক্ষার ব্যবস্থাও তদনুরূপ। আমি তাই আমড়া গাছের আবাদ করিয়াছি। তুমি আমার আমড়া-গাছে আতা পাইবার আশা করিতে পার না। প্রকৃত কথাটা এই। প্রেমের মহিমা, গৌরব, কবিত্ব আমরা অস্বীকার করিব না। কিন্তু যে দেশে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়' পাঠ্যপুস্তক হইতে ক্লিয়ারিক্যাল, সে দেশে শুধু প্রেমে মানুষ গড়িতে হইলে যে আত্মরক্ষা, সরকারের হাড় চাই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের আকাশে তাহার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ। উইলবিরিয়ের সঙ্গেও 'সাধারণ বিপদে' একটা সম্বন্ধ আছে। তাহাও 'জাতীয়-শিক্ষা'র প্রতিকূল। যে মানব-সমবায় লইয়া আমাদের সমাজ, তাহার সহিতও শিক্ষার সাফল্যের সম্বন্ধ আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রতিকূল।—এই মানব-সমবায়ের চূড়ামণিরা 'উত্তেজনা'র সময়ে না হইয়া, খুব ভাটার টানের সময়েও যদি কোনও প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহা কখনই পালন করিতেন না। কারণ, গত দেড় শত বৎসরের পরবশতায়, আমাদের আত্মবশতার সমাধি হইয়া গিয়াছে। আত্মবশ না হইলে কোনও জাতি প্রতিজ্ঞাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। জীবনীশক্তি হারাইলে জাতি বর্ত্তমানেই স্বপ্ন করে। অতীতে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের উপাদানে ভবিষ্যৎ গড়িতে পারে না। আপাতরম্য লাভে যে জাতির এমন প্রবল আগ্রহ, সে জাতি 'ভালর নাম ভিতর দিয়ে'ও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এই জন্য সেই পলিটিক্স আবশ্যক, যে পলিটিক্স এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিশ্চয়ই তাহার ক্ষেত্রে সফল হইয়াছে, নতুবা দেশে এত জাতদ্রোহী, এত জগচ্চাঁদ উমিচাঁদ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর, এত বিশু, চিশু, সুরেন, নরেন, ক্ষকড়ি, ছকড়ি দেখিতে পাইতাম না। আদ্যোপান্ত প্রেমের ওড়োন-পাড়োন দিয়া বুনিলেও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের থান অমনই জেলেকোচায় পরিণত হইত; গায়ে মলমল হইতে পারিত না। 'পরের উপর দ্বেষ'টা সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা যায়। 'পরের উপর দ্বেষটা যে' অত্যন্ত মন্দ, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। এমন কি, নীতিবোধেও তাহা পড়া গিয়াছে। অত বড় কষ্ট বস্তুটার অবশ্যই আমরা সমর্থন করিব না। কিন্তু 'পরের প্রতি দ্বেষ' যেমন মন্দ, 'পরের প্রতি অতি-ভক্তি'ও তেমনই নাংঘাতিক। আপনার প্রতি অখণ্ড, অক্ষ, আত্মবিস্মৃত অনুরাগ চাই। তাহাতে পরের প্রতি অনুরাগের লেশমাত্র থাকিবে না। আগে আপনার প্রতি অনুরাগে সম্পূর্ণ—ষোল আনা সিদ্ধি, তাহার পর পরের প্রতি দ্বেষ বা অনুরাগের বিচার। যাহারা আত্মবশ, আপনাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সে বিচার শোভা পায়। যে পরের অনুরাগী, পরের অনুকারী, পরের ধারে ভিখারী, বিষয়ে বিরাগী, আপনাকে

বেশ, এবং আধুনিকতম সুখ সুবিধার সন্ধিবেশ, তাহাকে আত্মোপলব্ধির সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে আরম্ভ হইতে হয়, আত্মপরিচয় করিতে হয়। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের সাধনাই তাহার ভবিষ্যৎ। 'বিশ্বমানবতা' জাতি-পরিচয়ের র‍্যাঢ়ীর-প্রেমচাঁদ; প্রথম ভাগের ফ্লাস নহে। যেমে থাকিবার আগে শিক্ষাক্ষেত্রেও এইটি ধরিতে নাই। লেখক জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কল্পনাকে যত অধম ও নিবুদ্ধি ভাবিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাকে ততটা 'নিরেট' কল্পনা করিবার হেতু নাই। যে ভাবের সমবায়ে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কল্পনা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা 'পরের উপরে দ্বেষ' দূর করিবার চেষ্টা অপেক্ষা 'আপনার উপরে প্রেমের' প্রতিষ্ঠাকে অধিকতর আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহা চক্রবর্ত্তী সমালোচকগণের বিচারে অপরাধ হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনীয়তার হিসাবে তখন অপরিহার্য্য হইয়াছিল, এমন মনে করিলেও নিশ্চয়ই কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হইতে পারে না। 'আপনার প্রতি প্রবল অনুরাগে' অজ্ঞাতসারে ও অন্যভাবে 'পরের উপরে দ্বেষ' আসিয়া না পড়িতে পারে, এমন নয়; কিন্তু সে শঙ্কায় 'আত্মনি প্রীতিতত্ত্ব' নিঃসন্দেহসাধনকে বন্ধ হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার কি এখনও সময় হয় নাই? শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 'ন্যায়দর্শনের' সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন —'ইউরোপীয় অধ্যয়ন-পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই।' কিন্তু আমাদের দেশী পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্যাই লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থসমূহে কাহারো হস্তক্ষেপই হইবে না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন মণিকাঞ্চনযোগ, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপেই হউক, যতদিন ইহা ঘটিয়া না উঠিতেছে, ততদিন আমাদের এই দীন পদ্ধতিকে অনুসরণ না করিলে আমাদিগকে ঠকিতে হইবে। বর্ত্তমান সংস্কৃতপরীক্ষা আমাদিগকে এই দিকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এখনো কয়েকজন প্রগাঢ় পণ্ডিত দেখা যাইতেছেন, পরে কি দাঁড়াইবে ভাবনার বিষয়।' ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ডাক্তার সরস্বতীর ভল্যাণে উপাধি-পরীক্ষা যে পথের পথিক হইয়াছে, এবং এ দেশের সমাজ পাণ্ডিত্য-রক্ষার যেরূপ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যেই তাহার ফল ফলিতেছে। এখন পদে পদে তীর্থ, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মত দেবতা ও সে সকল তীর্থে নাই। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে, ফটোমিশ্র ধর্ম্মায় ধনভাণ্ড দেশ পরিপূর্ণ। যাঁহারা বাঙ্গালায় মিথিলার গৌরব রাখিয়াছিলেন, এই সকল তীর্থে তাঁহাদের জ্ঞানের ধারা, পাণ্ডিত্যের পুণ্যপথ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ইহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।—বাঙ্গালার বহু দৈন্য শোচনীয়—কিন্তু এ দৈন্য? কোন্ ভাষায় ইহার মর্ম্মান্তিকতা প্রকাশ করিব? শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে 'জাতীয় শিক্ষাও চক্রবর্ত্তীর 'শিববিদ্যালয়' প্রবন্ধের ছাঁচে ঢালা। ইনি লিখিয়াছেন,—'তখন আমরা চাহিয়াছিলাম জাতির প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে।' তাহা সত্য। আমরা তখন যাহা চাহিয়াছিলাম, এখনও তাহাই চাহি। 'দেশাত্ম-বোধ জাগ্রত' করিবার পথেই আজকাল বিদ্বের শিক্ষা চলিতেছে। স্বাধীন দেশের মানুষ গড়িবার জন্যও যে ভাবের উদ্বোধন আবশ্যক, আমাদের পক্ষে তাহা কি অত্যন্ত আবশ্যক—অপরিহার্য্য নহে? আমাদের শিক্ষায় 'দেশাত্মবোধ' জাগ্রত করিবার উপায় নাই, চেষ্টা নাই, উপাদান নাই: তাই আমাদের শিক্ষা গড্ডলিকা-প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে, মানুষ গড়িতে পারিতেছে না, ইহা 'ধ্রুব সত্য' আগে মানুষ গড়, তাহার পর পদার্থপর, সার্ব্বভৌমিক

বিশ্বপ্রেমিকের অভিনয় করিও। শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্রের 'নূতন নক্ষত্র' আমরা সানন্দে পড়িয়াছি। লেখক "১৩১৩ঃ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর রাত্রে নয় ঘটিকার সময়" এই 'নূতন নক্ষত্রটি' প্রথম দেখিয়াছিলেন। পর দিন তাঁহার সংশয়ভঞ্জন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি পরে যাহা করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে—বিজ্ঞানসম্মত পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হন নাই। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী সাধারণ বাঙ্গালা গল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 'রাহুর প্রেম' নামক গল্পটি লিখিয়াছেন, এবং নূতনের রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখক নূতন দৃশ্যে গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন; আমাদের প্রায় অজ্ঞাত গ্রাম্য-জীবনের পরিচয় দিয়াছেন; এবং একটি প্রায়-অজ্ঞেয় মনের ছবি তুলিয়াছেন। বর্ণনার স্বাভাবিকতায় গৌরব প্রশংসনীয়। ভাষাটা গুরু-চণ্ডালী, 'বাস্তব' গল্পের রচনার পক্ষে যতটুকু আবশ্যক, তাঁহার প্রাদেশিকতা ও যথেচ্ছাচার তদপেক্ষা অনেক অধিক।—লেখক আর্টের হিসাবেও একটা বিষম অপরাধ করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার ও নাচুনে ছোকরার চিন্তায় কোনও প্রভেদ রক্ষা করেন নাই। যে পাত্রের মুখে যে কথা শোভা পায়, যা সম্ভব নহে, তিনি তাহার মুখে সেই কথার আরোপ করিয়াছেন। যথা,—"এত দিন ধরে বর্ত্তমানের মোহ একটু একটু করে ছোটে; যে ঝড়জল জীবনের পাতাটাকে ঝাপসা করে রেখেছে, পুরোনো সব কথা তার নীচে থেকে ফুটে বেরোয়।" এ উচ্ছ্বাস সুধীরবাবুর পক্ষে স্বাভাবিক; তিনি যাহার মুখে দিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার যোগ্য নহে; তাহার পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক নহে। আবার, "তার স্নেহসোহাগ সে দিন থেকেই দ্বিধাঘিত করে সে ছেলে দিচ্ছিল; কিন্তু ঐ দুটি কড়া চোখের পাহারায়! তার বুকের কাছে শুতে এর পর আমার কেমন ভয়-ভয় লাগত, মনে হতো তার চোখদুটি অন্ধকারের ভেতর দিয়েও নির্নিমেষ হয়ে যেন আমাকে দেখ্‌ছে। মাঝে মাঝে মনে হতো তার বুকটিতে করে সেদিনকার যত্নে সে দিনের নিবিড় কালো অন্ধকারকে সে যেন বয়ে নিয়ে এসেছে; যত পালাই যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, আমার আকাশ সেদিনকার বর্ষার আকাশের স্মৃতিতে তেমনিতর কালো হয়েই থাকবে।" লেখক ভাবের আতিশয্যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁর নাচুনে ছোকরা এতটা কবিত্ব করিতে পারে না। এই রূপ অস্বাভাবিকতা ও আতিশয্য সাহিত্যে সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই গল্পটি শেষ হইয়াছে। তৃতীয়টি যেন প্রক্ষিপ্ত। উপসংহারে মা-বাপের কাহিনীতে রসের সঙ্গে একটু কষও আছে। সে যাহা হউক, গল্পটি উপভোগ্য বটে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু' যেন কোনও রকমে পিতৃভক্তির ব্যবস্থা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী "চির ফাঁকা" নাম দিয়া একটি পদ্য লিখিয়াছেন—

'মনটী আমার ফাঁকা হয়ে হাওয়ার মত যাবে উড়ে,
খোলা বুকের দোলা পেয়ে থাকবে বিশ্ব আকাশ জুড়ে।'

'চির-ফাঁকা'র নিশ্চয়ই হাস্যরস আছে। এটা কি রস? আধ্যাত্মিক হইতে পারে, কিন্তু লেখক চরণটার প্রারম্ভ "মনটা 'ফাঁকা' হয়ে হাওয়ার মত উড়ে' না গেলে নিশ্চয়ই এমন কবিতা লেখা, অন্ততঃ ছাপানো সম্ভব নয়, তাহা বোধ করি বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমাদের

মাসিকগুলি কি ক্রমে ক্রমে ধনশালী ও বহুলগ্রন্থের স্থান অধিকার করিবে? 'চ' যাদুকরীর 'বেলুচিস্থান' সুখপাঠ্য। ইহার একাক্ষর স্বক্ষরে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-রচনা মনে পড়ে—'গানই আমার সকল কাজ originality!' নিমলকিশোর মুখোপাধ্যায়ের 'বর্গীয় ঈশচন্দ্র বসু' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে চরিত্র-বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এবার 'ভারতশাসনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা' সমালোচিত হইয়াছে। পাকা মত। আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে পড়িতে বলি। এই সমালোচনা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলে, এ সম্বন্ধে লোকমতগঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে।

মাল্‌বাবুর কোর্টশিপ্‌

(নক্‌সা)

১

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যোগিডিহি ষ্টেশনের মালগুদামের সম্মুখে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলকের উপর শ্বেতাক্ষরে অঙ্কিত নিম্নলিখিত কথাগুলি সকলের দৃষ্টিগোচর হইত ;—

অটল বিশ্বাস।
মাল্‌বাবু (Goods Clerk)
(শ্রীহরি শরণং ১৯১৬ খ্রীঃ)

বর্ষার দৌরাত্ম্যে অক্ষরগুলির গোটাকতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা উদ্ধার করা সুকঠিন নহে। ইহার ইতিহাস বড় বাবুর নিকট যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গল্প।

২

অটল বিশ্বাস খুব সরলপ্রকৃতি যুবা। দেখিতে সুশ্রী। পূর্ব্বে নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, পরে কর্ম্মের বিপাকে এ দেশে আসিয়াছিল।

মালবাবুদিগের বৈশিষ্ট্য চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু অটল বাবুর পিতার জমীদারী ছিল। তৌজি নং— ফরিদপুর জেলা, রায়ত বার্ষিক ১০১৮৶০। সুতরাং অটল বাবুর চাকরী কেবল সখের খাতিরেও চলে। বাস্তবিকও তাহাই অটল বাবুর পিতার বিশ্বাস যে, 'দেশ বিদেশ পর্য্যটন এবং চাকরী না করিলে কেহ মানুষ হইতে পারে না। যত দিন চাকরী করিতে শিখে নাই, তত দিন ভারতবর্ষের লোকের মনুষ্যত্ব জন্মে নাই। চাকরী করিয়াই এরা মাথা তুলিতে শিখিয়াছে। বিশেষতঃ, চাকরীর মধ্যে একটু কষ্ট আছে, সেটুকু তিক্তরসযুক্ত হইলেও পিত্তদমন ও বায়ুবর্দ্ধনকারক, অতএব রসায়ন।'

'বড় বড় লোক চাকরী করিয়াই নামজাদা হইয়াছে। সুইডেনের চার্লস, পোলাণ্ডের কসিয়স্কো, ইংলণ্ডের গ্লাডষ্টোন, ফরাসী দেশের রিসলিউ ও নেপোলিয়ন, জার্ম্মাণির বিসমার্ক, আমেরিকার ওয়াশিংটন, ইতালীর গারিবাল্ডি

চীনদেশের লীহং চাং, কে না চাকরী করিয়াছে? অনেকে চাকরীকে অধীনতা মনে করে, কিন্তু অধীনতা নহিলে 'ডিসিপ্লিন্' শিক্ষা হয় না। অধীনতা হইতেই স্বাধীনতা, যেমন ধান্য হইতে খই।'

রেলের চাকরী করিবার উদ্দেশ্য যে, 'ফ্রি পাশ' পাইয়া অটল দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবে; এমন কি, 'নিতান্ত ইচ্ছা হইলে একবার মেসোপোটেমিয়াতে যেতে পার', তাহাও পিতৃ-আজ্ঞা ছিল। অটলেরও একবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া 'হিপপটেমস্' দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

অটল বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে 'জয়েন্' করিবামাত্র বড় বাবু (ষ্টেশনমাষ্টার) এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অটল সৌখীন লোক। ফরাসডাঙ্গার ধুতি, হাটি, কোট, নেকটাই, ভাল 'বেডিং,' নেটের মশারি, ভিনোলিয়া সোপ, সাতখানা আর্সি, বারখানা চিরুণী, এক ডজন ঘোষের ম্যাকেসার, কুকার, এবং লম্পের ঝাসি ও আলবোলা প্রভৃতি সভ্যজগতের যত আধুনিক হিন্দু ও অহিন্দু সরঞ্জাম, আহার এক প্রস্থ অটলের সঙ্গে ছিল। 'এ সব আপনারেই জন্য' ইহা বলাতে সকলের আহ্লাদ অসীম হইয়া পড়িল। সকলে অটলের নিবাসে আসিয়া তামাক ও চা খাইয়া যাইত। অটলের নস্য গ্রহণ করা একটা পৈত্রিক অভ্যাস ছিল, নচেৎ অটলের মুখের শব্দ নাসিকা দিয়া বাহির হইত না।

অথচ অটলবাবু কর্ম্মে খুব দক্ষ। মালগুদামের কোনও খাতা বহিই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকিত না। দিনান্তে সমস্ত 'এন্ট্রি' টুকিয়া ও হিসাব মিলাইয়া সন্ধ্যাকালে অটল বাসায় আসিয়া নবেল লইয়া ইজিচেয়ারে বসিত। অটলের পূর্ব্বে যে সকল মালবাবু চাকরী করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন অটলের পছন্দ না হওয়াতে, সে পদের টাকা দিয়া একটা রাণীগঞ্জ টাইলের বাংলা ভাড়া করিয়াছিল। অটলের পাছে কষ্ট হয়, তাই অটলের পিতা, অটলের 'স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত' মাসে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিতেন। অটল পরিশ্রম করিয়া সব টাকারই জমা খরচ রাখিত। খরচ যতই হউক না কেন, সঠিক জমা খরচ রাখা অটলের অভ্যাস থাকাতে অনেক সময় কপর্দ্দকশূন্য হইবাও অটলের শান্তির লেশমাত্র হ্রাস হয় নাই।

অটলের উপর সকলেরই অটল বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তাহার বিশেষ কারণ, অটল চরিত্রশালী। যদিও মোটে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম, অটল বিবাহ

করে নাই। অটলের সে দিকে মনই যায় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে 'মন যদি যায়', সেই জন্য অটল ভাল ভাল রঙ্গীন চিঠির কাগজ ও খাম, সুগন্ধিবিশিষ্ট ও পত্রপুষ্পাঙ্কিত করিয়া, একটা 'ক্যাস'-বাক্সের মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

অটলের একটু তবলা বাজাইবার সখ্ ছিল। অটলের গলা ছিল (সকলেরই থাকে), কিন্তু গলা কাঁপাইবার শক্তি ছিল না। গলা কাঁপিলে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিত। কেবল এই দৌর্ব্বল্যটুকুর জন্য সে গান শিখিতে চেষ্টা করে নাই। অটলের মাতা বলিতেন, 'বৌ আসিয়া গান করিবে, অটল বাজাইবে;' সেই কথা অটলের মনে লাগিয়াছিল। অটলের ওস্তাদ ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রসন্ন-বাবুর এক জন শিষ্য। কাওয়ালী, একতালা, মধ্যমান প্রভৃতির সুন্দর 'ঠেকা' ও 'বোল' অটলের জানা ছিল। কোনও গায়কের সন্ধান পাইলে অটল সযত্নে তাহাকে দুই তিন দিন গৃহে রাখিয়া তাহার সেবা করিত, এবং তাহার সঙ্গে 'সঙ্গত' করিয়া কৃতার্থ হইত।

বলা বাহুল্য, অটল সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িল।

বড় বাবুই যত্ন করিয়া অটলের গৃহের সম্মুখে উল্লিখিত 'প্লাকার্ড'খানি টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। 'যোগিডিহি' একটা প্রকাণ্ড কারবারের স্থান। অনেক মাল চালান হয়। কাজেই অনেকে অটল বাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিত; ঐ তক্তাখানি দেখিয়া বাসা চিনিয়া লইত।

৩

জুন মাস। এ সময় যোগিডিহি রৌদ্রের তেজে ভট্টাকে তপ্ত হইয়া পড়ে; কারণ, এক ক্রোশের মধ্যেই আশে পাশে অনেকগুলি পাহাড়। অটল বসিয়া মালের হিসাব করিতেছিল। পার্শ্বে কুলীদিগের সর্দ্দার রামধন দাঁড়াইয়া অটলকে তালবৃন্ত দিয়া বাতাস করিতেছিল।

এমন সময় ৪০নং ডাউন প্যাসেঞ্জারে এক জন ভদ্রলোক ট্রেন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাণ্ড চশমা চোখে অটলের নামাঙ্কিত তক্তাখানি দেখিতে লাগিলেন। পরিধানে একখানা পাছাপেড়ে শাড়ী, মস্তকে টিকি ও গাত্রে একটা গেঞ্জির উপর 'ওপনব্রেষ্ট' আলপাকার কোট। দক্ষিণ হস্তে ক্যানবিসের একটা ছিদ্র-সংযুক্ত পুরাতন ব্যাগ ও বাম হস্তে ছাতা ও লাঠী। পদতলে চটীজুতা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রেলযাত্রীদিগের নির্দ্দিষ্ট শৌচাগারের দুর্গন্ধময় জলে তাহা ভিজিয়া যাওয়াতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। লোকটির চেহারা দেখিয়া খুব বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। বয়স প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। দাঁড়ি কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। লোকটির আপাদ কাঁচার চেহারাখানি ভাবিলেজনক ও বিশ্বাসকর।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেই তক্তাপোষের দিকে চাহিয়া থাকাতে এক জন কুলী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি মালবাবুকে খুঁজছেন?'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'বোধ হয়।'

কুলী তাঁহাকে অটল বাবুর আপিসে লইয়া গেল।

অটল তাঁহার পরিধৃত পাছাপেড়ে শাড়ীর দিকে কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে ভদ্রলোক অতিশয় লজ্জা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'সময়ের গুণে, ভায়া, সবই সময়ের গুণে। যখন ধুতি ছিল, অনবরত মরণা করেছি, আর ধোপা ব্যাটা বোডা দিয়ে কেচে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছে। এখন শেষদশায় অবলম্বন সহধর্ম্মিণীর বস্ত্র। তারই সঞ্চরশীলতার গুণে এই দুই একখানা পাছাপেড়ে শাড়ী বেরুচ্ছে, নচেৎ পাঁচ টাকা তের আনা জোড়ার কাপড় কি আমরা কিনতে পারি? জগতে স্ত্রী ছাড়া আর বান্ধব কেহই নাই, কেহই নাই।'

এই কথা বলিয়া ভদ্রলোক হুঁকা হস্তে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অটল স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া ছল-ছল-নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার স্ত্রীবিয়োগ কত দিন হয়েছে?'

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আমার নাম নকুড় চাটুর্য্যে, আমার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। যত দূর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস, আমরা সমসাময়িক। বোধ হয় মধুপানায় ভ্রূণ হয়ে থাকবে। আপনার বিবাহ হয় নাই?'

অটল। আজ্ঞে না।

নকুড় বাবু। ওঃ, তাই! বিবাহ হ'লে আপনি কখনও এ কথা বলতে পারতেন না। স্ত্রীবিয়োগ হ'লে কি তার পাছাপেড়ে শাড়ী পরা সম্ভব? ওটা যে ন্যস্ত স্মরণচিহ্ন! মনে করলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 'বাসাংসি জীর্ণানি' মনে আছে ত?

অটল। মাফ করবেন, আমি সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

নকুড় বাবু। আহা এমন দিব্যি ছেলে কোথাও দেখিনি!

তোমার নিবাস কোথায় ভায়া?

অটল। ফরিদপুর। জানকী বিশ্বাসের বংশ।

নকুড়। তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। টুনু বিশ্বাসকে জান ত?

তাঁর মেসমশাই আমার পিতার সমান ছিলেন। ব্যাবহারে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাচ্ছে, কিন্তু সেটা অনিবার্য্য।

অটল। আপনি নস্য লইয়া থাকেন?

নকুড়। নস্য নই না, কিন্তু তামাক খাই। তাতে কি আসে যায়? ভগবান বলেছেন, সকল ধর্ম্মই নানা পথ দিয়ে তাঁরই চরণতলে মিলিত হয়, নাক ও মুখ দুটো পথই এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে। তা বোধ হয় জানি।

অটল তৎক্ষণাৎ রামধনকে তামাক আনিতে বলিল। 'আমরা দু'জনেই ব্রাহ্মণ; তবে আপত্তি থাকে, আপনার হুঁকোতেই জল ফিরিয়ে দিতে পারি।'

অটল তৎক্ষণাৎ জল ফিরাইতে বলিল। তাহাতে নকুড় বাবু অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। অটলের কাণে সেটুকু গেল, এবং পায়ে তাল দিয়া দেখিল যে, আগন্তুক খুব লয়দোরস্ত।

তামাক খাওয়া শেষ হইলে অটল জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাসস্থান হবে কোথায়?'

নকুড় বাবু। এই যোগিড়িহির নিকটে এক জন ডাক্তার থাকেন, বোধ হয় তাঁকে জান। শ্রীনিবাস লাহিড়ী?

অটল। নাম শুনেছি। তিনি প্রাক্টিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। বোধ হয়, তাঁরা ব্রাহ্ম।

নকুড়। দীক্ষিত ব্রাহ্ম নয়, তবে ধরণ ধারণ সেই রকম বটে। তাঁর মেয়ে সরলা 'মেডিকেল কলেজে' পড়ে। সরলার মাসী চোরবাগানে থাকেন, আমার বাসস্থানও সেইখানে। তিনিই একখানা শাড়ী সরলাকে পাঠিয়েছেন, ডাক্তার বাবুকে চিঠি দিয়েছেন। আমি ঐজন্য কাল্‌ যাব। এবার কলকেতায় লা'র দর চড়ে গিয়েছে। ইচ্ছা যে, এখান হ'তে কিছু কিনে নির্জ্জাপুরে নিয়ে যাব।

অটল। আমি সুবিধা করে দে'ব। আমার হাতে অনেক কুটিয়াল মজুত। কিন্তু আপনি দেখ্‌ছি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ডাক্তারের বাড়ী খাওয়া দাওয়ার সুবিধা হবে কি?

নকুড়। তবে যাই কোথা?

অটল। আমার অতিথি হয়ে থাকুন। আপনি কোনও কষ্ট পাবেন না; অন্যলোকের উপকার করতে পারলে আমি কৃতার্থ হই।

৪

অটল আবার বলিল, 'আপনাকে ধ'রে রাখ্‌বার আর একটা বিশেষ মতলব আছে। আমি তব্‌লা শিখ্‌ছি, একটু হার্ম্মোনিয়ম ও এস্রাজ বাজাতে পারি। আপনি যে গুণ্‌ গুণ্‌ করে গাচ্ছিলেন, সেটা যেন স্বভাবতঃ তালের সঙ্গে মিশেছিল। 'খুব কস্‌রৎ না থাক্‌লে এমন হয় না।'

নকুড় বাবু। সে অনেকদিনকার কথা। কল্‌কেতায় সকলেই একটু না একটু তালের সঙ্গে গায়। আমি নোরাদ্‌ আলির নিকট গান শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম, পরে তিনি ম'রে গেলে রসুজানের কাছে টপ্পা শিখি। কিন্তু কি জান ভায়া, হরিনামের কাছে কিছুই না, তাই রাম খিত্তিরের মত নিজেই গান রচনা করে' তাল বসিয়ে নিই। আমি শুনে বড় সুখী হ'লেম। সন্ধ্যা বেলায় দু'জনে বস'ব এখন। সমজদার আছে ত?

অটল। বড় বাবু বেশ বুঝেন। আর মির্জাপুরী দুই এক জন জয়স্‌ওয়ালও মধ্যে মধ্যে আসে। তার মধ্যে এক জন সেতার বাজায় ভাল। সে মস্ত মহাজন।

নকুড় বাবু অতিরিক্ত আশানহকারে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং পাছে অহঙ্কার প্রবল হইয়া পড়ে, তন্নিবারণার্থ 'হরি' ধ্বনি করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জগতের মঙ্গলকামনা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শেষে বলিলেন, 'ভায়া, অনেক কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ হয়। ভগবানের সৃষ্টির মাত্রা যত বেশী, পালনের বেলা তত নয়, অতএব ঘন ঘন সংহার করিয়া দশ দিক রক্ষা করতে হয়। পালন করা বড় শক্ত কাজ। আমার মোটে দুটি ছেলে ও একটী মেয়ে; তাদের লালন পালন করতে ও বিবাহের খরচ যোগাড় করতে আমাকে অহরহঃ দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হ'চ্ছে। মনে কর, এই বিশ্ব পালন করতে গিয়ে ভগবানকে কি ওজনে ঘুরতে হয়। এত বন্‌ বন্‌ ক'রে ঘুরেন যে, সেই জন্য তাঁকে আমরা দেখ তে পাইনে। কি লীলাই তাঁর!'

ইহা বলিয়া নকুড় বাবু চক্ষু উল্টাইয়া মুদ্রিত করিলেন। অটল ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া কলিকার ফুৎকার দিতে লাগিল। ইত্যবসরে রামধন নকুড় বাবুর জন্য এক জোড়া উড়িষ্যার চটী লইয়া আসিল।

নকুড়। পূর্ব্বজন্মে তপস্যা না করলে তোমার মত মহাজনের ঘরে অতিথি হওয়া ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান করুন, তুমি সুখী হও। আমি প্রাণপণে তার

অটল ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে পুলকিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং সাদরে তাঁহাকে গৃহে লইয়া অভ্যর্থনা করিল।

নকুড় বাবু একমনে গৃহের চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন; পরে ব্যাগ হইতে একখানা সাদা ধুতি লইয়া পরিধান করিলেন।

জলযোগ শেষ হইলে নকুড় বাবু বলিলেন, 'আমি একবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি; নচেৎ অন্যায় হয়। ঠিক সন্ধ্যার সময় আস্‌ব এখন। তুমি যদি পার, একটা তানপুরোর যোগাড় ক'রে রেখ। লোকজনকে আজ ডেকে কাজ নেই। গলা পরিষ্কার হয়ে গেলে কাল্ তাদের শোনাব।'

অটল। বেশ, তাই হবে।

নকুড় বাবু। আচ্ছা, এখন আসি। তোমার সৌজন্য ও আতিথ্যসৎকার অত বাড়িও না, আমি তাতে লজ্জিত হই। তোমার গৌরব বাড়ে, কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতার উপর হানা পড়ে, আমি গরীব, এ ঋণ পরিশোধ করতে পার্‌ব না জান?

অটলের চক্ষুতে জল আসিল। তাহা দেখিয়া নকুড় বাবু প্রীত হইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া অটল এস্রাজে দেশ রাগিণী আলাপ করিতেছিল। অল্প একটু মেঘলা হইয়া বৃষ্টি পড়িয়া গিয়াছে। অন্য দিন অপেক্ষা আজ অনেকটা স্নিগ্ধ ও শীতল। অটল তন্ময় হইয়া বাজাইতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা।

এমন সময় নকুড় বাবু ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন।

অটল চট্ করিয়া এস্রাজটি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, দ্বার খুলিয়া দিল। নকুড় বাবুর সঙ্গে আরও দুইটি লোক ছিল, এক জন বৃদ্ধ, ও আর একটী যুবতী। অটল অপ্রতিভের ন্যায় তাকাইতে লাগিল।

নকুড় বাবু বলিলেন, 'এঁদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিই। ইনিই ডাক্তার লাহিড়ী মহাশয়, এবং ইনি তাঁহার কন্যা সরলা দেবী।

অটল করযোড়ে নমস্কার করিল, তাহাতে ডাক্তার মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সরলা দেবীও অটলের মত নমস্কার করিল।

নকুড় বাবু হর্ষচিত্ত হইয়া বলিলেন, 'বেশ! এঁরা অনেকক্ষণ ধ'রে বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার এস্রাজ শুন্‌ছিলেন।'

অটল লজ্জায় অধীর হইয়া বলিল, 'আপনারা না জানি কতই বিরক্ত হয়েছেন। আমি কেবল শিখ্‌ছি মাত্র।'

ডাক্তার। আমি যদিও রাগ রাগিণী বুঝিনে, কিন্তু সরলা, একটু গান গাইতে পারে, তার চমৎকার লেগেছিল।

সরলা বলিল, 'খুব মিষ্টি হাত। এমন চমৎকার আলাপ আমি খুব কম শুনেছি।'

সরলার মুখে প্রশংসা শুনিয়া অটলের ভয় হইল। অটল প্রথমে মনে করিল, 'নিশ্চয় আমাকে ঠাট্টা কচ্ছে'ন' কিন্তু সরলার সরল মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা মনে লাগিল না।

অটল। আমার ওস্তাদ গয়ার কানাইলাল চৌড়িব এক জন সাগ্‌রেৎ। তিনি ঢাকায় থাকেন। তাঁর বাজনায় চং বড় চমৎকার।

সরলা বলিল, 'শুনলে দুঃখ হয়।' অটল মনে মনে ভাবিল, 'এর মানে কি? দুঃখ হবে কেন? তবে কি সত্য সত্যই ঠাট্টা?'

৫

অটল বলিল, 'আপনারা একটু বসবেন না?' সরলা পিতাকে বলিল, 'একটু ষ্টেশনের দিকে বেড়িয়ে আসি।' তাহাতে অটল সকলকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেল।

মালগুদামের সম্মুখে অটল বাবুর নামাঙ্কিত তক্তা দেখিয়া সরলা জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা আপনারই তৈরারী?' ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'আগে আমি এটা লক্ষ্য করে দেখিনি। এটা একটু নূতন ধরণের।'

অটলের ভীতি ক্রমাগত অধিক ভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অটল শুষ্কমুখে বলিল, 'বড় বাবুর ইচ্ছাতে এটা হয়েছে। আমি বলেছিলুম যে, এটা কিম্ভূতকিমাকার, তা তিনি শুনলেন না।'

ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'এতে লজ্জার কথা কিছুই নাই। আমার বাড়ীর সম্মুখেও একখানা তক্তা আছে, তবে তাতে 'শ্রীহরি শরণং' টুকু নাই। আমার বোধ হয় এতে আরও সুন্দর হয়েছে।'

নকুড় বাবু। এটা ঐতিহাসিক রকম। এই রকম জিনিস লোপ পায় না। অশোক নিজের প্রস্তরস্তম্ভে ঐ রকম কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। সবই লোপ পায়, কিন্তু হরিনাম লোপ পায় না, আর সেই নামের সঙ্গে যে নাম থাকে, সে নামটিও ইতিহাসে থেকে যায়।

কথা শুনিয়া অটলের নস্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পাছে বেয়াদবী হয়, ইহা মনে করিয়া নস্যের কৌটা বাহির করিয়া আবার পকেটে

রাখিয়া দিল। ডাক্তার বাবু আড়নয়নে তাহা দেখিয়া খুসী হইলেন। নকুড় বাবু বলিলেন, 'বেশ্।'

ইত্যবসরে সরলা মালগুদামের সম্মুখের খুপ্‌রাকার মালের বস্তাগুলি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এগুলো কি?'

অটল। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে। লা', আলু, লবণ, ডাইল, অনেক রকম মশ্‌লা, আর ঐ বাক্সগুলোতে ঘি, ও তেলের টিন, কোনটাতে মণিহারী দোকানের জিনিস। দিনান্তে প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি 'ওয়াগন্' আসে, তার মধ্যে কয়লাই বেশী। এর সবগুলোর হিসাব আমাকে লিখ্‌তে হয়, দেরী হ'লে 'ডিমরেজে'র হিসাব কর্ত্তে হয়। একটু গোলমাল হবার যো নাই। এ ত কেবল আমদানী। রপ্তানীর সময় আরও হাঙ্গামা। অনেক গরীব লোক আসে, তারা 'ডিমরেজে'র কথা শুন্‌লে কেঁদে ফেলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটু বিশ্রামের সময় থাকে না।

সরলা। শুন্‌লে দুঃখ হয়। আমি খাতা পত্র দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। আমাদের কলেজে যত রোগীর চিকিৎসা হয়, তাদের কথা খাতার 'নোট্' করা থাকে। অনেকে বাঁচে না, তাদের স্ত্রী পুত্র এসে কাঁদে, আমরা খাতা দেখ্‌লেই সব বুঝ্‌তে পারি। তখন বড় দুঃখ হয়।

অটল ভাবিল, 'এঁর বুক একটা মালগুদামের মত দুঃখে ভরা।'

নকুড় বাবু। দিদিমণি! তার কি সন্দেহ আছে? তোমার দিদিমা (নকুড় বাবুর স্ত্রী) যে খাতাগুলি রাখেন, সেগুলি আমি মধ্যে মধ্যে পড়ি। কত বচ্ছরের খাতা আছে, তার সংখ্যা নাই। কোনটাতেই তারিখ পাওয়া যায় না, অথচ ধোপার কাপড়ের সংখ্যা, বাজারখরচ, ওষুধের দাম, জনার্দ্দন স্যাকরার দেনা, প্রত্যেকের উপর চোখ পড়লেই প্রাণ কেঁদে ওঠে। গিন্নীর খাতা অনেকটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত। পরিবারের নাড়ী নক্ষত্র, এমন কি, দেশের অবস্থাও তার মধ্যে বুঝা যায়।

সরলা হাসিল। অটল মনে করিল, কি অপূর্ব্ব মিষ্ট হাসি! সরলা দেখিতে যে সুন্দরী ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য হাসিতে ও কথাতে প্রকাশ পাইত। সরলার কথা আরও শুনিবার জন্য অটল ব্যগ্র হইয়া পড়িল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সরলা একেবারে কথা বন্ধ করিয়া বলিল, 'আমরা এখন যাই।'

এমন সময় বড়বাবু (ষ্টেশনমাষ্টার) সেখানে উপস্থিত হইয়া, লাহিড়ী

মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তার বাবু, আমাদের বাড়ী একবার যেতে হবে। আমার মেয়েটার ভয়ানক হাত কেটে গেছে।'

বড় বাবুর সঙ্গে ডাক্তারের অনেক দিনের পরিচয়। সরলাও বড় বাবুকে জানিত। অনেক দিন গাড়ীতে ভিড় হইলে, বড় বাবু তাঁহাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। ইহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়া গিয়াছিল। সরলা যদিও বড় বাবুর বাটীতে যায় নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যার অসুখ শুনিয়া তাহার যাইতে ইচ্ছা হইল।

বড় বাবুর কন্যা মনোরমা খুব ছোট নয়। বিবাহযোগ্যা বলিলেও চলে। খুব সুন্দরী, তায় সন্দেহ নাই। প্রবাদ যে, অটল বাবুর সঙ্গে মনোরমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল।

অটল বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল না, তাহাতে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অটল বাবু কোথায় গেলেন?'

নকুড় বাবু বলিলেন, 'অটলের একটু লজ্জা বেশী। ঐ মেয়েটির সঙ্গে অটল বাবুর বিবাহের প্রস্তাব হচ্ছে।'

মনোরমা শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "না!"

তাহাতে সকলে একটু হাসিলেন। সরলা বলিল, 'দিব্যি মেয়েটি, অটল বাবুর সঙ্গে বেশ মানাবে।'

এই প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সরলা মনোরমার অঙ্গুলি পরীক্ষা করিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'বেশী কাটে নাই, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেই চলবে।' সরলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। ক্রমে মনোরমার সঙ্গে সরলার খুব ভাব হইয়া গেল।

মনোরমা। তুমি আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে এস।

সরলা ভাবগতিকে বুঝিতে পারিল যে, মনোরমার মা নাই। বালিকার যত্ন করিবার কেহই ছিল না। ইতস্ততঃ চাহিয়া সরলা বলিল, "আচ্ছা।"

৬

নকুড় বাবু গাহিতেছিলেন; অটল বাজাইতেছিল।

শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া বাহবা দিতে লাগিল। অটল প্রাণপণে এবং অতি সাবধানে বাজাইল। খেয়াল, টপ্পা, কোনটারই 'ঠেকা'য় একবারও হটিল না; নকুড় বাবু বলিলেন, 'সাবাস্!'

সকলে চলিয়া গেলে অটল নকুড় বাবুর পদধূলি লইয়া বলিল, 'আপনার কৃপায় বোধ হয় আমার কোন ভুলও হয় নাই।'

নকুড়। মোটেই না। ভায়া, তোমার মত 'ভবিষ্যৎ' ছেলে পাওয়া সুকর। একটা কথা বলি, তোমার যেমন লম্বদোরস্ত হাত, শীঘ্র দারপরিগ্রহ করা উচিত।

অটল লজ্জায় মুখ অবনত করাতে নকুড় বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'এতে আর লজ্জা কি, তুমি পুরুষ মানুষ। আমাকে সব মনের কথা খুলে বল। অবশ্য, তুমি এক জন সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাও—তাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, সকলেই চায়, কিন্তু সকলের কপালে জুটে উঠে না। তোমার অদৃষ্ট ভাল, বড় বাবুর মেয়েটি খুব সুন্দরী।'

অটলের সাহস ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে সে বলিল, 'ও ভাল লেখা পড়া জানে না, গান জানে না।'

নকুড় বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিলেন, এবং বলিলেন, 'বেশ! মনে কর, আমাদের সরলা খুব লেখা পড়া জানে, গানের ওস্তাদ। উহাকে মনে ধরিবে কি?'

অটল। আমাকে উনি পছন্দ করবেন্ কেন? এরকম আশা করা বৃথা।

নকুড়। আশার সঞ্চার হতে কতক্ষণ? একবার পরখ্ করে নিলেই হয়। কোর্টশিপের কথা শুনেছ ত? আমাদের দেখে এটা ক্রমে বিলক্ষণ প্রচারিত হবে, এবং মানব-চরিত্র তাতে ক্রমে ফুটে উঠবে। প্রেম সম্বন্ধে আমরা এখনও জড় পদার্থের মত। কেবল ঘটকালীর উপর নির্ভর!

অটল। কি ক'রে তা সম্ভব হয়?

নকুড়। আরম্ভ ক'রে দেখ। এ সম্বন্ধে ডাক্তার বাবু তাঁর কন্যাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন তোমার হাতযশ।

অটলের মনে নকুড় বাবুর সুন্দর প্রস্তাবনা গাঁথিয়া গেল। সে ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল। উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। আহারান্তে অটল বলিল, 'নকুড়দা, আমি এ বিষয়ে বড় বেয়াকুফ, কি বলতে কি বলে ফেলব, তিনি চ'টে যাবেন।'

নকুড়। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের, এমন কি, ভগবানেরও বেয়াকুফের দিকেই টান বেশী হয়। এ সম্বন্ধে কোনও শিক্ষার দরকার নাই। প্রাণের কথা খুলে বল্‌বে, তাতে যা কপালে থাকে, তাই হবে। এই যে তবলায় বোল্ শিখেছিলে, তা কি গোড়াতেই লয়ে বাজাতে পারতে? ক্রমে হাত খুলে যায়।

রাত্রিকালে অটলের নিদ্রা হইল না। ক্রমাগত কোর্টশিপের কথা চিন্তা

করিয়া মাথা গরম হইয়া গেল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া একবার তবলাতে চাঁটী মারিল, একবার এস্রাজ লইয়া দুই একটা 'গিড়' টানিয়া লইল। নকুড় বাবু শয্যায় শয়ান হইবা নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শেষরাত্রিতে অটল যোড়করে অন্তরীক্ষে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিল, 'হে অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের সহায়! আমার বুদ্ধি নাই, তবে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, আপনি সহায় হউন! আর গতি নাই।'

নিদ্রা হইতে উঠিতে অটলের বেলা আটটা বাজিয়াছিল। সে দিন খুব মনোযোগের সহিত খাতাপত্র লিখিয়া সন্ধ্যাকালে নকুড় বাবুকে বলিল, 'নকুড়দা! আমাকে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে নিয়ে চলুন।'

নকুড় বাবু বলিলেন, 'বেশ!'

ডাক্তার বাবুর বাটী প্রায় এক মাইল দূরে। ডাক্তার বাবু 'ইজিচেয়ারে' বিশ্রাম করিতেছিলেন, এবং সরমা একটা হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে গান গাহিতেছিল।

নকুড় বাবু দূর হইতেই বলিলেন, 'শুনতে পাচ্ছ ত?'

অটল। চমৎকার!

নকুড়। হঠাৎ কোনও জিনিসে মতামত-প্রকাশ ঠিক নয়। অবলার গান গাওয়া খুব অভ্যাস, কিন্তু তাল ঠিক হয় না।

অটলকে দেখিয়া সরলা গান থামাইয়া দিল। নকুড় বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'চলুক, এতে আর লজ্জা কি?' ডাক্তার বাবু উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, 'চলবে বৈ কি। সরলার গানের রাতিক খুব। ওর লজ্জা টজ্জা বড় নাই।'

নকুড় বাবু। তবে অটল তাল্লা লয়দার লোক, সরমা এখন তালে গাইতে শিখে নাই, সেই জন্য একটু ইতস্ততঃ হ'তে পারে। কি বল দিদিমণি?

সরলা। আমি এ পর্য্যন্ত তাল কি বুঝতে পারলুম না। যদি কেউ বুঝিয়ে দেয়, তবে—

অটল। তাল অতি সোজা ব্যাপার—এই যেমন কাওয়ালী। 'তাধিন্ ধিন্, তাধিন্ ধিন্, তাম ধিন্, আর এই ফাঁক্', ইহা বলিয়া অটল দক্ষিণ করতল বিস্তার করিয়া ফাঁকের ঘর দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, লম্ফ তালেরও লয় বেশী কিছু না, যেমন মনে করুন সুরফাক্তা—'ধা ধেড়ে নাক ধি, ধেড়ে নাক ধদ্দি ধেড়ে নাক্।' অভ্যাস, কেবল অভ্যাস। আপনি গাচ্ছিলেন—

'ও দেখা নয় আনন্দধাম—'

ওটা তেওরা। তেওরা ধামারের অর্দ্ধেক মাত্রা। ধামারটা একটু কঠিন, কিন্তু তেওরার ছুনো করে ফেল্লেই ল্যাঠা চুকে যায়। ইহা বলিয়া অটল তুড়ি দিয়া তেওরার তাল দেখাইতে লাগিল।

নকুড় বাবু। আচ্ছা, তুমি আবার গান ধর, অটল তুড়ি দিয়া দেখুক।

সরলা। ওটা দুঃখের গান। তালের শব্দ হলে মন কেমন করবে।

নকুড় বাবু। তা করুক্ না। এই যে আমাদের নিমতলা দিয়ে যাবার সময় সকলে তাদো তালে পা ফেলে যায়। জীব্‌মাত্র সব তালের ভক্ত, বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষ মরণের সময়ই তালের চর্চ্চা বেশী করেছিল। কোনও নতুন প্রস্তাব হলেই তারা তাল বেঁধে দেখে, যদি তালে না মেলে, তবে টেঁকে না।

সকলের উৎসাহ দেখিয়া সরলা বলিল, 'আচ্ছা, আমি ওঁর মনে ভাবে গাইতে চেষ্টা করব।'

৭

সরলার শুশ্রূষায় ও ঔষধে মনোরমার হাত ভাল হইয়া গেল, কিন্তু সেই হাত কাটার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস ছিল, তাহার দাগ মুছিয়া যায় নাই। মনোরমা লুকাইয়া অটলের জানালার পার্শ্বে এস্রাজ শুনিতে গিয়াছিল, তাহাতে অটল বলিয়াছিল, 'মনোরমা, এস।', ইহাতে মনোরমা দৌড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, এবং রেলের লাইনের তার বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। হস্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত বাহির হইলে মনোরমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, 'আর অটল বাবুর বাড়ীর দিকে যাব না।' অটলের ইচ্ছা হইয়াছিল, মনোরমাকে তুলিয়া লইয়া আসে, কিন্তু মনের সাধ মনেতেই ছিল। কারণ, অনেক লোকের সম্মুখে সেটা লজ্জাকর ব্যাপার!

তাই অটল গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় করুণস্বরে আবার এস্রাজ বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় সরলা, ডাক্তার বাবু ও নকুড় বাবু সকলে—সন্ধ্যাকালে—আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই গোপনীয় ঘটনাটুকুর সন্ধান সরলা মনোরমার নিকট বাহির করিয়া লইয়াছিল। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু বুদ্ধিমতী সরলার নিকট তাহা সঙ্গীন। তখন সরলা অর্থহীন ভাষা কথায় মনোরমাকে অনেক নূতন ও পুরাতন ঘটনা বলিত, এবং তাহার মধ্যে সরলা খরজের তারের মত একটা সুর পাইত। সেটা মধ্যে মধ্যে সপ্তমী সুর দিয়া ধ্বনিত করিয়া সরলা দেখিতে পাইয়াছিল যে, মনোরমা সেই সুর অবলম্বন করিয়া অটলের হৃদয়ের অনেকটা নিকটে গিয়াছে।

তাই সরলা কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না। সে মধ্যে মধ্যে দিনের বেলা মনোরমাকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া গান শিখাইত। ক্রমে উভয়ের গলার সুরের মধ্যে কোনও পার্থক্য কেহ বুঝিতে পারিত না। এমন কি, এক দিন নকুড় বাবু দূর হইতে মনোরমার গান শুনিয়া সরলারই গান মনে করিয়াছিলেন।

এ সংবাদটা অটল বাবুকে কেহ দেয় নাই। দিবাভাগে অটল মালগুদামের হিসাব লইয়া ব্যাপৃত থাকিত। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে গিয়া সরলার তাল 'দোরস্ত' করিয়া দিত।

যে দিন কিন্তু অটল একটু সকালে হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ডাক্তার বাবুর বাটীর দিকে গেল। মনোরমা সরলার হার্ম্মোনিয়ম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছিল। দূর হইতে অটল তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং একটা আম্র বৃক্ষের নীচে বসিয়া নস্য লইতে লাগিল।

সরলা মনোরমাকে গৃহে লুকাইয়া রাখিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিল। অটল সরলাকে দেখিয়া বলিল, 'আপনার গলা দূর থেকে আজ আমার এত মিষ্টি লেগেছে যে, আমি এখানেই বসে পড়েছি।'

সরলা। আজ থেকে আমি দূরেই থাকব।

অটল। না। আমার ইচ্ছা আপনি খুব নিকটে থাকেন। বোধ হয়, বুঝতে পেরেছিলেন, নয় ত দৌড়ে আসবেন কেন?

অটল মনে করিল, কথাটা খুব প্রণয়ব্যঞ্জক হইয়াছে, অতএব অতিশয় লজ্জিত হইল।

সরলা। আপনি পাছে মূর্চ্ছা যান সেই ভয়ে।

এই কথার সঙ্গে এমন একটা ভাব ছিল, যাহাতে অটলের মনে সাহসের সঞ্চার হইল। কেবল সাহস নয়, অনেকটা আশারও সূত্রপাত বলিয়া বোধ হইল। অটলের মাথার মধ্যে যাহা ঘুরিতেছিল, তাহার গতি অতিশয় ক্ষিপ্র হইয়া পড়িল। অন্য কেহ হইলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইত, কিন্তু অটলের মাথা ঘোরার ব্যায়রাম ছিল না; বিশেষতঃ, মালগুদামের খাতা পত্রের কূট হিসাব প্রত্যহ অভ্যস্ত থাকাতে তাহার মস্তিষ্ক সাধারণ প্রণয়ী অপেক্ষা অনেক সবল ছিল।

সুতরাং অটল হঠাৎ বৃক্ষতলে দাঁড়াইল, এবং স্বীয় উত্তরীয় স্কন্ধ হইতে লইয়া মাথায় পঞ্জাবীদিগের ন্যায় একটা পাগড়ী বাঁধিল। কিয়ৎক্ষণ পায়চারী করিয়া

অটল বলিল, 'আমার অনেকগুলো কথা মন থেকে মুখের মধ্যে ছুটছে, আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত বলি।'

সরলা মনে মনে জানিল যে, কথাগুলি নিশ্চয় মনোরমার সম্বন্ধে। তাই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মনের কথা আমাকে বলিবেন, সে ত আমার অতিশয় স্পর্দ্ধার ও গৌরবের বিষয়।'

অটল। সে সব কথা ভালবাসার কথা, প্রণয়ের কথা। ভালবাসার কথা মুখে বলা বড় শক্ত, তাতে অনেক সময় এত হৃৎকম্প হয়ে পড়ে যে, কথাগুলো লজ্জাকর, এমন কি—

সরলা। যে নিজে প্রণয়িনীকে বুঝিয়ে বলতে পারে না, সে অন্য কোনও লোক দিয়ে কিংবা চিঠি লিখে চেষ্টা করতে পারে। কেউ কেউ চিঠি লেখার চেয়ে প্রণয়িনীর কোনও সখী কিংবা বন্ধুকে কথাগুলো ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে থাকেন, এমন শুনেছি।

অটল। সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে। প্রথমে আমার জিজ্ঞাস্য যে, বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? আপনি বোধ হয় দুটো-একটা কোর্টশিপ্ দেখেছেন?

সরলা। ঠিক দেখি নাই, তবে শুনেছি।

অটল। আমি ত নভেলে পড়েছি মাত্র, তবে আমার বোধ হয়, যদি কোনও লোক গান আরম্ভ করে, এবং আর একটা লোক মনে মনে তার তাল খুঁজে বেড়ায়, এবং সেইটে নির্ণয় করবার জন্য ইতস্ততঃ অনেক রকম চেষ্টা করে' দেখে, কোর্টশিপ সম্ভবতঃ অনেকটা সেই রকম।

সরলা। খুব সম্ভব। কিন্তু যেমন একটা লোক হঠাৎ গান আরম্ভ করলে তার তাল ঠিক করা শক্ত, এমন কি, তার মধ্যে তাল আছে কি না, বোঝা যায় না, সেই রকম এটারও মধ্যে। সেই জন্য গায়কেরা বলে, 'আপনি তাল আরম্ভ করুন, আমি ধরে নেব অখন।'

অটল। আপনি ঠিক ঠাউরেছেন। সেই জন্য আপনার পরামর্শ না নিয়ে আমি মনের কথা বলব না। আপনি প্রথমতঃ ভেবে দেখুন যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়টুকু বরাবর থাকে না কেন?

৮

সরলা। স্বামী নিজের ধান্দায় থাকে, তাই সঙ্গে প্রণয়টুকুও চলে' যায়। স্ত্রীকে কেবল গেটে মরতে হয়।

অটল। মনে করুন, যদি আমি ধোপার হিসাবপত্র রাখি, বাজার-খরচটুকু বিশেষ রকম সাবধানে চালাই, ছেলেপুলেদের অহরহঃ যত্ন করি, আর স্ত্রীকে তার মনের মত যা খুসী তা করতে দিই, তা হলে প্রণয়টুকু বজায় থাকে কি না?

সরলা। খুব সম্ভব। আর একটা কথা, কিছু লুকিয়ে রাখা ভাল নয়।

অটল। আমি প্রথম প্রথম মালগুদামের টাকা চুরী করতে ছাড়তুম না। কেউ টের পেত না, কিন্তু ভগবানকে ত লুকানো মুস্কিল, তাই ভয়ে ছেড়ে দিইছি।

সরলা। শুনে দুঃখ হয়। আমার এক জন বন্ধু ছিল, সে খড়া কাটতে ভালবাসত। বিয়ে হবার পর সে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে স্বামীর কান্ কাটতে গিয়েছিল, শেষে ভয়ে কলেজ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

অটল। আপনি কি খড়া কাটেন?

সরলা। তা না হলে, ডাক্তারী শিখব কি করে? মনে করুন, ভবিষ্যতে এই করে' অন্ন সঞ্চয় করতে হবে। আমার ঘরে একটা মানুষের কঙ্কাল আছে। যখন সে জিয়ন্ত ছিল, স্ত্রীর উপর সন্দেহ করে' একটা লোককে খুন করেছিল, তার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করে। তার মাথাটা দেখে বোধ হয়, বেশ সে একটু দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কিন্তু মানুষের কি পরিণাম!

অটল। আমার ও সব গোলমাল কিছু নেই। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী; আমার স্ত্রী যদি উকীল, কিংবা ডাক্তার, কিংবা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ হয়, তবে আমি খুব খুসী হই।

অটল ইহা বলিয়া খুব লজ্জিত হইল। মনে করিল, সরলা এবার তার মনের ভাব অনেকটা বুঝিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সরলার প্রেমের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যত দূর, অটলেরও সেই রকম। সরলা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—'স্ত্রী যদি স্বাধীনতা না চায়, তবে জোর করিয়া তাহাকে ঐ সব ব্যবসায়ে নিযুক্ত করবার কোনও দরকার দেখা যায় না। যারা কোনও ব্যবসা অবলম্বন করে, তাদের মধ্যে অনেকে কুমারীই থাকে। বিলাতে এ রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।'

অটল। আপনার বোধ হয় সে রকম বিশেষ কোনও ইচ্ছা নাই।

সরলা। আপনার সে কথা জেনে দরকার কি?

অটল। আমার বিশেষ দরকার আছে। মনে করুন, আপনি যদি

আমার জন্য একটি পাত্রীর চেষ্টা করেন, তবে আপনার জন্য একটা পাত্র চেষ্টা করা সম্বন্ধে আমারও দাবী দাওয়া থাকতে পারে। বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেক দরকার হয়।

সরলা মুখ নত করিয়া রহিল।

অটল। মনে করুন, আপনি যদি আমার জন্য পাত্রী খুঁজিয়া না পান, আমিও আপনাকে বিরক্ত করিব না।

সরলা। আমার জন্য আপনার পাত্র খুঁজতে হবে না। আমি চিরকালই 'সার্জ্জারী' করব, ওষুধ দেব, চিকিৎসার জন্য ঘুরে বেড়াব।

অটল। যা খুসী করুন না, আপনার স্বামীই আপনার এক নম্বর 'পেশেণ্ট' হ'তে পারে। চিররুগ্ন একটা স্বামী থাকলে তাকে রোজ ওষুধ দিতে পারেন, হাত পা কেটে দিতে পারেন। এমন একটা মস্ত 'একস্‌পেরিমেণ্টে'র ক্ষেত্র আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তার হ'তে গেলে প্রথমে দুটো একটা রোগীকে মারতে হয়, সে ধাক্কাটা স্বামীর উপর দিয়ে চালিয়ে নিলে মহাপুণ্য।

সরলা। আপনি আশ্চর্য্য রকমের লোক।

অটল। আমি এক জন বদ্ধ রোগী। মশার কামড় পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারি না। খিদে একেবারে হয় না। অনিদ্রা নিত্যাহ। দিন রাত্তির নস্য নেওয়া সত্ত্বেও মাথা ধরা ছাড়ে না। এত রোগ সত্ত্বেও আমি মেসোপোটেমিয়ার রেলওয়ের 'ষ্টোরকিপার' হয়ে যাব ঠিক করেছি। যদি সেখানে হাত পা কাটা পড়ে, তবে সে জন 'নর্সে'র দরকার। এই সব ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে শেষে দারপরিগ্রহ করব মনে করেছি, নচেৎ আর কোনও গতি নাই। আরও ভেবে দেখেছি, আমার এই রোগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে, তাতে ডাক্তার ভিন্ন গতি নেই। আমার বাপের মস্ত বিষয় আছে, সেটা বাজে কতকগুলো ডাক্তারের হাতে বিলিয়ে না দিয়ে, একেবারে স্ত্রীর নামে লিখে দেব—মনে করেছি। সেই চিকিৎসাপত্র করবে। বাঁচি যদি তার হাতে। অন্য ডাক্তারকে ডাকব না, সম্বল। এর উপরন্তু যদি সে আমাকে ভালবাসে, তবে সোনায় সোহাগা।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অটল কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় নস্য লইল, এবং খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইল, এবং তথা হইতে ঘুরিয়া আবার বৃক্ষতলে আসিল, কিন্তু ভয়ে সরলার দিকে তাকাইয়া দেখিল না; কারণ, এবার অটল মনে করিয়াছিল যে, সরলা তাহার মনের কথা ঠিক্ বুঝিবে, এবং সরলাও তাহার মনের কথা বলিবে।

কিন্তু সরলা তাহার মনের কথা বলিল না, সে দ্রুতগতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া গেল। অটল তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'সরলা! আমার উপর রাগ করিও না।'

সরলা হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল 'না', কিন্তু চলিয়া গেল। অটল অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আমি তোমাকে ভালবাসি। সেটা যেন মনে থাকে।'

৯

অটল মালগুদামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, নকুড় বাবু তাহার জন্যে বসিয়া আছেন। নকুড় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভায়া! খবর কি?'

অটল। 'খুব সক্‌সেস্‌ফুল্'। আমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, ডাক্তার ছাড়া আমি বিবাহ কর্‌ব না। তবে ভালবাসার কথাটা সে চ'লে যাবার সময় চেঁচিয়ে ব'লে দিইছি। ভালবাসার কথা হঠাৎ কোনও স্ত্রীলোককে ব'লে ফেলা আমার মতে ঠিক নয়। সে কেঁদে ফেল্‌তে পারে, কিংবা মূর্চ্ছা যেতে পারে। আমি সে রকম দেখ্‌লে বড় ভয় পাই। যা হয় সে ঘরে গিয়ে করবে।'

নকুড় বাবু ইহাতে খুব প্রীত হইয়া বলিলেন, 'মন্দ হয় নাই, তবে ভালবাসার কথা প্রথম দিন না বল্‌লে ভাল হ'ত। এতে আমার বোধ হচ্ছে, 'কেস্'টা খারাপ হয়ে যাবে।'

অটল। তাতে আমার কোনও দোষ থাকবে না। সম্মুখে বলার চেয়ে, ভালবাসার কথা পশ্চাতে প্রকাশ করাই নীতিসঙ্গত। একেবারে উল্লেখ না করা কেবল সময় নষ্ট। আমরা যখন 'ডি. টি. এস্'কে বাল কমতির কৈফিয়ৎ দি, তখন শেষটায় বুঝিয়ে দিই যে, আমরা তাঁর নিতান্ত অনুগত চাকর। প্রথমে সেটা বলি না।

নকুড় বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আচ্ছা, ক্রমে দেখা যাবে। এখন একটু তবলা বাজিয়ে নাও।'

অটল খুব স্ফূর্ত্তির সহিত সঙ্গত করিতে বসিল, এবং তাহার 'কোর্টশিপে'র কথা যতই স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল, ততই তবলার নূতন নূতন বোল বাহির হইতে আরম্ভ হইল। নকুড় বাবু অনেকবার হরিনাম-উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'শেষ রক্ষা হ'লে হয়।'

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন পত্রবাহক নকুড় বাবুর নিকট একখানা পত্র লইয়া আসিল। পত্রের মর্ম্ম যে, ডাক্তার বাবু সন্ধ্যাকালে অটল বাবু ও নকুড় বাবুকে চা খাইতে ও জলযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নকুড় বাবু। ভায়া, তবে বোধ হয় অনেকটা আশা আছে। প্রস্তুত হও।

অটল। আপনি সহায় থাকিলে কোনও ভয় নাই। নকুড় বাবু তাহাতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং বলিলেন, 'ভায়া, আমি তোমাকে বড় ভালবেসেছি। তোমার রীতিনীতি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আমি যদিও নিতান্ত বড়লোক নই, তবু তোমার স্ত্রীকে প্রায় হাজার টাকা গহনা দিয়ে মুখ দেখ্‌ব, সেটা নিশ্চয়।'

অটল আশ্চর্য্য হইয়া মনে করিল, 'নকুড় দাদা খুব চাপা লোক, নিশ্চয় তাঁর অনেক টাকা আছে, নচেৎ কয় দিনের আলাপেই আমার উপর এত অনুগ্রহ!'

অতএব নকুড় বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, 'তবে চলুন, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমাদের প্রায় এক ক্রোশ হাঁটতে হবে।'

ডাক্তার বাবুর বাটীতে সকলে একত্রে জলযোগ ও চা' শেষ করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সরলা বলিল, 'অটল বাবু, আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব, আসুন।'

অটল কম্পিতহৃদয়ে সরলার অনুসরণ করিল। সরলা অটলকে একটা সুসজ্জিত কামরায় লইয়া গিয়া বলিল, 'এই আমার 'ষ্টডি-রুম'। আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে বসে ডাক্তারী পুঁথির পাতা উল্টাই, শেষে ঘুমিয়ে পড়ি।'

অটল। ঐ কঙ্কালটা বিষম বিভীষিকা। আমার কখনও এমন ঘরে ঘুমিয়ে পড়্‌তে সাহস হয় না।

সরলা। আপনি সে দিন ডাক্তারীর কথা উত্থাপন করেছিলেন, তাই এ ঘরে আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনি জীবনের জন্য ব্যাকুল, আমি মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল! মানুষ কত কষ্ট পেয়ে মরে, তা আমি দিন রাত ভাবি। সেই জন্য সকলকে দেখে আমার দুঃখ হয়।

অটল। যে জন্য আমি ভেবেছিলেম যে, আমার জন্যও দুঃখ হ'তে পারে। সরলা!—

কথা শেষ হইতে না হইতেই সরলা বলিল, 'সেই দুঃখ মেটাবার জন্য আপনাকে নিয়ে এসেছি। মনোরমা আপনাকে ভালবাসে, তা বোধ হয় জানেন?'

অটল। মনোরমা? কি আশ্চর্য্য!

সরলা। আপনার সমস্ত কে তাহাকে ভালবাসে, তা সে বুঝতে পারে না।

আমি অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছি যে, আপনিও মনোরমাকে ভালবাসেন।

অটল গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল।

'আপনি প্রকাণ্ড ভুল করেছেন বোধ হয়।'

সরলা। মোটেই না। আমি সেই জন্য মনোরমার গান শিখিয়েছি। আপনি সে দিন যে গান শুনেছিলেন, সে মনোরমার গান। এখন আপনাদের দু'জনের বিবাহ হলে' আমরা খুব সুখী হব।

অটল। কি রকম দাঁড়িয়ে গেল, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সরলা (হাসিয়া) খুব স্বাভাবিক। আপনি আপনার নকুড় দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা দু'জনেই আপনার জন্য দুঃখিত। আপনার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। সেটা আমরা হ'তে দেব না।

ইহা বলিয়া সরলা অটলকে বাহিরে লইয়া আসিল।

১০

অটল নকুড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা! ব্যাপারটা কি বুঝতে পাচ্ছিনে।'

নকুড় বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'ভায়া, ব্যাপার খুব সোজা। তুমি প্রথমে যেটা ঠাউরেছিলে, তাই ঠিক। আমার স্ত্রীবিয়োগ অনেক দিন হয়েছে, এখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করব,—ঠিক করেছি।'

অটল। (বিস্মিত হইয়া) তার পর?

নকুড় বাবু। তার পর সরলার সঙ্গেই সেটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু, নিজে বৃদ্ধ বয়সে 'কোর্টশিপ' করাটা নিতান্ত কষ্টকর মনে করে' (বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের চেষ্টাস্থলে) তোমাকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিয়েছি! এতে যে কত দূর উপকৃত হলেম, তা জানানো অসম্ভব।

অটল (অবাক হইয়া) 'এর রহস্য প্রথমে জাহির করা উচিত ছিল।'

নকুড় বাবু। ক্রমে জাহির হয়ে পড়ে। আজ কাল কোনও বিষয়ে নিজে পরিশ্রম ক'রে সফল হওয়া অসম্ভব। জাহানাবাদে এক জন হাকিমের ছেলে পুলে না হওয়াতে তিনি চাপরাসীকে তারকেশ্বরে ধন্না দিতে পাঠিয়েছিলেন, তাহাতেই দেবতা সন্তুষ্ট। তুমি যে রকম ক'রে বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত জানিয়েছ, সেটা আমার প্রথম হ'তেই মনোগত ভাব, এবং তা সরলা জানতে পেরে আমাকে পছন্দ করেছে। আমার মেয়ে [illegible]

করে' সরলা মনোরমাকে রাজি করিয়েছে। এটা খুব স্বাভাবিক; কেন না, তুমি ছেলেমানুষ, সংসারধর্ম্মে অনভিজ্ঞ। মনোরমা তোমার পক্ষে মানাবে।

অটল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও শুনি নাই।

নকুড় বাবু। কোর্টশিপ এমনি করেই হয়ে থাকে। এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাবার্ত্তা শুনে নায়িকা আর এক জনকে পছন্দ করে। এ ধরণটা ক্রমে ভারতবর্ষে প্রচার হচ্ছে। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য। যখন তক্তায় 'শ্রীহরি শরণং' লিখেছ, তখনই বুঝতে পেরেছিলেম যে তুমি—

অটল। একটা গাধা?

নকুড় বাবু। নোটেই না। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের লোক। তুমি গাধা হ'লে একেবারে চীৎকার ক'রে ভালবাসার কথা আরম্ভ করতে; সেটুকু না করে' বিলক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ।

অটল আর কোনও কথা কহিল না।

কথাগুলি বড় বাবুর নিকট যথাসময়ে প্রচারিত হওয়াতে তিনি খুব প্রীত হইয়া নকুড় বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, এবং নকুড় বাবু সরলাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। মালবাবু বড় বাবুর জামাতা হওয়াতে এবং নকুড় বাবুর সহিত সরলা দেবীর শুভ পরিণয় হইয়া যাওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী।

পরলোকগত বেদবিদ্ ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "পুরূরবা ও উর্ব্বশী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "সাহিত্য" পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধগুলি এক্ষণে "বেদ-প্রবেশিকা" নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। এ প্রবন্ধটীও উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি ঐ প্রবন্ধে "উর্ব্বশী জাতিতে গান্ধারদেশীয়া গন্ধর্ব্বী বা অপ্সরা ছিলেন", এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (১) আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তিনি যে সকল যুক্তি ও কিংবদন্তীর উপর এই মত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

---

(১) বেদ-প্রবেশিকা, পৃঃ ১৭৭।

পুরূরবা ও উর্ব্বশীর গল্প বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে।

উর্ব্বশী যে অপ্সরা, এবং পুরূরবা যে মনুষ্য, তাহা ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে স্বীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মতে, দেবলোকে উঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। পরে মর্ত্তালোকে বাসকালে উঁহাদের বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের পর তাঁহাদের একবার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই কোনও ঋষি সূক্ত-রূপে রচনা করিয়াছেন। ইহাই ঋগ্বেদে আছে।(১)

কি জন্য উর্ব্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ-রচয়িতা (১) ঋগ্বেদীয় সূক্তের অন্তর্গত কোনও কোনও ঋক্ হইতে আভাস গ্রহণ করিয়া, কোনও কোনও ঋকের অর্থ ঘুরাইয়া লইয়া, এবং স্বকপোলকল্পিত গল্প রচনা দ্বারা, ইহার মীমাংসা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, উর্ব্বশী পুরূরবাকে এইরূপ বলিতেছেন :—

অথাসং। ঋ। বিদুষী। সম্ভিং। অহন্।
ন। মে। আ। কর্ণুতে। কিং। অভুক্। বদাসি॥ ১০।৯৫।১১

বিদুষী (আমি) তোমায় সকল দিন শিক্ষা দিতাম। আমার (কথা) শুন নাই; হে সন্ন্যাসী! (এখন) কি বলিতেছ?

এই ঋক্ হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরূরবা উর্ব্বশীর কোনও একটী কথা পালন করেন নাই। ব্রাহ্মণ-রচয়িতা ইহা হইতে আভাস গ্রহণ করিয়া উর্ব্বশী যে পুরূরবাকে কতকগুলি পণে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এইটী স্থির করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে তিনটী পণের অবতারণা করা হইয়াছে, (২) তাহাদের প্রথম দুইটী ঋগ্বেদীয় সূক্তের ৪র্থ ও ৫ম ঋক্ একটু ঘুরাইয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

(১) শতপথ ব্রাহ্মণের মূল গ্রন্থ না পাওয়ায় আমরা Julius Eggeling কৃত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(২) When she wedded him, she said, 'Thrice a day shalt thou embrace me; but do not lie with me against my will, and let me not see thee naked, for such is the way to behave to us women.

Translated by Julius Eggeling.—Satapatha Brahmana XI. 5.1.

কিন্তু পঞ্চম ঋকে উর্ব্বশী বলিতেছেন,—"হে পুরূরবা! আমি যখন তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, হে বীর! তখন তুমিই আমার দেহের রাজা ছিলে।" যদ্যপি উর্ব্বশী পুরূরবাকে নিজ দেহের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রাহ্মণে বর্ণিত প্রথম দুই পণ দ্বারা পুরূরবাকে উর্ব্বশী বন্ধন করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই পণদ্বয় উর্ব্বশী ও পুরূরবার মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করে নাই। অতএব, এই দুই পণ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক আলোচনা করিব না।

ব্রাহ্মণ-মতে, উর্ব্বশী পুরূরবাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কখনও তাঁহার উলঙ্গ অবস্থা না দেখেন। এই পণ-ভঙ্গের জন্যই উর্ব্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করেন। ঋগ্বেদীয় সূক্তে ইহার আভাসমাত্র নাই। এই পণ ভঙ্গ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-রচয়িতাকে একটী নূতন গল্পের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সে গল্প সংক্ষেপে এই,—(১) উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে চারি বৎসর বাস করিতেছেন; তাঁহার সন্তান হইয়াছে। গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীকে মর্ত্ত্যলোকে দীর্ঘ কাল থাকিতে দেখিয়া, তাঁহাকে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল। কি উপায়ে তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে, গন্ধর্ব্বগণ তাহার জন্য এক কৌশল স্থির করিল। একটী মেষ ও দুইটী মেষশাবক উর্ব্বশীর খাটের পায়ায় বাঁধিয়া রাখিল। ইহা উর্ব্বশী জানিতে পারেন নাই।

---

(১) She then dwelt with him a long time and was even with child of him, so long did she dwell with him. Then the Gandharvas said to one another, 'For a long time indeed, has this Urvasi dwelt among men; devise ye some means how she may come back to us.' Now a ewe with two lambs was tied to her couch; the Gandharvas then carried off one of the lambs. 'Alas, she cried, they are taking away my darling, as if I were where there is no hero and no man!' They carried off the second, and she spake in the selfsame manner. 3

He then thought within himself, 'How can that be (a place) without a hero and without a man where I am?' And naked, as he was, he sprang up after them; too long he deemed it that he should put on his garment. Then the Gandharvas produced a flash of lightning and she beheld him naked even as by daylight. Then, indeed, she vanished; 'Here I am back,' he said, and lo! she had vanished. Wailing with sorrow he wandered all over Kurukshetra.

রাত্রে তাহারা আসিয়া যখন মেষশাবকদ্বয়কে একে একে লইয়া যায়, তখন উর্ব্বশীর মনে হইল, কে যেন তাঁহার সন্তানকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখনই তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার বাছাকে তাহারা চুরী করিয়া লইয়া গেল; এখানে কি কোনও বীর নাই, মানুষ নাই? আমি এমন স্থানে আছি?" পুরূরবা তাহা শুনিয়া শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন! পাছে কাপড় পরিতে দেরী হইয়া যায়, সেই জন্য উলঙ্গ-অবস্থায় বহির্গত হইলেন। ধূর্ত্ত গন্ধর্ব্বগণ অমনই বিদ্যুৎ প্রকাশ করায় উর্ব্বশী পুরূরবাকে উলঙ্গ দেখিয়া ফেলিলেন। উর্ব্বশী তখনই অন্তর্হিত হইলেন। পুরূরবা ফিরিয়া আসিয়া আর উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং উর্ব্বশীর অন্বেষণে কুরুক্ষেত্রের সকল স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মধ্যে কেন বিচ্ছেদ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-কার এইরূপে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

তৎপরে, কোথায় পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, ইহাই আর এক প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ-কার ইহার এক মীমাংসা করিয়াছেন। পুরূরবা উর্ব্বশী বিহনে অধীর হইয়া কুরুক্ষেত্রের সকল স্থান অন্বেষণ করেন। পরে অন্যতপক্ষ নামক সরোবর বা হ্রদের নিকট আসিয়া, তাহার তীরে ভ্রমণ করেন। উর্ব্বশী ঐ হ্রদে পক্ষী বা রাজহংসী রূপে বিচরণ করিতেছিলেন। উর্ব্বশী পুরূরবাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হইলেন। (১) কিন্তু ঋগ্বেদে ইহা নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে দেখা গেল, মেষশাবকদ্বয় প্রকৃতপক্ষে উর্ব্বশীর দ্বারা সন্তান-রূপে রক্ষিত হয় নাই, এবং তাহাদের জন্য পুরূরবার সহিত তিনি কোনও পণ স্থাপন করেন নাই। ষ্টেবাল মহাশয় উর্ব্বশীর মেষশাবক-দ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে গন্ধারী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গন্ধারীগণ অত্যন্ত মেষপ্রিয় ছিল। কিন্তু উর্ব্বশী যদি মেষপ্রিয় না হন, তবে কেমন করিয়া গন্ধারী হইতে

---

(১) Now there is a lotus-lake there called Anyataplaksha; He walked along its banks; and there nymphs were swimming about in the shape of swans. 4

And she (Urvasi) recognised him, said, 'This is the man with whom I have dwelt.' They then said, 'Let us appear to him!'—'So be it.!' She replied; and they appeared to him. 5

Satapatha Brahman XI. 5.1.

যাবেন? গন্ধর্ব্বগণ যে মেষশাবক রাখিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাহারা মেষপ্রিয় ছিল কি না, তাহার কোনও প্রমাণ হয় না। তাহাদের কৌশল এই ছিল যে, মেষশাবকের খুব ছোট ছেলের ক্রন্দনের মত বলিয়া উর্ব্বশী নিজ সন্তান চুরী হইতেছে ভাবিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন, এবং রাজাও হঠাৎ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিতে ভুলিয়া যাইবেন। তাহা হইলেই তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ একই দেশের লোক। সেই দেশের নাম হওয়া উচিত গন্ধর্ব্বলোক। এই গন্ধর্ব্ব দেশ কোথায়? গন্ধার শব্দ হইতে কি গন্ধর্ব্ব শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে? বটব্যাল মহাশয় কোনও ব্যাকরণ হইতে এমন কোনও সূত্র উদ্ধার করেন নাই, যাহাতে গন্ধার শব্দ হইতে গন্ধর্ব্ব শব্দ সিদ্ধ হয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধার রাজার কন্যা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল গান্ধারী। (১) আমাদের মনে হয়, গন্ধার ও গান্ধার শব্দে কোনও প্রভেদ নাই। বৈদিক যুগে যাহাকে গন্ধার বলা হইত, মহাভারতের যুগে তাহাকেই গান্ধার বলা হইয়াছে। ইহাই কি বর্ত্তমান কান্দাহার? (২) যাহাই হউক, গান্ধারীকে কোথাও গন্ধর্ব্বী বা অপ্সরা বলিতে দেখি না। অতএব, গন্ধার বা গান্ধার দেশের লোককে গন্ধর্ব্ব বলা হইত বলিয়া মনে করি না।

আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, হিমালয়ের পরপারে উত্তরকুরু নামক একটী রাজ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই। উহাকে দেবক্ষেত্রও বলা হইয়াছে। (৩)

রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন উত্তর দিক্ জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন।

---

(১) ততো গান্ধাররাজস্য প্রেষয়ামাস ভারত।
দদৌ তাং ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধারীং ধর্ম্মচারিণীম্॥ ১২—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১০।

(২) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, বর্ত্তমান পেশাওয়র প্রাচীনকালে গান্ধার দেশ বলিত। —ঋগ্বেদ, ১২৮ পৃঃ, পাদটীকা।

(৩) সেই জন্য উত্তর দিকে হিমবানের (অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতের) ও পারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ সকল আছে, তাহারই বৈরাজ্য নির্ম্মিত (অর্থাৎ তাহাদের রাজাই বৈরাজ্য নামে অভিহিত) যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাট বলে।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৭।৩।১৪

হে ব্রাহ্মণ! আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে; আমি তোমার সেনাপতি হইব। বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন, 'ঐ দেশ দেবক্ষেত্র; মর্ত্ত্য উহা জয় করিবার অযোগ্য।'—ঐঃ ব্রাঃ ৩৭।৪।২৩

এই দিগ্বিজয়-বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মানস সরোবরের নিকট গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশ জয় করেন, (১) এবং উত্তর হরিবর্ষে উত্তরকুরুদিগের পুরেও আসিয়াছিলেন। ঐ দেশে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। (২)

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হিমালয়-পারে দেবক্ষেত্র বর্ত্তমান। মানস সরোবরের নিকট গন্ধর্ব্বদিগের দেশ, এবং তাহারও উত্তরে উত্তরকুরু। এই সকল দেশ হরিবর্ষের অন্তর্গত। রামায়ণেও হিমালয়ের পরপারে উত্তরকুরু দেশ বর্ণিত হইয়াছে। (৩)

এই সকল হইতে আমরা অনুমান করি, হিমালয়ের পর পারে দেবক্ষেত্রে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বাস করিতেন। পুরূরবা এই দেবলোকে জন্মিয়াছিলেন, এবং লালিত পালিত হইয়াছিলেন। দস্যুহত্যার জন্য দেবগণ

---

(১) তং জিগ্যে হাটকং নাম দেশং গুহ্যকরক্ষিতম্। সরো মানস মাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
পাকশাসননিরব্যগ্রঃ সহসৈন্যঃ সমাসদৎ ॥ ৩ গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ ॥ ৫
তাংশ্চ সাম্নৈব নির্জ্জিত্য মানসং সরউত্তমম্। তত্র তিত্তিরিকল্মষান্ মণ্ডূকাখ্যান্ হয়োত্তমান্।
ঋষিকুল্যা স্তথা সর্ব্বা দদর্শ কুরুনন্দনঃ ॥৪ লেভে স করমত্যুগ্রং গন্ধর্ব্বনগরাৎ তদা ॥ ৬
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৮ অধ্যায়।

তাহা (অর্থাৎ কিম্পুরুষ দেশ) জয় করিয়া গুহ্যক-রক্ষিত হাটক নামক দেশে সসৈন্যে ক্রমশঃ আসিয়া ইন্দ্রপুত্র উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে জয় করিয়া কুরুনন্দন উত্তম মানস সরোবর, তৎপরে ঋষিকুল্যা (অর্থাৎ ঋষি নদী সকল) দর্শন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপ্রভু ধনঞ্জয় নিকটবর্ত্তী মানস সরোবরে আসিয়া তৎপরে গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশ জয় করিয়াছিলেন। তথায় তিত্তির, কল্মাষ ও মণ্ডূক নামে উত্তম অশ্ব সকল আছে। তিনি সেই গন্ধর্ব্ব নগর হইতে বহু ধন লাভ করিলেন।

(২) উত্তরং হরিবর্ষন্তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ। পার্থ নেদং ত্বয়া শক্যং পুরং জেতুং কথঞ্চন।
ইয়ঞ্চ জেতুং তং দেশং পাকশাসননন্দনঃ ॥ ৭ উপাবর্ত্তস্ব কল্যাণ পর্য্যাপ্তমিদমচ্যুত ॥ ৯
তত এনং মহাবীর্য্যং মহাকায়াঃ মহাবলাঃ। ন চাপি কিঞ্চিৎ জেতব্যং মনুষ্যমত্র প্রদৃশ্যতে।
দ্বারপালাঃ সমাসাদ্য হৃষ্টা বচনমব্রুবন্ ॥ ৮ উত্তরাঃ কুরবো জেতা নাত্র যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

সেই পাণ্ডব উত্তর হরিবর্ষে আগমন করিলেন; ইন্দ্রনন্দন সেই দেশ জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর মহাকায়, মহাবল, দ্বারপালগণ এই মহাবীরের নিকট আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে এই বাক্য বলিলেন।—হে পার্থ! এই পুর তোমার দ্বারা কখনই বিজিত হইতে পারে না। হে কল্যাণীয় অচ্যুত! ইহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে; ফিরিয়া যাও। হে অর্জ্জুন! আরও এখানে কিছুই জেতব্য দেখা যায় না; এই উত্তরকুরুগণ; এখানে যুদ্ধ করিতে নাই।

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪৩ সর্গ।

তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন, উর্ব্বশীর মুখ হইতে ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেবলোকেই উর্ব্বশীকে তিনি বিবাহ করেন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উর্ব্বশী ও পুরূরবা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঋগ্বেদে উত্তরকুরু নাম পাই নাই। তখন দেবলোক নামেই সম্ভবতঃ হিমালয়ের পর পার প্রসিদ্ধ ছিল। দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা নাম ঋগ্বেদের কালেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের দেশ যে হিমালয়ের পর পারে ছিল, ইহা তেমন স্পষ্টভাবে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

ঈথার।

পদার্থবিদ্যার যে কোনও তত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে ঈথার আসিয়া পড়ে। আলোকতত্ত্ব, চুম্বকতত্ত্ব, তড়িততত্ত্ব, তাপতত্ত্ব, যে কোনটা সম্যকরূপে বুঝিতে গেলে ঈথারকে জানা আবশ্যক। ঈথার না বুঝিয়া পদার্থবিদ্যা বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। উপরিউক্ত তত্ত্বের প্রত্যেক তথ্যটি ঈথারের সাহায্যে বেশ বুঝা যায়, ভাবটি সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই যে এত আবশ্যক ঈথার, ইহার রূপ ও গুণ জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আজ এই ঈথার সম্বন্ধে দু' চারি কথা বলিব।

ঈথার একটী মহাসমুদ্র। এই ঈথার-সমুদ্রে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সকলে ডুবিয়া আছে। এত বড় মহান্ মধ্যস্থ (medium) আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যখন জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় পৃথিবী হইতে জগৎ-সবিতৃর দূরত্ব জানিতে পারি (১৯২,০০০,০০০ মাইল), তখন সাধারণতঃ মানুষের মনে হয় যে, এই বিশাল ব্যবধানের মধ্যবর্ত্তী স্থানটা কোনও দ্রব্যে পূর্ণ কি না; এ বিশাল দেশ (space) কি শূন্য পড়িয়া থাকা সম্ভব? প্রকৃতি-চরিত্র-পাঠে মনে হয় যে, এ বিশাল দেশ খালি পড়িয়া থাকিতে পারে না। কোনও না কোনও বস্তুতে পূর্ণ। আবার আর এক দল আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ধরা ও রবির মধ্যবর্ত্তী বিশাল দেশটা শূন্যই পড়িয়া আছে; তাহা না হইলে গ্রহ উপগ্রহগণ ছুটাছুটী করিবে কি করিয়া? এক দেশ দুই বস্তু দ্বারা এক সময়েই অধিকৃত থাকিতে পারে না। যদি এই বিশাল দেশ ঈথার-

রূপ কোনও দ্রব্যে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দেশটা (space) পদার্থে ঠাসাঠাসি হইয়া রহিল ; কোনও গ্রহের গতি থাকিতে গেলে সমুদয় পদার্থের মধ্যে একটা ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে। কাজেই পদার্থের স্বাধীন গতি (free motion) বলিয়া কোনও তথ্য থাকিতে পারে না। এখন যুক্তি তর্ক দ্বারা এই দুই মতের মীমাংসা করিতে হইবে।

টানা পাখা অনেকের বাড়ীতে আছে ; সকলেই দেখিয়াছেন। পাখা টানিতে হইলে পাখার সহিত দড়ি বাঁধিয়া মানুষের হাতে দিতে হয়। পাখা খাটান আছে, টানিবার জন্য মানুষ টুলের উপর বসিয়া আছে। কিন্তু পাখা চলে না। দড়ি চাই ; পাখা ও মানুষকে দড়ির সাহায্যে যোগ করিয়া দেওয়া চাই। তবে মানুষের বল দড়ির সাহায্যে পাখাকে দোলাইবে। মানুষের গায় শত হস্তীর বল থাকিলেও দড়ি দ্বারা মানুষ-পাখায় যোগ না থাকিলে পাখাকে তিলার্দ্ধও দোলাইতে পারা যায় না। এটুকু বেশ বুঝা গেল। আচ্ছা, আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। একটি চুম্বকদণ্ড নিকটস্থ লৌহখণ্ডকে টানিতেছে। লৌহখণ্ডটি অগ্রসর হইয়া চুম্বকদণ্ডকে স্পর্শ করিল। এটি একটি সত্য ঘটনা। ঘটনা সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। এখন কথা হইতেছে, চুম্বক লৌহকে টানিতেছে, কিন্তু কাহাকে অবলম্বন করিয়া টানিতেছে ? দড়ি কোথায় ? দড়ির শোক পড়িয়াছে। মানুষ আছে ; পাখা আছে ; কিন্তু দড়ির অবলম্বন পাইয়া যেমন পাখা চলিয়াছে, তেমনই এখানেও চুম্বক আছে, লৌহ আছে ; কিন্তু কাহার অবলম্বন পাইয়া লৌহ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে ? কিছু একটা অবলম্বন করিয়া শক্তি প্রকাশ পায়। এখানে চুম্বক-শক্তির বিকাশ কাহাকে অবলম্বন করিয়া হইল ? চুম্বকের টান কাহাকে অবলম্বন করিয়া লৌহতে পঁহুছাইল ? এই অবলম্বন ঈথার ; এখানে দড়ি হইতেছে ঈথার, "ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার" হওয়া যেমন অসম্ভব, অবলম্বন বিনা কোনও শক্তির স্থানান্তরে বিকাশও তেমনই অসম্ভব। অবলম্বন চাই, পরস্পর যোগ চাই; চুম্বক ও লৌহের ব্যবধান পদার্থে পূর্ণ থাকা চাই, চুম্বক ও লৌহ কোনও পদার্থের যোগে যুক্ত থাকা চাই। তবে চুম্বকের বল সেই ঈথার-রূপ পদার্থ-অবলম্বনে লৌহতে গিয়া পঁহুছিবে। তবে চুম্বকের আকর্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। চুম্বক আছে, লৌহ আছে, আর তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই—শূন্য। অথচ লৌহ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইবে,—ইহা কল্পনা করা বাতুলের কার্য্য। কাজেই আমরা চুম্বক ও লৌহের মধ্যে একটি মধ্যস্থ

(medium) খুঁজি। যে মধ্যস্থ থাকাতে তিনটি পরস্পরে সংযুক্ত। এই মধ্যস্থের নাম ঈথার। এখানে আমি একটী সত্য ঘটনা বিবৃত করিতেছি; বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সন্ধ্যার পর কোনও এক স্থানে কতকগুলি বালকের আসরে পুতুল-নাচ হইতেছে। সকলেই হাঁ করিয়া দেখিতেছে। কেহ বুঝিতেছে, হাত উঁচুতে, পুতুল নীচে; কেমন করিয়া হাতের সঙ্গে সঙ্গে পুতুল নাচিতেছে? কেহ বা আনন্দ করিতেছে। কেহ তাহার সঙ্গীদিগকে কত বিজ্ঞভাবে পুতুল নাচ-কারীদিগের বাহাদুরী বুঝাইয়া দিতেছে। এমন সময়ে একটি বালক বলিল যে, বাহাদুরী কিছুই নয়; কতকগুলি তারের সাহায্যে পুতুল নাচাইতেছে। পুতুল ও হাতের মধ্যে কিছু না থাকিলে কি পুতুল নড়ে? তার বাড়িতে দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বাজীকরেরা তার ব্যবহার করে। এ ছেলেটি বাস্তবিকই বুদ্ধিমান নয় কি? আজকালের বৈজ্ঞানিকগণও ঐ ছেলেটীর মত একটা মধ্যস্থের (medium) অবতারণা করেন। শূন্যে কেহ নাচিতে চান না; মধ্যস্থদেরই সকলে পৃষ্ঠপোষক।

তাহা হইলে, আমাদের এই জ্ঞান হইল যে, পদার্থ বা পদার্থের পরমাণুগুলি সর্ব্বব্যাপী ঈথার-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। ঈথার ওতঃপ্রোতভাবে জড়-জগৎকে ছেঁকিয়া আছে। এই সমগ্র দেশ (space) সম্পূর্ণভাবে ঈথারে পূর্ণ। তাহা হইলে, এই ঈথারের একটি কণা টানিলে পারিপার্শ্বিক কণাগুলিতে টান পড়িবে। সেই কণাটীর আন্দোলনে সেই টান আবার পার্শ্বস্থিত ঈথার-কণায় পঁহুছিবে। এইরূপে এক দেশ হইতে অপর দেশে ঈথার কণার স্পন্দন গিয়া পঁহুছাইবে।

মহাকর্ষণ ও ব্যাবাকর্ষণ বোধ হয় এই ঈথারের স্পন্দন-ফল। আলোক ঈথারের তরঙ্গসম্ভূত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। তড়িৎও এই ঈথারের কোনও বিশিষ্ট গুণ-প্রসূত। ঈথার সর্ব্বস্থানে সমভাবে বর্ত্তমান। ঈথার কোনও স্থানে পাতলা, কোনও স্থানে ঘন, এরূপ অবস্থায় থাকে না। এক কথায়, ইহার ঘনতা সর্ব্বস্থানে সমান। চাপ দিয়া ঈথারের আয়তন কমাইতে পারা যায় না। পদার্থের ন্যায় ঈথারের অণু পরমাণু নাই। পদার্থের অণুদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক আছে; পরমাণুদ্বয়ের মধ্যেও ফাঁক আছে। সুতরাং পদার্থ সর্ব্বব্যাপী নহে। সকল স্থান জুড়িয়া থাকে না। কিন্তু ঈথার সর্ব্বস্থান জুড়িয়া এক অবিভক্ত বস্তুর ন্যায় অবস্থান করে। তাহার অণুও নাই, পরমাণুও নাই, তাহার কণা

বিজ্ঞানে" প্রকাশিত মৎলিখিত "শূন্যবাদ ও মধ্যস্থবাদ" দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ের মধ্যে ফাঁকও নাই। ঈথারকে কখনও তরল, কখনও সরিল, আবার কখনও কঠিন বলা হয়। কিন্তু কোনটাই ইহার উপযুক্ত বিশেষণ নহে। ইহা অপরিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ব জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। ইহা স্থিতিস্থাপক, ঘর্ষণশূন্য (frictionless) মধ্যস্থমাত্র। গতি ও শক্তি (energy) বহন করাই ইহার কার্য্য। বারান্তরে ঈথার হইতে কিরূপে আলোকের উৎপত্তি ও গতি সাধিত হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে দু' চারি কথা বলিব।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

জিজিয়া।

'জিজিয়া' নামক কয়টী ইতিহাসে মুসলমানগণের চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের উদাহরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'জিজিয়া' এই শব্দটী শ্রবণ মাত্র হিন্দুগণ ভীত ও চকিত হইয়া উঠেন। কিন্তু ইহার উৎপত্তির বিবরণ জানা থাকিলে তাঁহারও কোনও ভয়ের কারণ থাকিত না; কারণ, প্রচলিত ইতিহাসে ইহাকে যে মূর্ত্তিতে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহা ইহার বিকৃত রূপ। প্রচলিত ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মুসলমান-বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ ইতিহাসে ইহার স্বরূপ মিলিবে না; ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস খুঁজিতে হইবে।

'জিজিয়া' কাহাকে বলে, তাহা না জানেন, এমন লোক খুবই অল্প; কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। কারণ, ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে—অক্ষয় রজনীকান্ত গুপ্ত, অধর মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি প্রায় সকল ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-প্রণেতার গ্রন্থসমূহে এ বিষয় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সমস্তই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিদ্বেষভাবাপন্ন-মত-প্রসূত রচনা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের এই বিদ্বিষ্ট কল্পনার প্রভাবে তদনুকারী এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক মুসলমান সম্রাটগণ, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও 'জিজিয়া' নামক রাজকর—যাহা মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি পৈশাচিকভাবেই চিত্রিত হইয়াছে! এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিড়ম্বনায় ও নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের কল্পিত হীনতায় ভারতীয় মুসলমানগণ হৃদয়ে কি

অসহ যাতনা অনুভব করিতেছেন! ইহা যে হিন্দু-মুসলমানের একান্ত ঈপ্সিত একতা ও সম্মিলনের ভয়ঙ্কর পরিপন্থী হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখা যাউক, 'জিজিয়া' কি, এবং কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি। 'জিজিয়া' পারস্য ভাষার 'গিজিয়া' শব্দ হইতে উৎপন্ন। যদি প্রশ্ন করা হয়, এ পরিবর্ত্তন কেন হইল? তাহা হইলে বক্তব্য এই, পারসীকদিগের নিকট হইতে 'গিজিয়া' শব্দটী আরবগণ 'জিজিয়া' নামে পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করেন। কারণ, আরবী-ভাষাবিদগণ সকলেই জানেন যে, আরবী ভাষায় 'গাফ' (গ) অক্ষর নাই। এই জন্যই পারস্য ভাষার গাফ (গ) অক্ষরের পরিবর্ত্তে আরবীতে 'জিম' (জ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, 'হুগলী' শব্দটী আরবীতে লিখিতে হইলে 'হুজলী' লিখিতে হইবে। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখন দেখা যাউক, 'জিজিয়া' শব্দের অর্থ কি? 'বোরহানে কাত' নামক পারস্য ভাষার প্রধান অভিধান গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, 'গিজিয়া' শব্দের অর্থ—কর বা খাজানা। পারস্য-কবিকুল-সম্রাট ফেরদৌসী তদীয় বিশ্ববিখ্যাত 'সাহনামা' গ্রন্থে 'গিজিয়া' শব্দটী কর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 'জিজিয়া' শব্দটী যে 'গিজিয়া' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা 'মফাতি হুল-উলুম' নামক প্রধান আরবী অভিধানে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন কে সর্ব্বপ্রথম 'গিজিয়া' বা 'জিজিয়া'র প্রবর্ত্তন করেন, দেখা যাউক। ইতিহাস-আলোচনায় জানা যায় যে, সুবিচারক কুল-সূর্য্য পারস্য-সম্রাট নওশেরওয়া এই 'গিজিয়া' নামক কর স্বীয় রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এমাম আবু জাফর তিব্রী তদীয় 'তারিখে কবির তিব্রি' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে বলেন, "উচ্চ বংশীয় আমীর ওমরা, ধর্ম্মগুরু ও সৈনিক পুরুষ ব্যতীত তিনি রাজ্যের অন্যান্য সকল শ্রেণীর বিশ বৎসরের অধিক ও পঞ্চাশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক লোকের প্রতি প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ৪, ৬, ৮, ১২ দেরেম হিসাবে 'জিজিয়া' নামক কর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন,—"সৈনিক পুরুষগণ দেশের ধন, প্রাণের রক্ষক; তাহারা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে বিপদাপন্ন করিতে এবং স্বয়ং শমন-সাগরে ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠিত নহে, সুতরাং নিরাপদে অবস্থানলিপ্সু লোকজনের পক্ষে সৈনিকগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু কর প্রদান করা একান্তই উচিত।" (১)

(১) আরবে মুসলমান সভ্যতা—[illegible]

'ফতুহুল বোল্‌দান' নামক আরবী ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 'জিজিয়া'র বিনিময়ে যে সকল ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'জিজিয়া'র বিনিময়ে নিম্নলিখিত দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সন্ধিপত্রের মুখ্য যথা :—

(১) শত্রুর আক্রমণ হইতে জিজিয়া-দাতাগণের ধন প্রাণ রক্ষা করা হইবে।

(২) তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(৩) 'জিজিয়া' দিবার জন্য তাহাদিগকে তহশিল কাছারীতে উপস্থিত হইতে হইবে না। তহশিল মোহরেরা স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জিজিয়া আদায় করিবে।

(৪) তাহাদের ধন প্রাণ নিরাপদ রাখা হইবে।

(৫) তাহাদের পথিক ও বণিকদলকে দস্যু তস্করের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।

(৬) তাহাদের ভূসম্পত্তি নিরাপদে রাখা হইবে।

(৭) তাহাদের অট্টালিকা সমূহ রক্ষা করা হইবে।

(৮) পাদ্রী ও ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতদিগকে পদচ্যুত করা হইবে না।

(৯) ক্রুশ ও প্রতিমাসমূহের কোনরূপ অনিষ্টসাধন করা হইবে না।

(১০) তাহাদের নিকট হইতে (মুসলমান প্রজার ন্যায়) 'ওশর' বা ভূমির উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ গ্রহণ করা হইবে না।

(১১) তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা হইবে না।

(১২) তাহাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

(১৩) তাহাদের পূর্ব্ব-প্রাপ্ত অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে না।

(১৪) যাহারা এখন উপস্থিত নাই, তাহারাও এই সন্ধিপত্রের ফলভোগের অধিকারী হইবে। (১)

যাহাদের নিকট হইতে 'জিজিয়া' আদায় করা হইত, তাহাদের নিকট হইতে দুর্ব্বহ দায়িত্ব স্বীকার করা হইত, এবং তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা সন্ধিপত্রের মর্ম্ম হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

(১) ভারতে মুসলমান সভ্যতা।

ভারতে মুসলমান সম্রাটগণও এই 'জিজিয়া' কর মুসলমান ভিন্ন অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর ধার্য্য করিয়াছিলেন। এরূপ 'জিজিয়া' নামক কর স্থাপন করা, বিশেষতঃ মুসলমানদিগকে উহার দায়িত্বভার হইতে অব্যাহতি দিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে 'জিজিয়া'র শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা সমীচীন ও ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে কি না, তাহা অবশ্যই বিচার্য্য। আমরা এখন তাহারই আলোচনা করিব।

এস্‌লামের শাসন-নীতি অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান দেশ, সমাজ, ও দেশ-বাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য সামরিক কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে বাধ্য। কোনও মুসলমানই এই কঠোর বিধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। এস্‌লাম ধর্ম্ম উদারতম ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী, ইহা তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র 'কোরাণ' সপ্রমাণ করেন। (১) তাই মুসলমান খলিফা ও বাদশাহগণ সামরিক বিধানকে স্বধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের উপর সামরিক আইন বাধ্যতামূলক করিলে তাহারা এ নিয়মকে অত্যন্ত কঠোর ও অত্যাচারমূলক বলিয়া মনে করিত। এমন কি, হয় ত দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, দেশ উচ্ছিন্ন হইতে প্রারিত। কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে ধর্ম্মের বিধান মনে করিয়া ইহার পালনে সতত সাধ্য ছিল। তাহাদের পক্ষে কোনও আপত্তির কারণ ছিল না।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, 'জিজিয়া' কোনরূপ বিদ্বেষমূলক কর নহে। যাহারা বিদ্বেষমূলক কর বলিয়া 'জিজিয়ার' প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, আমরা করি, তাঁহারা ইহাতে কিঞ্চিৎ শান্ত হইবেন। 'জিজিয়া' যে কোনমতেই বিদ্বেষ-মূলক কর ছিল না, তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে, মুসলমান রাজত্বে যে সকল অন্যধর্ম্মাবলম্বী সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'জিজিয়া' দিতে হইত না। যাঁহারা ইহাতেও জিজিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাদের জন্য

(১) কোরাণে আছে,—"লা একরাহা ফি-দ্দিনে", অর্থাৎ, 'এস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচারে কোনরূপ বলপ্রয়োগের বিধি নাই।' আর এক স্থানে আছে,—"লাকুম দিনকুম ওলিয়াদিন্।" অর্থাৎ, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম্ম। ইহাতে জোরজবরদস্তীর কথা কিছুই নাই। যাঁহারা 'মুসলমানেরা বল-প্রয়োগে ও তরবারী দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ করিবার মুসলমান ধর্ম্মে বিধি আছে' ইত্যাদি ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা 'কোরাণে'র উক্ত বাক্য ও ডাক্তার আর্ণল্ড লিখিত 'Preaching of Islam' গ্রন্থ পাঠ করিলে আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

আরও কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে; আশা করি, তাঁহারা ধীরভাবে বুঝিয়া দেখিবেন।

মুসলমান সম্রাটগণের অধীন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগকে 'জিম্মি' বলা হইত। 'জিম্মি' শব্দের অর্থ—'দায়িত্বভাব-গৃহীত লোক।' ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার নিকট হইতে 'জিজিয়া' নামক কর গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধন, প্রাণ ও সম্মান রক্ষার 'জেম্মা' অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণ করা হইত বলিয়া তাহারা 'জিম্মি' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। 'জিজিয়া' যে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রহণ করা হইত, তাহার বহু প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার খলিফাগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত যে সন্ধিপত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এ কথা স্পষ্ট লিখিত ছিল,—"তোমাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ও ধন প্রাণ নিরাপদে রাখিবার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে জিজিয়া গ্রহণ করিতেছি।" মুসলমানগণ যে এ সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা সম্যক রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। অগত্যা প্রবন্ধবৃদ্ধির ভয়ে সে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

যাহা হউক, এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'জিজিয়া' একটী সামরিক কর ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার জন্য মুসলমান সম্রাটগণ কোনও অংশেই দোষী প্রতিপন্ন হইতে পারেন না; বরং ইহাতে তাঁহাদের শাসন-শৃঙ্খলা, ও দূরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'জিজিয়া'-লব্ধ অর্থ তাঁহারা সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র-সংগ্রহ, রসদ-সংগ্রহ ও দেশের পথঘাট ও দুর্গাদির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা কি হারে 'জিজিয়া' আদায় করিতেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'জিজিয়া'র পরিমাণ কোনও অবস্থাতেই ২০৲ টাকার অধিক ছিল না। লক্ষপতি ও ক্রোরপতি হইলেও ইহার অধিক কাহাকেও দিতে হইত না। সাধারণতঃ বার্ষিক ৬৲ টাকা হিসাবে জিজিয়া গৃহীত হইত। স্ত্রীলোক, অশক্ত, অসহায়, অন্ধ, উন্মাদ, দরিদ্র, অর্থাৎ যাহাদের নিকট ২০০ দেরেমের ন্যূন অর্থ আছে, তাহাদের নিকট হইতে জিজিয়া লওয়া হইত না।

অধুনাতন ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, জলকর, পথকর ইত্যাদি নানা জাতীয় করের সহিত তুলনা করিলে জিজিয়াকে অতি সামান্য কর বলিয়াই বোধ হয়।

সকল মুসলমান সম্রাটই প্রজাবর্গের উপর 'জিজিয়া' নামক 'ট্যাক্স'টী স্থাপন করেন নাই। ভারতে পাঠান-শাসন-কালে হিন্দুগণ সৈনিক বিভাগে বিশেষ-

রূপে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে নাই, এই জন্যই তাহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপিত হইয়াছিল। বাবর ও হুমায়ুনের সময়েও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দুগণ দলে দলে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে থাকেন। আকবরের সময়ে পাঠান-বিপ্লবে দেশ পূর্ণ ছিল বলিয়া আকবর পাঠানদের উচ্ছেদসাধনমানসে রাজপুতদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন, এবং তাহাদিগকে সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমে রাজপুতদের অনুগামী হয়। অধিকাংশে হিন্দু সামরিক বিভাগে প্রবেশ করায় সম্রাট আকবর তাঁহাদের উপর সামরিক কর 'জিজিয়া' ধার্য্য করেন নাই। সাহজাহান ও জাহাঙ্গীর আকবরের এই নিয়ম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ভারতের অবস্থা অন্য রূপ ধারণ করিয়াছিল। যে পাঠানদের উচ্ছেদের জন্য সম্রাট আকবর রাজপুতদিগকে অত্যধিক প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহাদিগকে উচ্চপদস্থ, দরবারে ও সামরিক বিভাগে অধিকার প্রদান করেন। সেই রাজপুতগণের ক্ষমতা প্রতিপত্তি পাঠান রাজবংশ অপেক্ষাও বাড়িয়া যায়। তাঁহারা মোগলরাজের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ও তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি, তাঁহারা ক্রমে পিতৃপুরুষদের রাজ্য স্বাধীন করিয়া লইবার কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব মুসলমান রাজত্বের এই আসন্ন বিপদ্দর্শনে রাজপুতদিগের ক্ষমতা দুর্ব্বল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং তাঁহাদের সামরিক ক্ষমতার সঙ্কোচবিধানের জন্য তাঁহাদিগকে সামরিক বিভাগ হইতে সরাইয়া 'জিজিয়া'র পুনঃপ্রচলন করিয়া স্বীয় রাজ্যরক্ষার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

'জিজিয়া'র পুনঃ-প্রচলনের জন্য ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গজেবকে দোষী করেন। কিন্তু তিনি কি কারণে ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার অবসর ঘটিলে, নিশ্চয়ই তাঁহারা এত দূর বিক্ষুব্ধ হইতেন না। আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষাকে দোষাবহ মনে করিয়া এবং রাজদ্রোহিতা ও দেশদ্রোহিতা নিবারণ-চেষ্টাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া নিশ্চয়ই আওরঙ্গজেব দোষী।

বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য ও তদনুকারী ঐতিহাসিকগণের কৃপায় 'জিজিয়া' নামক সামরিক করটী যেরূপ ভীতিপ্রদ-রূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সরলচিত্ত পাঠকগণ ও স্কুল কলেজের ছাত্রবর্গের অন্তরে মুসলমান সম্রাট-

কাহার প্রতি স্বভাবতই ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া থাকে; এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইরূপ অলীক কাহিনীর প্রশ্রয়াধিক্যে হিন্দু ও মুসলমানের চিরবাঞ্ছিত একতা ও সম্প্রীতির পথে প্রবল অন্তরায় পুঞ্জীভূত হইতেছে।

আবুল কালাম মোহাম্মাদ শামসুদ্দীন।

নায়িকার শেষ কথা।

[A Woman's Last Word—by *R. Browning.*]

১

কাজ নাই প্রিয়তম! এ বিবাদে আর,
কাজ নাই বুঝিয়া কাঁদিয়া—
যেমন ছিলগো আগে হোক্ তা আবার,
এস—রহি শুধু ঘুরাইয়া!

২

কবে কের সম উচ্চ হাস্য কিবা?
প্রিয়তম! তোমায় আমায়—
জগতে কি ব্রত, কহ, নিশি দিবা,
শোন সখা ভয় শঙ্কায়!

৩

হের ওই দুই বাজ বেড়ায় ঘুরিয়ে
আমাদের শুনি-কুই বলি—
চুপ চুপ—জানা সব—ঘুমি ভাবে
ও পথে যাবি বওখানি।

৪

কোন্ সত্য, কহ সখা, মিছা এর চেয়ে
অনুচিতা নহি তব প্রতি?
সাবধান—যেও না সে ভগ্নমূলে ধেয়ে
বহে বেলা অহি মনমতি!

৫

ঐ দিকে সিন্ধুরসময় বলে রয়েছে ঝুঁকে,
মুগ্ধ পায়ে সে ধারে যা'ব না—
দুরাশা নয়ন-বন যদি হায় ভুলে,
তুমি সখা পথে চলনা!

৬

দেবতা হও গো সখা, ইন্দ্রজাল-বলে
মন্ত্রমুগ্ধ করি রাখ মোরে;
মানব হইয়ে সখা, মানব-আদরে
বাঁধ মোরে তব বাহু-ডোরে।

৭

শিখাও আমারে বঁধু! শিখাও গো শুধু
আমার উচিত যাহা হবে;
তোমারি ভাষা সে হবে মোর ভাষা বঁধু,
এ হৃদে তোমারি ভাব রবে।

৮

মিটাব পিপাসা তব যদি সাধ যায়,
দেহের প্রাণের তৃষা আর;
তনু মন দুই বঁধু! সঁপিনু তোমায়—
শুধু করে—সর্ব্বস্ব আমার।

৯

সে সাধ মিটিবে সখা কাল নহে আজ,
নহে এ নিশার আজিকার,
ডুবাব মনের খেদ—প্রথম এ কাজ—
চিরতরে—না জাগে আবার।

১০

আজি এ নিশায় বঁধু একটু কাঁদিব,
(অবোধের মত হবে তা সে)
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে ঘুমায়ে পড়িব
ক্রোড়ে তব প্রেমের পরশে।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গায়ক পাখী।

ময়না।

ময়না বলিতে অনেক জাতীয় পাখীকে বুঝায়। আমরা এ স্থলে যে ময়নার বিবরণ লিখিব, সেগুলিকে 'পাহাড়ে ময়না' বা 'পাহাড়িয়া ময়না' বলে। এই নামেই ইহারা সমধিক পরিচিত।

গারো পাহাড়ের ময়নাই আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিপালিত হয়, এ জন্য ইহাদের বিবরণই আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ময়না কোকিলের মত বড় পাখী। গাঢ় নীলের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ পালকে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। ময়নার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের সর্ব্বপ্রধান সহায় তাহার মনোহর কর্ণযুগল। নিকষে কষিত উজ্জ্বল সোনার দুইখানি কোমল পাত যেন তাহার সুন্দর চঞ্চল কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাথা নাড়া দিলেই কাণ দুইটী দুলিতে থাকে। এ জন্য ইহাদিগকে সোণাকাণি ময়না কহে। সোনাকাণি ময়নাকে কয়েক দিন দুধ ভাত খাইতে দিলে ইহার কাণ দুইটী রূপার মত সাদা হইয়া যায়, ময়না রূপাকাণি হইয়া পড়ে। ছোলা-ভিজা মাখা ছাতু বা কুঁচিলা ফল খাইতে দিলেই ময়না পুনরায় সোনাকাণি হয়। সোনাকাণি ময়নাই দেখিতে বেশী সুন্দর। কাণ দুইটী ক্রমে সরু হইয়া মাথার পিছনে গিয়া মিলিত হয়। দুই পার্শ্বে দুইটী ছিদ্রও দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট লালের আভাযুক্ত হলদে কি ভিতরটা লাল। ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা, ধারাল, শক্ত এবং সুন্দর। ঠোঁটের গোড়ার দুই দিকে দুই নাসারন্ধ্র। পা দুইটী ঈষৎহরিদ্রাভ।

ইহারা কখনও পার্ব্বত্যভূমি ছাড়িয়া নিম্নভূমিতে বিচরণ করিতে আইসে না। এমন কি, পার্ব্বত্য ভূমির নিকটবর্ত্তী অরণ্যেও ময়না কখনও ভ্রমণ করিতে আইসে না। ইহারা পর্ব্বতের উচ্চতম বৃক্ষের কোটরে বাসা করিয়া ডিম পাড়ে। মানুষ-ভীতিই ইহাদের এই সতর্কতার প্রধানতম কারণ। কিন্তু সেখানেও মানুষ জীবন হাতে লইয়া ময়নার বাচ্চা সংগ্রহ করিতে যায়। মানুষের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ইহারা যতই চেষ্টা করুক, মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। মানুষ ইহাদের অসংখ্য ঝুপড়ি তৈয়ার করিয়া তাহা মনোনীত গাছের উপর স্থাপন করে। বহু ময়না তাহাতে বাসা করে।

বসন্তাগমেই ময়না বাসা ঠিক করে। শীতকালে ইহারা গর্ভধারণ করে, এবং চৈত্র, বৈশাখ মাসে ডিম পাড়ে। এক একটী ময়না দু' চারিটী ডিম পাড়ে। পনর বিশ দিন ধরিয়া অধিকাংশ সময়ই পক্ষিণী ডিমে তা দেয়। পক্ষী তখন তাহার আহার যোগায়। ডিম ফুটিলে উদরসর্ব্বস্ব, একটী মাথা, দুইটী ক্ষুদ্র পা ও ক্ষুদ্র ডানা বিশিষ্ট ছানা বাহির হয়। কিছু দিন পরে ঐ ছানার শরীরে পীতাভ লোমরাজি দেখা দেয়। দুই তিন দিন পরে ঐ লোমরাজির বর্ণ ক্রমে পাঁশুটে হয়, এবং ক্রমে কৃষ্ণাভ হইয়া আইসে। আরও দুই সপ্তাহ কাল ইহারা মাতা পিতার প্রদত্ত আহার্য্য বাসায় বসিয়া গ্রহণ করে। এই সময়ই ছানা-চুরীর প্রশস্ত কাল। ময়না এই সময় হইতে ক্রমে ছানাগুলিকে এ ডাল সে ডাল করিয়া উড়িতে শিখায়। ক্রমে পাখায় বল সঞ্চার করিয়া ইহারা মাতা পিতার সঙ্গে আহার্য্য-সংগ্রহে গিয়া থাকে। পোকা, মাকড়, ফল ইত্যাদি ইহাদের ভক্ষ্য।

ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, ময়নার ছানা পাড়িতে গেলে ইহারা মানুষের ভাষায় কহিত,—"ওই গর্ত্তে সাপ আছে।" সে কথা সত্য না হউক, ময়না যে প্রায় সকল পাখীর স্বর অনুকরণ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহ-পালিত ময়নাই তাহার সাক্ষী। আমি দুইটী ময়নার কথা জানি, যাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। একটী ময়না কিশোরগঞ্জের তিন মাইল দূরবর্ত্তী 'চৌদশ' বাজারে এক পশ্চিমে বেহারার প্রতিপালিত ছিল। তাহার কথাবার্ত্তা, গান, শিশু মানুষের অব্যক্ত অনুকরণ ছিল। নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কথা কহিত। সে বহু পথিককে নূতন কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিত। তাহা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ব্যতীত বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সে অনেক সময়ে প্রশ্ন করিত, 'আপনি কোথা যাবেন? কি নাম আপনার? বাড়ী কোথায়? তামাক খাবেন? মা যবে আছ? একটু আগুন দাও ত!' সে উত্তর দিয়াও মানুষকে খুসী করিত। পাখীটা ছত্রিশ টাকায় বিক্রীত হইয়া গেলে, অপর এক ধনী উহার জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। এই পাখীটার কথাবার্ত্তায় প্রায়ই মানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিত। এ কুকুর, বিড়াল, অন্যান্য পাখী প্রভৃতির স্বর অনুকরণ করিত। এ রকম 'পণ্ডিত' গোছের পাখী আর দেখি নাই। এক দিন নাকি এই পাখীটার কৃপায় তাহার প্রভু চোরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। পাখী গভীর রাত্রিতে জাগিয়া 'বাবা, চোর, চোর!' বলিয়া চেঁচায়; তাহাতেই গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

হোসেনপুরের নিকট 'পিত্তলগঞ্জে'র বাজারেও এক দোকানীর একটী 'ময়না পাখী'র গল্প শুনিয়াছি। উহারও অনেক অদ্ভুত কথা শুনিয়াছিলাম। পাখীটা দেখি নাই।

এত বেশী পোষ মানিলেও ময়না স্বাধীনতার জন্য লালায়িত। একটীমাত্র ময়নাকে পিঞ্জরের বাহিরে গিয়া পুনরায় স্বেচ্ছায় পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। * ইহারা একবার ছাড়া পাইলে সহজে ধরা দিতে চায় না। তবে, আশৈশব পিঞ্জরাবদ্ধ থাকায় ইহাদের ডানার শক্তি কমিয়া যায়, এবং উড়িবার কায়দা-কানুন অনভ্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং সহজেই ক্লান্ত হইয়া ধরা দেয়। কখনও কখনও পলায়ন করিতে গিয়া অপর পাখী কর্ত্তৃক হত হয়। পরাধীন পাখী ছাড়া পাইলেই অন্য পাখী তাহাকে চিনিতে পারে, এবং ইহাকে ধ্বংস করা সুসাধ্য মনে করিয়া আক্রমণ করে।

পাখীমাত্রেরই পুচ্ছের নীচে একটী তৈলাধার আছে। পাখী সময় সময় ঠোঁট দ্বারা ঐ তৈলাধার টিপিয়া প্রয়োজনমত তৈল বাহির করে, এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রসাধনে নিয়োগ করিয়া থাকে। ময়নাকে প্রত্যহ সকাল বেলায় স্নান করাইতে হয়। কখনও কখনও দুই বেলা স্নানও করান উচিত। স্নান বন্ধ করিলে ইহারা অসুস্থ হয়। রুগ্ন ময়নার তৈলাধারটী একটু বড় দেখায়, তাই অজ্ঞ পালকেরা উহাকে 'গ্যাঙ্গ' মনে করিয়া কাটিয়া দেয়, তাহাতে প্রায় শতকরা নব্বইটী ময়না মারা পড়ে।

বর্ষান্তে ময়না পালক বদ্‌লায়। ঐ সময় মোটা কাপড় দিয়া খাঁচা বেষ্টন করিয়া রাখা উচিত। ঠাণ্ডা বা বেশী গরমে তখন ক্ষতি করে। পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া তখন নিতান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ ময়নাকে মধ্যে মধ্যে মাছ ও মাংস খাইতে দেন।

ময়নার খাঁচায় দুইটী পাত্র দেওয়া হয়। একটীতে ছাতু, অপরটীতে জল। কুঁচিলা ফল ইহাদের প্রিয়। ময়নার আহার্য্য রাখিবার জন্য চীনামাটীর পাত্রই প্রশস্ত। আহার্য্যের গুণের তারতম্যে ময়নার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। এ জন্য সকল প্রতিপালকের ময়না খাঁটী এক বর্ণের দেখা যায় না। একটু একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ময়না পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* এই 'মডারেট' ময়নাটিকে ঐ জাতীয় উদার-সংঘের সভ্যশ্রেণি ভুক্ত করা হয় না।

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির কৃষিকার্য্য।

আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভিন্ন প্রবন্ধে তাহার আলোচনা লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইব। অদ্য প্রসঙ্গবশতঃ একটু আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

মহাপ্রাজ্ঞ ম্যাক্সমূলর মহোদয় তাঁহার 'Science of Language' নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৯—৪৩ পৃষ্ঠায় এবং 'The Homes of the Aryas' নামক পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে লাটিন ও গ্রীক ভাষার *ar, aro* ও Anglo-Saxon ভাষার *erian* দ্বারা *earing* অর্থাৎ *Ploughing* (কৃষি) বুঝায়। তিনি বলেন এই ভাষাগুলির *ar* (অর) ধাতু হইতে বৈদিক 'আর্ব' ও 'উর্বরা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'উর্বরা' শব্দ 'অরা' ও 'বরা' যোগে গঠিত, তিনি ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ঋগ্বেদের ৪।৪১।৬-৩-৮।২৬।৩ ঋকের 'উর্বরা' শব্দ লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রীক ও লাটিনের 'অর' (ar) ধাতুর অর্থ *to stir* ও *earing* হইলেও, সংস্কৃতে 'অর' ধাতু দ্বারা কিরূপে 'অরা' ও 'বরা' যোগে কৃষিকার্য্য বুঝায় না। গ্রীক ও লাটিনের এই অর' (ar) ধাতু দ্বারা বৈদিক 'আর্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন নহে। 'অর' ধাতু সংস্কৃতে আছে কি না, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার উত্তর দিবেন।

বৈদিক 'উর্বরা' শব্দের অর্থ—শস্যদায়িনী ভূমি। এক ভাষার শব্দের সঙ্গে অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণগত সাদৃশ্যের তুলনা করিয়া অভিন্নতা সপ্রমাণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক কার্য্য।

একটী কথা বলিয়া রাখি। গ্রীকেরা হিব্রুভাষীদের প্রতিবেশী জাতি। আরবী ও হিব্রুর অনেক শব্দ গ্রীক ও লাটিনের কুক্ষিগত হইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বৈদিক 'উর্বরা' শব্দের সঙ্গে হিব্রুর কোনও সদৃশ্য আছে কি না, একটু আলোচনা করিব।

হিব্রু ভাষায় 'অদামা' শব্দের অর্থ ভূমি (Genesis I—25)। বৈদিক 'অদিতি' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও, ঋগ্বেদের ১।৪৩।২ ঋকে যে 'অদিতি' শব্দ আছে, বেদজ্ঞ বিখ্যাত সায়নাচার্য্য মহোদয় তাহার অর্থ 'ভূমি' করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৫।৪৩।৬, ৭।৩৬।৯, ১০।৯২।৫ ঋকে যে 'অরমতি' শব্দ আছে, সকলে তাহার অর্থ মহী বা ধরিত্রী বলেন। পারসীকদের আবেস্তা গ্রন্থে বৈদিক এই 'অরমতি' Spenta Armaiti রূপে 'Goddess of earth' রূপে

পরিচিত। হিব্রু ভাষায় 'অর' অর্থে *'to stir up'* (Job 41—10, Deut 32—11) এবং 'অরা' অর্থে ভূমি (Ezra 5—11, Jermia 10—11)। হিব্রুর 'এরেদ' (earth ?) অর্থে ভূমি (Genesis 1—1)। সংস্কৃত ও হিব্রু, উভয় ভাষায় 'বর' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, উত্তম (Song of Solomon 6—9)। হিব্রুতে 'বর' শব্দের আর একটি অর্থ দস্যু বটে।

ঋ ধাতুর অর্থ,—গমন। সকলে বলেন, তাহা হইতে 'আর্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন; 'এবার' নামক ব্যক্তির (Genesis—10—21) বংশধরগণই পরবর্ত্তী কালে 'ইব্রি' নামে পরিচিত। এই 'ইব্রি' শব্দের অর্থ,—Passer-over। যাঁহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রয়ান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'ইব্রি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ইব্রীয় জাতি যেমন পশুপালক, তেমনই কৃষি-জীবী (Genesis 26—12, Deut 15—14, Ruth, 1 King 19—19, Proverbs 22—26) ছিলেন। অন্য পক্ষে, প্রাচীন আর্য্যজাতি যেমন কৃষক, তেমনই পশুপালক (১।৯২।৭-৮, ৩।৪।১৫-১৬, ৩।১৯।২, ৩।২১।৪, ৩।৪৭।২০, ৭।৬২।৫, ৭।৭৭।৪ ঋক) ছিলেন। ঋগ্বেদ-পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্যগণ কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষা পশু-পালের উপর অধিক নির্ভর করিতেন। প্রাচীন আর্য্য ও ইরাণিগণ যে বরফভূমিবাসী যাযাবরদের ন্যায় বস্ত্রাবাস বা তাঁবুতে বাস করিতেন, তাহা Vendidad 8—9 পদ ও অন্যান্য বহু প্রমাণ দ্বারা অবশ্য বলা যায়।

সংস্কৃতে 'কৃ' হইতে কর, কর্ত্তন, ছেদন, খনন, উৎকীর্ণ নিষ্পন্ন। হিব্রুর 'কর' শব্দ দ্বারা খনন (2 Kings 19—24, Genesis 26—15, Job 24—16) এবং 'কারা' দ্বারা বিভাগ করা (Genesis 37—29) বুঝায়। ঋগ্বেদের ১।৪।৬ ঋকের 'কৃষ্টয়' ও ৮।৫।৩ ঋকের 'কৃষ' শব্দের অর্থ কৃষক ও কর্ষণ। হিব্রুর 'কারাব' (Deut 23—10, Judges 14—18, 1 Samuel 3—12) ও 'কারিব' শব্দের (Genesis 45—6, Exodus 34—21) অর্থও কৃষক এবং কৃষি। হিব্রুর 'কারাব' শব্দে যে প্রকার কৃষক ব্যতীত শ্রমজীবী, শিল্পী বুঝায় (2 Samuel 5—11, 1 Kings 7—14, Isaiah 40—20, Hosea 8—6) সেই প্রকার বৈদিক 'কৃষ্টি' শব্দে (২।২।১০, ৬।৩।১১ ঋক) শ্রমজীবী শিল্পী বুঝায়। ঋগ্বেদে (৮।১৬।৯ ঋক) 'কৃষ্টয়' শব্দ আর্য্য-গণের গৌরবাত্মক বিশেষণ। 'কারাব' শব্দও বাইবেলে (Ezekid 21—31) ইব্রীয়দের দক্ষতা-জ্ঞাপক উপাধি। 'কারাব' শব্দযোগে আধুনিক আর্য্য

নায়ক স্থানের পূর্ব্ব দিকে একটি স্থানের 'কারাষিয়' (কৃষকপুরী) নামকরণ হইয়াছিল (1 Chron 4—14)।

ঋগ্বেদে যে 'ধানা' ও 'ধান্য' শব্দ আছে, বিখ্যাত সায়নাচার্য্য মহোদয় সর্ব্বত্রই তাহার অর্থ 'ভৃষ্টযব' করিয়াছেন। কিন্তু ৪।২৪।৭ ঋকের "পচাৎ-পক্কীকৃত ভৃজ্জাতি-ধানাঃ", ৫।৫৩।১৩ ঋকের "যেন তোকায় তনয়ায় ধান্যং বীজং বহ্বেব অক্ষিতম্", ৩।৩৬।৮ ঋকের "হৃদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ" ৬।২৮।৪ ঋকের "পক্তিঃ পচ্যতে সন্তি ধানাঃ" এবং ১০।৯৪।১৩ ঋকের "বপন্তো বীজমিব ধান্যাকৃতঃ" উদ্ধৃত ঋকের ভৃজ্জাতি ধানা, ধান্যবীজ, সোমধানা ইত্যাদির 'ধানা' বা 'ধান্য' শব্দের অর্থ ভাজা যব হইতে পারে না। এই ধানা বা ধান্য শব্দের অর্থ সাধারণ খাদ্যশস্য হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। খাদ্যশস্য (Grain) হিব্রুতে 'দাগান' (Genesis 27—28) এবং সংস্কৃতের ভগিনী পারসীতে 'দানা' নামে পরিচিত। হিব্রুতে শস্যের অপর নাম শেবির। কখনও কখনও দ্রাক্ষারস পর্য্যন্ত 'দাগান' পর্য্যায়ভুক্ত। ৩।৩৬।৮ ঋকের 'সোমধানা' শব্দের অর্থ কি হইলে উচিত তাহা বিচারসাপেক্ষ।

ঋগ্বেদের ১।২৩।১৫, ১।১৬৪।২ ঋকে ষড়ঋতুর প্রসঙ্গ ও ৭।৬৬।১৬, ৭।১০৩।৯, ১০।৯০।৬, ১০।১৬১।৪ ঋকে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুর নাম আছে। শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ থাকিলেও, হেমন্ত ঋতু সহিত ঋতু ছয়টি।

'বর্ষ' শব্দের অর্থ সেচন, বৃষ্টি, বৎসর। বর্ষা অর্থে বৃষ্টি। 'বর্ষ' শব্দের অপর অর্থ বৎসর। মুদ্গলদের স্তুতি-বাচক ঋগ্বেদের ৭।১০৩।১ ঋকের "সংবৎসরং শশয়না ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ" ও ৯ম ঋকের "সংবত্সরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্" ইত্যাদি ঋকে যে 'সংবত্সর' শব্দ আছে, দত্ত মহোদয় তাহার অর্থ বৎসর সম্পূর্ণ হওয়া, এবং ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদক গ্রিফিথ মহোদয় ১ম ঋকে "They who lay quiet for a year", এবং ৯ম ঋকে "Soon as the Raintime in the year returneth" অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে, ঋগ্বেদ-রচনা-কালে প্রাচীন আর্য্যগণ যে দেশে বাস করিতেন, সেই দেশে সংবৎসর-অন্তে প্রাবৃষ-আগত অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টিপাত হইতে বর্ষ বা বৎসরের গণনা আরম্ভ হইত। ইহার সমর্থনকল্পে আরও কিছু বলিতে হইবে।

ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র দেখা যায়, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র বা অহিই জল-অবরোধক। জীমূত-

বাহন ইন্দ্র বৃত্র বধ করিয়া 'শরৎ'-(৪।১৯।৮ ঋক)-কালে সিন্ধু অর্থাৎ আকাশের অবরুদ্ধ জলরাশি মুক্ত করিয়া আর্য্যদের উপকার করিতেন। ঋগ্বেদের ১।১৩১।৪, ১।১৭৪।২, ৬।২০।১০ ঋকে 'শারদীপুর' শব্দ আছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত সায়নাচার্য্য মহোদয় নিজ ভাষ্যে তাহার 'শারদী সংবৎসরঋষন্ধিনী সংবৎসরপর্য্যন্তং প্রাকারপরিখাদিভিদৃঢ়ীকৃতা' এবং 'সংবৎসরপর্য্যন্তং দৃঢ়ীকৃতঃ' ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদক দত্ত মহোদয় 'শারদীপুরী' এবং ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথ মহোদয় 'Autumnal forts' অনুবাদ করিয়াছেন। এই 'শারদীপুর'ই জল-অবরোধক ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের বাসস্থান।

ঋগ্বেদের ১।১৭৪।২ ঋকে "দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দর্ৎ। পণেরপো অনবদ্যার্ণা যূথে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ" এবং ৬।২০।১০ ঋকের "সনেম তেঽবসা নব্য ইন্দ্র প্র পূরবঃ স্তবন্ত এনা বয়ঞ্চঃ। সপ্ত যত্ পুরঃ শর্ম শারদীর্দর্দ্ধন্দানীঃ পুরুকুৎসায় শিক্ষন্" ঋক্ বাক্যের দ্বারা জানা যায়, ইন্দ্র 'শারদীপুর' ভেদ বা জয় করিয়া যজ্ঞবিবাহসূত্র কর্ত্তৃক শারদীপুরে আবদ্ধ জলরাশি আর্য্যরাজা পুরুকুৎস এবং প্রজাদের জন্য প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ৪।১৯।৮ ঋকের "পুর্ব্বীরুষসঃ শরদশ্চ গূর্তা বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্" অর্থ—দত্ত মহোদয় 'ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া তমিস্রা দ্বারা আচ্ছাদিত বহু ঊষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করিয়াছেন, এবং জল বিমুক্ত করিয়াছেন", এবং গ্রিফিথ মহোদয় "Through many a morn and many a lovely autumn, having slain Vritra, he set free the rivers" অনুবাদ করিয়াছেন। উদ্ধৃত ঋকের 'সিন্ধু' শব্দের অর্থ নদী সঙ্গত নহে। ইহার অর্থ জল বা আকাশ হওয়াই সঙ্গত। বৃত্রের এই শারদীপুর ভেদ বা জয় কিংবা অতিক্রম না হইলে, আকাশ বা নদীর বারিরাশি মুক্ত হইত না। সংবৎসর সম্পূর্ণ (৭।১০৩।১, ৯ ঋক) ও বৃত্রের শারদীপুরী ভেদ বা অতিক্রম (১।১৭৪।২, ৬।২০।১০ ঋক) হইলেই, প্রাচীন আর্য্যনিবাসে আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিক হইতে বৃষ্টিপাত, বর্ষ ও বর্ষা আরম্ভ হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের বর্ষা ঋতুতে ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে বৃষ্টিপাত হইত না।

ভারতবর্ষে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা লইয়া উত্তরায়ণ এবং শরৎ, হেমন্ত, শীত লইয়া দক্ষিণায়ন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।১।৩।৪)। ভারতবর্ষে এই উত্তরায়ণের গ্রীষ্ম ঋতুর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ হইতে বৃষ্টিপাতের আরম্ভ, এবং শরৎ ঋতুতে (ভাদ্র, আশ্বিনে) [illegible] শেষ হয়। ঋগ্বেদের ৬।৩২।৫ ঋকের

"স সর্গেন শবসা তক্তো অত্যৈরপ ইন্দ্রো দক্ষিণতস্তুরাষাট্"-এর অর্থ দত্ত মহোদয় "স্বভাবত তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট্ দক্ষিণ হইতে বারি-রাশিকে বিমুক্ত করেন", এইরূপ করিয়া টীকায় বলেন,—'ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয়।' ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক Mr. Griffith উক্ত ঋকের 'Indra with rush and might sped by his coursers, hath swiftly won the *waters from southward*' অনুবাদ করিয়াছেন। এ স্থলে 'দক্ষিণতঃ' শব্দের অর্থ জটিল হইলেও, ইহা দ্বারা দক্ষিণায়ন বা দক্ষিণ দিক মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের ২।১৫।৬ ঋক এবং ৫।৮৫।৩ ঋকের "ত্বেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজন্ বয়ং ন বৃষ্টির্বন্তি ভূম" দ্বারা জানা যায়, যবের জন্য বৃষ্টিপাতে তুমি সিক্ত হওয়া আবশ্যক। ঋগ্বেদের ৫।৮৩ সূক্ত, বিশেষতঃ ঐ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দেখা যায়, ওষধি (যব) বৃষ্টিপাতে অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হয়। ভারতবর্ষে বর্ষাকাল-অন্তে যব-বপন আরব্ধ ও পুনঃ বর্ষা-আগমনের পূর্ব্বেই কর্ত্তন শেষ হয়। দক্ষিণায়নের যব-বপন-সময় (কার্ত্তিক) হইতে ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে বৃষ্টি-পাত হইত, ইহা দ্বারা তাহা আরও সুস্থিতি হইতেছে।

ঋগ্বেদের ১।১১৭।২১ ঋকের 'যুবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা', ৮।২২।৬ ঋকের 'যশস্তমা মনবে পূর্বাং দিবি যব বৃকেণ কর্ষথঃ' দ্বারা জানা যাইতেছে, অশ্বিদ্বয় মনু নামক ব্যক্তি বা প্রথম মনুষ্যকে লাঙ্গল দ্বারা যবের চাষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। যেমনক ঋকে 'পূর্ব্ব' শব্দ থাকায় গ্রিফিথ মহোদয় তাহার অনুবাদে "Ploughed first harvest" করিয়াছেন। ইহাতে এই বুঝা যায়, আদিম মনুষ্য বৈদিক ভূমিতে প্রথমেই যবের চাষ শিক্ষা বা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে যবই বৎসরের প্রথম ফসল। যবের চাষের সময়ে বৃষ্টিপাত ও বর্ষা ও বর্ষগণনা আরম্ভ হইত।

এক্ষণে ইব্রীয় জাতি ও দেশের কথা আলোচনা করিব। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি দুই প্রকার-প্রথায় বৎসর গণনা করিতেন। প্রাচীনতর প্রথায় আমাদের আশ্বিন হইতে 'তিসরি' নামক প্রথম মাস (1 Kings 8—2) গণনা আরম্ভ হইত। যেমন আমাদের দ্বিতীয় মাসের নাম বৃষ, তদ্রূপ ইব্রীয় জাতির প্রাচীন-তর প্রথায় দ্বিতীয় মাসের নাম 'বুল' (1 Kings 6—38)। হিব্রু ভাষায় 'বুল' শব্দের অর্থ বৃষ। মহাপুরুষ মুসার সময়ে যে মাসে ইব্রীয় জাতি মিষর হইতে বাসস্বমুক্ত হইলেন, সেই 'আবিব' মাস হইতে (Exodus 12—2) তৎপর বৎসর গণনা-আরম্ভ পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রাচীন কানান (জুডিয়া) ভূমিতে বৎসরে দুইবার (Joel 2—23, Deut 11—14) বৃষ্টিপাত হয়। প্রথম বৃষ্টিপাত যব-বপনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্বিনের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া হিমের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় (Song of Solomon 2—11)। অন্তিম বৃষ্টি চৈত্রের শেষে আরম্ভ হইয়া অল্পসময়মাত্র স্থায়ী থাকে। সাধারণতঃ বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত আকাশে মেঘ দেখা যায় না। অধিকন্তু সেই সময়ে আকাশে পূর্ব্বীয় শুষ্ক বাতাস (Genesis—41—6, Hosea 13—15) বহিতে থাকে। দক্ষিণায়নের ভাদ্র আশ্বিন (শরৎ ঋতু) অন্তেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রায়ই দক্ষিণ দিক হইতে বৃষ্টি আনিয়া থাকে (Job 37—9, 17 Psalms 78—26, 27 Amos 126—4)। নোয়ার জল-প্লাবন দক্ষিণায়নের শরৎঋতু-অন্তেই 'বুল' (কার্ত্তিক) মাসে (Genesis 6—11) হইয়াছিল; কানান ভূমিতে যবই বৎসরের প্রথম শস্য (Exodus 9—31, Ruth 2—23)। আশ্বিনের শেষ হইতে যবের বপন ও চৈত্রের শেষ হইতে কর্ত্তন আরম্ভ হয়। যব-বপন বা আশ্বিনের শেষ হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়।

প্রাচীন মিষরে নদীর জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত (Deut 10—11)। কিন্তু বাইবেলের প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে (কানানে) কৃষিকার্য্য জন্য জলসেচনের আবশ্যক হইত না। বৃষ্টির জলে কৃষিকার্য্যাদি নিষ্পন্ন (Deut 11—11) হইত। বৈদিক-ঋষিগণ যেমন কৃষি-ও প্রসবের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বৃষ্টিদাতৃরূপে অর্চ্চনা করিতেন, তদ্রূপ প্রাচীন ইব্রীয় জাতির কোনও কোনও শাখা বৃষ্টিদাতা বিশেষের কোনও দেবতাবিশেষের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেন (Jermia 41—32)।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, 67° North latitude পর্য্যন্ত শীতপ্রধান স্থানেও যব শস্য জন্মিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে যব ভারতে উৎপন্ন হইত না। ইহা আর্য্যদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন কালে লোহিত সাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর ও কাকেশস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বনগ্র পশ্চিম এসিয়া ভূমিতে Hordeum-distichon জাতীয় যব বিনা চাষে (বন্য-জাত-রূপে) জন্মিত (The Plants of the Bible, 6)।

ঋগ্বেদে যব ব্যতীত গো-ধূম কি অন্য কোনও প্রকার শস্যের নাম আমার চক্ষে পড়ে নাই। সর্ব্বত্রই কেবলমাত্র যবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মনে হয়, ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে যব ব্যতীত অন্য শস্য উৎপন্ন হইত না। ঋগ্বেদ-পাঠে [illegible] যব আর্য্য-জনসাধারণের (১০।৪২।১০ ঋক) খাদ্য শস্য ছিল।

যব হইতে প্রস্তুত হব্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইত। তৎকালে যব পশ্বাদিরও যে খাদ্য শস্য ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদের বহু ঋকে ইন্দ্রাদি দেবগণের অশ্বকল্পনা ও যব-শস্য-ভক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারি।

প্রাচীন ইব্রীয় জাতি যে দেশে বাস করিতেন, সেই কানান দেশে গম উৎপন্ন হইলেও, যবের চাষ ও ব্যবহার অধিকতর ছিল। যবই ইব্রীয় জনসাধারণ ও অশ্বাদির প্রিয় খাদ্য (Judges 7—13, 1 Kings 4—28 2 Kings 7—1, 16 Leviticus 27—16) ছিল। বাইবেলের বিখ্যাত রূথের বৃত্তান্ত কৃষি ও শস্যাদির কথায় পরিপূর্ণ। এই রূথের কথার ১।২২, ২।১৭, ২।২৩, ৩।২, ৩।১৫,১৭ ইত্যাদি বহু পদে কেবল যবের নাম উল্লেখ দেখি। একটি মাত্র পদে (২।২৩) গমের উল্লেখ আছে। ভাববাদী ইলিশায় বিশখানা যবের রুটী দ্বারা (2 Kings 4—42) শতাধিক ব্যক্তিকেও মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট পাঁচখানা যবের রুটী দ্বারা নিস্তার-পর্ব্বে পাঁচ সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন (John 6—9, 13) করাইয়া অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী ইব্রীয় নারীর প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশ্যে যিহোবার নিকট যাজক কর্ত্তৃক যে ঈর্ষ্যার নৈবেদ্য উৎসর্গ হইত, তাহা কেবল মাত্র যবের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া (Numbers 5—11—31) বিধি। এই প্রকার আর্য্য-নারীর ব্যভিচার-পাপ-স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তে যে হবি উৎসর্গ করিতে হইত, তাহাও যবময় হওয়া আবশ্যক (শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৪।৩।২০।২।৪।৩।২৩)। উভয় জাতির এই প্রশস্ত প্রায়শ্চিত্তে নিবেদিত যবের হব্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হইত (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।৩ ব্রাহ্মণ ; Numbers 5—26) এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে আর্য্য-নারী (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।২০) ও ইব্রীয় নারীকে (Numbers 5—19) তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে একই-প্রকার প্রশ্ন করিবার বিধি দেখা যায়। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি 'নিস্তার' নামক (Easter) পর্ব্বে তাড়ীশূন্য যবের পিষ্টক ভোজন করিতেন।

প্রাচীন ইব্রীয় জাতি পরবর্ত্তী প্রথায় গণিত প্রথম মাসে যবের শীষ উদ্গত হয়, এই জন্য সেই মাসের নাম 'আবিব' (যবের শীষ) এবং তৃতীয় মাসের নাম 'সীবান' (কৃষি-উৎসব) রাখিয়াছেন। এ দেশে অগ্রহায়ণ মাসে ধান্যের শীষ উদ্গম হয়, এই জন্য সম্ভবতঃ ঐ অনুকরণে অগ্রহায়ণ মাসের অপর নাম মার্গশীর্ষ। হিব্রুতে শস্যের শীষের নাম 'শীবোলেদ।'

ঋগ্বেদের ৪।৫৭ ও ১০।১০১ সূক্তে যেমন লাঙ্গল, বোয়াল, ফাল ইত্যাদি নানা প্রকার কৃষি-যন্ত্রের নাম আছে, তেমনই হিব্রু বাইবেলের বহু পদেও

কানানভূমি প্রাচীন কালে পশ্চিম এসিয়ার শস্যভাণ্ডার-স্বরূপ (1 Kings 5—11, Acts 12—2) ছিল। বাইবেলের অনেক পদে শস্যের খামার ও শস্য-মর্দ্দন-স্থানের প্রসঙ্গ (Deut 25—4 and 2 Samuel 24—22) আছে।

'বৈদিক 'উর্দর' (২।১৪।১১ ঋক), হিব্রু ভাষায় 'ইদ্দোরিম' (Deut 2—35) ও সংস্কৃতের ফুল্ল হিব্রুতে 'কারুর্ত' (Amos 1—3) ও এদেশীয় শস্যের গোলা হিব্রুতে 'গোরেন' (Job 39—12) ও মরাই হিব্রুতে 'মোরগ' (2 Samuel 24—22) ও 'মেগুরা' (Hosea 9—1) নামে পরিচিত।

ইলীশায়ের দ্বাদশ ঘোড়া বলদ দ্বারা হার্ষ-বহন (1 Kings 19—19) ও শস্যমর্দ্দনসময়ে গরুর মুখে জালতি বাঁধার নিষেধাজ্ঞা (Deut 25—4) ভূমির সীমানা স্থির রাখার (Deut 27—17 and Proverbs 22—28, 23—10) এবং কৃষি-উৎসব-পালনের বাধ্যতা-সূচক আজ্ঞা (Exodus 23—16, 34—22) দ্বারা ইব্রীয় জাতির কৃষি-প্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংস্কৃতের কর্ত্তরী (কাস্তে) সহ হিব্রুর 'কেরমেস', এবং প্রচলিত কুলা সহ হিব্রু ভাষার 'কেবরা'র তুলনা হইতে পারে। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির মধ্যে ভূমিতে সার দিবার প্রথা (Psalms 83—10) ছিল। তাঁহারা অস্থি-সারের বিষয় অবগত (Jermia 8—2) ছিলেন।

প্রাচীন পারসীক জাতি একটি বলদ ও একটি গর্দ্দভ একত্র যুতিয়া চাষ নির্ব্বাহ করিতেন। মহাপুরুষ মুসার সময় হইতে এই প্রকারে চাষ নির্ব্বাহ করা নিষিদ্ধ (Deut 22—10) হয়। ঋগ্বেদের ১।২৩।১৫, ১।১৭৩।২, ৮।২০।১৯ ঋক ও ৪।৫৭ সূক্তে দেখা যায়, প্রাচীন আর্য্যজাতি ইব্রীয়দের ন্যায় (1 Samuel 14—14, Job 1—14) কেবল বলদ দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

ইব্রীয় জাতি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন (Deut 13—9) করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে আবাদ-যোগ্য ক্ষেত্র ছয় বৎসর অন্তর চাষ ক্ষান্ত রাখিয়া বিশ্রাম দিবার বিধি (Exodus 23—10, 11) ছিল।

আর্য্যদের ন্যায় প্রাচীন পারসীক জাতি (Vendidad 19—19) এবং সেমেটীক জাতি (Hibbert Lecture by Prof. Sayce 438) যবের দ্বারা মাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিতেন। ভূম্যোৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ প্রাচীন আর্য্য রাজগণের (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭১—২৫) Huan Tsuang by Beal

11—87) এবং পঞ্চমাংশ মিষরীয় জোসেফাস রাজাদের (Genesis 41—34) ও দশমাংশ ইব্রীয় অধ্যক্ষের (Genesis 14—20, Nahimia 13—12) এবং দশমাংশ ও শস্যবিশেষে চতুর্থাংশ প্রাচীন সিনিয়র ও আক্কাদ (মেসপটেমিয়া) দেশের ভূমির মালিকের প্রাপ্য (The Primer Assyriology 112) ছিল।

ইব্রীয় জাতি ভূমি-পরিমাপ-প্রথা অবগত (Psalms 60—6, Amos 7—17) ছিলেন। মিষর হইতে দাসত্বমুক্তির পর মহাপুরুষ মুসা ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে সাত হাত নল ও মানরজ্জু দ্বারা ভূমি জরীপ ও বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন (Psalms 78—55)। প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যেও মান-দণ্ড দ্বারা ক্ষেত্রমাপ প্রথা (১।১১০।৫, ৫।৮৫।৫ ঋক) প্রচলিত ছিল। লেউবিয়া-বিধানের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মুসার পূর্ব্বে ভূমি বিক্রয় হইলে তাহা চিরকালের জন্য হস্তান্তরিত (Genesis 23/13—16) হইত। কিন্তু তাঁহার সময় হইতে বিক্রেতা সাত বৎসর অন্তর মূল্য প্রত্যর্পণ করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রীত ভূমি ফিরাইয়া লইতে পারিত। অধিকন্তু মূল্য-প্রত্যর্পণে অক্ষম হইলে ৪৯ বৎসর ৬ মাস ৯ দিবস অন্তর অনুষ্ঠিত 'য়োবেল' নামক (Jubilee) মহোৎসবে বিক্রীত ভূমি আপনা হইতে মুক্ত হইয়া (Levi 25—23—30) পূর্ব্ব মালিকের স্বত্বাধিকারে আসিত। ভূমিতে কাহারও চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে না। যেহেতু সমস্ত ভূমির মালিক যিহোবা (Levi 25—23)। উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে আর্য্যগণ ভাষার কল্যাণে যে প্রকার 'ইরাইয়া' 'আইহান' ইত্যাদি নাম যিহোবা ও যোহন (John) রূপে পরিবর্ত্তিত, তদ্রূপ এই 'যোবেল' শব্দ—জার্ম্মাণে 'য়োবেল'—ক্রমে ইংরাজিতে জুবিলী (Jubilee) রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহমদ।

দেখিত, এবং নিজের সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মৃদু মৃদু হাসিত। আবার কখনও বা স্বামীকে মনে পড়ায়, আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

২

কাল বিকালে মামা আসিয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর দিদির রাঁধা ভাত খাইয়া বাবুর বাড়ী যাইবে। তার পরদিন ভোর ছয়টার ট্রেণে প্রভুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিবে। আবার কবে যে ফিরিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—চাই কি, এক সপ্তাহের ভিতরও ফিরিতে পারে; আবার দুই মাস না হইতে পারে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। তাই সে আজ বিকালে দাওয়ায় বসিয়া, ভাগ্নীকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। ভাগ্নী কিন্তু আজ মামার প্রতি তেমন সুপ্রসন্ন হিল না। সে মামাকে অনেক করিয়া 'বাপ্পা টুকটুকে' শাড়ী আনিতে বলিয়াছিল, মামা কিন্তু কি একটা ভাল নাম কাপড় আনিয়া দিয়াছিল। মামা তাহার মনের অবস্থাটা বুঝিয়াছিল বলিয়াই বোধ করি বলিল, "দেখ দিদি, সিনু কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে।"

সিনু এতক্ষণ আপনার মনেই ঘর-তোর করিতেছিল। প্রকাশ্যে ভাল মন্দ কিছুই বলে নাই; ভাবিয়াছিল, বলিবেও না। কিন্তু এইমাত্র ঐ কথা শুনিয়া আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি দুই হাতে মামাকে জড়াইয়া ধরিয়া মামার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অভিমানে ঠোঁট দু'টা ফুলাইয়া বলিল, "না, আমি তোমায় ভালবাসতে চাইনে, তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি; তুমি আমায়—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার লজ্জা হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

৩

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সিনু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, মা কাঁদিতেছে। দেখিয়া তাহারও কান্না আসিল, কিন্তু কাঁদিল না; সে যে চালাক মেয়ে, মাকে কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, সে যে তাহা জানে! থপ্ করিয়া মায়ের কোলের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মায়ের চোখের জলে ভেজা গাল দু'টি টিপিয়া ধরিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, "তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন মা? আজ ত আমি পেট ভরে ভাত খেয়েছি, তবে তুই—" মা আর গয়লা বুড়ীর সেই উপদেশ স্মরণ রাখিতে পারিল না—তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তোর মামা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে রে—"

"কোথায় পাঠিয়েছে—না মা, কে তোকে বল্লে?"

হায়! পেটুকপনে করিয়া মেয়েকে বুঝাইয়া বলিবে যে, কোনও মানুষ এ কথা বলিয়া যায় নাই, একটী 'পোষ্ট কার্ড' সংবাদ আনিয়াছে যে, তিন দিন হইল, সে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে। মা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আজ তিন দিন হ'ল সে যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে রে, এখন থেকে আমি তোর খোট, আব্দার কেমন ক'রে রক্ষে কর্‌ব মা—"

সিদু ভাবিল, এমন ত আরও কত বার কত জায়গায় গিয়াছে, এবার না হয় ঘরেই গিয়াছে, তাহাতে এমন কাঁদিবার কি কেন! মা যদি বলিত, তাহার মামা কাশী গিয়াছে, তাহা হইলে সে বোধ করি মনে করিত, এই ত সে মাসে কাশী গিয়াছিল, এবার না হয় কাঁসাই গিয়াছে। এমনই সে চালাক মেয়ে! কাজেই মায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"তা গেলেই বা মা, আবার ত আস্‌বে, তার জন্যে আর কাঁদা কেন?" "কি মেরে মা! কৈ আমি ত কাঁদচি নে।" "সেই ত আর একবার কেঁদেছিলি, আবার ত এসেছিল।"

মেয়ের এই কথায় মায়ের দুঃখ উছলিয়া জলিয়া উঠিল। সেবার ভাইয়ের ভারি জ্বর হইয়া মা তাহার পাঁচ পয়সার মানত করিয়া তবে ভাইকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। কিন্তু এবার? সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে এবার সেরেও আর—"

মেয়ে মায়ের মুখ ভার করিয়া টিপিয়া ধরিয়া বিরক্ত হইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—"তুই থামিস্ নে, আমারও কে কান্না পাচ্ছে, চুপ কর!" সিদু আবার মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আস্‌বে, গো আস্‌বে, সে যে সেখানে যাবার সময় আমায় চুপি চুপি বলে গেছে, এবার আমার জন্যে কাপড় আন্‌বে, পুতুল আন্‌বে।"

এতক্ষণে মেয়ে-বেলা পড়শীশিক্ষার উপদেশ মনে পড়াতেই মা চুপ করিবার চেষ্টা করিল। এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলিল না।

৪

দেখিতে দেখিতে পনর দিন কাটিয়া গেল। মা স্পষ্ট বুঝিল, মেয়ে মনে মনে দিন দিন মামার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; অথচ মুখে কিছু বলে না। সে জানে, আজ কাল মা একলাতেই কাঁদিয়া উঠে। কাজেই আগে ভাত খাইতে বসিয়া সে যেরূপ গোলমাল করিত, ক্রমেই সে সব দৌরাত্ম্য কমিয়া আসিতে

লাগিল। যাকে শাস্তিতে রাখিবার উদ্দেশ্যে মেয়ের এইরূপ চেষ্টা, সিঁদুর মায়ের বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। মাও সাধ্যমত তাহার সম্মুখে মুখে হাসি আনিবারই চেষ্টা করিত। যদি দৈবাৎ অসাবধানে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে ধুলা পড়িয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিত।

* * * * *

ভাই বাগ্দীর ঘরের ছেলে ছিল সত্য, এবং সে নিজে লোকের বাড়ীর চাকর ছিল, তাহাও সত্য, কিন্তু তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানটা যেন কিছু বেশী ও অসঙ্গত রকমের ছিল বলিয়া বোধ হয়। সে নিজে বিবাহ করে নাই; দেব-তুল্য ভগ্নীপতির কথা স্মরণ করিয়া তাহার মৃত্যুর পর হইতে প্রাণপণে ভগিনীর দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। একবার তাহার কাজ ছিল না, ক্ষুধায় সিঁদু কাঁদিতেছিল। কাজেই ভগিনী, নিজে তাহারও বাড়ী দাসীবৃত্তি করিবে কি না, এই কথাটা ভাইকে জিজ্ঞাসা করায়, ভাই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই দিনই চাকুরীর জোগাড় করিয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

এখন সেই ভাই মরিয়াছে শুনিয়া সে কোন্ লজ্জায় দাসীবৃত্তি আরম্ভ করে! ভাই বলিত, মেয়ে ছেলের ভিক্ষে মেগে খাওয়াও ভাল, তবু পরের বাড়ীর দাসী হওয়া ভাল নয়। আজ প্রায় এক মাস হইতে চলিল, ভাই মরিয়াছে। এই এক মাসের মধ্যে, সে একটি একটি করিয়া ঘরে যাহা দু'একখানি পিতল কাঁসা ছিল, সব বেচিয়া মেয়েকে অনশনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু এবার? আর ত বেচিবার মত কিছু নাই। ভাবিল, এই যে একটী টাকা আছে, এতে যে ক'দিন চলে চলুক, তার পর ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। ব্যাস, ধর্ম্ম দেখিবে, সে ভাই ও স্বামীর আদেশপালনে কিছুমাত্র ত্রুটী করে নাই; পাড়ার লোক দেখিবে, এক পয়সার সম্পত্তি থাকা পর্য্যন্ত সে ভিক্ষা করিতে বাহির হয় নাই।

৫

প্রায় দিন পনের হইতে গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। দিনে একটা না একটা মরিতেছে। যে যাহার নিজের বিপদ লইয়াই ব্যস্ত। এ সময় সে কাহার বাড়ী ভিক্ষা মাগিতে যাইবে। কাজেই ঘরের আসা তক্তপোষটীও পর দিন আধা দামে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহাতেই এ কয়

দিনও এক রকমে চলিয়া গেল, কিন্তু আবার 'যে নাই, সেই নাই' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ অবস্থায় জমীদারের কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত? আর যদিও তিনি তাহা পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান নায়েব মহাশয় ত কখনই সেরূপ পারেন না, আর পারাও উচিত না। কাজেই এক দিন রাত্রে তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিলেন, মা কালী আসিয়া বলিতেছেন, "আমার ভাল করে পূজো দে, বলিহীন পূজো চলবে না—নইলে পাঁঠা বলি দিতে হবে।" সুতরাং পর দিন হইতে জমীদার মহাশয়ের আদেশমত পাঁঠার জোগাড় হইতেছে; পূজারও রীতিমত আয়োজন চলিয়াছে।

আজ বিকালে জমীদারের সরকার আসিয়া নিধুর নাকে বলিলেন—"শুনছিস্ বাগ্দী বৌ, বলি ক'দিন ধ'রে বাম্নের ছেলে তোর বাড়ী আনাগোনা কচ্চি মায়া ক'রে আর করবি কি বল্—শেষে ত সেই কশাইয়ের হাতেই দিতে হ'বে—মায় আসল নেহাত অল্প চাচ্চিনে। আর তা ছাড়া তোর পাঁঠার ভাগ্যি ভাল যে, মা স্বয়ং তা মানসা করেন। আর যদি জোর করিস্, তা হ'লে জমীদারের লোকজন এসে জোর ক'রে নিয়ে যাবে,—তখন এক টাকা তিন আনা ত দূরের কথা, একটা তাম্রার পয়সাও পাবি নে। দে, আর বাজে গোলমাল বাড়াস্ নে, আমাদের ঐ এফটার জন্যেই আট্কাচ্চে, কোথাও পাওয়া যাচ্চে না—তাই ন্যাতোর দর্জ্জায় আসা—"

বাগ্দী-বৌ ভাবিয়া দেখিল, ঠিক কথা, আর মায়া করিয়া করিবে কি, আর তা ছুঁড়ি-ঐটাই বা আর বাকী থাকে কেন। আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"আচ্ছা দাদাঠাকুর, কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।" দাদাঠাকুর বলিলেন, "দেখ বাছা, কথার যেন নড়্ চড়্ না হয়—তা হ'লে এখনও বল, আমি না হয় অন্য কোথাও দেখি।"

বাগ্দী-বৌ বুকে প্রাণপণ বাঁধিয়া বলিল, "না, তা হবে না।"

দাদাঠাকুর হৃষ্টচিত্তে দু' এক পা অগ্রসর হইয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া খাটো-গলায় বলিলেন—"হ্যাঁ, আর এক কথা, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কতোয় বেচ্লি, তুই বলিস, আমার সখের ছাগল, দাদাঠাকুর অনেক ক'রে বল্লে, তাই চার টাকায় দিলুম, নৈলে কি ও আমার বেচ্বার ছাগল?'—বুঝ্লি, কাজ কি লোকের কাছে ছোটো হয়ে'?"

দাদাঠাকুরের কথাটা বুঝিয়াও, সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পর্ণ-কুটীরের দরজা খুলিয়া বাড়ী ঢুকিল।

৬

আজ কাল সিন্দুর কেন যে পাঠার সঙ্গে খেলা করিতে ভাল লাগে না, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। তাহার কেবলই ইচ্ছা করে, ঘোপের ভিতর, পুকুরধারে, দুপুর বেলা বোসেদের কলা-বাগানে, এক কথায়, মা যাহাতে দেখিতে না পায়, এমন জায়গায় আপন-মনে বসিয়া আশ মিটাইয়া খুব খানিক কাঁদিয়া লয়। কাহার উপর তাহার যেন ভারি রাগ হয়, কিন্তু তাহা ঠিক মায়ের উপর, কি মামার উপর, কি নিজের উপর, তাহা সে ঠিক করিতে পারে না। একবার ভাবে, তাহার দুষ্ট মামা কেন আসিতে এত দেরী করিতেছে। এবার আসিলে, সে তাহার সহিত কথা কহিবে না—আদর করিলে তাহা দিতে আসিবে, তাহা লইবে না—কোলে করিতে আসিলে, কোলে যাইবে না। আবার ভাবে, মা কেন আজ কাল অমন হইয়াছে, কিন্তু কেমন হইয়াছে, তাহাও ঠিক করিতে না পারিয়া মায়ের উপর নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে থাকে। তার পর নিজের উপর রাগ হয়—সে কেন ছাগলের উপর রাগ করিয়াছে, সে তাহাকে মারের উপর ঝাঁপাইয়া আসিতে চাহিলে, সিধু তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া তাহার মনে কষ্ট দেয় কেন?

আজ বারে সিধু বলিল—"বেচলে ও কোথায় যাবে মা?"

মা বলিল—"কালীর মোচ্ছবে পূজো হ'য়ে ও স্বগ্গে যাবে।"

'পূজো হয়ে' যে 'স্বগ্গে' যায় কেমন করিয়া, সিধু তাহা জানিত না। সে যষ্ঠী বুড়ীর 'পূজো' দেখিয়াছে—দেখ টুর পূজো দেখিয়াছে—অধিক কি সে নিজেও কত 'খেলা-ঘরে'র পূজো করিয়াছে; কিন্তু পূজাতে যে তাহার মত অমন কচি পাঁঠাকেও 'লেবকেরা' দুইখানা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারে, ইহা সে কখনো দেখে নাই। আবার পূজা হইয়া গেলে, কোনও জিনিস প্রাণীর মত উড়িয়া 'স্বগ্গে' বা আর কোথাও যায় কি না, তাহাও সে জানিত না। কাজেই সে বিহ্বলের মত মার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আর ওকে দেখ্‌তে পাবো না?" মা বলিল—"না।" মেয়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া বলিল, "তবে অমন পূজো হ'য়ে কাজ নেই মা, ওকে স্বগ্গে যেতে হ'বে না। ওকে সেখানে আমার মতন ক'রে খেতে দেবে কে? ও যে আমার জন্যে কাঁদবে তা' হলে।" এই বলিয়া সে দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না মা, তুই ওকে বেচ্‌তে পাবি নে।" মা ঈষৎ হাসিয়া মেয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল "ও কাঁদবে, আর তুইও কাঁদবি, না? তুই ওকে খুব ভালবাসিস, না মা?" মেয়ের একটু লজ্জা হইল,

বলিল—"না, আমি কাঁদব না—ত্ব" বলিয়াই মায়ের কোলে মুখ লুকাইল। মেয়ের অলক্ষ্যে মায়ের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

৭

পর দিন প্রাতঃকালে দাদাঠাকুর এক টাকা তিন আনা হাতে করিয়া বাগ্দী-বৌয়ের কাছে আসিতেই বাগ্দী-বৌ মিনতি করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুর, আমাকে মাপ ক'রতে হ'বে, এ কাজ আমি পারবো না।" এই কথার পর প্রথমটা দাদাঠাকুর 'মিষ্টি' কথায় বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এখন' বলছি বাগ্দী-বৌ, ভাল ক'রে ভেবে দেখ, এতে আমার মনে কষ্ট হ'বে হোক্, তা'তে আর তোর ভয় কি বল—আজ কাল তোরা ত বামুনকে বড্ডই মানিস্।"

তিনি এই পর্য্যন্ত বলিতেই বাগ্দী-বৌ তাঁহার পা দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অমন কথা ব'লো না দাদাঠাকুর, তোমরাই ত কলির দেবতা, ওতে আমার অমঙ্গল হ'বে।"

'দেবতা' কিন্তু তাহার কথায় শ্রদ্ধা দিলেন কি না দিলেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"তা' আমাদের না-ই মানিস, কিন্তু এতে ঠাকুরও তোর ওপর রুষ্ট হ'বেন—তা জানিস্, আর ঠাকুর রাগ করলে, তুই যার জন্যে দিতে চুচ্ছিস্‌ছে, তার কি হ'বে, তা বুঝতে পারচিস্ কি?"

এই কথায় বাগ্দী-বৌয়ের মাথা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে সমস্ত অন্ধকার বোধ হইল। সিঁদ কাঁছেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, 'রাট্—ষাট্' বলিয়া চুমো খাইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া অবশেষে তাহাকে দাদাঠাকুরের পায়ের কাছে পোঁয়াইয়া দিল; তার পর নিজেও তাহার পা দু'টা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"তোমার দোষ করিছি ঠাকুর, তার জন্যে আর যা বলবে পথ দিতেও হয় দাও, কিন্তু এ কথা মুখে এন' না—তুমিও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে ত দাদাঠাকুর—"

তাহার শেষ কথা শুনিয়া নিজের ছেলের হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়িতেই দাদাঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি অল্প রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"যাক, আমার কিছু বলার দরকার কি, তুই তা হ'লে সত্য বেচ্‌বি নি?"

বাগ্দী-বৌ ভয়ে ভয়ে বলিল—"না দাদাঠাকুর, আমাকে রেহাই দাও।"

দাদাঠাকুর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

৮

বলা বাহুল্য যে, বিপদের উপরেই বিপদ আসে। বাগ্দী-বৌয়ের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। আজিকার দিনটী কোনও গতিকে কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সিদু পর পর দুইবার বমি করিল। ইহাতে তাহার মায়ের মন অস্থির হইয়া উঠিল।

সিদুর মা মেয়েটীকে কোলে করিয়া আনিয়া তুলসীতলায় শোয়াইয়া দিল। তার পর তাহার গায়ে মাথায় তুলসীতলার মাটী ছোঁয়াইতে লাগিল। এমন সময় গয়লা-গিন্নী বাড়ী ঢুকিল। এতক্ষণ বাগ্দী-বৌয়ের চোখে এক ফোঁটাও জল দেখা যায় নাই, কিন্তু গয়লা-গিন্নীকে আসিতে দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে "মা গো" বলিয়াই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। গয়লা-গিন্নী শশব্যস্তে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া কাঁদিতে বারণ করিলেন। সে তখন শান্ত মেয়েটীর মত তাহাই করিল। এ দিকে নেয়ে আর একবার বমি করিতেই, গয়লা-গিন্নী বলিল—"তুই তা হ'লে মেয়ে নিয়ে বস্, কি ক'রবি মা। যাই আমি একবার দেখি, যদি তুলসী ডাক্তারের হাতে পায়ে ধ'রে আন্তে পারি।—" বলিয়াই সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিল। ইনি কিছু দিন হইল কবিরাজি ছাড়িয়া রাবণো পুস্তক পাঠ করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।

ডাক্তার বাসিকার দেহ পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ ভাষায় বলিলেন, "উপস্থিত ঔষধের মূল্য তিন টাকা পড়্‌বে।" শুনিয়াই বুড়ী তাঁহার পা দুটী চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল—"কোথায় পাবো বাবা, দেখ্‌লে ত, এক আনা সুদে সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে তোমায় 'বিজিট' দিলুম, তুমি ত তখন শুন্‌লে না বাবা, নেয়ে আমরা গরীব লোক—কবে আর তোমাকে 'বিজিট' দিয়েছি ঐ টাকাই ওবুদের দাম।"

তিনি বলিলেন—"না পাঁচুর মা, আমিও গরীব, আমাকে দাম দিয়ে ওষুধ কিন্‌তে হয়।" বুড়ী ভাবিয়া পাইল না, আজ তিনি পাষাণের মত এত কঠিন হইলেন কেন? অগত্যা বলিল—"আচ্ছা বাবা, তবে আবার যাই চল সরকার মশাইয়ের কাছে, কি করবো, ঠায় মেয়েটা মরে যাবে গা—" বলিতে বলিতে বাড়ীর বাহির হইতেছিল, এমন সময় বাগ্দী-বৌ পশ্চাৎ হইতে তাহার আঁচল ধরিয়া বলিল—"না মা, থাক্, কাজ নেই—তুমি টাকা ধার কোরো না।"

বুড়ী বিরক্ত হইয়া 'ছাড় বাবু ছাড়' বলিয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বোধ করি বলিল—"এ সময় তোদের টাকা যদি না শোধ করতে পারি, তা হ'লে আমি যে নরকে যাবো—তুই জানিস সে নরকে কি তোর জোয়ানীও ঘণ্যে বসে সব দেখতে না।"

৪

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। যথাসময়ে মেয়েকে জ্বর খাওয়ান হইয়াছিল। এখন মেয়ে নড়াচড়া করিতেছে, আর মা তাহার সংসার ভাঙ্গে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বাড়ীতে, ঘরে ও বাহিরের দাওয়ায় সেই ছাগশিশুটী ভিন্ন আর কেহ নাই। গয়লা-বউ এ বাড়ীতে শুইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার নিজের ভাইয়ের বৌয়েরও দুই দিন ধরিয়া বড় জ্বর হইয়াছিল, আজই তাহা ছাড়িয়া উঠিয়াছে।

এই সময় যদি কেহ প্রতিবেশিনী কলিকাতা গুলিতে পাইত তাহা হইলে সে ছুটিয়া আসিত। মা কালী, আমি পাঁঠা দিব বলিয়া তুমি আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও।' তবু আমি পাঁঠা দিব না। মেয়ে মরিবে, ও'ও ত আমার ছেলেকে খাইয়াছে। পাঁঠা দিলে সে লইয়া যাইবে, মা হয় মেয়েকে খাইবে। তাহা হইলে পাঁঠা দিয়া লাভ। তার পর টাকার জন্য মামলা করিবে। এখন সে তোমরি যা হোক একটু জ্বর কমিতেছে, তখন আর তাহাকে কলিকাতা যাইতে দিব না।

এইরূপ চিন্তায় ভাবিতে তাহার আর তন্দ্রা আসিল। তার পর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন জাদাঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন—"এখনও বলছি বাগ্দী-বৌ, যদি মেয়েকে ফিরে পেতে চাস ত ভাল্লয় ভাল্লয় পাঁঠা ছেড়ে দে—দেখ্‌বি, বামুনের তেজ!" এই কথার উত্তরে সে যেন দৃঢ়ভাবে বলিল—"না, দোবো না।" অমনই ব্রাহ্মণ একটা করিয়া ডাকিল—"যমদূত যাও, এই পাপিষ্ঠা'র মেয়েকে টানা-দন দিয়ে নিয়ে যাও।" পাপিষ্ঠা সভয়ে দেখিল, কে এক জন ভূতের মত ধামুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়াই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বাগ্দী-বৌ চোখ বুজিল। শুনিল, যমদূত বলিল—"এই যাই, কাঁটার ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাই।" মা আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুম্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের উপর পড়িয়া তাহার পা দু'টা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"না ঠাকুর তুমি ছাগল নিয়ে যাও, মেয়েকে নেও না।" তখন ঠাকুর যেন মনে মনে "পথে এস" বলিয়া ছাগলটীর গলার দড়া

ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; আর ছাগলছানাটী তাহার দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া "মা মা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। মা আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল, "ও ঠাকুর—তুমি ওকে ফিরিয়ে দাও, কাজ নেই।" ঠাকুর কিন্তু ছাগল লইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। এই সময় মেয়ে যেন তাহার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সে যেমন মেয়েকে একা ফেলিয়া ঠাকুরের পশ্চাতে ছুটিতে গেল, অমনই রেখিল, সেই যমদূত সজোরে তাহার মেয়ের গলাটা টিপিয়া ধরিল। মেয়ে গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল। মা আর ঠাকুরের পশ্চাতে ছুটিতে পারিল না—"মা গো" বলিয়া সেই খানেই দুম করিয়া পড়িয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে মেয়ে বলিয়া উঠিল—"মা, জল খাব।" মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইল। তার পর মেয়েকে জল দিয়া ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিয়া দাওয়া হইতে ছাগলটীকে কোলে করিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। "না—তুই আমায় ফেলে যাবি নে?" মায়ের এই কথার উত্তরে মেয়ে বলিল—"তুই কাঁদিসনে মা, আমার অসুখ ত ভাল হ'য়ে গেছে।"

সত্য সত্যই তাহার পর দিন সকালে মেয়ে যেন সুস্থদেহে খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর প্রায় ছয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। গয়লা-বুড়ী না থাকিলে এই ছয় দিনের মধ্যে মেয়ে না খাইতে পাইয়াই মারা পড়িত। কিন্তু এমন করিয়াও আর বেশী দিন চলিল না। আজ বিকালে বাগ্দী-বৌ এমন কিছু শুনিল, এবং বুঝিল, যাহাতে সে একটা সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল। শুনিল, সরকার মশায় নিজের টাকা ও জমাদারের বাকেয়া খাজনার টাকা দুই জড়াইয়া মোট ১৮৲ টাকার জন্য বুড়ীর উপর অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে; বুঝিল, সে তাহার সাহায্য করে বলিয়াই বুড়ীর এই দুর্দ্দশা; সঙ্কল্প করিল, আর সে নিজের জন্য "মা"কে অভুক্ত রাখিতে দিবে না।

ইহার পর আরও দিন পাঁচ ছয় কোনও রকমে কাটিয়া গেলে এক দিন বাগ্দী-বৌ 'মা'কে জানাইল যে, পশু সে গোপনে ৭৷৷০ গণ্ডা টাকায় নিজের পৈতৃক বাস্তভিটাটী হীরু মণ্ডলকে বিক্রয় করিয়াছে। বুড়ী শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এখন তবে মেয়ে নিয়ে থাকবি কোথা হতভাগী?" সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি বাগ্দীর মেয়ে বলে কি আর এত বোকা মা,

যে সাড়ে সাত গণ্ডা টাকায় এতখানি জায়গা শুদ্ধ বাড়ী বিক্রী ক'র্‌ব? আমি যে বাড়ী বিক্রী করেছি, তা' কি তোমরা কেউ শুনতে পেয়েছ? কথা হ'য়েছে, এখন পাঁচ বছর আমি মেয়ে নিয়ে যেমন আছি, তেমনটি এ বাড়ীতে থাক্‌বো, তার পর যা' হয় হ'বে; হ্যাঁ, আর তা ছাড়া এই পাঁচ বছরের মধ্যে যদি টাকাটা যোগাড় করতে পারি, তা' হলে আমার বাড়ী আমারি থাক্‌বে—কার আনে, বাঁধা রেখেছি, সুদটুদ কিছু লাগ্‌বে না ব'লেছে।"

শেষ কথা শুনিয়া বুড়ী কিছু খুসী হইল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে বাগ্দী-বৌ বুড়ীকে আটটী টাকা দিতে গেল। বুড়ী বলিল যে, মেয়ে যে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই তাহার টাকা শোধ হইয়া গেছে। কাজেই বাগ্দী-বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল—"নিলে না, আমার-ই বেঁচে গেল।"

গয়লা-বুড়ীও আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কতকটা যেন আপন মনে বলিল—"বেঁচে যে কার গেল, তা' মাথার ওপর যিনি আছেন, তিনিই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন।"

ইহার পর "কেন?"র উত্তরে গয়লা-বুড়ী স্বর পাল্টাইয়া সহস্রবার তাহার মৃত স্বামীর প্রশংসা করিয়া একটী একটী করিয়া জানাইল যে, সেই একবার যখন তাহার ছেলের ভারি ব্যামো হয়, তখন সে যদি না দশটী টাকা ধার দিত, তাহা হইলে সে কি আর সেবার ছেলেকে ফিরিয়া পাইত? তাহার পর কত দিন কাটিয়া গেল, তবু আর সে কোনও মতেই সে টাকা শোধ করিতে পারিল না। ইহাতেও সে একটী দিনের জন্যও বলে নাই যে, 'কি গো, টাকা কটা দেবে?'

* * * *

পর দিন সকালে "সা"য়ের মাথায় অপূর্ব্ব বুদ্ধি যোগাইল। সে ভাবিল, এই টাকাটা সুদে খাটাইলে, বাগ্দী-বৌয়ের কোনও রকমে চলিয়া যাইতে পারে, চাই কি, বাড়ীটাও ছাড়ান যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সে বাগ্দী-বৌয়ের মত জানিবার জন্য বরাবর বাগ্দী-বাড়ী আসিল। কিন্তু বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাগ্দী-বৌ নাই, তাহার মেয়ে নাই, ছাগলছানাটীও নাই—বাড়ী যেন শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বুড়ী মাথায় হাত দিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র।—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নেপথ্যে' নেপথ্যে থাকিলেও সেখানে ক্ষতি হইত না।' শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের 'সুন্দর-মঙ্গলে' প্রথমে 'কুৎসিতে'র ছায়া, তাহার পরে 'সুন্দরে'র আলো। এই ছায়া ও আলোর সমাবেশে কবি 'সুন্দর-মঙ্গল' ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রাম্যতা—ভাবের গ্রাম্যতা, ভাষার গ্রাম্যতা, অঙ্গনার গ্রাম্যতা অত্যন্ত অধিক। সুন্দর ও কুৎসিতের দুইটি সুদীর্ঘ, সুবিস্তৃত তালিকাই প্রীতিকাব্য হইতে পারে না। তাহে কুৎসিতে ও সুন্দরে—উভয় ভাগেই উপভোগ্য শ্লোক আছে। কিন্তু

"লজ্জাহীনা, উলঙ্গ হইয়া,
টপ্পা দীস্ নাচিছে নাচিয়া"

জানিয়া দেখাইবার প্রয়োজন কি? প্রত্যেক কুৎসিতকে নিরাবরণ করিয়া, তাহার বীভৎস কৌৎসিতা দেখাইয়া সুন্দরের মহিমা ও গৌরব ঘোষিত করিতে হইলে, সৌন্দর্য্যই ম্লান হইয়া পড়ে। সর্ব্বজনপাঠ্য—বিশেষতঃ ~~নবীনা কবিতা~~ ~~কবির~~ নবীনতার অভাবও অন্যান্য দোষের।

'ভিখারীর গালে মারি চড়,
হেসে ছেলে গড়িস্ বপ্পড়!'

পুরাতন common-place। অত্যন্ত খেলো। দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য নহে। 'চড়ে'র সঙ্গে মিলাইবার জন্য 'বপ্পড়'কে টানিয়া আনিয়া ব্যবহার করিলে কবিতা নিশ্চয়ই মুষড়াইয়া পড়ে।

'অযুত মুকুল, পরিচুলা
বিম্ব মাঝে বিন্দু বাঁকুলা!'

আকারের চিহ্নটি সার্থক হইয়াছে বটে। কিন্তু পরিচুলার অনুরোধে 'বিম্ব' স্ত্রীলিঙ্গ হইতে সম্মত হইবে কি?

'দীঘাকারে বিথারিয়া তনু
ধায়ে সৌন্দর্য্যের বানধনু।
সবুজে সবুজে এ কি ছুটি!
লাগে নীল পীতের কি ছটা!'

এইরূপ দুই চারিটী সুন্দর শ্লোক এই সুদীর্ঘ কবিতায় বিরল নয়। 'ধাত্রি এ কি আনন্দ উদয়' হইতে 'হে সুন্দর তব মূর্ত্তি রাজে' পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের ছাপ আছে।—কিন্তু মণিহারীর দোকান কবিতা নহে। এই কবিতায় সুদীর্ঘ কুৎসিতের তালিকা ও অপেক্ষা সুদীর্ঘ সুন্দরের তালিকা আছে বটে, কিন্তু সেই সকলের সমাবেশে ও সমাহারে কবি একটী সমগ্রের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাই কবিতাটি খাপছাড়া ও 'পানসে' হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু তাহা বাজারে স্তূপীকৃত পণ্যের মত—কবিতার নিজস্ব নহে। 'ফরাসী হইতে' অনূদিত 'সাহিত্য' উল্লেখের যোগ্য। তাহার রচনা, তাহা প্রকাশ নাই। ফরাসী লেখকের একটি সিদ্ধান্ত,—'ইংরেজের

অনুকরণে সমস্তই যথাসম্ভব হইয়াছে।' 'সমস্তই' অত্যুক্তি। 'যাত্রা ও পৌরাণিক নাটকের পরিবর্ত্তে, সামাজিক নাটক।' এখনও পৌরাণিক নাটকের পার্শ্বে সামাজিক নাটকের অভিনয় হইতেছে। 'কবি লক্ষ্মীলাল "প্রেমসাগর" নাম দিয়া ভাগবদ্গীতার অনুবাদ করেন।' 'ভাগবদ্গীতা' নামক কোনও বস্তু নাই। আমাদের ভগবদ্গীতা আছে, আর ভাগবত আছে। 'প্রেমসাগর' ভগবদ্গীতার অনুবাদ নহে; ভাগবতেরও অনুবাদ নহে। তাহা ভাগবতের প্রভাবে অনুপ্রাণিত কাব্য হইতে পারে। 'সমস্ত ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে, ভারতবাসীদিগের য়ুরোপকে জানিবার চেষ্টা, য়ুরোপকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়; কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটা "লজিক্যাল" ধরণের ও একটা সর্ব্বাধীন ক্রমোৎকর্ষ-পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে, বঙ্গদেশ ভারতের জ্ঞানানুশীলন-ক্ষেত্রে একটা গৌণ স্থান অধিকার করিত; তথাপি, হিন্দু চিন্তা-প্রবাহে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যিক ইতিহাসে বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়।' বঙ্গদেশ ভারতের জ্ঞানক্ষেত্রে গৌণ স্থান অধিকার করিত, এ মতও অভ্রান্ত নহে। ন্যায়শাস্ত্র, তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের জ্ঞান ও ভক্তির ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল; এখনও সে অধিকার বঙ্গদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বঙ্গদেশ পাণিনি পড়িয়াছে, তাঁহার পুঁথি স্বয়ং নকল করিয়া লইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর 'স্বাদেশিকতা'র প্রমাণ-পরিমানের দাবী নহে। ঐতিহাসিক সত্য। কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণও 'অনুবাদ'—ভারতচন্দ্রের গোটা অংশ—বিদ্যাসুন্দরের কিয়দংশ 'কামগন্ধী', সমগ্র 'অন্নদামঙ্গল' কামগন্ধি নহে। তাহাকে লঘু-কবিতাও বলা যায় না; বস্তুতঃ আমরা তাহা মনে করি না। তবে 'লঘু'র বিপরীত যদি 'গুরুগম্ভীর' হয়, তবে গুরুগম্ভীরের বিপরীত বলিয়া ভারতচন্দ্র 'লঘু ধরণের কবিতা' হইতে পারে। রামপ্রসাদ শুধু 'সরল প্রাঞ্জল ধরণের কবি' নহেন, তিনি সিদ্ধ সাধক। তাঁহার গান 'নিছক' কবিতা নহে; সাধনালব্ধ অনুভূতি ও ভক্তির উচ্ছ্বাস; সত্যের প্রকাশ। প্রাচীন সাহিত্যের এই আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব, এবং সেই বিশেষত্বের অসাধারণ প্রভাব, লেখক তাহার অধিকার ও সার্থকতা প্রভৃতি বিচারে ধরিতে পারেন নাই। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী এই নিবন্ধে নিমজ্জতীনোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ। ভারতের স্ত্রী-ইতিহাস বিচারে লেখক যে বিচক্ষণতার ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, —'রামমোহন রায়ের পর সমস্ত সাহিত্য নবীভূত হইল। এক দিকে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮০৯-৫৮) Aristophanএর মতো রক্ষণশীল ও পরিহাস-রসিক, বিদ্রূপ-কশার দ্বারা য়ুরোপের পক্ষপাতী, উদারমতাবলম্বী নৈয়ায়িকদিগকে চাবুক কাইতেছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে, একেশ্বরবাদের পক্ষ ও সমাজসংস্কারের পক্ষ প্রদর্শন ও পোষণ করিতেছিলেন। সকলের অগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১); ইনি বিংশ শতাব্দীর এক জন মহানুভব ব্যক্তি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ শক্তিশালী লেখক, এবং সর্ব্বোপরি সমাজসংস্কারক:—১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। Seeley প্রণীত Ecce homo গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকে দেবতার মধ্যে গণ্য করেন নাই, তাঁহাকে এক জন ধর্ম্মশীল বীরপুরুষ, শান্তিপ্রিয় ও সভ্যতা-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তিনি বলেন,—গোপীগণ ও রুক্মিণী—এ সমস্ত কবিকল্পনা।' শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চক্র ও চক্রান্ত' চলনসই গল্প বটে, 'ছোট গল্প' নহে। শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরীর 'স্বপ্নে' নূতন তথ্য প্রকাশ, দৃষ্টান্ত, বা অভিনব সিদ্ধান্ত নাই। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ভারতীর কূলে 'কুঁড়ি'কে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুঁড়ি ফুটিবে না, কবিও ছাড়িবেন না। 'কুঁড়ির লজ্জা করে, কিন্তু তিনি 'লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে' বলিতেছেন—'ত্বরা করে নাও মুকুল ফুটাও আবেশ পানে!' যেন পূজার ছুটীতে কোনও ব্যস্তবাগীশ কেরাণী কেরাণী-পাড়াতে তাঁহার জড়-সড় তরুণী গৃহিণীকে দ্রুত চলিবার জন্য ধমক দিতেছেন—'শীগ্‌গির চল,—ট্রেণ ছাড়িয়া যায়!' শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'শরৎকুমার' সামাজিক গল্প; এ কালের চলতি সুখপাঠ্য।

প্রতিভা। ভাদ্র। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের 'বাঙ্গালীর ইতিহাসের সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য' ভাদ্রের 'প্রতিভা'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অধ্যাপক বসাক প্রত্নতত্ত্বের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি মনীষীর সংস্কৃত-ভাষার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণের শক্তি ভাবতীর প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে তাঁহার সহায় হইয়াছে। বর্ত্তমান নিবন্ধে তিনি তাঁহার বক্তব্য সুচারুরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছেন, এবং 'বাঙ্গালীর ইতিহাসের সঙ্কলনে লেখের মূল্য' যে অত্যন্ত অধিক, তাহা সুপ্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] 'প্রাচীন ভারতের বিবাহবিধান' প্রবন্ধে প্রাণিতত্ত্ব ও গবেষণার পরিচয় আছে। শ্রীপূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্যের 'ঘাটু গান' আমরা সকল সাহিত্যপ্রিয় বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। এই প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গালার 'ভাটীমুলুকের' স্ত্রী-কবিরের ঘাটু গানের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আমাদের সজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যে—গ্রাম্য সাহিত্যে নিম্নবাঙ্গালীর জীবনের এইরূপ বিবিধ বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট মানসিক বিপরিণামের বহু পরিচয় এখনও খুঁজিলে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমাদের সাহিত্যের প্রথম স্তর, স্বাভাবিক স্তর। এইরূপ অনেক স্তর পরবর্ত্তী স্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, অনেক স্তর কালপ্রবাহে লুপ্ত হইয়াছে। অনেক লুপ্ত স্তরের উপর আবার নূতন স্তরের সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল স্তরের স্বরূপ আমরা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি; আমাদের গ্রাম্য-জীবনের অমূল্য স্মৃতিসমূহ কালের গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেগুলি রক্ষা করিতে না পারিলে আমরা জাতির অতীত ভাবসম্পদে বঞ্চিত হইব; বাঙ্গালার 'গণে'র মানস-বৃত্তির ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিতে পারিব না। লেখক বলেন,—'বর্ষাকালে ভাটীমুলুকের প্রত্যেকেরই দুয়ারে নৌকার প্রয়োজন। * * * হাটবাজার করিতে বা একটু দূরে যাইতে হইলেই পরের নৌকার সাহায্য লইতে হয়। এমন-কি, কোনও কোনও গ্রামের দুই দশখানা নৌকাই সারা পাড়ার মানুষ লইয়া বাজার করিতে যায়। ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া মানুষ তুলিয়া লওয়া হয়। হাটে বাজারে যাইবার পথে সমাজের কথা, পরনিন্দা প্রভৃতির আলোচনা অপেক্ষা ভাটিয়াল রাগিণীতে "বাইত্তর বছরের পাড়ি—বেলা আছে দণ্ড চারি" [illegible] ভাবাত্মক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লালা আনন্দীরাম নির্দ্দিষ্ট গানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ

করিয়া ঘাটু গানের প্রবর্ত্তন করিলেন। ঘাটে ঘাটে গানকারী সংগৃহীত হয় বলিয়া 'ঘাটু' গান নামকরণ হইয়াছে। প্রথমে হয় ত ঐ ভাবেই ঘাটুগান গীত হইত। তার পর উহার বিস্তৃতি হইয়াছে। ক্রমে ঘাটুগান আর হাটে বাজারের পথে আবদ্ধ রহিল না। শুধু গানের উপরেই গায়ক সংগ্রহ করা হইত, এবং নৌকার উপর যন্ত্রবৎ আসর জমান হইতে লাগিল। পাটনীর বড় নৌকা বা দুই নৌকা একত্র বাঁধিয়া তাহাতে চাঁদোয়া খাটাইয়া—রং বেরঙের নিশান উড়াইয়া, ঘাটুর আসর তৈয়ার হইতে লাগিল। * * কিন্তু ইহাতে একটু অসুবিধা হইয়া পড়িল। নৌকায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মানুষ লওয়া হয়; সুতরাং সকলের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এ জন্য একদল সৌখীন গায়ক ঘাটুকে স্থলচর করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। * * * ফলে ঘাটুগান—স্থলঘাটু ও জলঘাটু—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একই গান —একই রীতিনীতি—কেবল গানের বিভিন্নতামাত্র।'—লেখক ঘাটুগান রক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা জানি, তাঁহার ঐ পরামর্শ নিষ্ফল হইবে না। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'সপ্তর্ষি' ছাপা হইয়া গেল? বাঙ্গালার জীবনে অনেক দুঃখ আছে, আর কবিতায় দুঃখ সহি কেন? শ্রীসুন্দরমোহন মল্লিক 'শ্রীবৃন্দাবনে' 'শ্লোকে'র সঙ্গে পুলকের মিল করিয়াছেন! 'ধ্যান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আঁখি-জল দিয়ে ভক্তি-নবনীতে' বৃন্দাবন গড়িয়াছেন। ধ্যান ও প্রাণ চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না। রচনায় এক বিন্দুও নবনী দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সুমুদের বৃন্দাবন-রচনায় যে অজস্র আঁখি-জল খরচ হইয়াছে, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। লেখক তাহা বলিয়া না দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

প্রবাসী।—ভাদ্র।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পল্লীসংস্কারের আদর্শ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসুর 'অভিলাষ' এই যে, 'সুর হই, অতি নাই; প্রবাসদীপের সম সপ্তদীপ করিব গঠন।' এই শেষটুকুর বুঝা ভার। উদ্দেশ্যের [illegible] নাই, [illegible] আছে, কিন্তু কিছু 'বুঝিবার উপায় নাই। [illegible] কবির জয় কি? এই কয় চরণের কুদ্র কবিতায় এত অস্পষ্টতা। ইঁহার প্রবাসদীপ কি দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'বৈষ্ণব-ভিক্ষা' সুলিখিত। আমাদের অল্প পরিসরে এ প্রবন্ধের মতামতের আলোচনা সঙ্গত নহে। অজিতবাবু পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে আলোচনার ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। অজিতবাবু এই প্রবন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। আশা করি, যাঁহারা বিশেষবিৎ, তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের 'নব-যৌবন' কথার কচকচি।—প্রথমে 'অঙ্গে অঙ্গে উথলে পুলক!'—পুলক নাচে নাচিয়াছে, তাহার পর তাহারও পুলকের মত দশা হইয়া গিয়াছে। এবার সে কড়ার ভর্ দুধের মত উথলাইয়া উঠিল। প্রথমে দেহের কারবার; কিন্তু উপসংহারে 'হে সুন্দর!' আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা একটু বদলাইয়া বলা যায়—,

'সবগুলই বিচিত্র কবিতার কাঁও,
গোড়া নাই, আগা!'

এখনও সিধা 'অভ্যস্ত ও দুরস্ত' হয় নাই: 'পুলক' ও 'চোখ', 'মন' ও 'যৌবন', 'গুঞ্জন' ও 'গুন্ত-গুন' অযথা মিল। 'যা পড়া যা [illegible]

[illegible]

[illegible]

নারায়ণ। ভাদ্র। [illegible]

করিয়াছেন। সূচনায় বিদেশী ও স্বদেশী সমালোচকগণের সমালোচনার সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।—এই সবে আরম্ভ। 'এ কি স্বপ্ন?' মোপাসা অবলম্বনে সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে আখ্যান-বস্তুর বৈচিত্র্য ও পরিণতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীভারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 'প্রাচীন পুঁথির বানান' প্রবন্ধে যে সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী ও ভক্তগণ তাহার মীমাংসা না করিলে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিবে।—'কমলের দুঃখ' এই সংখ্যায় শেষ হইল।—যাহা অ-শেষ, অনন্ত ও অনপনেয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, খোদ 'নারায়ণ'কেও তাহা শেষ করিতে হইল। 'বিসর্জ্জন আসিয়া' কুৎসিতের 'প্রতিষ্ঠা'কে লইয়া গেল।' বালুময়ী বেলার উপর লালসার পদচিহ্নও থাকিবে না; কারণ কামের সরোবরে জলের উপর যে আলিপনা দিয়াছিল, তাহাও ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই শিবের জলময়ী চমুতে মিশিতে পারিবে। কিন্তু 'কমলের দুঃখ' কালের এক অংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এক খণ্ডে যে গরলের ধারা ঢালিয়া দিল, কোন্ মহাদেব তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবেন?—'দাও করতালি, জয়-জয় বলি'—চিত্তরঞ্জনের পরম-প্রিয় 'কমলের দুঃখ' শেষ হইল। বাঙ্গালা দেশে ভাদ্র মাসে ইহার শেষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ হইয়াছে; তাহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রীরত্নেশচন্দ্র সেনের 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' এই সংখ্যায় শেষ হইল।—চাঁদগ্রামের কবি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে চারিটী 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীতে'র উদ্ধার করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'বঙ্কিম-স্মৃতি'র বিজ্ঞাপন আমরাও ছাপিয়া দিলাম। আশা করি, পরিষদের এই সাধু চেষ্টা অচিরে সাফল্য লাভ করিবে।

বঙ্কিম স্মৃতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট অর্থসাহায্য-প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।